Calcutta Sanskrit College Research Series No. XIII.

Published under the auspices of the
Government of West Bengal.

STUDIES NO. 4

VEDA-MIMAMSA

(A Vedic Compendium)

VOL. I.

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1961

VEDA-MIMAMSA

VOL. I

BY

ANIRVAN

Honorary Research Fellow, Sanskrit Seminar,
Government Sanskrit College, Calcutta.

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1961

CALCUTTA SANSKRIT COLLEGE RESEARCH SERIES NO. XIII

প্রথম খণ্ড

অনির্বাণ

तस्यै

या

उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ।

—ऋक्संहिता, १०।७१।४

বৈদিক সংস্কৃতসাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের অনেকেরই নেই। সংস্কৃতসাহিত্য বল্‌তে আমরা সাধারণতঃ লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যকেই বুঝি। ঊনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথম পাদে পাশ্চাত্ত্য মনীষিবৃন্দের অনলস চেষ্টার ফলে বৈদিকসাহিত্যের অতুলনীয় রত্নভাণ্ডারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বর্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৈদিকসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও বৈদিকগ্রন্থের প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে। এর ফলে বৈদিকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌রাজি জনসাধারণের গোচরে আস্‌বার সুযোগ হয়েছে।

আমাদের দেশে অনেকের মনে এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল ছিল যে সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের অন্য প্রান্তে বৈদিকসাহিত্যের চর্চা অব্যাহতভাবে প্রবর্তিত হয়ে আস্‌লেও পূর্বভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে এর চর্চার স্রোত লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছুকাল হ'ল এমন সব প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে যার জোরে বলা যেতে পারে যে বৈদিকসাহিত্যের চর্চা এদেশে বরাবরই ছিল এবং কোনদিনই তার প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ১৯৫০ সালে যখন আমাদের এই কলেজে স্নাতকোত্তরগবেষণাবিভাগের উদ্বোধন হয় তখন বৈদিকসাহিত্যের সবিশেষ আলোচনা কর্‌বার জন্যে একটি শাখা স্থাপিত হয়। গত কয়েক বৎসরে সেই শাখায় যে সব গবেষণা হয়েছে তার জন্যে জগতের সুধীসমাজ আনন্দ প্রকাশ করেছেন। একটা অসামান্য আবিষ্কারের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে থাক্‌তে পারছি না—সেটা হলো অথর্ববেদের পৈপ্পলাদসংহিতার সমগ্র পুঁথিটি আমরা পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা কর্‌ছি যে তার সম্পাদনার কাজও অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

বৈদিকসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের পাঠকসমাজের যাতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় অনায়াসে করিয়ে দেওয়া যায় তার জন্যে বাংলাভাষার মাধ্যমে বৈদিকসাহিত্যের বিষয়-বস্তু এবং মন্ত্রার্থ প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছা অনেকদিনই আমার ছিল এবং সেজন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানেও ছিলাম। বছর দুই আগে যখন শিলং যাই তখন অনির্বাণের নিকট আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করি এবং তিনি সানন্দে আমার সেই অভিপ্রায়সাধনে স্বীকৃতি দেন। আজ এই গ্রন্থপ্রকাশ তারই পরিনিষ্ঠিত ফল।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

নিবেদন

বেদ-মীমাংসা ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রব্যাখ্যার ভূমিকা। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আছে বেদব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিকসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরবর্তী খণ্ডে আলোচিত হবে বৈদিক দেবতা, বৈদিক সাধনা, বৈদিক দর্শন, বৈদিক জীবন এবং পুরাতত্ত্ব। তারপর ঋক্‌-সংহিতার মন্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করবার ইচ্ছা আছে।

কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদ্যোগী না হলে এ-গ্রন্থ প্রকাশিত হত না। মুদ্রণব্যাপারের সমস্ত ভার উক্ত কলেজের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং পুস্তকপ্রকাশন-বিভাগের সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয় নিজেদের কাঁধে নিয়ে আমার পরিশ্রমকে লঘু করেছেন। এঁদের সবার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য হয়ে রইল। যেসব বন্ধু বা বান্ধবী নানাভাবে এই গ্রন্থরচনায় আমার আনুকূল্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন।

"হৈমবতী"
অক্ষয়তৃতীয়া, শকাব্দ ১৮৮৩

অনির্বাণ

সূচীপত্র

সঙ্কেত-পরিচয়

অ., অ. স.	অথর্বসংহিতা
আ. শ্রৌ.	আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র
ঋ., ঋ. স.	ঋক্‌সংহিতা
ঋ. ভা.	সায়ণকৃত ঋগ্‌বেদভাষ্য
ঐ. আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষৎ
কাঠ.	কাঠকসংহিতা
গী.	গীতা
ছ. ব্রা.	ছন্দোগব্রাহ্মণ
ছ. সূ.	ছন্দঃসূত্র
ছা., ছা. উ.	ছান্দোগ্য উপনিষদ্
জৈ. উ. ব্রা.	জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ
জৈ. ব্রা.	জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
তা. ব্রা.	তাণ্ড্যব্রাহ্মণ
তু.	তুলনীয়
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. ব্রা.	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ
তৈ. স.	তৈত্তিরীয়সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘণ্টু
পা.	পাণিনিসূত্র
পাত.	পাতঞ্জলযোগসূত্র
পু.	পুরাণ
পূ. মী. সূ.	পূর্বমীমাংসাসূত্র
প্র.	প্রশ্নোপনিষদ্

প্রতু.	প্রতিতুলনীয়
বৃ., বৃ. উ.	বৃহদারণ্যক উপনিষদ্
ব্র. সূ.	ব্রহ্মসূত্র
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মহা.	মহাভারত
মাণ্ডু.	মাণ্ডূক্যোপনিষদ্
মু.	মুণ্ডকোপনিষদ্
মৈ.	মৈত্র্যুপনিষদ্
মৈ. স.	মৈত্রায়ণীসংহিতা
যা. স্মৃ.	যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি
যো. সূ	যোগসূত্র
R. P. V. U.	Keith's Religion & Philosophy of the Vedas & the Upanishads
ৱা. স.	বাজসনেয়সংহিতা
শ., শ. ব্রা.	শতপথব্রাহ্মণ
শা. আ.	শাঙ্খায়ন আরণ্যক
সা. স.	সামসংহিতা
H. D.	Kane's History of Dharmashastra

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সর্বত্র বর্গীয় 'ব'-এর উচ্চারণ বোঝাতে বাংলা **ব** এবং অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ বোঝাতে অসমীয়া **ৱ** ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্ধরণগুলির মাঝে নিম্নের চিহ্নগুলি বোঝাচ্ছে :

o	সমরূপ বলে বর্জিত শব্দাংশের অনুবৃত্তি
+	সন্ধি
*	বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য
( )	পুনরুক্ত বা তদ্বৎ
...	ইত্যাদি

উদ্ধরণের সূচক সংখ্যার কোনও অঙ্ক পরিত্যক্ত হয়ে থাকলে পূর্বের সংখ্যা থেকে তার জের টানতে হবে, যেমন—

ঋ. ১০৷১০৩৷৪, ২৫৷২ = ১০৷২৫৷২।

বেদ-মীমাংসা

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-কথন

১

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উষাকাল শুরু হয়েছে বৈদিক যুগ দিয়ে। তার আগের কথা আমাদের ভাল করে জানা নাই। এর চাইতেও প্রাচীন কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতি এদেশে যদি থেকেও থাকে, তা বৈদিক সংস্কৃতির মাঝে জীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, বেদের মাঝেই ভারতবর্ষ যেন সর্বপ্রথম সমগ্রভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে।

আর এই আত্মসচেতনতা রূপ নিয়েছে অধ্যাত্মভাবনায়। বৈদিক যুগের ইতিহাসের পুরাতত্ত্বীয় উপাদান বিশেষ-কিছুই নাই, কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান উপাদান আছে বৈদিক সাহিত্যে। সাহিত্যে পাই জাতির অন্তরের ইতিহাস, তার যথার্থ আত্মপরিচয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসকে বোঝবার পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা এবং তার ভাবনার অনুশীলন তাই অপরিহার্য।

এই সাহিত্যের আয়তন অতি বৃহৎ। একটা জাতির বহুসহস্রব্যাপী অধ্যাত্মচিন্তার ধারাকে এর মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। আজও যে সে-চেষ্টার বিরাম হয়েছে, একথা বলা চলে না। কালক্রমে মানুষের ভাষা বদলায়, তার আচার-ব্যবহারেরও অদল-বদল হয়। কিন্তু ভাবের অন্তর্নিহিত সত্যের ক্রমিক অভিব্যক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে, কোনও জাতির অন্তরপ্রকৃতির খুব যে বদল হয় তা নয়। নিজের সম্পর্কে বিশ্বের সম্পর্কে বৈদিক ঋষিরা যে-ধারায় চিন্তা করতেন বা এই রহস্যকে বোঝবার চেষ্টা করতেন, সে-ধারাকে অনুসরণ করবার প্রয়োজন আজও আমাদের ফুরিয়ে যায়নি। তবে হৃদয়ের আকূতিকে তাঁরা যে-ভঙ্গিতে প্রকাশ করে গেছেন, আমরা আজ তা সবসময় ব্যবহার করি না। কালের ব্যবধানে এখানে বাইরে একটা ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে, তাইতে তাঁদের অনেক কথা আজ হয়তো আমাদের কাছে দুর্বোধ মনে হয়।

কিন্তু এই দুর্বোধতাও সমগ্র বৈদিক সাহিত্যসম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। এ-সাহিত্যের মোটামুটি চারটি ভাগ—মন্ত্রসংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক আর উপনিষদ। খুব প্রাচীন বিভাগ হল মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। এর মধ্যে মন্ত্রই মূল, ব্রাহ্মণ তার উপব্যাখ্যান। আরণ্যক আর উপনিষদ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতার দিক দিয়ে

(কালের পৌর্বাপর্যের দিক দিয়ে নয়) দেখলে মন্ত্রে যে-সাহিত্যের আরম্ভ, উপনিষদে তার শেষ। এর মধ্যে উপনিষদ আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য—কেননা উপনিষদে ভাব প্রধান, তার প্রচার বহুল, তার ভাষাও আমাদের কাছে খুব অস্পষ্ট নয়।

কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে বেদের মন্ত্রভাগ নিয়ে। একে মন্ত্রভাগের ভাষা প্রাচীন, তারপর যে-ব্রাহ্মণগুলি বেদের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা বলে গণ্য হতে পারে, ধারাবাহিকভাবে মন্ত্রব্যাখ্যা করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। ব্রাহ্মণভাগ মুখ্যত বেদার্থ-মীমাংসা নয়, কর্ম-মীমাংসা। বেদের মন্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়াকাণ্ডের যোগ অতি নিবিড়। ব্রাহ্মণের আসল উদ্দেশ্য এই ক্রিয়াকাণ্ডের দিকটাকে সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট করে তোলা। তার জন্য ব্রাহ্মণকারদের অনেক বেদমন্ত্র উদ্ধার করতে হয়েছে এবং মোটামুটি একটা ব্যাখ্যাও দিতে হয়েছে। সে-ব্যাখ্যাতে মন্ত্রের মধ্যে কোনও রহস্যার্থ আবিষ্কার করবার চেষ্টা বিশেষ নাই, ব্রাহ্মণকারেরা তা প্রয়োজনও বোধ করেননি। অধিকাংশক্ষেত্রেই উপস্থিত ক্রিয়ার সঙ্গে মন্ত্রের যোগটাকে সাধারণভাবে বুঝিয়ে দিয়েই তাঁরা নিরস্ত হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণে আরণ্যকে এবং ব্রাহ্মণভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত উপনিষদগুলির মুখবন্ধে এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা বেদের রহস্যার্থ বোঝার পক্ষে অপরিহার্য।

এথেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জ্ঞান আর কর্মের মধ্যে পরবর্তী কালে যে একটা প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছিল, বৈদিক যুগে সে-প্রাচীরটা ছিল না। গীতাতে বলা হয়েছে, দ্রব্যযজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ বড়, সমস্ত কর্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপেরও লক্ষ্য তা-ই। আত্মচেতনাকে একটা লোকোত্তর চিন্ময় ভূমিতে উত্তীর্ণ করা—এই হল তার প্রধান লক্ষ্য। এই চিন্ময় ভূমিই স্বর্গ। তার প্রাচীন সংজ্ঞা 'স্বঃ' অর্থাৎ একটা জ্যোতির্ময় অনুভব। জ্ঞানযজ্ঞের সহায়ে আমরা যেমন সে-অবস্থায় পৌঁছতে পারি, তেমনি পারি দ্রব্যযজ্ঞ দিয়েও। স্বর্গ এবং মোক্ষ দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবনা নয়। অন্তত বৈদিক যুগে তা ছিল না। তার প্রমাণ বেদের ব্রাহ্মণেই আছে।

একটা বড় প্রমাণ রয়ে গিয়েছে শুক্লযজুর্বেদে। এই বেদের শেষ অধ্যায়টি একটি উপনিষদ। ঈশোপনিষদই একমাত্র উপনিষদ যা বেদের সংহিতাভাগের অন্তর্ভুক্ত। যজুর্বেদ কর্মবেদ। তার শেষ অধ্যায়রূপে এই উপনিষদটিকে উপস্থাপিত করা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। এই ছোট্ট উপনিষদের আঠারটি মন্ত্রের মধ্যে যে একটা উদার দৃষ্টি ও বিরাট সমন্বয়ের চেষ্টা রয়েছে তা সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অতুলন। মনে হয়, কর্মবেদের শেষে এই সার্বভৌম জ্ঞানের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিয়ে সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি যে তত্ত্বজ্ঞানে, একথাটি জ্বলন্তভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কৃষ্ণযজুর্বেদের ধারাকে শুক্লযজুর্বেদের খাতে বইয়ে দেওরা তাঁর প্রধান কীর্তি। তার তাৎপর্য হল কৃষ্ণ বা অবিদ্যার কর্মকে শুক্ল বা বিদ্যার কর্মে রূপান্তরিত করা। যাজ্ঞবল্ক্যের মাঝে আর্য জ্ঞানসাধনা আর কর্মসাধনা—দুই-ই যে চরমে উঠেছিল তার পরিচয় উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য আর এই শুক্লযজুর প্রবর্তক যাজ্ঞবল্ক্যকে মিলিয়ে নিলেই পাওয়া যায়। যে-বেদমন্ত্রকে আমরা কেবল কর্মপর বলে ভাবতে অভ্যস্ত, তার যে একটা রহস্যার্থ ছিল এবং সম্প্রদায়ক্রমে তা রক্ষিতও হয়েছিল, তা আমরা এই থেকেই অনুমান করতে পারি। বেদ নিজেও বলছেন 'নিণ্যা বচাংসি' বা রহস্যোক্তির কথা।

'মন্ত্রে'র সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'মীমাংসা'। দুটি সংজ্ঞা একই ধাতু হতে এসেছে। মন্ত্র দেবাবিষ্ট মননের স্বতোবিচ্ছুরণ, আর অভ্যাসের দ্বারা তাকে বুদ্ধিগত করবার প্রচেষ্টা হল মীমাংসা। মন্ত্রের রহস্যকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে তার প্রতিপাদ্য কর্মচোদনা ও জ্ঞানপ্রেরণাকে সুসংবদ্ধ রূপ দেবার স্বাভাবিক চেষ্টা হতে ব্রাহ্মণগুলির আবির্ভাব। এই ব্রাহ্মণগুলিই বেদার্থের আদি মীমাংসা, যাতে আমরা পাই কর্মমীমাংসা এবং ব্রহ্ম-মীমাংসা দুই-ই। মীমাংসার ধারা বরাবর অব্যাহত থাকলেও তার গোড়ার রূপটি হয়তো গাঢ়বন্ধ ছিল না। কালক্রমে মীমাংসকেরা তাঁদের মতবাদগুলিকে একটা বিশিষ্ট আকার দিতে বাধ্য হয়েছেন তার্কিকদের কাছে ঘা খেয়ে। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বোঝা দরকার।

বৈদিক সাহিত্যে অধ্যাত্মসাধনার যে-রূপটি আমরা দেখতে পাই, তার মূলে রয়েছে দেববাদ। দেববাদের ভিত্তি হল 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা মানবচিত্তের মৌলিক বৃত্তি, অতীন্দ্রিয় একটা-কিছুকে পরাক্‌-দৃষ্টিতে অনুভব করা হল তার বিশিষ্ট রূপ। তার মূলে রয়েছে 'আবেশ'। এরই পাশাপাশি মানবচিত্তের আরেকটি বৃত্তি রয়েছে, যাকে অতি প্রাচীনকালে বলা হত 'ওহ' বা 'উহ', পরে বলা হয়েছে 'তর্ক'। তর্কের দৃষ্টি প্রত্যক্‌-বৃত্ত, তার মূলে আছে 'জিজ্ঞাসা'। সাধনার দিক দিয়ে তার পরিণাম আত্মবাদে। দেবতাও অতীন্দ্রিয়, আত্মাও অতীন্দ্রিয়। সুতরাং দেবদর্শন ও আত্মদর্শন দুয়েরই পথ তুল্যভাবে অতিপ্রাকৃত। তবুও মানুষ দেববাদী বা আত্মবাদী হয়—স্বভাব অনুসারে। আত্মবাদী সংশয়কে নিমিত্তরূপে ব্যবহার করে অধ্যাত্মভাবনার সমস্ত অস্পষ্টতাকে দূর করতে চান। তাঁর সংশয়ের আঘাতে ভাবনার পরাক্‌-বৃত্ত সব অবলম্বন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, থাকে শুধু আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়ের মূলে যদি আত্মপ্রসারণের প্রেরণা থাকে, তাহলে আত্মবীর্যের বলেই তিনি একদিন চেতনার চরম বিস্ফারণে পৌঁছে বলতে পারেন 'এই সত্য'। দেববাদীও এই বৃহৎকেই পান—কিন্তু পান হৃদয়ের আবেগ দিয়ে, বোধিগ্রাহ্য বস্তুরূপে। আর আত্মবাদী পান বীর্য দিয়ে, নিজেরই আত্মরূপায়ণ-রূপে। বেদের ভাষায় একজন আবেগকম্পিত 'বিপ্র', আরেকজন পৌরুষদৃপ্ত 'নর'। একজনের প্রাপ্তির সাধন শ্রদ্ধা এবং বোধি, আরেকজনের তর্ক এবং বুদ্ধি।

এই দুটি মৌলিক চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করে এদেশে সাধনার দুটি ধারা আবহমানকাল প্রচলিত আছে। তার একটি ঋষিধারা, আরেকটি মুনিধারা। বৈদিক ঋষিরা অনেকজায়গায় 'অদেব' এবং 'দেবনিদ্‌'দের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। পরবর্তী-কালে এঁদের সাধারণ আখ্যা হয়েছিল 'হৈতুক' 'বেদনিন্দক' বা 'নাস্তিক'। বস্তুত, এঁরা হৈতুক হতে পারেন, কিন্তু চার্বাকের মত বেদনিন্দক বা নাস্তিক নন। এই হৈতুকেরাও সম্প্রদায়প্রবর্তক। ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তাধারার এঁরাই স্রষ্টা। এদেশের পরম্পরাগত দর্শনগুলির প্রায় সব-ক'টিই এঁদের মননের ফল। এসব দর্শনের সাধারণ নাম তর্কপ্রস্থান। তার পাশেই রয়েছে মীমাংসাপ্রস্থান। অধ্যাত্মদর্শনে একটি হল ব্যাপক অর্থে বৌদ্ধ (Rationalist) ধারা, আরেকটি ব্রাহ্মণ্য (Intuitionist) ধারা। বারবার তার্কিকদের আঘাতে মীমাংসকদের শৈথিল্য দূর হয়েছে, তাঁরা আপন ঘর সামলাবার চেষ্টা করেছেন—ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। জ্ঞান আর কর্মের বিরোধটা ক্রমে জোর ধরেছে তর্ক আর মীমাংসার এই সংঘাত

থেকেই। অথচ গোড়ায় এ-বিরোধ ছিল না, বেদার্থ-মীমাংসার সময় একথাটি স্মরণে রাখতে হবে।

যে-বাণীর সঙ্গতিসাধনে দুটি মীমাংসার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, তার সাধারণ নাম বেদ শ্রুতি বা মন্ত্র। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কোনও মীমাংসাই সমগ্র বেদের মীমাংসা নয়। পূর্বমীমাংসার উপজীব্য বেদের ব্রাহ্মণভাগ, আর উত্তরমীমাংসার উপনিষদ। অর্থাৎ উভয় দর্শনের অধিকার হতে বাদ পড়েছে বেদের মন্ত্রাংশ বা সংহিতাভাগ, যদিও সমগ্র বেদের প্রামাণ্যকেই মীমাংসকেরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন। পূর্বমীমাংসা কর্মমীমাংসা, চলতি কথায় কর্মকাণ্ড অর্থাৎ সাধনশাস্ত্র। কিন্তু সাধনার উপকরণ এখানে স্থূল। সাধনার লক্ষ্য অবশ্য স্বর্গ বা একটা অধ্যাত্ম-চেতনার ভূমি; কিন্তু সেখানে পৌঁছনর উপায় হল দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ নয়। এক্ষেত্রে স্বভাবতই সাধনার মনস্তত্ত্বের দিকটা আলোচনা হতে বাদ পড়ে যায়। সুতরাং পূর্ব-মীমাংসা হতে বৈদিক ঋষির অধ্যাত্মদর্শনের সুসম্বদ্ধ পরিচয় আমরা পাই না।

এই পরিচয় আমরা পেতে পারি উত্তরমীমাংসা হতে। উত্তরমীমাংসা ব্রহ্মমীমাংসা, চলতি কথায় জ্ঞানকাণ্ড। তারও সাধনা আছে এবং সে-সাধনার উপকরণ সূক্ষ্ম, মনোময়। এই মনোময় সাধনার বিবৃতি ও আলোচনা হতে আমরা বৈদিক ঋষির অধ্যাত্মদর্শনের একটা পূর্ণায়ত ছবি গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ-ছবি হবে উপনিষদের ঋষির ভাবনার ছবি। আধুনিক মতে, উপনিষদ্ বৈদিক চিন্তার শেষ পরিণাম, তার মধ্যে যে-দর্শনের পরিচয় আমরা পাই, তা মন্ত্রকৃৎ ঋষির দর্শন হতে পারে না। তার কারণ, পরিণামের আদিপর্ব স্বভাবতই অপরিণত এবং অস্পষ্ট; অন্ত্যপর্বের অপেক্ষাকৃত পরিণত চিন্তার সঙ্গে তার সমতা কখনই থাকতে পারে না। এই অদ্ভুত এবং গাজুরি মতবাদের সমালোচনা আমরা পরে করব।

বেদব্যাখ্যার সমস্যা এইখানেই। প্রচলিত বেদ-মীমাংসার কোনটাই সাক্ষাৎভাবে মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা নয়। মন্ত্রাংশের সর্বপ্রাচীন ব্যাখ্যা আমরা পাই ব্রাহ্মণে। আগেই বলেছি, সে-ব্যাখ্যা কর্মপর, অতএব অনেকক্ষেত্রেই একদেশী এবং প্রায় সর্বত্রই শব্দব্যাখ্যা মাত্র। পূর্বমীমাংসা তার উপর প্রতিষ্ঠিত; কর্মের ছকটিকে অবিকল্পিত আকার দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। সুতরাং বেদার্থের গূঢ়রহস্য তার কাছে আমরা আশা করতে পারি না। রহস্যের পরিচয় আমরা পাই উপনিষদে; কিন্তু উপনিষদেও ব্রাহ্মণের মতই মন্ত্রব্যাখ্যা নাই। আপাতদৃষ্টিতে উপনিষদ যেন যজ্ঞবাদ হতে বিচ্যুত। আরণ্যকে ও প্রাচীন উপনিষদের গোড়ায় যজ্ঞসম্পর্কে কিছু-কিছু আলোচনা আছে, সেগুলিকে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সেতু বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু মোটের উপর উপনিষদের চিন্তাধারাকে মনে হয় অনেকটা স্বাধীন। স্বাধীন অর্থে অবশ্য বৈপ্লবিক নয়, তবে কর্মকাণ্ডের মত বেদের মন্ত্রভাগকে সাক্ষাৎভাবে অবলম্বন করে তার উদ্ভব নয় এইমাত্র। উপনিষদ আর সংহিতার মধ্যে এই ফাঁকটাই বেদব্যাখ্যাকে জটিল করে তুলেছে।

বেদমন্ত্রগুলিকে যথাযথভাবে রক্ষা করবার চেষ্টায় তাদের আঁকড়ে ছিলেন কর্ম-কাণ্ডীরা। এ-বিষয়ে তাঁদের স্মৃতি নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় বিশ্বের একটা বিস্ময়। হাজার-হাজার বছরের দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে এত যত্নে যাকে রক্ষা করে আসা হয়েছে তাকে বোঝাবার চেষ্টা যে তাঁরা করেননি, তা হতে পারে না। পূর্ব-মীমাংসাকার স্পষ্টই

বলছেন, বেদার্থ বোঝাবার জন্যই তাঁর মীমাংসার অবতারণা; সাঙ্গ এবং সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে-রহস্য বলতে গেলে শুধু প্রয়োগরহস্য। অন্য রহস্যও যে ছিল এবং তার শিক্ষার ব্যবস্থাও যে ছিল তার আভাসমাত্র আমরা পাই, কিন্তু পূর্ণ বিবৃতি পাই না।

যে-মালমসলা এখন আমাদের হাতে আছে, তা থেকে কর্মকাণ্ডীরা যেভাবে বেদব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, তার একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা পেতে পারি। ব্রাহ্মণের বেদব্যাখ্যার পরেই আমরা পাই বেদাঙ্গযুগের ব্যাখ্যা। তার মধ্যে নৈরুক্তদের ব্যাখ্যাই প্রধান, যদিও অন্যান্য বেদাঙ্গীরা যে বেদরহস্যকে তাঁদের দিক হতে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন তা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। নৈরুক্তদের শেষ আচার্য যাস্ক। তিনিও আনুপূর্বিক বেদব্যাখ্যা করেননি, তবুও অনেকগুলি মন্ত্রের ব্যাখ্যা আমরা তাঁর কাছে পাই। তাঁর ব্যাখ্যা মোটের উপর কর্মপর, যদিও স্থানে-স্থানে তাঁর মন্তব্য আঁধারে বিদ্যুৎ-চমকের মত অনেক রহস্যকে আলোকিত করে তোলে। বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন ধারার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। যাস্কের পরেই বলতে গেলে আমরা একেবারে নেমে আসি মধ্যযুগের শেষভাগে—পাই সায়ণাচার্যকে। সায়ণাচার্যের কাছেই প্রথমত সমগ্র বেদের আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা মেলে। তবে সায়ণাচার্যের আবির্ভাব যে আকস্মিক নয়, তিনি যে একটা প্রাচীন সাম্প্রদায়িক ধারাকে অনুবর্তন করে তাঁর ব্যাখ্যা লিখেছেন, তার প্রমাণ আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সায়ণের ব্যাখ্যা কর্মপর, যদিও বেদের অন্যধরনের ব্যাখ্যাও যে সম্ভব, তিনি সরল-ভাবেই তা স্বীকার করেছেন এবং কোনও-কোনও জায়গায় সেধরনের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

আগাগোড়া বিচার করে দেখলে মনে হয়, বৈদিক যুগ হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত বেদ-ব্যাখ্যার একটা বিশেষ ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত ছিল। মাঝে-মাঝে দীর্ঘদিনের ফাঁক থাকলেও এই ব্যাখ্যাপদ্ধতির গ্রন্থপরম্পরা এখনও পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যা আর সায়ণের ব্যাখ্যার মধ্যে ধরনের বিশেষ প্রভেদ নাই। মন্ত্রের কর্মে প্রয়োগই তাঁদের লক্ষ্য এবং সেইজন্য চলতি ভাষায় মন্ত্রের মোটামুটি একটা অর্থ দিয়েই তাঁরা নিরস্ত। কিন্তু তাঁদের দেওয়া অর্থই যে মন্ত্রের একমাত্র অর্থ, এমন কথা তাঁরা কোথাও বলেননি। ব্রাহ্মণকারেরা সরল, এমন-একটা সম্ভাবনার কথা তাঁদের মনেও আসেনি। বরং কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁরা যেসমস্ত উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন কিম্বা মন্ত্রের উপযোগিতা দেখাতে গিয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, মন্ত্রের বা কর্মের অভিধা ছাড়া একটা ব্যঞ্জনাও যে আছে সেসম্বন্ধে তাঁরা অচেতন ছিলেন না। আধ্যাত্মিক অর্থের কথা যাস্ক স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। তাঁর দৈবতকাণ্ডের গোড়ায় দেবতত্ত্বের আলোচনা নিগূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ। এদিক-সেদিকে ছড়ানো তাঁর নানা মন্তব্য হতে বোঝা যায়, বেদের গূঢ়ার্থসম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই তিনি শুধু শব্দ-নিরুক্তির দিক দিয়ে মন্ত্রকে বিচার করে গেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এক্ষেত্রে তাঁকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করেনি, এইমাত্র। মধ্যযুগের ব্যাখ্যাকারদের তো কথাই নাই। আগাগোড়া কর্মপর ব্যাখ্যা করে গেলেও কেউ যদি তাঁদের বলত, এই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক একটা অর্থও আছে তাঁরা তাতে আপত্তি করবার কিছুই দেখতেন না—কেননা তাঁদের বিশ্বাস,

বেদ ঋষিদের অলৌকিক অনুভবের ফল, সুতরাং তার অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা থাকাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু বেদমন্ত্রকে এপর্যন্ত কর্মকান্ডীরাই রক্ষা করে এসেছেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী তাঁদের ধরনে ব্যাখ্যাও করে এসেছেন বলে আমাদের দেশেও ক্রমে একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে বেদসংহিতা কর্মকান্ডের গ্রন্থ, বেদমন্ত্র কর্মপর, কর্ম সকাম ইত্যাদি। এই মনোভাবের চরম পরিণাম আমরা দেখি অখন্ড মীমাংসাশাস্ত্রকে পূর্ব আর উত্তর দুভাগে ভাগ করার মধ্যে। পূর্বমীমাংসার প্রতিপাদ্য ধর্ম এবং কর্ম, উত্তরমীমাংসার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এবং জ্ঞান। জ্ঞানবাদীদের মতে কর্ম আর জ্ঞানের মধ্যে অধিকার সাধনা ও ফলের ভেদ আছে। জ্ঞানই লক্ষ্য; কর্ম তার সাধন বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু তবুও সে মুখ্য সাধন নয়, অবান্তর সাধন মাত্র। আর কর্মকে যদি একমাত্র বেদবিধিনির্দিষ্ট যজ্ঞাদি বলেই বুঝি, তাহলে সে-কর্মকে জ্ঞানের উপায় বলে স্বীকার করবারও প্রয়োজন থাকে না। দ্রব্যযজ্ঞ না করেও মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। জ্ঞানবাদীদের এ-যুক্তিতে স্বভাবতই কর্মবাদ মানুষের চোখে ছোট হয়ে গেছে। যে-কর্মবাদীরা বেদমন্ত্রের রক্ষক, তাঁদের পথকে খাটো বলে প্রতিপন্ন করলে সেইসঙ্গে বেদমন্ত্রের আলোচনা এবং তার অর্থ-আবিষ্কারের চেষ্টাতেও যে ক্রমে একটা শৈথিল্য আসবে, এটা স্বাভাবিক। এর মূলে পূর্বোক্ত তর্কপন্থীদের প্রভাব যে আছে তা বলাই বাহুল্য।

মানুষের মধ্যে অতিরঞ্জনের একটা ঝোঁক আছে; তার মন যখন যেটাকে ধরে, সেটাকেই একান্ত করে আর সব-কিছুকেই ছোট করে ফেলে। এর একটা উদাহরণ আমরা দেখি মন্ত্রের প্রতি কর্মবাদীর মনোভাবেঃ কর্মে মন্ত্রের বিনিয়োগ করতে হবে, সে-বিনিয়োগে মন্ত্রের অর্থাবধারণ অনাবশ্যক। তাহতে ক্রমে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াল, বেদমন্ত্রের কোনও অর্থই নাই। এই মতের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ আমরা পাই নিরুক্তে। যাস্ক কৌৎসের মত উদ্‌ধৃত করে খন্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, কৌৎস বেদমন্ত্রকে যে অনর্থক বলেছেন, তার মানে এ নয় যে বেদমন্ত্র দুর্বোধ। কৌৎসের মূল বক্তব্য কর্মকান্ডীদের বক্তব্যের মতই। কর্মে যথাযথ বিনিয়োগের জন্যেই যখন মন্ত্র, তখন তার কী অর্থ তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নাই—এই হল তাঁর আসল কথা। ভাষার দিক দিয়ে দুর্বোধ বেদমন্ত্রও আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কম; কৌৎসও তেমন মন্ত্রের খুব বেশী উদাহরণ দিতে পারতেন না। অবশ্য মন্ত্রশাস্ত্রের দিক দিয়ে তাঁর মতের একটা গভীর যৌক্তিকতা আছে। মন্ত্রকে যদি পরম ব্যোমের স্পন্দ বলে জানি, তাহলে শুধু সেই স্পন্দকে ধরেই চেতনার উত্তরায়ণ ঘটানো যেতে পারে, বিশিষ্ট অর্থভাবনার কোনও প্রয়োজন হয় না—শব্দ-ব্রহ্মবাদের এটা একটা মূল অভ্যুপগম। কিন্তু তাহতে মানুষের অতিরঞ্জনবুদ্ধি যে-সিদ্ধান্তকে দাঁড় করিয়েছে, তা বেদার্থচিন্তার পক্ষে একটা বাধাই হয়েছে উত্তরকালে।

কর্মকান্ডীরা একদিকে কর্মের খুঁটিনাটি এবং তার প্রয়োগশুদ্ধি নিয়ে মত্ত থেকে বেদমন্ত্রকে যেমন গভীরভাবে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন না, জ্ঞানবাদীরাও তেমনি বেদের মন্ত্রাংশকে কর্মকান্ডীদের ইজারামহল মনে করে তার প্রতি উদাসীন রইলেন। কর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে এই কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্ট হওয়ার ফলেই অর্থবিচারের দিক দিয়ে বেদমন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে এমন অনাদৃত রয়ে গেল।

আসলে বেদের মন্ত্রাংশে কিন্তু কর্ম আর জ্ঞানের এই বিরোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। বেদের সব মন্ত্রই কোনও কর্মকে লক্ষ্য করে রচিত, একথা সত্য নয়। বিশেষ-কোনও ক্রিয়াকে লক্ষ্য করে রচিত সূক্তের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ সূক্তেই কর্ম উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়। কর্মের উল্লেখ নাই, আছে শুধু অন্তরের আকূতির প্রকাশ, এমন মন্ত্রের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ব্রাহ্মণে যে-ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের দেখা পাই, শুধু বেদমন্ত্র থেকে তার একটা ছক আবিষ্কার করা অসম্ভব। এমন-কি যে-যজুঃসংহিতায় ক্রিয়ার মন্ত্রগুলিই বিশেষ করে সংগৃহীত হয়েছে, তাতেও ক্রিয়াকে উপলক্ষ্য করে ভাবই ফুটেছে প্রধান হয়ে। যদি মনে রাখি বৈদিক ঋষির লক্ষ্য চেতনাকে একটা লোকোত্তর স্তরে উত্তীর্ণ করা, তাহলে তার জন্যে যেধরনের সাধনাই তিনি অবলম্বন করুন না কেন, তার মধ্যে ক্রিয়াকে ছাপিয়ে ভাব যে প্রধান হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। অধ্যাত্মসাধনায় লক্ষ্যের প্রতি মানুষের নিষ্ঠা যদি প্রবল হয়, তাহলে বাহ্য সাধনা ক্রমেই সরল ও আড়ম্বরবর্জিত হয়ে আসে, এ একটা স্বাভাবিক নিয়ম। ব্রাহ্মণে যে জটিল ক্রিয়াবিধির বিবরণ আমরা পাই, তা সাধারণের পক্ষে আচরণীয় ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। এইসব জটিল ক্রিয়ার একটা আদিম সরল রূপ নিশ্চয়ই ছিল এবং সর্বসাধারণের মধ্যে তারই প্রচলন ছিল এ-অনুমান অপ্রমাণ নয়। আধুনিক যুগেও ঠিক এই ব্যাপারই আমরা দেখতে পাই না কি? তিথিবিশেষে যেমন দেবতার আড়ম্বরপূর্ণ সর্বজনীন পূজা আমাদের দেশে আছে, তেমনি নিভৃতে গৃহকোণে ভক্তের সরল হৃদয়ের পূজাও আছে। আচারের সঙ্গে ভাবের একটা সমন্বয় এখানে আপনাথেকেই যে হয়ে যায়, তন্ত্রের বাহ্য ও মানস পূজার বিধি তার প্রমাণ। যে-কোনও আচারের পিছনে ভাবের একটা গূঢ় ব্যঞ্জনা না থাকলে সে-আচার কখনও দীর্ঘায়ু হয় না বা মানুষের অন্তরের গভীর পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারে না। বেদমন্ত্রের মধ্যে আমরা যে-ক্রিয়াবিধির উল্লেখ পাই, তারও এমনিতর একটা বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ দিক থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

উদাহরণস্বরূপ সোমযাগের কথা বলা যেতে পারে। ঋগ্‌বেদে সোমের উল্লেখ যত্র-তত্র, তার একটি মণ্ডল শুধু সোমমন্ত্রের সংগ্রহ। ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমযাগের যে-বর্ণনা আছে, তাতে দেখা যায় সোমযাগ যেমন সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ, তেমনি তার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। সবার পক্ষে সোমযাগের অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। অথচ সোমযাগই বলতে গেলে বৈদিক কর্মসাধনার চরম কথা—তার ফল অমৃতত্বলাভ, জ্যোতিতে জীবনের উত্তরণ, বিশ্বদেবতার সঙ্গে একাত্মতা। এই অমৃতত্ব যে কেবল গুটিকয়েক ধনী যজমানের জন্য, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? আজকালই কি আমরা বলব, যে দুর্গোৎসব করে সে-ই মহাশক্তিকে পায়? সুতরাং সোমযাগের যেমন একটা জটিল কর্মরূপ আছে, তেমনি তার একটা সরল জ্ঞানরূপ থাকাও সঙ্গত। তা যে ছিল তার উল্লেখ বেদেই আছে। বেদ বলছেন, যারা ওষধি সোমকে ছেঁচল, তারা মনে করল আমরা সোমপান করেছি; কিন্তু যে-সোমকে ব্রহ্মবিদ্‌রা জানেন, তার রস কেউ পান করতে পারে না। এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতকে মনে রেখে পরবর্তী যোগ ও তন্ত্রের সাধনায় অগ্নিসোম-তত্ত্বের বিবৃতি এবং প্রয়োগের যদি আমরা অধ্যয়ন এবং অনুশীলন করি, তাহলেই বেদের সোমযাগের যে আরেকটা রহস্যক্রম ছিল সে-সম্বন্ধে আমাদের আর সংশয় থাকে না।

২

এইবার দেখা যাক, প্রাচীনকাল হতে আজপর্যন্ত বেদব্যাখ্যার যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল বা হয়েছে, তাদের মূল স্বীকার্যগুলি কি। কেননা, যে-কোনও ব্যাখ্যার মূলে ব্যাখ্যাতার অজ্ঞাতসারে হলেও যে কতকগুলি মৌলিক সংস্কার প্রচ্ছন্ন থাকে, এটা সহজবুদ্ধির কথা। প্রথমত আমাদের দেশের প্রাচীন ব্যাখ্যাপদ্ধতির কথাই ধরা যাক।

বেদপন্থীরা বেদকে বলেন প্রথমত শ্রুতি, তারপর আপ্তবাক্য। আপ্তবাক্য তা-ই জানিয়ে দেয়, লৌকিক কোনও প্রমাণে যা জানবার উপায় আমাদের ছিল না। এমনি করে কোনও গুহ্যতত্ত্বকে শুধু জানানোই নয়, তাকে অধিগত করবার উপায়সম্পর্কেও আপ্তেরা উপদেশ দিয়ে থাকেন তাঁদের অনুভবের গভীর হতে আহরিত অভিজ্ঞতার সহায়ে। এতে স্বভাবতই তাঁদের বাণীর দুটি তাৎপর্য দেখা দেয়—একটি তত্ত্বের জ্ঞাপন, আরেকটি তত্ত্বের সাধন। যেমন আপ্তের প্রতিপাদ্য জ্ঞান অলৌকিক, তেমনি তার সাধনও অলৌকিক। অলৌকিক জ্ঞানকে লাভ করতে গেলে লৌকিক জ্ঞানের উপায়কে পরিমার্জিত এমন-কি রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এই থেকে হয় অতিপ্রাকৃত মনোবিদ্যার সূত্রপাত, যার ভিত্তি হচ্ছে চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে। অন্তরাবৃত্তিসাধনের নানা উপায় আছে এবং তার গভীরতারও তারতম্য আছে। সেদিক দিয়ে আপ্তপ্রামাণ্যের স্তরভেদ হতে পারে। কিন্তু আসলে বিষয়টা যে মানবচিত্তের একটা মৌলিক প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা অনস্বীকার্য। অলৌকিক তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় যখন হয় পরাক্-বৃত্ত, তখন কর্মকাণ্ডের উৎপত্তি। কর্মকাণ্ডের উপদেশও আজ্ঞাসিদ্ধ, কেননা তার মূল নিহিত রয়েছে আপ্তের অলৌকিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই। কর্মকাণ্ডের উপদেশ শুধু সাধনসম্পর্কিত আচারকেই যে নিয়ন্ত্রিত করে তা নয়, ক্রমে তা মানুষের জীবনের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে এবং এমনি করে ধর্মানুশাসনের সূত্রপাত হয়।

আপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা মানবচিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম। জগতের সমস্ত ধর্মের মূলে এবং শুধু ধর্মই-বা বলি কেন, যে-কোনও বিজ্ঞান-সাধনার মূলে আপ্তবাক্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। আপ্তবচন শুধু নিষ্ক্রিয় শ্রদ্ধার অবলম্বন নয়, বিজ্ঞানের অভিযানে তা প্রেরণাও জোগায়। তাকে একটা সামাজিক প্রাজনী-শক্তি বলা চলে। আপ্তবচনের প্রামাণ্য মানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাবৃত্তিকে উত্তেজিত ক'রে অজানার অভিসারে তাকে প্রেরণা দেয়—কি লৌকিক কি অলৌকিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ফলে মানুষের জ্ঞানের পরিসর যে বৃদ্ধি পায়, লৌকিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা স্পষ্টই দেখতে পাই। অলৌকিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আলোর দিগন্ত আরও প্রসারিত হয় কিনা তা বিবেচ্য—কেননা এখানে যাত্রার ধারা উল্টাদিকে। কিন্তু বহু জ্ঞানতপস্বীর সাধনায় সমাজের অবরভাগ যে ক্রমেই আলোকিত হয়ে ওঠে, তা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আপ্তবচনকে যে-দৃষ্টিতে দেখেন, তার সঙ্গে বেদপন্থীদের গোড়ায় একটা তফাত আছে। আপ্তবচন যে শাশ্বত সত্যের বাহন হবে, এবিষয়ে সমস্ত ধর্মই একমত। বেদপন্থীরাও বেদবাক্যকে নিত্যই বলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীর সঙ্গে তাঁদের এই তফাৎ, তাঁরা বেদবাক্যকে অধিকন্তু অপৌরুষেয়ও বলে থাকেন। মনে হতে

পারে, এ-দাবির মূলে সেই সনাতন নর আর বিপ্রের, তর্ক আর শ্রদ্ধার ঝগড়া। বৈদিক ধর্ম একটা সামাজিক শক্তি, একটা সমূহের শক্তি। সমূহের অসাড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয় সবসময়ে ব্যক্তিকে। তাই বৈদিক ধর্মের যাঁরা সমালোচক, তাঁরা এদেশে একটা-না-একটা পৌরুষেয় মতের প্রবর্তক। তাঁদের কাছ থেকে ঘা খেয়ে নিজের বৈশিষ্ট্যকে অপৌরুষেয়ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বেদ-পন্থীদের মধ্যে দেখা দেবে, এটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ববাদ যে কেবল তর্কবুদ্ধি হতে উদ্ভূত হয়েছে, তা বলা চলে না। এই মতবাদের মূল আমরা বেদেই পাই—তার বাক্‌তত্ত্বে।

ব্রহ্ম অর্থাৎ চেতনার ক্রমব্যাপ্তি এবং বাক্ অর্থাৎ তার বহির্মুখ প্রকাশ, দুয়ের মধ্যে অবিনাভাবের সম্পর্ক বৈদিক দর্শনের একটা মূলসূত্র। পরবর্তী যুগে বৈয়াকরণ এবং তান্ত্রিকেরা এই মতবাদকে নানাভাবে পল্লবিত করবার চেষ্টা করেছেন। আসলে এ-প্রশ্ন ভাষার উৎপত্তির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। বৈদিক মতটা এইধরনেরঃ এক শাশ্বত ভাব আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় যে-স্পন্দন তোলে, তাহতেই ভাষার সৃষ্টি। এ-ভাষা দেবভাষা কিনা আলোর ভাষা এবং তা-ই হল মন্ত্র। এ-মন্ত্র মনুষ্যকৃত সঙ্কেত নয়, যা বৃদ্ধের কাছ থেকে শিশুরা শেখে। এ একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, ভাবের অনুকূল ভাষার স্পন্দন। তিনটি অবস্থা পার হয়ে চতুর্থ অবস্থায় যখন তা এসে পৌঁছয়, তখনই সে আবার মনুষ্যকৃত সঙ্কেতের সাহায্য গ্রহণ করে। তুরীয় দশায় কিন্তু সেই মূল স্পন্দনের শক্তি সম্পূর্ণ অব্যাহতই থাকে। এইজন্য এই অভিব্যক্ত মন্ত্রকেও সেই অন্তর্গূঢ় আদিস্পন্দনের মর্যাদা দিতে হয়। আদিস্পন্দ যেমন অপৌরুষেয়, এই বৈখরীবাকও তেমনি অপৌরুষেয়। ঋষিরা মন্ত্রস্রষ্টা নন, মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র।

বৈদিক মন্ত্রবাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হতে এটুকু বোঝা যায়, আধুনিক বিজ্ঞান যেমন তার তত্ত্বসংগ্রহের বেলায় পৌরুষেয়তাকে পরিহার করে চলবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, বেদপন্থীরাও অবিকল তা-ই করেছেন। এসম্পর্কে মীমাংসকের একটা যুক্তি এই, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভ্রম প্রমাদ করণাপাটব বা বিপ্রলিপ্সা থাকা অসম্ভব নয়, সুতরাং অধ্যাত্ম জ্ঞান ও সাধনার ভিত্তি হওয়া উচিত অপৌরুষেয়। পুরুষ প্রবক্তা হতে পারেন, কিন্তু তাঁর বাণীতে কোনও মালিকানা স্বত্ব থাকতে পারে না। সত্যের খ্যাপনের বেলায় কোনও পুরুষের কর্তৃত্বই স্বীকার্য নয়, এমন-কি ঈশ্বর নামে কল্পিত পুরুষেরও নয়, নবী ইত্যাদি তো দূরের কথা। মন্ত্র বাণীমাত্র—ঈশ্বরের বাণীও নয়। তার মধ্যে যে স্বাভাবিক স্ফুরত্তা রয়েছে, তার বেগেই সে মানুষকে সিদ্ধি ও ঋদ্ধির পথে নিয়ে যাবে। মানুষ শুধু শ্রদ্ধায় তাকে অনুসরণ করে যাবে। তলিয়ে দেখলে মীমাংসকের এই মনোভাবে পাই অধ্যাত্মভাবনার এক অপূর্ব অবদানের পরিচয়। সমগ্র বৈদিক চিন্তা-ধারার মূলে এই ভাব আছে বলেই বৈদিক ধর্ম কোনদিন প্রোটেস্টাণ্ট্ বা মিশনারী ধর্ম হতে পারেনি। তার শক্তি আর অশক্তি দুয়েরই মূল এইখানে।

বস্তুত অপৌরুষেয়বাদের মূল কথাটা হল চেতনার স্বোত্তরণ। অপক্ষপাতে বলতে পারি, সকল ধর্মেরই মূল অপৌরুষেয়। ভারতবর্ষ একথাটা গোড়াতেই স্বীকার করেছে। সত্যের প্রশ্নটা যখন তার বাঙ্‌ময় প্রকাশকে অতিক্রম করে তত্ত্বভাবনার কোঠায়

উত্তীর্ণ হয়েছে, তখন বৈদিক আর অবৈদিক ধারার মধ্যে কোনও তফাত থাকেনি—অলক্ষ্যে তারা এসে মিলেছে একই আর্যচিত্তের অপৌরুষেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সাধারণ ভূমিতে। তাই আমরা দেখতে পাই, আদিম বৈদিক যুগেরই মত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-চিন্তার পরবর্তী যুগে নর আর বিপ্রের সাধনধারা পরস্পর মিলে গেছেঃ কপিল, কণাদ, গৌতম তার্কিক হয়েও বেদপন্থী সমাজে সর্বজনমান্য, বুদ্ধ অবৈদিক হয়েও সত্যকার বেদ ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাশীল, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সবারই অধ্যাত্মসাধনার একটা সাধারণ নাম 'ব্রহ্মচর্য'। আর এই 'ব্রহ্ম' কথাটির মধ্যে সেই বৈদিক যুগ হতে আরম্ভ করে আজ-পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার সমগ্র ইতিহাসটি ধরা রয়েছে। এই একটি শব্দের ব্যঞ্জনার মধ্যে এসে মিলেছে এখানকার সাধনার প্রত্যক্-বৃত্ত আর পরাক্-বৃত্ত দুটি ধারাই। চেতনার ক্লিষ্টতা হতে মুক্তি চাই, মানবাত্মার এই চিরন্তন আকূতি। সে-মুক্তির আশ্বাস যেখান থেকেই আসুক না কেন, তাকেই তুল্যভাবে আপ্তবচন বলে মেনে নিতে হবে তার লোকোত্তর ব্যঞ্জনার প্রতি লক্ষ্য রেখে। আপ্তবাণী ঈশ্বরের হতে পারে, দেব-মানবের হতে পারে, শুধু বাণীও হতে পারে। কিন্তু সর্বত্রই তা লোকোত্তর শাশ্বত একটা অপৌরুষেয় তত্ত্বেরই প্রকাশ, কেননা সে-তত্ত্ব পাওয়া গেছে আমাদের লৌকিক প্রমাণবিধিকে অতিক্রম করে, পাওয়া গেছে শ্রদ্ধার দ্বারা এবং তপস্যার দ্বারা, পাওয়া গেছে অন্তরাবৃত্ত চিত্তের অনুধ্যান দ্বারা।

এই ভাবটি ভারতবর্ষের অন্তরে সবসময় জেগে ছিল বলেই 'বেদ' বা 'শ্রুতির' অর্থব্যাপ্তি ঘটিয়েছে সে যুগে-যুগে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের সমস্ত সাধনপন্থা বাইরের দিক দিয়ে যত পৃথকই হ'ক না কেন, মানবপ্রকৃতির সাধারণ প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে অন্তরের সাধনার একটা সাধারণ ক্ষেত্রে এসে কিন্তু তারা মিলে গেছে। এই সাধনা হচ্ছে যোগ। বাইরের সাধনার দিক দিয়েও একটা সমন্বয় ঘটেছে তন্ত্রে। তন্ত্র আবার বহুব্যাপক হয়ে যোগকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। বেদবাদ যেমন একটা গণ্ডির মধ্যে পুষ্ট হয়ে তার বিশিষ্ট রূপকে বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে, তেমনি স্বভাবের নিয়মেই তার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সর্বত্র। বেদবাদের এই লোকাতত রূপটিই হল তন্ত্র। আজ আর্যচিত্ত বেদবিশ্বাসী, কিন্তু তন্ত্রাচারী—এই কথাটি বললে তার সাধনার একটা অখণ্ড পরিচয় দেওয়া হয়। বেদবাদের এই বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রুতি-সংজ্ঞারও অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে। শ্রুতি শুধু বৈদিক শ্রুতি নয়, তান্ত্রিক শ্রুতিও—উভয়েরই প্রামাণ্য সাধারণতঃ তুল্যভাবে স্বীকৃত। তান্ত্রিক শ্রুতির প্রকাশ-ভঙ্গি বৈদিক অপৌরুষেয়বাদের দ্বারা প্রভাবিত। এখানেও প্রবক্তা মূলত যা-ই থাকুন না কেন, নিজেকে তিনি বাণীর মধ্যে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিয়েছেন। বেদে তবু ঋষির নাম আছে, কিন্তু তন্ত্রে তাও নাই। এ শুধু ধাপ্পাবাজি বা বেদের নকল নয়—সেই সনাতন আর্যচিত্তের একই রীতির প্রকাশঃ অপৌরুষেয়তার অকুণ্ঠতা দিয়ে তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়া।

বেদপন্থীর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বেদের শব্দরাশি নিত্য—এই বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস বেদপন্থীর একার নয়। পৃথিবীর সব ধর্মই তাদের বাণীকে ঈশ্বরবাণী অতএব নিত্য বলে ঘোষণা করেছে। যেসব ধর্ম প্রবক্তাতে বিশ্বাস করে, তারা প্রবক্তার বাণীকে উৎপন্ন বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও সে-বাণী যে কোনও মূল দিব্যবাণীরই

অভিব্যক্তি মাত্র, একথা জোরের সঙ্গেই বলেছে। অপৌরুষেয়ত্ব বা অলৌকিকত্বের সঙ্গে নিত্যত্বের একটা ন্যায়সিদ্ধ সম্পর্ক আছে। আসলে দুটি ভাবনাই মানুষের চেতনার স্বোত্তরণের প্রয়াস হতে উদ্ভূত। স্বোত্তরণের প্রবেগ মানুষের প্রাকৃত জীবনেও আছে। আমরা আছি একটা ঝামেলার মাঝে, ভেসে চলেছি পরিবর্তনের স্রোতে। এর মধ্যে সত্তার একটা স্থির নির্ভর কোথাও চাই, নইলে আমাদের কাজ চলে না। বাইরে যেমন প্রকৃতির ক্রিয়াসারূপ্যের উপর আমাদের বিশ্বাস, অন্তরেও তেমনি চাই একটা অধ্যাত্ম ক্রিয়াসারূপ্যের অচল প্রতিষ্ঠা। চিত্তের এমন-একটা ভূমি চাই, যাকে বলতে পারি প্রাকৃত চেতনার সমস্ত বৃত্তির আশ্রয়, তার সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তির একটা নির্ভরযোগ্য উৎস। এই অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠাকেই পরাক্-দৃষ্টিতে বলি ঈশ্বর, প্রত্যক্-দৃষ্টিতে বলি আত্মা। এই গভীর উৎস হতে উৎসারিত যে-বাণী, যা আমাদের কর্ম এবং ভাবনাকে সংশয় ও অনৈশ্চিত্যের আন্দোলন হতে প্রতিষ্ঠার ভূমিতে উত্তীর্ণ করে, তা-ই আমাদের কাছে আপ্তবাণী শাস্ত্র বা বেদ। অতএব এখানে নিত্যত্বের অর্থ কালিক পরিণামের অতীতত্ব। অর্থাৎ নিত্যত্বকে শুধু ব্যাপ্তি দিয়ে মাপলে চলবে না, বলতে হবে বস্তুর অবাধিত ক্রিয়া-সামর্থ্যের স্বরূপযোগ্যতাই নিত্যত্ব।

স্পষ্টই দেখছি, এই নিত্যত্ব ভাগবত, সামান্যপ্রত্যয়ের সহচরিত। অধ্যাত্ম অনুভবের সামান্যধর্মকে নিত্য বললে আপত্তির কিছুই থাকে না; কিন্তু স্থূল বাণীরূপকে যদি আমরা নিত্য বলি, তাহলেই গোল ওঠে। মীমাংসকের কাছে বেদ আর বাণী এক। তাই তাঁর দাবি, বেদের অর্থই যে নিত্য তা নয়, বেদের শব্দরাশিও নিত্য। বলা বাহুল্য, তার্কিকেরা তাঁদের এই মতকে স্বীকার করেননি। তার্কিকদের যুক্তিকে মীমাংসকেরা যথাযথভাবে খণ্ডন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এখানেও, শব্দকে নিত্য বলে প্রমাণ করবার যে-আগ্রহ তাঁদের মধ্যে দেখা যায়, তা শুধু তর্কবুদ্ধির কাছে ঘা খেয়ে নিজের শাস্ত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা থেকে উদ্ভূত নয়। কথাটার একটু বিস্তার করা দরকার।

এদেশের দর্শনে একটা অদ্ভুত মতবাদ আছে, 'আকাশের গুণ শব্দ।' আধুনিক জড়বিদ্যার বিচারে কথাটা মনে হবে অযৌক্তিক। প্রাচীন তর্কশাস্ত্রও তাকে যুক্তিসিদ্ধ করতে গিয়ে অবশেষে পরিশেষ-ন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছে। বস্তুত এই মতবাদের মূল রয়েছে বৈদিক বাক্‌তত্ত্বে। সেখানে কিন্তু তার চেহারাটা আরেকরকম। ঋগ্‌বেদ বলছেন, 'অগ্নিরূপা বাকের প্রতিষ্ঠা হল অক্ষর পরম ব্যোমে, যেখানে বিশ্বদেবতার নিত্য আসন পাতা। সেইখানেই একপদী বাক্ হয়েছেন সহস্রাক্ষরা। তিনি প্রাণচঞ্চলা গৌরী, কারণ-সলিলকে তক্ষণ করে রূপ সৃষ্টি করছেন তিনিই। তাঁর চারটি পাদ। তাদের তিনটি গুহায় নিহিত, বাইরে তাদের প্রকাশ নাই; মানুষের মুখে ফোটে কেবল চতুর্থী বাক্। লোকোত্তরের অগম সমুদ্র হতে প্রবাহিতা দিব্যচেতনার তিনি মুক্তধারা—ওখান হতে আমাদের চেতনায় আবিষ্ট হচ্ছেন এইখানে।' ব্রহ্ম আকাশবৎ—একথা আমরা উপনিষদে পাই। সেই ব্রহ্মের সঙ্গে বাক্ অবিনাভূতা—এই হল ঋগ্‌বেদের উক্তি। আকাশ এবং প্রাণ অথবা আকাশ এবং বাক্ এক অনাদি দিব্যমিথুন। এই বৈদিক ভাবনারই দার্শনিক বিবৃতি হলঃ 'আকাশের গুণ শব্দ।'

এইদিক দিয়ে দেখলে কথাটাকে আর অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। দার্শনিকের

ভাষায় তখন বলতে পারি, বিসৃষ্টির মূলে আছে আকাশ বা শূন্যতা। কিন্তু সে-শূন্যতা অশক্ত নয়, শক্তিযুক্ত। অস্পন্দের স্পন্দই হল সেই শক্তি। চেতনা যখন উজিয়ে যায়, তখন অস্পন্দে সে নিথর হয়ে যায়; কিন্তু ভাটার সময় ঐ অস্পন্দতাকে অটুট রেখেই তার মাঝে জাগে স্পন্দলীলা। এই স্পন্দই বাক্ বা স্ফোট—অশব্দের অনাহত গুঞ্জরন বা অরূপের আত্মরূপায়ণ। আকাশ বা মহাশূন্য হতে এই বাকের স্ফুরণের চারটি ধাপ। প্রথমত বাক্ যেন অনুত্তরের হৃদ্যসমুদ্রে নিত্যসামরস্যের আনন্দ-আন্দোলন মাত্র। তারপর বিচিত্র আত্ম-আস্বাদনের সংবেগে সেই আন্দোলনে জাগে রূপের আকৃতি, বাক্ তখন আত্মচেতনার দর্পণে চিন্ময়ী দ্যুতির ঝলক। তারপর সেই বাক্ ফোটে ভাব হয়ে এবং অবশেষে ভাষার ঝঙ্কারে। কবির চেতনা কাব্যে রূপ নেয়, অন্তঃসমাহিত চেতনার শূন্যতা হতে ফোটে বাণীর বিলাস। কাব্যসৃষ্টিই প্রাকৃত জগতে সত্যকার সৃষ্টি, যেখানে স্রষ্টা স্ব-তন্ত্র থেকে নিজেকে উৎসারিত করেন; আর সব-কিছু সৃষ্টি নয়, নির্মাণ মাত্র। সৃষ্টিতে নিমিত্ত এবং উপাদান অভিন্ন, আমিই সেখানে আমাকে অন্তর্গূঢ় প্রাণের সংবেগে ফুলের মত ফুটিয়ে চলি। এটি সাক্ষাৎভাবে পারি ভাবে। সেইখানেই প্রজাপতির সৃষ্টিলীলার অপরোক্ষ পরিচয় পাই। অন্তরাবৃত্ত চেতনায় সৃষ্টির আবেশে যা স্ফুরিত হয়, তার বৈখরী মূর্তিই হল মন্ত্র। সে-মন্ত্র বেদের ভাষায় 'কবি-ক্রতু' অর্থাৎ একাধারে দৃষ্টি এবং সিসৃক্ষা। সৃষ্টির কাজ প্রথম শুরু হয় মন্ত্রদ্রষ্টার নিজের আধারে, তারপর গ্রহিষ্ণু এবং অনসূয় সন্ততিতে, তারপর বিশ্বজগতে। কালক্রমে তার শক্তি আর বেগ বাড়ে, দেখা দেয় সম্প্রদায়ের পরম্পরা। অবশেষে বহুযুগের অতন্দ্র তপস্যায় তা জাতি-চেতনায় সংহত হয় যখন, তখন বৈখরী বাকও হয় সিদ্ধমন্ত্র। সব মন্ত্রেরই অর্থনিত্যতা আছে, কিন্তু তাছাড়াও সিদ্ধমন্ত্রের আছে বর্ণানুপূর্বীর নিত্যতা। এমনি করে আকাশের ঈক্ষণই রূপান্তরিত হয় মন্ত্রবীর্যে। সে-মন্ত্র অপৌরুষেয় এবং নিত্য।

এই আলোচনা হতে একটা কথা বুঝতে পারি, বেদপন্থী কর্মীই হ'ন বা জ্ঞানীই হ'ন, বেদের প্রতি তাঁর যে-শ্রদ্ধা, তার একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। সে-দর্শন স্বভাবতই জড়োত্তর, কিন্তু তাবলে তা অপ্রমাণ নয় বা অবৈজ্ঞানিকও নয়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় দাবি, অনুভবগম্য তথ্যের ভিত্তি না থাকলে কোনও তত্ত্বকেই সে প্রামাণিক বলে গণ্য করে না। বেদপন্থীও তার এ-দাবিকে স্বীকার করে নেবেন। তিনিও বলবেন, তাঁর দর্শন তত্ত্বের দর্শন এবং সে-দর্শনের একটা ক্রিয়াপর পদ্ধতি আছে। যাস্কের ভাষায় 'ঋষিরা সাক্ষাৎকৃতধর্মা। তর্কের সঙ্গে শ্রদ্ধার কোনও বিরোধ নাই, বরং সময়বিশেষে তর্কই ঋষি, কিন্তু সে-তর্ক বাকের অনুগামী।' বস্তুত সব-কিছুরই চরম প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ অনুভবে। তবে অনুভবের এলাকা হয়তো স্বতন্ত্র এবং সেইজন্য তার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। বুদ্ধিবাদী বলবেন, এ তো নিছক ভাবকালি। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার পরিণাম ভাবকালি ছাড়া আর কি হতে পারে বলে আমরা আশা করতে পারি? ভাবই চেতনার চরম লাভ, লৌকিক হতে অলৌকিকের দিকেই তার অভিযান। তবে কিনা এ-অলৌকিক লোকোত্তর হলেও লোকবাহ্য নয়। বৈদিক দর্শনের এইখানেই বিশেষত্ব।

শ্রদ্ধা এবং ভাবকালির আমেজ না থাকলে বেদব্যাখ্যার প্রচেষ্টা পন্ডশ্রম হবে, একথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল। এদেশের বেদব্যাখ্যাতাদের এই শ্রদ্ধার পুঁজিটুকু ছিল,

কিন্তু তর্কসম্মত উপায়ে তাকে কাজে লাগাবার আগ্রহটুকু ছিল না। তার কারণ পূর্বেই বলেছি, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে আবহমান একটা কৃত্রিম বিরোধ। বেদমন্ত্রের গূঢ়ার্থ যদি ঋষির তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফল হয়, তাহলে তার রহস্যার্থ ধরা পড়বে বিজ্ঞানীর কাছেই, অতএব সমস্ত কর্মের পর্যবসান ঘটবে জ্ঞানে—একথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন কর্মবাদীও অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু মন্ত্রকে ক্রিয়ার উপলক্ষ্যে পর্যবসিত করতে গিয়ে এদিকটায় তিনি দৃষ্টি দেননি। জ্ঞানবাদীও কর্ম থেকে নিজেকে তফাত করে নিয়েছেন বলে মন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি তাঁর উপেক্ষা। মানুষের অধ্যাত্মবৃত্তির বিভিন্নতাহেতু সাধনপদ্ধতির এই ভেদে ক্রমে মন্ত্রশাস্ত্রের সম্প্রদায়পরম্পরা অব্যাহত থেকেও তার রহস্যার্থ আমাদের কাছে হয়ে গেছে দুর্লক্ষ্য।

কিন্তু রহস্যার্থ একেবারে লোপ পায়নি। মহাভারতে একটা কথা আছে, 'ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থম্ উপবৃংহয়েৎ'। অত্যন্ত খাঁটি কথা। বেদার্থকে লোকাতত করবার প্রচেষ্টাতেই ইতিহাস-পুরাণের সৃষ্টি। তাই ব্রাহ্মণগ্রন্থে তারা পঞ্চম বেদ বলে পরিগণিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অনুরঞ্জিত করে ইতিহাসকেও দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করা এদেশের একটা ধরন। পুরাণগুলিকে অবিকৃত আকারে আমরা পাইনি। তবুও তার একটা বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টঃ জাতির বাইরের আর অন্তরের ইতিহাস, তার লৌকিক আর অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি দুটিকেই পুরাণের মধ্যে একাকার করে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের বাইরের ইতিহাস গড়ে তোলবার পক্ষে পুরাণের উপযোগিতা যা-ই থাকুক না কেন, অন্তরের ইতিহাস বোঝবার পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তা অসীম। বেদের বহু প্রতীক পুরাণে পল্লবিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থের মত পুরাণও আনুপূর্বিক বেদব্যাখ্যা নয়, কিন্তু তারই মত ব্যঞ্জনাবহ। দুয়ের মধ্যে রয়েছে অধ্যাত্মভাবনার একই আবহ। এমন কথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, যেমন তন্ত্রের সাধনাকে না বুঝতে পারলে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়, তেমনি পুরাণের কল্পনার সঙ্গে গভীর পরিচয় না থাকলে বেদের কল্পনাকেও বোঝা যায় না। এইসঙ্গে আরেকটা কথাও যোগ করা চলে, যোগসাধনার পদ্ধতি এবং তার চিত্তবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে উপনিষদ বা বেদান্ত বোঝাবার চেষ্টাও একটা স্পর্ধা মাত্র। বেদান্ত বস্তুত বেদবাদেরই অন্ত, বেদার্থের 'বিজ্ঞান'-সমন্বিত পরিচিতি। অতএব বলা যেতে পারে, মন্ত্রার্থ আবিষ্কারের জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে উপনিষদ্-জ্ঞানের ব্যাপক ভিত্তি, তন্ত্র ও পুরাণের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং যোগ ও তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। চিরকাল ধরে আমাদের দেশের সব সম্প্রদায়ই বলে এসেছে, তাদের ভাবনা ও সাধনার মূল বেদে। এমন-কি যারা বেদের কর্মকাণ্ডকে স্বীকার করে না, তাদের মুখেও ঐ কথা। তারা এমনও বলে, বেদের রহস্য কর্মকাণ্ডীরা জানে না, জানে তারাই। অধ্যাত্মসাধনার একটা অনুবৃত্তি যে অবিচ্ছেদে এদেশে চলে এসেছে, তাতে ভুল নাই। ভাবনায় ও সাধনায় আজ যে-বৈচিত্র্য দেখতে পাই, তা যদি এক মৌল আর্যভাবনারই শাখায়ন হয়ে থাকে, তাহলে বেদার্থ আবিষ্কারের জন্য এদের ভাবে ভাবিত হয়ে আবার স্রোতের উজান বেয়ে চলাই হবে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয়।

৩

বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যাপদ্ধতির মূল অভ্যুপগমগুলি কি ছিল, মোটামুটি তার আলোচনা করা গেল। দেখা গেল, যে-শ্রদ্ধা মানুষের মধ্যে অপাবৃত করে অতীন্দ্রিয় জ্যোতির দুয়ার, সে-ই তাদের মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু এই শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎ-তর্কের যোগ না থাকায় অনেকক্ষেত্রে তা পর্যবসিত হয়েছে শ্রদ্ধালুতায়; এবং তার ফলে বেদের বাক্ যদিও রক্ষা পেয়েছে, তার অর্থ আমাদের কাছে রহস্যময়ই থেকে গেছে।

আধুনিক যুগে বেদব্যাখ্যার একটা নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, তাকে অবলম্বন করে একটা সম্প্রদায়ও ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা ইওরোপীয়। তাঁদের প্রধান উপজীব্য হল তর্ক, যাকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দান বলে প্রচার করে থাকেন। এদেশের প্রাচীন তার্কিকদের সঙ্গে এই নতুন তার্কিকদের গোড়াতেই একটা তফাত এই যে, এদেশের তার্কিকেরা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আস্তিক, কিন্তু ওদেশের তার্কিকদের আস্তিক্য শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে নিয়ে।

বেদোক্ত 'দেবনিদ্'দের মতবাদ কি ছিল, তার পরিষ্কার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে, তাঁরাই পরবর্তী যুগের লোকোত্তর-তর্কবাদের পথিকৃৎ—অবশ্য চার্বাক এই দলের নন। এই তার্কিকদের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য, অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা (যাকে বৈজ্ঞানিকের hypothesis-এর সঙ্গে উপমিত করা যেতে পারে) এবং সেই সত্যকে লাভ করবার জন্য বিশিষ্ট সাধনপন্থার নির্দেশ। এইদিক দিয়ে বেদবাদীদের সঙ্গে তাঁদের কোনও ভেদ নাই। দুয়ের মধ্যে তফাত হচ্ছে চরম সত্যের রূপ এবং তাকে পাওয়ার সাধনপন্থা নিয়ে। এঁরা জগতের অন্যান্য আস্তিকদের মতই আপ্তবচনে বিশ্বাসী। বেদবাদীরা শুধু বাক্‌কে মানেন (এবং তা-থেকে মন্ত্রবাদরূপ বিশিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভব), আর এঁরা সেই বাকের প্রবক্তারূপে মহা-মানবকে বা ঈশ্বরকে মানেন—এই এঁদের বৈশিষ্ট্য। সাধনপদ্ধতির দিক দিয়ে এঁরা বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরোধী; এঁদের দৃষ্টি প্রত্যক্-বৃত্ত। বেদবাদের এঁরা কিধরনের সমালোচনা করতেন, তার একটা সুন্দর উদাহরণ পাই দীঘনিকায়ের 'তেবিজ্জসুত্তে'। সেখানে বেদবাদীরা বেদকে কিভাবে বুঝতেন, তার কোনও সমালোচনা নাই; সমালোচনার লক্ষ্য হচ্ছে, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদের পন্থায় বেদপ্রতিপাদিত সত্যকে পাওয়া যায় কিনা তা-ই।

কিন্তু এযুগের তার্কিক ব্যাখ্যাতারা ভিন্নপন্থী। প্রথমত তাঁরা বেদকে 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিতে বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাচীন ব্যাখ্যাতাদের ভাবনাকে কোথাও স্বীকার করেছেন, কোথাও করেননি; দ্বিতীয়ত বেদপ্রতিপাদিত সত্যের একটা চরম মূল্য আছে কিনা, সেবিষয়েই তাঁদের ঘোর সন্দেহ। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করে এখন আমাদের দেখতে হবে, এটা যুক্তিসহ এবং বেদার্থ-আবিষ্কারের পক্ষে অনুকূল কিনা।

প্রাচীন ব্যাখ্যাতাদের মত আধুনিকদেরও বেদব্যাখ্যার কতকগুলি অভ্যুপগম আছে। তাঁদের প্রধান অভ্যুপগম হচ্ছে প্রাকৃত-পরিণামবাদ (Theory of Natural

Evolution)। এই মত প্রথম প্রযুক্ত হয় প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে, ক্রমে প্রসারিত হয় জড়-বিদ্যা এবং মনোবিদ্যাতেও। এই মত অনুসারে যে-কোনও প্রাণক্রিয়ার আদিম রূপটি অস্পষ্ট সরল ও অনভিব্যাকৃত, কালক্রমে প্রতিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে অথবা অন্তর্নিহিত প্রাণবেগে তা স্পষ্ট জটিল ও সুব্যাকৃত হয়ে ওঠে। এই সূত্রটিকে মানুষের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আদিম মানুষ বর্বর, ক্রমে সে সভ্য হয়েছে। মানুষের ধর্মবোধকে জীবনের অভিব্যক্তির নিত্যসহচর বলে স্বীকার করে নিলেও তার সংস্কৃতির পরিণামের সঙ্গে ধর্মবোধের পরিণামের একটা অনুপাত আছে। বর্বর মানুষের ধর্মও বর্বরোচিত। বর্বর ধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ, ধর্মবোধের দিক দিয়ে এ্যানিমিজম (সজীব-নির্জীব সমস্ত বস্তুতেই প্রাণাত্মার আবেশ আছে এই বিশ্বাস) এবং ধর্মসাধনার দিক দিয়ে ম্যাজিক বা তুকতাক। আদিমানবের যুক্তিবুদ্ধি পরিপক্ব নয় বলে বিশ্বমূল সার্বভৌম একত্বের ধারণা তার কাছে অস্পষ্ট। তাই ধর্মের গোড়াতে আমরা পাই বহুদেববাদ। বহু আবর্তন-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ক্রমে তা পরিণত হয় একেশ্বরবাদে। প্রকৃতির সব-কিছুতে দেবত্বের আরোপ এবং তার ফলে প্রকৃতিতে যা-কিছু উজ্জ্বল শক্তিশালী বা ভয়ঙ্কর তাকেই দেবতা বলে পূজা করা, নানা তুকতাক ও মন্ত্রতন্ত্রের সহায়ে কি ঘুষ দিয়ে দেবতাকে বশ করবার বা তার ক্রোধ এড়াবার চেষ্টা করা, দৃশ্য-জগৎ ছাড়াও নানা ভূতযোনি ও দেবযোনিতে পরিপূর্ণ একটা অদৃশ্যলোকে বিশ্বাস করা এবং অদৃশ্য সত্ত্বদের নানা উপায়ে আপ্যায়নের প্রয়াস—মোটামুটি এইগুলি মানুষের আদিম ধর্মবিশ্বাসের লক্ষণ।

এখন বৈদিক ধর্ম আদিমানবের ধর্ম না হ'ক, সুপ্রাচীন যুগের ধর্ম তো বটেই। সুতরাং আদিমানবের অস্ফুট ধর্মবোধ ও কুসংস্কারের ছাপকে সে খুব বেশী কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই ধর্মের যে-সাহিত্য পাওয়া যায়, তার ভাব ও ভাষার ইতিহাস-সম্মত আলোচনা করলে ধর্মবোধের ক্রমাভিব্যক্তির রূপটি আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেদমন্ত্রের বর্বরোচিত দেববাদ ক্রমে উপনিষদের ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়েছে, মানুষের বহির্বৃত্ত চিত্ত বাইরে দেবতাকে না খুঁজে ক্রমে অন্তর্মুখ হতে শিখেছে। কিন্তু জীবনের নৈতিক ভিত্তি স্বভাবতই দুর্বল থাকাতে, তার ধর্মবোধ একেশ্বরবাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) এবং তার আশ্রিত নানা বিক্ষেপে ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মসাধনার দিক দিয়েও বৈদিক যুগ উপ-নিষদের যুগ থেকে অনেক অনুন্নত। যজ্ঞবিধি নিতান্ত বাহ্যিক, বলতে গেলে অনেকটা আদিম ম্যাজিকেরই মত। তার লক্ষ্য দেবতার সাযুজ্য নয়, অন্তরের কোনও দিব্যানুভবের অভিব্যক্তি নয়, চারিত্রিক বিশুদ্ধি নয়; লক্ষ্য, দেবতাকে ঘুষ দিয়ে ধনজনলাভ শত্রুনিপাত ইত্যাদি ঐহিক নানা সুখ-সুবিধা আদায় করে নেওয়া। অতএব কি ভাবের দিক দিয়ে, কি সাধনার দিক দিয়ে মন্ত্রযুগ উপনিষদের যুগ থেকে অনেকখানি যে পিছিয়ে আছে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বেদব্যাখ্যা করবার সময় এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে এবং বৈদিক ঋষির মানসিক আবহাওয়াটি ঠিক-ঠিক বুঝে তার রচিত বাণীর তাৎপর্য নিরূপণ করতে হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বাণীও দুর্বোধ। বেদের যে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা আমরা পাই, তা মন্ত্রযুগ হতে কয়েক হাজার বছর পরের রচনা। তার বহু পূর্ব হতেই বেদমন্ত্রের

আক্ষরিক অর্থও লোকের মনে আবছা হয়ে এসেছিল। খুব প্রাচীন ব্যাখ্যা যা আছে, তা যেমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, তেমনি অস্পষ্ট এবং নানা অবান্তর জঞ্জালে পূর্ণ। এ-অবস্থায় বেদার্থনিরূপণের প্রয়াস নিষ্ফল হত, যদি না সৌভাগ্যক্রমে তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হত। বহু গবেষণার পর একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, বৈদিক আর্যজাতি এক মূল 'আর্য'জাতির শাখা মাত্র। সম্ভবত বৈদিক আর্যেরা ভারতবর্ষে এসেছিল বাইরে থেকে এবং এদেশের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তাদের এই বিজয়কাহিনীর নিদর্শন বেদমন্ত্রের এখানে-সেখানে ছড়ানো আছে। আদিম নিবাস তাদের কোথায় ছিল, এখনও তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইওরোপ এবং এশিয়ার নানা ভূখণ্ডে তাদের জাতভাইরা এখনও ছড়িয়ে আছে এবং তাদের প্রাচীন ধর্মসাহিত্যও কিছু-কিছু সম্প্রতি হাতে এসেছে। এই থেকে তুলনাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা বেদার্থের অনেকখানিই পুনরাবিষ্কার করা যেতে পারে। কোথাও শব্দসাদৃশ্য, কোথাও আখ্যানসাদৃশ্য, কোথাও আচারসাদৃশ্য ইত্যাদি জোড়া দিয়ে বৈদিক সমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের একটা আদল আবার খাড়া করা চলে। তাতে বৈদিক যুগের ধর্মবোধের যে-ছবি পাওয়া যায়, তাকে পূর্বোল্লিখিত অর্ধসভ্য মানুষের ধর্মবোধের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করবার কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

ইওরোপীয় গবেষকদের এই হল একটি অভ্যুপগম। আরেকটি অভ্যুপগমের নাম দেওয়া যেতে পারে প্রকৃতিবাদ (Naturalism)। বৈদিক দেবতারা বাহ্যপ্রকৃতির নানা বিভূতির রূপায়ণ—এই হল তার তাৎপর্য। মতটা আধুনিক নয়। বেদমন্ত্রের এই ধরনের ব্যাখ্যা যে হতে পারে, যাস্কও তার উল্লেখ করে গেছেন। মন্ত্রগুলিতে নিসর্গ-বর্ণনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মত। মধ্যযুগের ব্যাখ্যাকারেরা অনেকক্ষেত্রেই প্রকৃতি-বাদকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এই উপর-ভাসা ব্যাখ্যাই যে মন্ত্রের একমাত্র ব্যাখ্যা, একথাটা তাঁরা কস্মিন্‌কালেও ভাবেননি। নৃতত্ত্বের দিক থেকে প্রকৃতিবাদকে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, রোদ আর বৃষ্টি দুয়ের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। শীতে সূর্য নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মানুষের প্রাণও তখন পড়ে ঝিমিয়ে; বসন্তে জাগে নতুন সূর্য, নতুন প্রাণ, প্রাণিজগতে 'প্রজন কন্দর্পের' লীলা উদ্দাম হয়ে ওঠে,—এই একটা প্রাকৃতিক ছন্দ। কৃষিজীবী মানুষের প্রাণ নির্ভর করে শস্যের উপরে। বৃষ্টি ছাড়া শস্য হয় না, অতএব বৃষ্টির জন্য উতলা হওয়া আদিমানবের পক্ষে স্বাভাবিক। ধর্মবোধের মূল প্রেরণা যদি প্রাণের পুষ্টি ধরা যায়, তাহলে রোদ আর বৃষ্টির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে দেববাদের সঙ্গে যুক্ত করা মানুষের পক্ষে খুবই সহজ। রোদ আর বৃষ্টির উপর জীবনের নির্ভর; কিন্তু দুটিই আকাশের দান, অদৃশ্য দেবতা-দের খেয়ালমাফিক মানুষের ভাগ্যে তাদের বরাদ্দ। অতএব রোদ আর বৃষ্টির জন্য দেবতাদের স্তুতি-আরাধনা ইত্যাদি করতে হবে—সর্বজীবসাধারণ জিজীবিষারই (will to live) তাগিদে। এই হতে সূর্যের মন্ত্র আর বৃষ্টির মন্ত্রের উদ্ভব। বৈদিক মন্ত্র তারই পল্লবিত রূপ। মানুষ এবং ভূমি দুয়েরই উর্বরতাবৃদ্ধি তার একটা মুখ্য লক্ষ্য।

৪

অতিসংক্ষেপে ইওরোপীয় বেদব্যাখ্যার মূল অভ্যুপগমগুলির একটা খসড়া দেওয়া গেল। এগুলিকে ভিত্তি করে গবেষকরা বহু বাগ্‌বিস্তার করেছেন এবং মূল সিদ্ধান্তের আনুষঙ্গিক অনেক উপসিদ্ধান্তেরও অবতারণা করেছেন। মোটের উপর প্রায় একশ বছরের বেদালোচনায় ওদেশে একটা ব্যাখ্যার ধারা বা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, যা এদেশের আধুনিক বেদব্যাখ্যাপদ্ধতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। ফলে ইওরোপীয় বৈদিক গবেষণার সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা মতবাদেরও উদ্ভব হয়েছে। সংক্ষেপে এখানে তাদের উল্লেখ করছি।

সপক্ষের কথাই আগে বলি। ধরা যাক, প্রকৃতিবাদ অবলম্বনে বেদের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা। এই ধারাটি আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ প্রসার লাভ করেছে। বেদের অনেক মন্ত্র কোনও জ্যোতিষিক ঘটনার ইঙ্গিত—এই হল এ-ধারার প্রতিপাদ্য। কথাটা বহু পুরাতন; অতি প্রাচীন কাল হইতেই জ্যোতিষ একটি মুখ্য বেদাঙ্গ বলে স্বীকৃত। কিন্তু বেদমন্ত্র 'জ্যোতিষিক ঘটনার বিবৃতি' এই বললেই সব ফুরিয়ে যায় না। কেন বিশেষ একটা জ্যোতিষিক ঘটনাকে মন্ত্রকার বেছে নিলেন, সে-প্রশ্নের কোনও মীমাংসা এতে হয় না। অতএব শুধু জ্যোতিষিক সমীকরণ থেকেই মন্ত্রের মূল তাৎপর্যে আমরা পৌঁছই না। প্রকৃতিবাদের অনুষঙ্গে আমাদের দেশে আরও দুটি ব্যাখ্যাপদ্ধতি দাঁড় করানো হয়েছে—একটি আবহতত্ত্বকে, আরেকটি ভূতত্ত্বকে আশ্রয় করে। তবে এ-দুটি খুব বেশী চলেনি। এদেরও প্রধান ত্রুটি ঐ। প্রথমত এদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যা মাত্র পাওয়া যায়; দ্বিতীয়ত, মন্ত্রকারের ঘটনানির্বাচনের হেতুর উপরে এসব ব্যাখ্যা কোনও আলোকপাত করে না। বস্তুত, বেদের এমন-একটা ব্যাখ্যা-পদ্ধতি আমাদের চাই যার আমলে সমস্ত না হোক, অধিকাংশ মন্ত্রই এসে পড়বে এবং তাতে মন্ত্রকারের মন্ত্ররচনার মূল অভিপ্রায়টিও স্পষ্ট হবে। জ্যোতিষ ভূতত্ত্ব বা আবহ-তত্ত্বের অনুকূল ব্যাখ্যাতে এ-চাহিদা মেটে না।

তারপর, বিপক্ষের কথা। ইওরোপীয় ব্যাখ্যাপদ্ধতির ধাক্কায় আমাদের দেশে আস্তিকদের মনে আবার বেদসম্পর্কে নতুন করে কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। প্রাচীন কালের মতই তর্কের মার খেয়ে শ্রদ্ধা তার শৈথিল্য পরিহার করে একটা নতুন ধরনে বেদমীমাংসার পত্তন করছে। এ-আন্দোলনটা খুব পুরাতন নয় এবং এখনও তা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হতে পারেনি, যদিও তার যে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বেদব্যাখ্যার যে-ধারা এতদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশী সরকারের সমর্থন পেয়ে এসেছে, তা কিন্তু ইওরোপীয় গবেষণারই অনুবৃত্তি এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই তার মধ্যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারী গণ্ডির বাইরে আরেকটি ধারা ইওরোপীয়-প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। তার মূলে কাজ করছে প্রধানত জাতীয় মমত্ববোধ এবং তারও চেয়ে বড় কথা—শ্রদ্ধা এবং ভাবকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বেদকে নতুনভাবে বোঝবার চেষ্টা।

এদেশে বেদচর্চার এই নতুন ধারা আবার দুটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে। তার একটির বৈশিষ্ট্য মীমাংসকদের প্রবর্তিত প্রাচীন ধারার সম্পূর্ণ অনুবর্তন এবং তারই

পরিবর্ধন। এ-প্রচেষ্টা অনেকটা লোকাতত এবং রক্ষণশীল ভারতবর্ষের সমষ্টিচেতনার একটা কীর্তি। এর প্রেরণার উৎস প্রধানত সায়ণের ভাষ্য। সায়ণের ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে এদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বেদব্যাখ্যা এবং বেদপ্রচারের একটা প্রশংসনীয় প্রয়াস অনেকদিন থেকেই দেখা দিয়েছে। সায়ণের কর্মবাদী ব্যাখ্যা সাধারণত দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে নীরব। নবীন ব্যাখ্যাতারা সায়ণের এই ত্রুটি পূরণ করে ভক্তিবাদের সাহায্যে দেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। যেদেশে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তথাকথিত বহুদেববাদ এখনও অধ্যাত্মপ্রেরণার একটা জীবন্ত উৎস, সেদেশে সর্বসাধারণের কাছে অধ্যাত্মবিদ্যার চরম প্রমাণরূপে স্বীকৃত বেদকে এইভাবে বোঝাবার আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক। আপ্তবাক্যের তাৎপর্য বোঝাবার জন্য শ্রদ্ধা যে একটা অপরিহার্য সাধন এবং উপাদান, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু যেখানে আপ্তবাক্যের গূঢ়ার্থ একটা অবিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক ধারা বেয়ে আমাদের হাতে আসেনি, সেখানে শুধু শ্রদ্ধা এবং ভক্তি দিয়ে লুপ্ত তাৎপর্যকে পুনরাবিষ্কার করবার চেষ্টা সবক্ষেত্রে যুক্তিসহ নাও হতে পারে। এজন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্তির এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণপদ্ধতির যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য বেদ বোঝবার পক্ষে সায়ণের ব্যাখ্যা অপরিহার্য। তাঁকে আমাদের প্রধান দিশারী বলে মেনে নিতেই হবে এবং তাঁর উপস্থাপিত অর্থকে প্রত্যাখ্যান করবার আগে ধীরভাবে বিচার করতেই হবে। কিন্তু শ্রদ্ধালুতাবশত তাঁকে সবক্ষেত্রেই মেনে নিতে হবে—এ হয় তো সায়ণ স্বয়ংও দাবি করতেন না। তিনিও মন্ত্রব্যাখ্যায় অনেকক্ষেত্রে যাস্ককে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অমন প্রাচীন প্রামাণ্যকে দরকার হলে অস্বীকার করতেও পশ্চাৎপদ হননি।

সায়ণের ধারা ছেড়ে নতুনধরনে অথচ শ্রদ্ধা ও ভাবকতাকে ভিত্তি করে বেদব্যাখ্যার দুটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস আধুনিক যুগে হয়েছে—একটি আর্যসমাজী-সম্প্রদায়ের দ্বারা, আরেকটি পণ্ডিচেরী-সম্প্রদায়ের দ্বারা। দুটি সম্প্রদায়েরই উদ্দেশ্য এদেশের গোঁড়া সম্প্রদায় বা ইওরোপীয় নব্য সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে বেদার্থকে জীবনদর্শনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যাখ্যা করা। এই প্রচেষ্টার যে একটা গভীর সার্থকতা আছে, তা বলাই বাহুল্য। কর্মকাণ্ডীদের বেদব্যাখ্যায় যে-ফাঁক রয়ে গেছে, তাকে যদি আমরা পূরণ করতে না পারি, তাহলে বেদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা একটা অন্ধবিশ্বাসের পর্যায়ে নেমে আসে এবং তার কোনও প্রামাণিকতাও থাকে না। বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে প্রাচীন মীমাংসকদের যেসব পূর্বপক্ষীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আধুনিক বেদবাদীদের পূর্বপক্ষীরা তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাচীন পূর্বপক্ষীরা জড়োত্তর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বেদকে সরাসরি অপ্রমাণ বলেছেন, কিন্তু স্বকল্পিত কোনও-একটা অভ্যুপগম অবলম্বন করে নিজেরা বেদব্যাখ্যা করতে যাননি। আধুনিক পূর্বপক্ষীরা কিন্তু তা-ই করছেন। বেদকে বিচার করছেন তাঁরা আপ্তবাক্য হিসাবে নয়, কিন্তু প্রাচীন মানবের অপরিণত চিত্তের সাহিত্য হিসাবে এবং সেই দৃষ্টিতে বেদের একটা ব্যাখ্যাও দাঁড় করাচ্ছেন। এই ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহলে বেদ অতীত কুসংস্কারের একটা প্রাণহীন জঞ্জাল হয়ে পড়ে, সুতরাং শ্রদ্ধার্হ কিংবদন্তী হিসাবে ছাড়া আধুনিক অধ্যাত্মজীবনে তার কোনও প্রামাণিক প্রভাবও থাকতে পারে না। কিন্তু একথা স্বীকার করে নেবার পূর্বে, এদেশের কিছু-না-জেনে গোঁড়ামি আর

ইওরোপের সবজান্তা কালাপাহাড়কে যাচাই করে দেখবার একটা প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। এদেশের আস্তিকদের অসায়ণীয় বেদমীমাংসাপদ্ধতির উদ্ভব সেই প্রয়োজন থেকেই। আর্যসমাজী আর পণ্ডিচেরী দুটি সম্প্রদায়ই এই কাজে ব্রতী আছেন। আর্য-সমাজীদের প্রবর্তকের রচিত বেদভাষ্য আছে, যা সায়ণের পরে সেইধরনে বেদের উপর আধুনিক যুগের প্রথম ভাষ্য। আর্যসমাজীদের পরবর্তী বৈদিক গবেষণার ভিত্তি অবশ্য এই ভাষ্যই, কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা ইওরোপীয় সমীক্ষাপদ্ধতির অনুসরণে বেদার্থকে নতুন করে আস্তিক্যবুদ্ধির অনুকূলে যাচাই করবার বিরাট কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। পণ্ডিচেরী-সম্প্রদায়প্রবর্তকের রচিত ধারাবাহিক বেদভাষ্য নাই, আছে তাঁর কতকগুলি নিবন্ধ ও দিগ্‌দর্শনহিসাবে আংশিক মন্ত্রব্যাখ্যা। এগুলি মরমীয়ার দৃষ্টি নিয়ে বেদার্থের উপর নতুন আলোকপাত করেছে বলে ভবিষ্যৎ বৈদিক গবেষণার চৈত্যস্তম্ভ-রূপে গণ্য হবার যোগ্য। তাঁর ইঙ্গিতের অনুসরণে সংস্কৃত বেদভাষ্যের কাজও এই সম্প্রদায়ের তরফ থেকে শুরু হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের কাজই চলতি অবস্থায়। এঁদের প্রভাব ধীরে-ধীরে এদেশের বৈদিক গবেষকদের মাঝেও সংক্রামিত হয়ে ইওরোপীয় ব্যাখ্যার সম্মোহনমন্ত্রকে খানিকটা নির্বীর্য করে আনছে বলে মনে হয়।

৫

এই গেল এদেশের আধুনিক বৈদিক গবেষণার বিভিন্ন ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এইবার ইওরোপীয় ব্যাখ্যার মূল সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্, তার কল্পিত মানকে বেদব্যাখ্যায় নির্বিচারে প্রয়োগ করতে পারা যায় কি না।

প্রথমেই ওঠে অধিকারের কথা। যাস্ক তাঁর নিরুক্তের উপক্রমণিকায় একটি শ্লোক উদ্ধার করেছিলেন, তাতে আছে ঃ 'বিদ্যা এসে ব্রাহ্মণকে বললেন, যে অসূয়ক, যে অনৃজু, যে অযতি, তার কাছে আমার কথা বলো না।' এ-সাবধানতা শুধু বিদ্যার বেলায় নয়, যা-কিছু প্রাণ বা মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা-কিছু একটা জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, তার বেলাতেও খাটে। যেমন মানুষের বেলায়, তেমনি মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বেলায়, বিশেষ করে তার অতি অন্তরঙ্গ ধর্মবোধের বেলায়—তাদের বুঝতে বা বিচার করতে হলে আগে চাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ। যাকে বুঝতে চাইব, তার সঙ্গে আত্মবিনিময় দ্বারা তদ্‌গত না হলে তার অন্তররহস্যের নাগাল আমরা পাব না। নানাদিক দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইওরোপের পার্থক্য এত বেশী যে ইও-রোপের পক্ষে ভারতবর্ষকে বুঝতে পারা বলতে গেলে একরকম অসম্ভবের শামিল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ভাবনা ও সাধনার অধিকাংশ এপর্যন্ত যবনিকার অন্তরালেই রয়ে গেছে। তাই তার যতটুকু ইওরোপের চোখে পড়ে, তা তার কাছে অদ্ভুত ও রহস্যময় ঠেকে।

তাছাড়া ধর্ম সম্পর্কে মানুষের একটা তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা আছে, যার ফলে আমার ধর্ম আমার কাছে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক মনে হলেও অপরের কাছে অথবা অপরের ধর্ম আমার কাছে দুর্বোধ বলে মনে হয়—যদি সে-ধর্মের চারদিকে আবার আচারের

বেড়া থাকে। মানুষ নিজের ধর্মকে যত নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেছে, ততই অপরের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞাও দেখিয়েছে—এও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আর এই বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা বিশেষ করে বাসা বেঁধেছে সেমিটিক বা প্রোটেস্টাণ্ট মনের মাঝে—যার মূলে রয়েছে ধর্মের স্বাভাবিক সর্বজনীন প্রকাশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। প্রথমত হয়তো সঙ্গত কারণেই এ-বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু পরে তা নিজের বেগেই একটা অসহিষ্ণু মতুয়ারিতে পরিণত হয়ে যাকে আঘাত করে তাকে মূঢ় হয়েই অন্ধের মত আঘাত করে। দেশ কাল আচার ও জীবনযাত্রার পার্থক্য, অল্পকালের মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতিতে সভ্যতার মান সম্পর্কে একটা উন্নাসিক আভিজাত্যের বোধ, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক শ্রেষ্ঠতার গর্ব, কেবল উপরে-উপরে দেখেই তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করে বসার প্রাকৃতজনসুলভ দুর্বলতা—এইগুলি যেন গোড়া হতেই ইওরোপীয় মনকে ভারতের সব-কিছুকেই খাটো করে দেখবার জন্য তৈরী করে রেখেছে। ভারতবিদ্যার ইতিহাস যাঁরা মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরাই জানেন, ভারতবর্ষকে তার কৃতিত্বের ন্যায্য সম্মান দিতে ইওরোপ কী অসম্ভব দীর্ঘ সময়ই না নিয়েছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহুদিন ধরে ইওরোপের মনের চারদিকে যে একটা স্বরচিত কুয়াসার কুণ্ডলী সৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে তার অধিকাংশ গবেষণাই এমন-সব কিম্ভূতকিমাকার জল্পনায় আবর্তিত হয়ে চলেছে, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের বাস্তবজীবনের বিশেষতঃ তার অন্তর্গূঢ় চেতনার কোনও যোগই নাই।

ভারতবর্ষের সমাজচেতনা সম্পর্কে ইওরোপের বিচারধারায় যে-হঠকারিতা দেখতে পাওয়া যায়, তা আরও বেশী রূঢ় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তার ভারতীয় ধর্মের বিচারে। ধর্মবোধের চরম পরিণতি অতীন্দ্রিয় অনুভবে। অতীন্দ্রিয় অনুভবের ক্ষমতা ব্যক্তি-বিশেষে একটা প্রাক্‌সিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম। এই অনুভবের প্রবণতা যার মধ্যে নাই, তার পক্ষে নিজের ধর্মকেই বোঝা কঠিন—পরের ধর্মকে বোঝা তো দূরের কথা। ধর্মের সত্য যদি অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের বিষয় হয়, তাহলে কোনও অভিজ্ঞতা অর্জন না করেই তার সম্পর্কে মত প্রকাশ করাকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় বলা চলে না। অথচ বেদব্যাখ্যার বেলায় ঠিক এইটিই ঘটেছে। যাঁরা মরমীয়া নন, বেদের মর্মোদ্ধারের জন্য তাঁরাই নিজেকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করেছেন—এই এক আশ্চর্য ব্যাপার।

তাছাড়া ইওরোপীয় মনের মধ্যে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে একটা মোহ আছে। বহু দেবতার আরাধনা হতে এক দেবতার আরাধনায় পৌঁছনোকে সে ধর্মজগতে একটা অভ্যুদয়ের ব্যাপার বলে মনে করে। একাধিক দেবতাকে যে মানে, তার ধর্ম একেশ্বর-বাদীর ধর্মের চেয়ে খাটো, এ তার একটা প্রাক্তন সিদ্ধান্ত। গোড়া হতেই এই নিরাকৃতির ভাব মনের মধ্যে যে-অশ্রদ্ধার সঞ্চার করে, তা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের মর্ম গ্রহণ করবার পক্ষে একটা অলঙ্ঘ্য বাধা। ধর্ম অনুভবের বস্তু, আর সে-অনুভবের ভিত্তি হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা যেখানে নাই, সেখানে অপরের অন্তরের গভীরতম সত্যকে কেউ স্পর্শ করতে পেরেছে, এ-দাবি তার মূঢ়তা মাত্র। আর-কিছু না হ'ক, শুধু এই অশ্রদ্ধার জন্যেই ইওরোপীয় বেদব্যাখ্যার ধারাকে সংশয়ের চোখে না দেখে পারা যায় না।

বৈদিক দেববাদ ইওরোপীয় মনের কাছে একটা রহস্য—শুধু রহস্য নয়, একটা অবজ্ঞার বিষয়। অথচ এক দেবতাকে বহু দেবতাতে পরিণত করবার একটা স্বাভাবিক

প্রবণতা মানুষের মধ্যে আছে। যারা দেবতাকে মানে না, তারা অলৌকিক শক্তির আধাররূপে অতিমানবকে মানে, অতিমানবের সাঙ্গোপাঙ্গরূপে পীরদের মানে, দেবতার জায়গায় angel দিয়ে তাদের pantheonকে তারা পূর্ণ করে। এক আর বহুর মধ্যে বিরোধের কল্পনা করে তার্কিক মন। কিন্তু বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে সামান্য আর বিশেষের যে অঙ্গাঙ্গিভাব রয়েছে, তা মনুষ্যচিত্তের একটা মৌলিক বৃত্তি। এই বৃত্তিকে অতীন্দ্রিয় জগতেও পরিহার করে চলা যায় না, যদি না আগে থেকেই তার বিরুদ্ধে আমরা একটা মতুয়ারিবুদ্ধিকে সজাগ করে রাখি। বহুর প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে একটা অন্যোন্যব্যাবর্তকতা আছে, এটা হল জড়াসক্ত বুদ্ধির কথা, ইন্দ্রিয়জগতের কথা। একটু ঊর্ধ্বে উঠলেই আমরা এর মধ্যে সামান্যজ্ঞানের আভাস ফুটে উঠতে দেখি। তখন মনের বিক্ষিপ্ত ও বিবিক্ত বৃত্তির মাঝে একটা অন্তরঙ্গ যোগসূত্র আবিষ্কার না করে আমরা পারি না। আর একটু ঊর্ধ্বে উঠলে এই যোগাযোগের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় একটা অন্যোন্যসঙ্গমের সূত্র, যাতে একত্বের বহুধাবিসৃষ্টি একটা স্বাভাবিক সত্য বলেই প্রতিভাত হয়। এই-যে স্বাভাবিক এবং সর্বগ্রাহী একত্বের বোধ, বহুত্বের সঙ্গে তার কোনও বিরোধই থাকতে পারে না। কেননা, বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহায়ে জগৎকে বোঝবার যে মানবমানসসুলভ ভঙ্গি, এই যুগ্মবোধের সৃষ্টি হয়েছে সেই আদিম দ্বৈতাদ্বৈত হতেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বেলায় বিশেষ ও সামান্যের, এক আর বহুর ভাবগত অন্যোন্যবিনিময় প্রতি মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে ঘটছে এবং অনুভবের এই দুটি প্রান্তকে জড়িয়ে জেগে থাকছে এক অখণ্ড অভঙ্গ সমগ্রতার বোধ। এ-বোধ মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম। সে-মন যখন অন্তশ্চেতনার বিস্ফারণের প্রেরণায় ইন্দ্রিয়রাজ্য ছেড়ে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়, তখন তার স্বাভাবিক ধর্মকে সে পরিহার করে যায় না, যেতে পারে না। এককে বহুরূপে বিবর্তিত দেখা, আবার বহুকে একের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখা—এ তখন অধ্যাত্মানুভূতির একটা সহজ ছন্দে পরিণত হয়। যদি কোনরকমের গোঁড়ামি দিয়ে এই সহজ ছন্দকে আমরা খণ্ডিত না করি, তা হলে একদেববাদ এবং বহুদেববাদকে একই সঙ্গে স্বীকার করা অধ্যাত্মচেতনার একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গি হয়ে দাঁড়ায়। এ যেন একরকম অতি-মানস স্বভাববাদঃ ঠিক এই জগতে যেমন একটা অভঙ্গতার মধ্যে এক আর বহুর অন্যোন্যসঙ্গত অথচ নিটোল প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অতীন্দ্রিয় জগতের জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখেও ঠিক তা-ই ফুটে উঠবে—মনের দেখবার মৌলিক ভঙ্গি সেখানে বিপর্যস্ত হয় না বলেই। যে-কোনও মরমীর অধ্যাত্মানুভবের ইতিহাস অনুধাবন করে দেখলেই এ-ব্যাপার ধরা পড়ে—যদিও ধর্মের গোঁড়ামি অনুভবের এই মৌলিক সত্যকে গায়ের জোরে চাপা দেবার চেষ্টা করবেই।

একদেববাদ আর বহুদেববাদে বিরোধ আর্য মনের অগোচর। এটি বিশেষ করে সেমিটিক মনের দান। সেমিটিক মন ঈশ্বরের পৌরুষেয় সত্তা স্বীকার করেও তাকে নির্গুণরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করবার চেষ্টা করেছে—এইখানে তার একদেববাদের চরম গৌরব। 'এই এক দেবতা ছাড়া আর দেবতা নাই'—এইধরনের অধ্যাত্মমায়াবাদের গোঁড়ামিকে যদি সে আঁকড়ে না ধরত, তাহলে তার এ-বাদ সম্পর্কে নালিশ করবার কিছুই থাকত না। কিন্তু আর্য মন ঈশ্বরত্ব হতে পৌরুষেয় ধর্মকে ছেঁটে দিয়েও, এমন-কি

ঈশ্বরভাবনাকে অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বলে প্রত্যাখ্যান করেও অধ্যাত্মচেতনার একটা ভূমিতে বহুদেবের মণ্ডলীকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এইখানেই দুটি মনের তফাত। একটি মন খণ্ডদর্শী, আর একটি অখণ্ডদর্শী। একটি অখণ্ডসত্তার মধ্যে ভেদরেখা টেনে ঈশ্বর আর জগতে বিরোধের আভাস জাগিয়ে তোলে এবং জগৎকে মনে করে ঈশ্বরের কৃতি; আর একটি অভেদদর্শনের নিটোলতার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বহুকে স্থান দিয়ে জগৎকে দেখে এক অখণ্ডচৈতন্যের বহুধা আত্মবিসৃষ্টিরূপে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি প্রজ্ঞাবাদীদের দর্শন ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিয়েও কি করে বহুদেবতার একটা মণ্ডলীকে স্বীকার করতে পারে, তা ইওরোপীয় মনের কাছে কল্পনাতীত। তাই অতি আধুনিক কালেও ইওরোপীয় পণ্ডিতকে দেববাদবর্জিত আদিম বৌদ্ধধর্মের রূপকে আবিষ্কার করবার চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম হতে দেখি। বস্তুত তুরীয় ও সুষুপ্ত চেতনা হতে বিচ্ছুরিত স্বপ্ন ও জাগ্রতের খেলাকে উপনিষদের যে-ঋষিরা চতুষ্পাৎ ব্রহ্মেরই লীলা বলে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের কাছে নিরীশ্বরবাদ ও দেববাদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকবার এতটুকু সম্ভাবনা কোথাও নাই। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর আর বহু-দেবের স্তুতিতে মুখর শঙ্কর এদেশের অধ্যাত্মবোধে কোনও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেন না। এদেশের রামকৃষ্ণ নির্বিকল্পস্থিতিতে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েও আবার নানা দেবদেবীর পায়ে কি করে মাথা ঠুকতে পারেন, তা ইওরোপীয় মনের কাছে রহস্য হলেও ভারতীয় মনের কাছে মোটেই কোনও রহস্য নয়।

একদেববাদ ও বহুদেববাদ নির্বিবাদে শুধু পাশাপাশি নয়, একেবারে একাকার হয়ে ঠাঁই পেয়ে এসেছে এদেশের ঋষির মনে সেই বৈদিক যুগ হতে। আজপর্যন্ত দুয়ের মধ্যে কোনও protest-এর সৃষ্টি না করেও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছন এদেশের মরমীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি করে, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ডুবে এ-ব্যাপারটি না বুঝলে বেদব্যাখ্যার অধিকার কারও আছে একথা আমরা মানতেই পারি না। বস্তুত দেববাদের সত্যকে না বুঝে বেদ বোঝাবার দাবি অজ্ঞের একটা ঔদ্ধত্য মাত্র।

দেববাদকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে রেখে দেখবার পক্ষে আরেকটা বাধা হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর কল্পিত পরিণামবাদ। এই বাদ বলে, আদিমমানবের পক্ষে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরপুরুষের ধারণা অসম্ভব; আদিতে বহুদেবতার উপাসনা, তারপর ক্রমে ন্যায়বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে এক ঈশ্বরের ধারণা—এই রীতিতে ধর্মবোধের পরিণাম ঘটে থাকে। পরিণামবাদকে ধর্মবোধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ধর্মের আদিরূপ আবিষ্কার করবার চেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলছে। এই উপলক্ষ্যে যেসমস্ত ism-এর সৃষ্টি হয়েছে, তাদের অনেকগুলিই বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে খাটে না, ওদেশের অভিজ্ঞ ভারতবিদ্যা-বিদ্‌দের অনেকেই এবিষয়ে একমত। তবুও দেখি, মানুষের মন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ঐতিহাসিক আলোচনা করে যাঁরা তার উৎসে পৌঁছতে চান, তাঁদের লেখায় অনেকসময় নিজেদের মতের পোষকরূপে বৈদিক সাহিত্য হতে উদ্ধরণ হাজির করে তার অপব্যাখ্যা করবার একটা রীতি পণ্ডিতমহলে বেশ প্রসার লাভ করেছে। প্রকরণ হতে বিচ্ছিন্ন এমন ব্যাখ্যার অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। এতে আর কিছু না হ'ক, যেসব প্রাক্‌কল্পনা হতে বেদের অপব্যাখ্যা হবার সম্ভাবনা, মানুষের মধ্যে

তাদের কায়েমী করে দিয়ে একটা ভ্রান্ত সম্প্রদায়বুদ্ধির সৃষ্টি করা হয়। ওদেশের ভারত-বিদ্যাবিদ্‌রাও সত্যের খাতিরে বাধ্য হয়ে এর প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও বৈদিক ধর্মের বহুদেববাদ যে ধর্মবোধের অপরিণত রূপের সূচক, এসম্বন্ধে তাঁরা সবাই একমত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই অভিজ্ঞ নৃতত্ত্ব-বিদ্‌দের মহলে আদিম ধর্ম সম্বন্ধে এধরনের মতবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। একেশ্বরবাদই যে আদিমানবের স্বভাবধর্ম, এ-মত বৈজ্ঞানিক রীতিতে তথ্যের পরীক্ষা ও সমীক্ষার উপর এখন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যদিও পরিণামবাদকে পরাজিত করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তবুও ভারতবিদ্যা-বিদ্‌দের মধ্যে এখনপর্যন্ত প্রাচীন পরিণামবাদকে আঁকড়ে থাকবার রীতি বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ।

কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে, একেশ্বরবাদের আদিমত্ব বৈদিক ধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে কোনও সাহায্য করে না। এতে শুধু এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, বহুদেবতার উল্লেখ দেখেই বৈদিক ধর্মকে ধর্মের বর্বরোচিত আদিরূপ বলে কল্পনা করা অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। আদিমানবও যদি একেশ্বরবাদী হয়, তাহলে একেশ্বরবাদ দিয়ে কোনও ধর্মের কৌলীন্য নিরূপিত হয় না—পরিণামবাদের উপরে ঐতিহাসিক পদ্ধতির এইখানে জিত। ভারতবিদ্যাবিদ্‌রা যদি একথাটি স্মরণে রাখেন, তাহলে তাঁদের গবেষণা উৎপথপ্রস্থিত হবার আশঙ্কা থেকে বেঁচে যাবে।

আসলে এ-প্রশ্নটার সমাধান হতে পারে ধর্মবোধের নিরপেক্ষ মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ দ্বারা। পরিণামবাদ ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি দুইই ক্ষেত্রবিশেষে সত্য, অর্থাৎ তারা রূপের সত্য, কিন্তু ভাবের সত্য নয়। ধর্ম সম্পর্কে বিচার করতে গেলে দৃষ্টি দিতে হবে এই ভাবের দিকে, রূপের দিকে নয়। তার জন্যে প্রয়োজন—যেমন আগেই বলেছি—একটা মমত্ববোধ, গভীরে ডোববার একটা কুশলতা। এও বলেছি, এক বা বহুর গাণিতিক প্রশ্নটা এদেশের মনে কোনদিন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। অথচ ঐতিহাসিক কালের মধ্যেই সেমিটিক মনে এটাকে অন্তত দুবার আমরা বিপ্লব সৃষ্টি করতে দেখেছি। সে-মন যখন ধর্মবোধকে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে, তখন স্বভাবতই গাণিতিক অপসংস্কারকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। মনের মধ্যে গোড়ার এই বাধাটুকু তাই প্রথম হতেই তার সমস্ত বিচারকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করে দেয়। ফলে বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে আমরা ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের মুখে এমন-সব কথা শুনতে পাই, যা এদেশের সংস্কার ও ইতিহাস দুয়েরই বিরুদ্ধে এবং সত্য বলতে ধর্ম সম্পর্কে অতি আধুনিক যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতারও বিরুদ্ধে।

সমস্ত বিষয়টাকে খুঁটিয়ে বিচার পরে করব। এখন শুধু একটা কথা বলে রাখি, বৈদিক ধর্মের মূল লক্ষ্য চেতনার স্বোত্তরণ, দেবতা তার উপলক্ষ্য মাত্র। সব ধর্মেই তা-ই, কিন্তু বৈদিক ধর্ম এ-সাধনাকে একটা বিশেষ খাতে প্রবাহিত করেছে, যার প্রতিরূপ অন্যত্র মুখ্য হয়ে ফুটে ওঠেনি। জীব-বিশ্ব-বিশ্বোত্তীর্ণের তাদাত্ম্য বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত এবং তা-ই বৈদিক ধর্মেরও মূল কথা। এই তাদাত্ম্যকে অনুভবে রেখে তার উৎসের দিকে যদি আমরা উজিয়ে যেতে পারি, তাহলেই বেদার্থের সত্যকার রূপটি আবিষ্কার করতে পারব। গোড়ায় একটা অখণ্ড বোধ, তারপর কালক্রমে তার বিচিত্র

পরিণাম—অধ্যাত্ম অনুভবের বিবর্তন এইভাবেই হয়। মূল ভাবটিকে এখানে প্রাক্‌সিদ্ধ বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। এ যেন ভাব-বীজের মত। পরিণামের প্রত্যেক পর্বে তার আত্মরূপায়ণের সংবেগ ক্রিয়া করে চলেছে। কিন্তু এই ক্রিয়াকে অস্ফুটের স্ফোটন বললে ভুল হবে। মনে রাখতে হবে, অধ্যাত্মসাধনা মাত্রেই প্রবৃত্তিপর (progressive) নয়, নিবৃত্তিপর (regressive)। পরিণামবাদ রূপের বিবর্তন হতে দেখে অস্ফুট থেকে স্ফুটের দিকে। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনা ফিরে চলে স্ফুটব্যক্ত হতে আদিঅব্যক্তের দিকে। এই অব্যক্তবোধ মনোবিবর্তনের যে-কোনও পর্বে অহেতুকভাবে আবির্ভূত হতে পারে। তা-ই হল মরমীয়া অনুভবের (mysticism) মর্মকথা। একটা সহজের বোধি এবং তার সুস্পষ্ট বাণীরূপ—এই যদি আমরা কোথাও পাই, তাহলে নিঃসংশয়ে তাকে ধর্ম-বোধের তুঙ্গত্বের সূচক বলে গ্রহণ করব। বেদমন্ত্রের মধ্যে এই লক্ষণ যত্র-তত্র সুস্পষ্ট। সুতরাং বেদার্থের বিচার করতে হবে এই সূত্র ধরেই।

বৈদিক ধর্মের প্রতি সুবিচার করবার পক্ষে আরেকটা প্রকাণ্ড বাধা তার বাহ্যিক ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য। এ-বাধা শুধু ইওরোপীয় মনেই নয়। আমাদের দেশেও যে এসম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব আছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে এদেশে ক্রিয়াকাণ্ডকে জ্ঞানবাদীরা নিন্দা করেছেন, ভোগ আর ঐশ্বর্য তার লক্ষ্য বলে। কিন্তু তার ফলোপধায়কত্ব সম্পর্কে তাঁরা কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। যজ্ঞবাদীরা স্বর্গ-কামী, স্বর্গকেই তাঁরা অমৃতলোক মনে করেন; কিন্তু যথার্থ অমৃতত্ব হল মোক্ষ—তা তত্ত্বজ্ঞানলভ্য, কোনও কর্মের ফল নয়: এই হল জ্ঞানবাদীদের মত। কিন্তু ইওরোপীয় মনের কটাক্ষ ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে অবিদ্যার প্রতি। ক্রিয়াকাণ্ড ম্যাজিক বা অপবিদ্যা, মন্ত্রশক্তি এবং তুকতাক দিয়ে জড়কে বশ করবার চেষ্টা সুতরাং হাস্যকর—এই হল সমালোচকের মনোভাব।

চিত্তশক্তি দিয়ে জড়শক্তিকে বশ করবার প্রচেষ্টাকে আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। বিজ্ঞানও তা-ই করছে—অবশ্য জড়কে জড়ের ভূমিতে রেখেই তার ধর্ম ও প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করে। তার ফল প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং লোকাতত, তাই তার প্রামাণ্য বেশী। কিন্তু জড়ের অনুভবকে যদি সূক্ষ্ম চৈতন্যের ভূমিতে উত্তীর্ণ করি এবং তার সঙ্গে কর্তার চেতনার একটা সমতা অনুভব করে তাকে বশে আনবার চেষ্টা করি, তাহলে ব্যাপারটাকে একেবারে অযৌক্তিক বলতে পারি না। তবে এক্ষেত্রে যুক্তিটা জড়োত্তর, কিন্তু তাবলে কুযুক্তি নয়। প্রাকৃত ইচ্ছাশক্তি মনের উপরভাগ নিয়ে জড়ের উপরভাগের উপর ক্রিয়া করছে। ইচ্ছাশক্তিকে আরও গভীরে তলিয়ে দিয়ে চিত্তের সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে জড়ের সূক্ষ্মশক্তিকে আমরা প্রভাবিত করতে পারি কি না—এটা একটা গবেষণার বিষয়। রহস্যবিদ্যার উদ্ভব এইখানে। মানবচিত্তের এটা একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। এ-চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয়েছে, একথা বলা চলে না। অধ্যাত্ম-চেতনার ব্যাপ্তির একটা বিশেষ পর্বে ব্যক্তিতে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়, এটা সব ধর্মেই মানে। আজও এ-শক্তির আবির্ভাব বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-সেখানে হতে দেখা যায়। সুতরাং ব্যাপারটা অসম্ভব বলে একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে আমরা অন্তত সম্ভাব্যের কোঠায় তাকে ফেলতে পারি। অতিপ্রাকৃতকে নিয়ে একটা বিজ্ঞান গড়ে তোলবার চেষ্টা এদেশে আবহমান কাল হয়ে এসেছে। এমন-কি আজপর্যন্ত তার বিরাম ঘটেনি।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে তার যে অনুবৃত্তির সম্পর্ক রয়েছে, তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না এবং বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে বিচার করতে গেলে তার উপর আগে থেকেই পছন্দ-অপছন্দের রায় দিয়ে বসতে পারি না। তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তথ্যকে আমাদের সহজভাবেই মেনে নেওয়া উচিত—প্রাক্‌সিদ্ধ কোনও সিদ্ধান্ত দিয়ে নিজেকে প্রভাবিত না করে, এটা সহজ বুদ্ধির কথা।

কিন্তু পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি, বৈদিক ধর্ম কেবল ক্রিয়াকাণ্ড, একথা মনে করা ভুল। বাহ্যক্রিয়া যেমন আছে, তেমনি তার গভীরে অর্থের একটা ব্যঞ্জনাও আছে। ক্রিয়ার লক্ষ্য যে কেবল প্রকৃতিবশীকার তা নয়—আত্মচেতনার উন্মেষও। দার্শনিক পরিভাষায় এ-দুটিকে বলা হত অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স। এ-দুয়ের প্রভেদ অতি প্রাচীন। একই ক্রিয়ার একটা রূপ অভ্যুদয়কে লক্ষ্য করে এবং আরেকটা রূপ লক্ষ্য করে নিঃশ্রেয়সকে—এমন বিধান যেমন তন্ত্রে আছে, তেমনি আছে বেদের ব্রাহ্মণে। ক্রিয়াকাণ্ড ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধনের সহায়মাত্র। ইচ্ছা সিদ্ধচেতনার অস্ফুট বোধ। তাকে সক্রিয় করবার জন্য যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণের সাহায্য নেওয়া হয়, সেখানেই ক্রিয়াকাণ্ডের উৎপত্তি। উপকরণ যদি হয় নিজের দেহ (যাকে সাধারণত পরাক্-দৃষ্ট বস্তুর অন্তর্গত বলে আমরা ধরে নিই), তাহলে পাই যোগ; যদি হয় দেহবাহ্য বস্তু, তাহলে পাই তন্ত্র। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে দুটি একাকার হয়ে মিশে আছে। একই মন্ত্র অধ্যাত্ম অর্থে ইঙ্গিত করছে যোগের, আবার অধিভূত অর্থে তন্ত্রের। আগেরটা মন্ত্রের উপনিষৎ (mystic sense), পরেরটা রহস্য (occult power)। বৈদিক ধর্মে দুয়ের সংমিশ্রণ। উপনিষৎ এবং রহস্যসমেত বেদার্থ অধিগত করতে হবে—এ-বিধান ব্রাহ্মণের।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মসাধনায় আজপর্যন্ত উপনিষৎ ও রহস্যের সংমিশ্রণ অব্যাহত আছে। উপনিষদের লক্ষ্য বিজ্ঞান বা চেতনার উত্তরায়ণ এবং পরিশেষে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান; আর রহস্যের লক্ষ্য সিদ্ধচেতনাতে আত্মা হতে শক্তির বিচ্ছুরণ। জ্ঞান আর শক্তি অবিনাভূত—এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর উপনিষৎ ও রহস্যের সংমিশ্রণের ভিত্তি। এই অবিনাভাবের অনুভব হয় প্রথম আত্মচেতনাতে। আমার বিজ্ঞানের ফল-স্বরূপ দেখি আমার প্রকৃতির অবরুদ্ধ শক্তির উন্মেষ। ব্যাপারটা অসাধারণ কিছুই নয়, বলতে গেলে চিৎশক্তির এ একটা মৌলিক বৃত্তি। এলোমেলো ছড়ানো চেতনা একটা কেন্দ্রে গুটিয়ে এসে আমার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে। এই ব্যক্তিত্ব বা সংহত আত্ম-চৈতন্য আমার মাঝে চেতনার যে-ঐশ্বর্যের বিকাশ ঘটায়, তার প্রভাব বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে—বিশেষ করে আমার অনুধর্মীদের মাঝে। আত্মশক্তির এই বিচ্ছুরণকে আমরা চলতি ভাষায় বলতে পারি সম্মোহন (hypnotism)। সম্মোহন সিদ্ধ ব্যক্তিত্বের একটা বৈশিষ্ট্য। পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে নানাভাবে সম্মোহনের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। সম্মোহনের মূলে কাজ করছে যে-শক্তি, তাকে একজন নৃতত্ত্ববিদ্ একটা সুন্দর নাম দিয়েছেন—অতীন্দ্রিয় সাযুজ্যবোধ (mystic participation)। আমার চেতনার প্রভাব খানিকটা তোমার মাঝে সঞ্চারিত হয়, তখন তোমাতে-আমাতে একটা একাত্মতার বোধ আসে এবং তুমি আমার যন্ত্র হয়ে চল। চেতনার প্রভাব এক্ষেত্রে পড়ছে চেতনার উপরে। আবার এ-প্রভাব দেহের উপর পড়তে পারে। নিজের দেহের উপর নিজের চেতনার প্রভাব যে পড়ে, এ তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সম্মোহনের দৌলতে অপরের

দেহের উপরেও যে তা পড়তে পারে, এও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অপরের উপর প্রভাব-সঞ্চারের জন্য আমরা কোনও-না-কোনও আকারে ভাষার প্রয়োগ করে থাকি। ভাষা সেখানে ইচ্ছাশক্তির বাহন। ইচ্ছাশক্তি যদি দুর্বার হয়, তাহলে ভাষা হয়ে ওঠে মন্ত্র। কোনও বাহ্য বস্তুকেও আমরা এমনি করে ইচ্ছাশক্তির বাহনরূপে ব্যবহার করতে পারি। শক্তি যত প্রবল হয়, বাহনের প্রয়োজনীয়তা ততই কমে আসতে থাকে। অবশেষে ইচ্ছামাত্র সাক্ষাৎভাবে অপরের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করা অসম্ভব হয় না। ওদেশের মনোবিজ্ঞান সম্প্রতি তা বুঝতে শুরু করেছে। সংহত আত্মচৈতন্যের তীব্রতায় এই ইচ্ছাশক্তিকে মনে হয় অধৃষ্য এবং অনিবার্য। তখনকার অনুভবের একটি সুন্দর মন্ত্রচিত্র আমরা পাই ঋগ্‌বেদের বাক্‌সূক্তে, অম্ভৃণকন্যা যেখানে নিজের মাঝে ভুবনেশ্বরীর মহিমাকে অনুপম ভাষায় ফুটিয়ে তুলছেন।

প্রত্যক্‌চেতনার দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে মন্ত্রশক্তির এই পরিচয় পাই। এর মধ্যে অযৌক্তিক কিছুই নাই, কেননা সংহত আত্মচেতনার বিস্ফারণ হতে এ-অনুভবগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই যে-কোনও সাধকের মাঝে আসতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কোনও মাধ্যমের সাহায্য না নিয়ে আমার ইচ্ছাশক্তিকে আমি জড়েও সংক্রামিত করতে পারি কি না। তা যদি পারি, তাহলে রহস্যবিদ্যার একটা বড়রকমের ভিত্তি পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করলে পর বৈদিক-ভাবনার মাঝে এদিকেরও একটা ইশারা মিলতে পারে।

ঋগ্‌বেদের অনুক্রমণিকাকার কাত্যায়ন বলেছিলেন, বৈদিকদের একটিমাত্র দেবতা, তিনি সূর্য। বৈদিক ঋষির লক্ষ্য তাহলে এই সূর্যের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ। অধিকাংশ বৈদিক যজ্ঞই যে সূর্যের সাযুজ্যভাবনা হতে উদ্ভূত হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য। এই সাযুজ্যলাভের আকূতি চমৎকার ফুটে উঠেছে বাজসনেয়সংহিতার একটি উদ্দীপ্ত মন্ত্রে—যার শেষ চরণটিতে আছে এই উদাত্ত ব্রহ্মঘোষ ঃ 'য়ো অসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।' উপনিষদের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যসূচক মহাবাক্যগুলিতেও পাই এই একই ঘোষণা। তবু দুয়ের মাঝে সূক্ষ্ম একটু তফাত আছে। উপনিষদের দৃষ্টি প্রত্যক্‌-বৃত্ত, আর সংহিতার দৃষ্টি পরাক্‌-বৃত্ত। উপনিষদ্‌ বলছেন অতীন্দ্রিয় অনুভবের কথা, আর সংহিতায় আছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শনের কথা। কথাটার একটু বিস্তার প্রয়োজন।

সেমিটিক ভাবনায় ঈশ্বর জড়োত্তর, তিনি শুদ্ধ চিৎস্বরূপ। কিন্তু আর্য ভাবনায় দেবতা জড়াত্মক এবং জড়োত্তর দুইই। বস্তুত জড় এবং চৈতন্যের মাঝে আর্য ভাবনা কোনও বিরোধ দেখে না। দুটি দর্শনের সৃষ্টিবাদে দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য ফুটে উঠেছে। সেমিটিক ঈশ্বর বিশ্বের নির্মাতা—তিনি বাইরে থেকে জগৎ গড়ছেন। আর বৈদিক দেবতা নিজেই জগৎ হচ্ছেন, অথচ হয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছেন না। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তের ভাষায়—'তিনি এই ভূমিকে সবদিক থেকে আবৃত করেও দশ আঙুল ছাপিয়ে আছেন,...তাঁর একপাদ এই সর্বভূত, আর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে। তিনিই সব হয়েছেন'—ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতবাদের নাম দিয়েছেন Pantheism বা সর্বেশ্বরবাদ। এ তাঁদের দুচক্ষের বিষ, অথচ এ-বাদ না বুঝতে পারলে বৈদিক অধ্যাত্মরহস্যের কিছুই বোঝা যাবে না। তবে একথা বলে রাখা ভাল, বৈদিক দেববাদ Pantheism নয়, তাকে ছাপিয়ে আরও-কিছু। তিনিই সব হয়েছেন, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি। যেমন তিনি বিশ্বের প্রতিষ্ঠা, তেমনি অতিষ্ঠাও।

তিনি বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ দুইই। সেমিটিক ধর্ম বিশ্বোত্তীর্ণকে স্বীকার করে, কিন্তু বিশ্বাত্মককে নয়। ফলে তার ভাবনায় জগৎ সম্পর্কে কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয়, অধ্যাত্ম সাধনা ও সিদ্ধির ধারাতেও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। সে-আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

তিনিই যদি সব, তাহলে তাঁকে শুধু আন্তর অনুভব দিয়ে নয়, বহিরিন্দ্রিয় দিয়েও পাওয়া যায়। বহিরিন্দ্রিয়ের কাছে যা সবচাইতে স্পষ্ট সবচাইতে উজ্জ্বল, সে তাঁরই বিভূতি, সে তিনিই। মাধ্যন্দিন সূর্য আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাঁর সর্বোত্তম বিভূতি। তিনিই সূর্য হয়েছেন, অতএব আমাদের দিক থেকে সূর্য তিনিই। ঋষি কুৎসের ভাষায় 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'—যা-কিছু জঙ্গম, যা-কিছু স্থাবর, সূর্য তারই আত্মা। সূর্যকে যখন দেখছি, তখন তাঁকেই দেখছি। সূর্য জড় নন, চিন্ময়; তিনি বিষ্ণু। সূর্য পুরুষ। সেই পুরুষই আমি। এই ভাবনা এবং সাধনার বিস্তার উপনিষদগুলিতে আছে।

এমনি করে ইন্দ্রিয় দিয়ে যা-কিছু দেখছি, তাতে তাঁকেই দেখছি। দেখছি বৃহৎকে, সমস্ত-কিছুর মাঝে সেই একের প্রাণস্পন্দকে। বৃহৎ এই পৃথিবী, বৃহৎ এই বায়ু, বৃহৎ ঐ আকাশ—সব বৃহৎ এবং জ্যোতির্ময়। পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক—সবই সেই দেবতা, সবই চিন্ময়। এই ইন্দ্রিয় দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ করছি। এই চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদই হল বৈদিক ধর্মের মর্মকথা।

ইওরোপীয়েরা animism বলতে যা বুঝেছেন, এ মোটেই তা নয়। অথচ animismও উন্নাসিকের অবজ্ঞার বস্তু নয়। তার মাঝে অতীন্দ্রিয় সাযুজ্যবোধের যে গভীর সত্য রয়েছে, বৈদিক চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদে তারই সুষ্ঠুতম প্রকাশ।

ভৌতিক সূর্য শুধু জড় নয়, কেননা তা আমার চেতনাকেও উদ্দীপ্ত করে, তাতে আমি তার সাযুজ্য অনুভব করি। কার্যত জড়বাদ আধুনিক বিজ্ঞানে পরিত্যক্ত। সে আসলে মানে শক্তিবাদ। বিশ্বজগৎ এক অতীন্দ্রিয় শক্তির খেলা, জড় তার একটা বিভূতি মাত্র। পরাক্-দৃষ্টিতে যাকে বলি শক্তি, প্রত্যক্-দৃষ্টিতে তাকেই বলি প্রাণ। 'আমি হচ্ছি, বাড়ছি'—এই হল শক্তির সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ পরিচয়। আমার এই বৃহৎ হওরাটা শক্তির চিন্ময় রূপ। বাইরের যে-নিমিত্তকে আশ্রয় করে শক্তি অন্তরে চিন্ময়ী হয়ে ফুটছে, তাকে বলতে পারি তার মৃন্ময় রূপ। কিন্তু চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ীতে তফাত করবার দরকার কি? কেন বলি না, দুইই অদিতি—অখণ্ডিতা অবন্ধনা অন্তহীনা এক মহাশক্তি? বেদের সমস্ত দেবতাই এই অদিতির পুত্র, তাঁরা আদিত্য। সূর্য প্রত্যক্ষ আদিত্য। সে-প্রত্যক্ষ যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। বাইরে যা আলো, অন্তরে তা-ই চেতনা। কিন্তু আমার অন্তশ্চেতনা নিষ্প্রভ। তা ঐ বাইরের আদিত্যদ্যুতির মত ভাস্বর হয়ে উঠুক এই আমার আকূতি, এই আমার বৃহৎ হওরার সাধনা। আমি তাই সূর্যের উপাসক। সূর্য আমার চিন্ময় আত্মবিচ্ছুরণের আদর্শ। সূর্য হতেই প্রাণের স্পন্দন, চেতনার উন্মেষ। তিনি শুধু তাপ দেন না, চেতনাও জাগান। শক্তি যখন তাপরূপে ফোটে, তখন সে জড়। কিন্তু যখন সে প্রাণ ও চেতনারূপে ফোটে, তখন তো জড় নয়। তাপ প্রাণ আর চেতনা তিনটিই তো সাবিত্রী শক্তির বিভূতি। তবে আর জড়ে-চৈতন্যে ভেদ করা কেন?

একটা সূর্য একটা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যদি সেই কেন্দ্রের সঙ্গে এক হতে পারি, তাহলে আমিও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হতে পারি। বৈদিক রহস্যবিদ্যার এই হল মূল সূত্র—নিজেকে সৌরশক্তির বিদ্যুৎকূটে রূপান্তরিত করা। এরই নাম সূর্যবিজ্ঞান। তার মূল সূত্র হল, অধিভূত সূর্যের মাঝে গুহাহিত অধিদৈবত পুরুষকে আবিষ্কার করে অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে তার সাযুজ্য-অনুভবের দ্বারা আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ এবং আত্মশক্তির বিস্ফোরণ। এই শক্তিযোগই রহস্যবিদ্যা, অথর্ববেদ তার আকর। ঋগ্‌বেদে দেখি, অথর্বাঙ্গিরসের প্রবক্তা ঋষিরা সিদ্ধবিদ্যার ধারক বলে পরিগণিত। সোমযাগে তাঁরাই হতেন যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ। ঋগ্‌বেদ এবং অথর্ববেদের বহুস্থানে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা শুধু বৃহতের চেতনাকেই নয়, শক্তিকেও বুঝিয়েছে। এই শক্তিযোগের যুক্তিসিদ্ধ রূপ কি হতে পারে, তার বিবৃতি আমরা পাই পতঞ্জলির যোগসূত্রের বিভূতিপাদে—ভূতজয় ইন্দ্রিয়জয় এবং প্রধানজয় সম্পর্কিত অনুশাসনে। অর্বাচীন যোগপন্থাতেও তার বহু উল্লেখ আছে।

সুতরাং রহস্যবিদ্যাকে আজগবী বলে উড়িয়ে দেওৱা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় হবে না। বৈদিক রহস্যবিদ্যা সূর্যবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই সূর্য-বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় না থাকলে বেদব্যাখ্যার প্রচেষ্টা সফল হবে না, একথা বলাই বাহুল্য।

উপনিষদ ও রহস্যের সংমিশ্রণ হতে বৈদিক প্রতীকবাদের (symbolism) উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদে আমরা তার বিস্তার দেখতে পাই। যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যেরা একে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন, কিন্তু ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা একে একেবারেই উপেক্ষা করে গেছেন। তাইতে তাঁদের মন্ত্রব্যাখ্যা একধরনের বাস্তববাদকে আশ্রয় করেছে, যা ইন্দ্রিয়ের অধিকারকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য দোষ শুধু তাঁদের একার নয়। এদেশের জ্ঞানবাদীদের মধ্যেও একটা ধারণা প্রচলিত আছে, বৈদিক সাধনা সকাম, ইহলোকের ধনদৌলতের বাইরে তা আর-কিছুই চায় না। কোনও-কোনও বৈদিক মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ থেকে তা-ই মনে হয় বটে। কিন্তু সব বেদমন্ত্রেরই যে তা-ই তাৎপর্য, একথা বলা অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। এই গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে নিঘণ্টুকারের বৈদিক অভিধান হতে। নিঘণ্টুকার কতকগুলি বহু-প্রচলিত বৈদিক শব্দের যে-অর্থ বেঁধে দিয়ে গেছেন, যাস্ক মন্ত্রব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারই অনুসরণ করেছেন, মাধব সায়ণ প্রভৃতি আচার্যেরাও প্রায়শ তা-ই করেছেন। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা আক্ষরিক অর্থের গভীরে তলিয়ে দেখবার কোনও প্রয়োজনই অনুভব করেননি—কেননা বৈদিক ধর্মের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাই আছে, শ্রদ্ধা নাই। কৌতুকের বিষয় এই, সায়ণের ব্যাখ্যার প্রতি তাঁরা বিশেষকোনও গুরুত্ব আরোপ না করলেও সন্দিগ্ধ স্থানগুলিতে সায়ণের আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে বহুক্ষেত্রে আত্মসাৎ করতে একটুও দ্বিধা করেননি। ফলে বেদমন্ত্র তাঁদের কাছে অতিসহজেই sun-spell আর rain-spellএ পরিণত হয়েছে।

অবশ্য সব বেদমন্ত্রের তাৎপর্যই যে নিঃশ্রেয়সমুখী, একথা আমরা বলতে চাই না। অনেক মন্ত্রের লক্ষ্য শ্রেয় এবং প্রেয় দুইই হতে পারে—বিনিয়োক্তার প্রয়োজন অনুসারে। শৌনকের 'ঋগ্‌বিধানে' প্রেয়োমুখী বিনিয়োগের অজস্র উদাহরণ আছে।

কিন্তু তাবলে প্রেয়ই সব বেদমন্ত্রের অভীষ্টার্থ—উপরভাসা রকমে বেদ পড়লেও একথা মনে হবে না। আসলে মন্ত্রগুলি সাধারণত প্রতীকী ভাষায় রচিত। ঋষিরা বহু জায়গায় নিজেরাই তা বলে গিয়েছেন। বিদ্যাগুপ্তির এটা একটা প্রাচীন রীতি। তন্ত্রেও এ-রীতি অনুসৃত হয়েছে। শুধু বিদ্যাগুপ্তিই নয়, অধিকারভেদে মন্ত্রবিনিয়োগের ব্যবস্থাও তার একটা উদ্দেশ্য। মন্ত্রকৃৎ ঋষি একটা মৌলসত্যকে লক্ষ্য করেই আটপৌরে ভাষায় মন্ত্র রচনা করে গেছেন। এখন তার বিনিয়োগ সাধকের সংস্কার বুদ্ধি এবং ইচ্ছার অধীন।

এটা অবশ্য একটা মোটামুটি নিয়ম। আসলে মন্ত্রের ভাষায় প্রতীকধর্মিতা দেখা দিয়েছে চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদ থেকে। কি করে তা বলছি।

কোনও-একটা বিষয়ের জ্ঞান তিনটি ভূমি থেকে আসতে পারে। প্রথম ভূমি হল অধিভূত (phenomenal বা material)। যেমন চোখ মেলতেই আলো দেখছি। আলো এখানে ভূতগুণ। কিন্তু আলোতে আমার চিত্তে যে স্বচ্ছতা এবং প্রসন্নতার আবির্ভাব হল, তাও জ্ঞানের আরেকটা দিক। বলতে পারি, যেন বাইরের আলো আমার ভিতরে ফুটল। এই-যে ভিতরের আলোর জ্ঞান, এটা হল অধ্যাত্ম (psychical)। অধিভূত এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানে একটা সাযুজ্য আছে। বাইরে-ভিতরে তত্ত্বের একতা না হলে জ্ঞানই সম্ভব হয় না। তাই বেদান্তী বলেন, বিষয়ি-চৈতন্য আর বিষয়-চৈতন্যের একাত্মতাই জ্ঞান। সাংখ্যবিদ্‌ও এইধরনের কথাই বলেন। যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়—অর্থাৎ বিষয়ের সংযোগে যে-চেতনার উন্মেষ, চিত্তকে অন্তর্মুখ করে তারই অনুধাবন করা হয়, তাহলে চেতনার উত্তেজন ও বিস্ফারণ ঘটে। এই বিস্ফারণে বিষয়ী এবং বিষয় উভয়কে কুক্ষিগত করে তৃতীয় একটা ব্যাপ্তিচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। এই ব্যাপ্তিচৈতন্যই দেবতা এবং তাঁর জ্ঞান অধিদৈবত (spiritual)। বাইরের অধিভূত আলো দেখে অন্তরে যে অধ্যাত্ম আলো ফুটল, যদি চিত্তকে তাতে নিবিষ্ট করি, তাহলে এক অধিদৈবত আলোর মাঝে দুয়ের সমাহার ঘটাতে পারি। ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়। বাহ্যপ্রকৃতির সংস্পর্শে প্রত্যেক কবিচিত্তেই এইধরনের একটা উদ্দীপনা জাগে। এদেশের রবীন্দ্রনাথ তার অজস্র পরিচয় দিয়ে গেছেন—যা পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ। বৈদিক ঋষিরা নিজেদের বলতেন কবি, দেবতাকেও বলতেন কবি। এই 'কবি' সংজ্ঞাতে বেদমন্ত্রের গূঢ় রহস্য যতখানি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এমন বুঝি আর-কিছুতে নয়।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্য এই কবিচেতনার বাঙ্‌ময় বিগ্রহ। অধ্যাত্মচেতনা সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছে অধিদৈবত চেতনায় এবং তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে অধিভূতের ভাষায়। ভোরের বেলায় দেখছি সূর্য উঠছেন ঃ দিব্যজ্যোতির এক আশ্চর্য চিন্ময় ব্যঞ্জনা—'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্'। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার পানে। এ কার চোখ? 'চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ'—এ সেই বিশ্বভাবন মিত্রের চোখ, সেই বিশ্বোত্তীর্ণ বরুণের চোখ, এই অন্তর্যামী চিদগ্নির চোখ। দেখতে-দেখতে সে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে দ্যুলোকে—'আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষম্'। একটি পরম অনুভূতিতে আমার অন্তর স্তব্ধ হয়ে গেল। অনুভব হল, 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'—যা কিছু স্থাবর, যা-কিছু জঙ্গম, এই সূর্যই তার আত্মা।

একটি সহজ বেদমন্ত্রের সহজ বিবৃতি। এমনি হাজার-হাজার মন্ত্রে দেবতার চিন্ময়-প্রত্যক্ষের উদাত্ত-ললিত প্রশস্তি। ভূমাকে এই চোখ দিয়ে দেখছি, এই কান দিয়ে শুনছি, এই প্রাণ দিয়ে স্পর্শ করছি, এই মন দিয়ে মনন করছি, এই বাক্ দিয়ে প্রকাশ করছি। আমার বাক্ চক্ষু শ্রোত্র প্রাণ মন সেই ভূমার চিন্ময় রহস্যপুরীর দ্বারপাল। এই প্রত্যক্ষ-অনুভবের আনন্দ-আন্দোলনে টলমল করছে বৈদিক সরস্বতীর 'মহো অর্ণঃ' —বিপুল জ্যোতির পারাবার। এ যদি animism হয়, naturalism হয়, তাকে মাথায় করে রাখব।

লোকোত্তর অনুভবের এই বীজটিই উপনিষদের মাঝে অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হয়েছে পূর্ণাদ্বৈতবাদে, যাকে বলা যেতে পারে একমাত্র আর্য ভাবনারই একটি বৈশিষ্ট্য। উপনিষদের বহু জায়গায় আমরা দেখতে পাই, কোনও-একটা তত্ত্বের অধিভূত প্রতীককে পাশাপাশি দুই ধরনে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে ঃ 'ইতি অধ্যাত্মম্', 'ইতি অধিদৈবতম্'। কথাটার সরল অর্থ এই দাঁড়ায় ঃ যা বাইরে আছে, তা ভিতরেও আছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে বাইরে অনুভব করছি বস্তুরূপে, বোধি দিয়ে তাকেই অন্তরে অনুভব করছি চিদ্‌বৃত্তিরূপে। এমনি করে বাইরের আকাশ অন্তর্হৃদয়ে হয় প্রশান্ত সর্বব্যাপী আনন্দ, বাইরের সূর্য অন্তরের চিদ্‌ঘন প্রত্যয়, বাইরের বায়ু অন্তরের প্রাণসংবেগ, বাইরের উষা অন্তরের প্রাতিভসংবিৎ ইত্যাদি। উপনিষদে এমনতর প্রতীকের বিবৃতি অজস্র। প্রতীকোপাসনা ঔপনিষদ-সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। এই উপাসনার চরম পরিণাম যে-পূর্ণাদ্বৈতবোধ, তার সূত্ররূপ এই ঃ জীব জগৎ আর ব্রহ্ম এক। আমারই আত্ম-চেতনার বিস্ফারণ ব্রহ্মচেতনায়, আর সেই চেতনারই বিসৃষ্টি এই জগৎ। যদি আমার আত্মানুভবের কেন্দ্র হতে ধরি, তাহলে বলতে পারি, এই চেতনাই যেমন লোকোত্তর ব্রহ্মচেতনায় বিস্ফারিত হয়, তেমনি আবার বিকীর্ণ হয় লোকাত্মক বিশ্বচেতনায়। উপনিষদের ভাষায় যেমন 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', তেমনি 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্'—এই আত্মাই যেমন ব্রহ্ম, তেমনি এই আত্মাই এই যা-কিছু সব। অর্থাৎ আমি জগৎ আর ব্রহ্ম তিনে এক, একে তিন।

উপনিষদে যে-অনুভব বিশ্লেষণমুখে প্রকাশ পেয়েছে, বেদমন্ত্রে তারই প্রকাশ দেখি সংশ্লেষণমুখে। উপনিষদের তত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য, আর সংহিতার তত্ত্ব বোধিলব্ধ। বুদ্ধি দিয়ে বোধির অনুভবকে বিবৃত করলেই প্রাকৃত মনের পক্ষে তা ধরা সহজ হয়। এইজন্য উপনিষদ আমাদের কাছে যদিও-বা সুবোধ, বেদার্থ দুর্বোধ—কেননা আমাদের চেতনা তো গোড়া থেকেই চিন্ময়-প্রত্যক্ষের জন্য তৈরী নয়। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই ঔপনিষদ বোধ আমাদের কাছে সহজ হয় মনের অনেক বাঁকাচোরাকে সোজা করে। অথচ বেদমন্ত্র ঠিক এই অপরোক্ষ-অনুভবেরই কাব্যরূপ। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সমস্ত সত্তায় সেই এককে অনুভব করছি—এই সহজ বোধ হতেই বেদমন্ত্রের উৎসারণ। উপনিষদে অধ্যাত্ম-অনুভবের তিনটি ভূমির কথা আছে—জ্ঞান বাল্য এবং মৌন। বুদ্ধির ব্যাপার দিয়ে তত্ত্বকে প্রথম আমরা 'জানি', আমরা তখন প্রাজ্ঞ। তারপর সেই জানা যখন সহজবোধে পরিণত হয়, চেতনা তখন হয়ে যায় ছেলেমানুষের মত, আমাদের মাঝে ফোটে 'বাল্য'। আরও গভীরে গেলে সব চুপ হয়ে যায়, তখন 'মৌন'। বেদমন্ত্রে এই 'বাল্যের' প্রকাশ। অনুভবের আদিম সারল্য সেখানে প্রজ্ঞার বীজভাবের সূচক। তারই বিস্তার উপনিষদে।

সর্বোত্তম অনুভবের সহজ প্রকাশ যে অকারণে চিৎপরিণামের একেবারে গোড়ার দিকেই হতে পারে, প্রাকৃত-পরিণামবাদের নিয়ম যে এখানে খাটে না, তার ইঙ্গিত আগেই করেছি।

চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, ইওরোপীয় পণ্ডিতদের উদ্ভাবিত Rain-spell আর Sun-spell Theory কত অসার। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যা-ই থেকে থাকুক না, আমরা যে-যুগের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছি, তা ইতিহাসের আমলেই পড়ে। তাকে অপরিণত মনের সৃষ্টি কিছুতেই বলা চলে না। এই যুগের চিত্তের আকূতির মূলে যা কাজ করছে, তা যে জৈব প্রেরণা নয়—অধ্যাত্ম প্রেরণা, আত্ম-বিস্ফারণের প্রেরণা, তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ হাজির করা যেতে পারে। মানুষ অধ্যাত্ম-পিপাসার তর্পণ করতে যায় যখন, তখন যে প্রাণের তর্পণকে সে ভুলে থাকে, তা তো নয়। এ-কথাটা বৈদিক ঋষিদের পক্ষে বিশেষ করে সত্য। তান্ত্রিকের মতই ভুক্তিতে-মুক্তিতে তাঁরা কোনও বিরোধ দেখেন না। যাঁরা দেখতেন, তাঁরা 'অদেবাঃ' 'অয়জ্ঞাঃ' 'অনিন্দ্রাঃ'—এক কথায় তাঁরা অবৈদিক মুনিপন্থী আর্য। কিন্তু ভুক্তিকে জীবনে একটা মর্যাদা দিলেও বৈদিক ঋষির মন্ত্রচেতনার প্রেরণা আসলে আসছে মুক্তির আকূতি থেকেই। তাঁর প্রাণ কাঁদছে যার জন্য, তা 'উরুরনিবাধঃ' 'অমৃতমভয়ম্', 'বৃহজ্জ্যোতিঃ', 'ঋতং বৃহৎ'।

প্রাণের এই কান্নাই বেদমন্ত্রে দুটি প্রতীকে রূপ নিয়েছে—একটি বর্ষণ, আরেকটি সূর্যোদয়। দীর্ঘদিনের অবর্ষণে পৃথিবী শুকিয়ে আছে, আকাশে মেঘ জমেছে, তবুও বৃষ্টি হচ্ছে না—প্রাণ যে মরুভূমি হয়ে গেল! এই সর্বশোষক অনাবৃষ্টি 'শুষ্ম', এই কৃপণ মেঘের আবরণ 'বৃত্র'। দেবতা এলেন বিদ্যুতের আলোকে, হানলেন বজ্র, মেঘ গলে জল হয়ে পড়ল, শুষ্ক প্রাণ সঞ্জীবিত হল। সাধনার প্রথম পর্বে অন্তরিক্ষলোকে হানাহানির এই একটি ছবি। দেবতা এখানে ইন্দ্র। আরেকটি ছবি তার ঊর্ধ্বভূমির —দ্যুলোকের। এবার হানাহানি নয়, প্রাতিভসংবিতের উন্মেষে চেতনার নিঃশব্দ বিস্ফারণ। এও একটা 'বৃত্র'-সংহারের লীলা। বৃত্র এখানে আঁধারের আবরণ। মধ্যরাত্রির গভীর হতে শুরু হয়েছে অশ্বিদ্বয়ের অভিযান, আলোর সূচনা এসে ফুটল ঊষার কূলে। তারপর নেপথ্য হতে সবিতার কীর্ণচ্ছটা, তারপর যথাক্রমে ভগ সূর্য ও পূষার অভ্যুদয়, অবশেষে মাধ্যন্দিন গগনে বিষ্ণুর প্রভাস্বর মহিমার প্রকাশ। 'বিষ্ণোঃ পরমে পদে মধ্ব উৎসঃ'—বিষ্ণুর এই পরমপদে অমৃতের উৎস। চেতনার উত্তরায়ণের এই আরেক ছবি। দেবতা এখানে বিষ্ণু। ইন্দ্র আর বিষ্ণু দুটি দেবতা পাশাপাশি। সাধনার ক্রমে ইন্দ্রবিজয়ের পরেই বিষ্ণুচেতনার আবির্ভাব। তাই বিষ্ণু পুরাণে উপেন্দ্র। ভারতবর্ষের প্রকৃতির সংস্থানই এমন যে, ইন্দ্রের বৃত্রবধ বা বর্ষার সূচনা আর বিষ্ণুর মধ্যগগনে উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে আরোহণ একই সময়ে ঘটে। সময়টা পড়ে আষাঢ় মাসে। সেই সময়েই পড়ে সংবৎসরব্যাপী বৈদিক যজ্ঞভাবনার মধ্যদিন, বৌদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তনতিথি, হিন্দুর ব্যাসপূর্ণিমা, অম্বুবাচী। চেতনার দ্যুলোকে তখন সবচাইতে বেশী আলো, অন্তরিক্ষে তেমনি প্রাণোচ্ছল বর্ষার সমারোহ। দিব্যজীবনে যেমন প্রাণ ও চেতনার অফুরন্ত দাক্ষিণ্য, পার্থিবজীবনেও তেমনি অন্নসম্পদের সূচনা। অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোকের দুটি আধিভৌতিক ব্যাপার নিয়ে বৈদিক ঋষি এক অপরূপ

আধ্যাত্মিক প্রতীকের সৃষ্টি করেছেন। একে শুধু জৈবতাড়নায় রচিত rain-spell আর sun-spell বলেন যাঁরা, তাঁদের পাণ্ডিত্যকে কি বিশেষণ দেব ভেবে পাই না।

ইওরোপীয় বেদব্যাখ্যার মূল অভ্যুপগমগুলির মোটামুটি আলোচনা করা গেল। এখন পূর্বপক্ষীর আর দু-একটি অনুসিদ্ধান্তের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আপাতত এ-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

বৈদিক ধর্ম বর্বর আদিমানবের ধর্ম, একথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরাও আজকাল আর একথাটা জোরের সঙ্গে বলতে চান না। তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত এদেশের পণ্ডিতদের মাঝেও এখন একটু-একটু করে সুর বদলাতে আরম্ভ করেছে। বৈদিক ধর্ম নিঃসন্দেহে 'আদিম'—এদেশের বেদপন্থীদের ভাষায় 'সনাতন'—যদিও দুটি সংজ্ঞায় তফাত অনেকখানি। আদিম ধর্মের লক্ষণ দিতে গিয়ে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেছেন, তার মূল হচ্ছে ভয়। কথাটা অর্ধসত্য। আসলে সমস্ত ধর্মের মূলেই রয়েছে একটা লোকোত্তর বৃহৎ সত্তার বোধ। এই বৃহৎকে কতকগুলি লোক ভয় করে, আবার কতকগুলি লোক ভালও বাসে। ভালবাসার দ্বারা শোধিত হয়ে ভয় দেখা দেয় প্রপন্নের মহিমবোধের (awe) আকারে। অদ্ভুতরসও তার অঙ্গীভূত। অধ্যাত্মবোধের এই মূল উপাদানগুলি চিরন্তন। আধুনিক সভ্যসমাজের লোকও দেবতাকে দস্তুরমত ভয় করে, তাঁর কাছে ছেলেমানুষের মত প্রার্থনাও করে। এসম্পর্কে আদিমানবের সঙ্গে তার তফাত নাই। আদিমানবও যে দেবতার সম্বন্ধে শুধু ভয়ই পোষণ করত, ভক্তি বিস্ময় ও মহিমবোধ যে তার একেবারেই ছিল না, একথা অবিশ্বাস্য। লোকোত্তর যে-কোনও অনুভব অজানার প্রতি একটা সম্মোহনের সৃষ্টি করে, তাতে চিত্তের মাঝে আবেশ (afflatus) নামে। এই আবিষ্ট চেতনার প্রচুর পরিচয় আদিমানবের ধর্মেও পাওয়া যায়। সব সমাজেই দেবাবিষ্টেরাই ধর্মগুরু। আবেশের একটা ফল দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যানুভবজনিত আত্মমহিমার বোধ। এ-বোধ চিরকাল ছিল, আজও আছে। Shaman, medicine-man, rain-doctor, wizard থেকে শুরু করে Prophet, Son of God আর Divine Man পর্যন্ত সব এক পর্যায়ের, সবার মাঝে এই মহিমবোধ। প্রথম শ্রেণীর দেবাবিষ্টদের মাঝে শক্তির প্রকাশ বেশী, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাঝে তেমনি জ্ঞানের প্রকাশ। বৈদিক দেবাবিষ্টের মাঝে দুয়ের সমন্বয়—যার ফলে বৈদিক ধর্মে রহস্য আর উপনিষদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। দেবাবিষ্টেরা স্বয়ং অভয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁদের ভয় করে চলে। আধ্যাত্মিক সমাজচেতনা অভয় আর ভয়ের একটা মিশ্ররূপ—চিরকাল ধরে। বৈদিক সমাজের অধ্যাত্মবোধকে যাঁরা বাণীরূপ দিয়েছিলেন, তাঁরা অভয়ের দিকটাই জোরগলায় বলে গেছেন, যার চরম পরিণাম 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাদে। যাঁরা চট্ করে সিদ্ধান্ত করে বসেন, বৈদিক ধর্ম ভীত-ত্রস্ত আদিমানবের প্রকৃতিপূজা মাত্র, তাঁরা কি একবার হিসাব করে দেখেছেন বৈদিক সাহিত্যে কয়টা ভয়ের মন্ত্র, কয়টা অন্ধকারের মন্ত্র আছে? প্রসন্ন উদার আলোর মহিমায় উদ্দীপিত চেতনার স্বোত্তরণের মন্ত্রই যেখানে-সেখানে। এ কি তথাকথিত আদিমানবের ধর্ম?

বৈদিক ধর্মে আদিমতা নিশ্চয় আছে, কিন্তু বর্বরতা নাই, মোহ নাই। এ-ধর্ম অতি প্রাচীনকালেই একটা বিরাট সুসংবদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য সৃষ্টি মূঢ়

বর্বর চিত্তের পরিচয় নয়। আবার এ-সাহিত্যের যে-রূপটি আমরা পাচ্ছি, তা অসম্বদ্ধ এবং অপরিণত গণসাহিত্যও নয়, দীর্ঘকাল ধরে বাকের রীতিমত সাধনার ফলে সৃষ্ট সুসম্বদ্ধ ও সমৃদ্ধ অভিজাত সাহিত্য। বেদের পুনরুক্ত মন্ত্রের আলোচনা করলে বুঝতে পারি, বহু প্রাচীনকালেই এ-সাহিত্যপ্রচেষ্টা দানা বেঁধে একটা সুনিরূপিত সম্প্রদায়ের পরম্পরা সৃষ্টি করেছে। পারিভাষিক শব্দের প্রাচুর্য এ-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ, আর সে-পরিভাষাও আত্মবোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচায়ক। বাকের সুমিতিতে এবং ব্যঞ্জনাশক্তিতে বলতে গেলে এ-সাহিত্য অতুলন। দার্শনিক কবিকৃতির কথা ছেড়েই দিলাম, লৌকিক (secular) বিষয় নিয়ে ঋগ্‌বেদে যে-কয়টি সূক্ত আছে, তাদেরও রচনানৈপুণ্য বিস্ময়কর, তারা আধুনিক যে-কোনও কবিতার পাশে দাঁড়াতে পারে। এ কি অমার্জিত বর্বর মনের পরিচয়, না সুসংস্কৃত বিদগ্ধ মনের?

বেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন, সেকথা আগেই বলেছি। এ-পদ্ধতির দোষ-গুণ দুইই আছে। যা দুর্বোধ, তুলনাত্মক আলোচনার ফলে অনেকসময় তা সুবোধ হয়, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু দেখতে হবে, আমরা কার সঙ্গে কার তুলনা করছি। প্রকরণের (context) সাম্য না থাকলে তুলনায় বিচার অযৌক্তিক হয়ে পড়ে—যেমন তথাকথিত আদিম ধর্ম বা সেমিটিক ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের তুলনার বেলায় হয়েছে। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ইন্ডো-ইওরোপীয়' সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির তুলনা করতে আরম্ভ করলেন। দুয়ের মাঝে একটা মৌলিক ঐক্য থাকা অসম্ভব নয়, কেননা ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সব মানুষই মূলত এক জাতের। কিন্তু জাতিতে-জাতিতে যেমন ঐক্য আছে, তেমনি ভেদও আছে। দেশ ও কালের ব্যবধানে যে-ভেদের সৃষ্টি হয়, তাতে সাজাত্যের চাইতে বৈজাত্যের পরিমাণই হয় বেশী। তুলনা এক্ষেত্রে সবসময় নিরাপদ নয়। বিশেষত বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে যেসব সংস্কৃতির তুলনা করা হচ্ছে, তারা সবাই বৈদিক সংস্কৃতি হতে অর্বাচীন। তুলনা যদি করতেই হয়, তবে এদেশের বেদোত্তর সংস্কৃতির সঙ্গেই-বা তুলনা করা হয় না কেন? বৈদিক সংস্কৃতি ও সাধনার ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরাও নিঃসংশয়, এর মধ্যে যে কোনও ছেদ পড়েনি একথা তাঁরাও স্বীকার করেন। যে-সংস্কৃতির বীজ এদেশের মাটিতে অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হয়েছে, তার মর্মসত্যের পরিচয় তো এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসেই পাওয়ার কথা। প্রাচীন আচার্যেরাও এই কথাই বলতেনঃ 'ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থ-মুপবৃংহয়েৎ।' শুধু ইতিহাস-পুরাণ কেন, এর জন্য অবৈদিক আর্য এবং লৌকিক অনার্য সংস্কৃতিরও সাহায্য আমরা নিতে পারি। মীমাংসকেরা বলতেন, বেদ স্বপ্রমাণ, তার তাৎপর্য তার মধ্যেই নিহিত আছে। কথাটা খুবই সত্য। বেদের রহস্য প্রথমত খুঁজতে হবে, বেদের মাঝেই—তুলনামূলক পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ হবে সেইখানেই; এদেশের বেদ-মীমাংসকেরা বহুপূর্বেই তার ছক বেঁধে দিয়ে গেছেন। তারপর তার প্রয়োগ হবে বেদের দেশে এবং সবার শেষে বিদেশে। বিদেশের পণ্ডিতেরা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নন। 'আর্য'জাতির একত্বের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে তাঁরা যদি গবেষণার মালমসলার জন্য নিজের দেশ হাতড়ান, তাহলে সেটা ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এদেশের পণ্ডিতেরাও কি বলে মুক্তকচ্ছ হয়ে বিদেশের দিকে ছোটেন?

তুলনামূলক শব্দ-বিজ্ঞানকে (Comparative Philology) এক সময় বেদ-ব্যাখ্যার অপরিহার্য সাধন বলে মনে করা হত। আজকাল একটু হাওয়াবদলের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতির গলদ এক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট। পরিবেশের প্রভাবে শব্দের অর্থ যে কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়, একই শব্দের অর্থে যে ব্যঞ্জনাশক্তির কত বিচিত্র লীলা দেখা দেয়, তা শব্দবিদের অজ্ঞাত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু শব্দের আক্ষরিক সাম্য দেখে এক দেশের একটা অর্থকে আরেক দেশের ঘাড়ে চাপানো যে কতখানি অযৌক্তিক, তাও কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে? প্রকরণবিচ্ছিন্ন তুলনার বোধ হয় এইটাই সবচাইতে মারাত্মক নিদর্শন।

বৈদিক আর্যেরা বিদেশ থেকে এদেশে এসেছিলেন না এদেশ থেকে ওদেশে গিয়েছিলেন, মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার আগে না পরে, বৈদিক সভ্যতার বয়স কত ইত্যাদি নানা লৌকিক প্রসঙ্গ পণ্ডিতদের বৈদিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বেদার্থনিরূপণের পক্ষে এসব প্রশ্নের মীমাংসা মুখ্য নয়, গৌণ।

৬

বেদব্যাখ্যার আধুনিক অভ্যুপগমগুলির একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এইবার দেখা যাক, বেদব্যাখ্যার সত্যকার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত।

আধুনিক মন নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলে অহঙ্কার করে, তাই প্রাচীন ধর্মকে কতকটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির একটা কুসংস্কার হল, জড় আর চিতের মাঝে একটা চিড়ের সৃষ্টি করা। ধর্মের যে-কোনও প্রাচীন রূপে এই কৃত্রিম তফাতটা নাই, বৈদিক ধর্মেও নাই। সেখানে জড় আর চিৎ দুই মিলিয়ে এক অখণ্ড সত্তার অনুভবই চেতনায় মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। এই অনুভবের প্রাগৈতিহাসিক রূপ যা-ই হ'ক না কেন, এটা বৈদিক ঋষিদের অপরিণত মনের একটা অন্ধকল্পনা মাত্র নয়। সত্য বলতে, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে এই ভাবনারই অনুবৃত্তি এবং ক্রমিক পরিণাম। বৈদিক সাধনার পরিণততর অভিব্যক্তি যোগে এবং তন্ত্রে। তাদের মধ্যে মানুষের অন্তরের আকূতি যে-রূপ পেয়েছে, তাকে যদি আমরা ঠিকমত বুঝতে পারি, তাহলে বৈদিক অধ্যাত্মসাধনার গোড়ার কথাটাও বুঝতে পারব। দর্শনের ভাষায় আদিভাবনার রূপ এই দাঁড়াবেঃ 'চৈতন্যই বিশ্বের মূল। অভিব্যক্তির মধ্যপর্বে আমার আত্মচৈতন্যের বিকাশ। আমার আধারে (প্রাচীনদের ভাষায় আত্মাতে বা তনুতে) জড় আর চৈতন্যের মিলন হয়েছে। আমি যদি আমার আধারগত চিৎশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে আমি জড়োত্তর হয়ে জড়কে প্রশাসনও করতে পারি।'

দেখতে পাচ্ছি, এই ভাবনার মাঝে সাধনার দুটি দিকের কথা আছে—একটি উত্তরণ, আরেকটি অবতরণ। অধ্যাত্মসাধনায় সাধারণত এই উত্তরণের দিকটাই প্রবল হয়। চেতনাকে কি করে জড়ের ছোঁয়াচ হতে মুক্ত করব, এই হয় সাধকের লক্ষ্য। ফলে অধ্যাত্মবোধের মধ্যে বুদ্ধির প্রভাবই হয় প্রবল। এদেশেও তা হয়েছে। কিন্তু অবতরণের দিকটা সাধকেরা একেবারে ভুলে যাননি। বৈদিক সাধনায় উত্তরণ আর অবতরণের মধ্যে

একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। দ্যুলোক এবং পৃথিবী দুইই দেবতা; দেবতা শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নন, তিনি আমার চিন্ময় প্রত্যক্ষের গোচর; আমার আত্ম-চৈতন্যের বিস্ফারণেই আমি দেবতার সাযুজ্য অনুভব করি এবং আমিই দেবতা হয়ে যাই; এই বিস্ফারণ শুধু প্রকাশধর্মীই নয়, এ ক্রিয়াপর শক্তিও—এইগুলি হল বৈদিক ভাবনার মূলসূত্র। এই সূত্রগুলির অনুধ্যান করে চেতনাকে যদি বৈদিক ঋষির চৈতন্য-লোকে উত্তীর্ণ না করতে পারি, তাহলে বেদ বোঝবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

বোঝবার জন্য সাধনারও যে প্রয়োজন আছে, সেকথা বৈদিক ঋষিরাও বলে গেছেন। বেদের আরেক নাম ব্রহ্ম; আধুনিক ভাষায় তর্জমা করলে কথাটা দাঁড়ায়, জ্ঞান (বেদ) হল আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ (ব্রহ্ম)। এই ব্রহ্মকে বোঝবার জন্যই 'ব্রহ্মচর্যের' সাধনা। আধারকে শুদ্ধ না করলে (প্রাচীনদের ভাষায় ধাতু প্রসন্ন বা স্বচ্ছ না হলে) বৃহতের চেতনাকে ধারণা করা যায় না। সুতরাং শুধু বুদ্ধি দিয়ে বেদার্থ বোঝবার চেষ্টা করলে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বুদ্ধি সায়ণের ব্যাখ্যা শুনলেও যা বুঝবে, ইওরোপীয় ব্যাখ্যা শুনেও তা-ই বুঝবে। বেদের রহস্যার্থ দুয়েরই অগোচর। শুধু তফাত এই, সায়ণ একথা দাবি করছেন না যে তিনি রহস্যার্থ প্রকট করতে বসেছেন, কিন্তু ইওরোপীয়েরা সেই দাবিই করছেন।

যাস্ক তাঁর নিঘণ্টুব্যাখ্যার গোড়াতেই একটি প্রাচীন উক্তি উদ্ধার করে বলেছিলেন, 'বিদ্যা তাকেই দেবে, যে তপস্বী অনসূয়ক ঋজু সংযত শুচি অপ্রমত্ত ব্রহ্মচর্যোপপন্ন এবং মেধাবী।' এই লক্ষণগুলি পড়ে বোধির অধিকারে। অথচ বুদ্ধিকে যাস্ক একেবারে উপেক্ষা করেননি, নিরুক্তের পরিশিষ্টে তর্ককে তিনি ঋষির মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অধ্যাত্মবিচারে বুদ্ধি যদি বোধির অনুগত না হয়, তাহলে তাকে দিয়ে রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আধুনিক পণ্ডিতেরা বেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করেছেন এবং বুদ্ধিকে যেভাবে ব্যাপৃত করেছেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু এই বুদ্ধির কসরতের মূলে বোধির আলো না থাকায় তাঁদের প্রচেষ্টা শুধু ব্যর্থ নয়, প্রমাদযুক্ত এবং অনিষ্টকর হয়েছে। বুদ্ধির ক্রিয়া যান্ত্রিক, যে-কোনও-কিছুকে ভিত্তি করে সে যা-কিছু একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। তাই বুদ্ধি কোন্ অভ্যুপগমের উপর দাঁড়িয়ে বিচার করছে, সেটা আগে দেখা দরকার।

বোধি যে-বাণীর উৎস, তার বিচার বোধির আশ্রিত বুদ্ধি দিয়েই করা উচিত। যদি অন্তর্দৃষ্টি না থাকে, প্রজ্ঞার বৈশারদ্য না থাকে, তাহলে বেদ বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আবার ব্যাখ্যা যদি তর্কানুগত না হয়ে শুধু শ্রদ্ধালুতার উচ্ছ্বাস মাত্র হয়, তাহলেও তা অশ্রদ্ধেয় হবে। সুতরাং বোধি এবং বুদ্ধির সমন্বয় হবে বেদব্যাখ্যার সত্যকার ভিত্তি। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ঐতিহাসিক জ্ঞানকে। বেদের অনেক-কিছু ভাবনাই আমরা পাই বীজের আকারে, যার অঙ্কুরণ এবং পল্লবন ঘটেছে পরবর্তী যুগে। ব্যাখ্যার সময় যদি পরের যুগ এবং আগের যুগকে মিলিয়ে ফেলি, তাহলে সেটা দোষের হবে। আবার পরবর্তী যুগকে যদি পূর্বযুগের বিরোধী বলে কল্পনা করি, তাহলে সেটাও দোষের হবে। আসলে এখানে রয়েছে বীজভাবনার একটা ধারাবাহিকতা। বীজ সংহত, কিন্তু তা ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। আদিযুগের সেই ব্যঞ্জনাই পরের যুগে বিচিত্র

হয়ে দেখা দিয়েছে। 'সব-কিছু বেদে আছে'—এই লোকোক্তির অর্থই তা-ই। বীজ-ভাবের পরিণামে অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দিয়েছে, বাইরের অনেক-কিছু আহরণ করে তার সিসৃক্ষাও পুষ্ট হয়েছে। এই সবকেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু আসলে সে যে একই মূল ভাবের বিস্ফারণ, একথা ভুললে চলবে না। বেদব্যাখ্যায় পরিণামবাদের প্রয়োগ যদি করতে হয় তো করা উচিত এইভাবেই।

বোধির আলো, বুদ্ধির মীমাংসানৈপুণ্য এবং ঐতিহাসিক পরিণামজ্ঞান—এই হবে তাহলে বেদব্যাখ্যার ভিত্তি। প্রথমেই এই সংস্কার বর্জন করতে হবে যে, বেদমন্ত্র শুধু কর্মোপলক্ষ্যে উচ্চারিত কতকগুলি নিরর্থক শব্দপরম্পরা, কিংবা মন্ত্রপ্রতিপাদ্য কর্মের কোনও গভীর লক্ষ্য নাই। আসলে কর্ম একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ভাব এবং তার বিস্তার। জ্ঞানযজ্ঞই সাধ্য, দ্রব্যযজ্ঞ তার সহায়ক মাত্র—এ-তত্ত্বটা বৈদিক ঋষিদের যে অপরিজ্ঞাত ছিল না, তার অজস্র প্রমাণ ঐ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ থেকেই আবিষ্কার করা যেতে পারে। এই ভাব জাতিচেতনার একটা বৈশিষ্ট্য; তার একটা সংবেগ আছে, স্ফুরণের একটা ধারা আছে। সে-ধারা যে-মহাসমুদ্রের দিকে যাত্রা করেছে, আজও হয়তো তার কূলে সে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু দীর্ঘযুগবাহিত তটভূমির যত্রতত্র সে তার পরিচয়কে অক্ষুন্ন রেখে গেছে। জাতির অন্তরের একটা গভীর আকূতি যুগে-যুগে যে-সাধনাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে গেছে, বাইরের দিক থেকে তাদের মধ্যে বহু বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, অন্তরের দিক দিয়ে তারা সগোত্র। এমন-কি বাইরে যে-ভেদ, তাও অনেকক্ষেত্রে খুব গভীর নয়। ভারতবর্ষের সেই আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে আজপর্যন্ত তার অধ্যাত্মপ্রগতির ইতিহাসকে একটা অখণ্ড দৃষ্টিতে না দেখলে তার গোড়ার কথাটা আমরা মোটেই বুঝতে পারব না। এইজন্য বেদমন্ত্রকে বুঝতে হলে অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন স্বল্পালোকের মধ্যে চোখ বুজে কেবল হাতড়ে বেড়ালেই চলবে না, তার জন্য বুঝতে হবে ভারতবর্ষের অনতিবিস্মৃত অতীতকে এবং বর্তমানকেও। কেননা এই মন্ত্রের মূলে যে-প্রবেগ একটা জাতির উষাকালে তার গভীরতম আকূতি হতে উৎসারিত হয়েছিল, তা আজও স্তিমিত হয়ে যায়নি এবং তার এমন-একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা কালপ্রবহণের মধ্যেও নিজের অনন্যত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বৈদিক যুগকে বুঝতে হলে ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে তলিয়ে বুঝতে হবে তার বর্তমান যুগ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদিক সাহিত্য

ভূমিকা

বর্তমান ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে মুখ্যত 'হিন্দু'-ভাবনারই প্রাধান্য, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর হিন্দুসমাজের নাম দিয়েছিলেন 'বেদপন্থী' সমাজ, কেননা 'এই সমাজ বেদের শাসন মানে এবং বেদের আনুগত্য স্বীকার করে।'[১] এই নামকরণে হিন্দুভাবনার একটিমাত্র উৎসমুখের সন্ধান পাই। বস্তুত হিন্দুসংস্কৃতি একটা মিশ্র সংস্কৃতি। সমস্ত প্রাণবন্ত সংস্কৃতিই তা-ই। কিন্তু দীর্ঘযুগের ইতিহাসের খাত বেয়ে হিন্দুসংস্কৃতির মাঝে বৈদিক ভাবনার প্রাধান্যই যে এক মহাসাগরসঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে, এ-তথ্য অবিসংবাদিত।

বেদ হিন্দুশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়, বেদ ব্রাহ্মণদের ধর্মশাস্ত্র, বেদ আর্যজাতির রচনা—এসব উক্তির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। বেদের সঙ্গে আমরা এক নিঃশ্বাসে হিন্দু ব্রাহ্মণ বা আর্যকে জড়িয়ে ফেলি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই সংজ্ঞাগুলির উৎপত্তি একই সময়ে হয়নি, কিংবা তাদের ব্যঞ্জনাও সবসময় এক ছিল না। এর মধ্যে 'হিন্দু' সংজ্ঞাটি বিদেশীদের দেওরা, তার মূলে আছে সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দ।[২] যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন, তাঁরা অবশ্যই নিজেদের 'হিন্দু' বলতেন না। বিভিন্ন বৈদিক জনের বিভিন্ন নাম ছিল, সেইসব নামেই তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন।[৩] অথচ ঋক্‌সংহিতাতেই দেখতে পাই, মন্ত্রকৃৎ ঋষিরা নিজেদের 'ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করছেন।[৪] আবার নিজেদের তাঁরা 'আর্য'ও বলছেন।[৫]

---

[১] যজ্ঞকথা (১৩২৭) পৃ. ৩।

[২] বৈদিক 'সিন্ধু' শব্দ নদের সামান্য এবং বিশেষ সংজ্ঞা দুইই। তা থেকে Pers. *Hind,* Gk. *India,* Lat. *India,* সিন্ধুধৌত দেশ। Darius নিম্নসিন্ধুদেশের নাম বলছেন *bi(n)dus* (Elamite *bi-in-du-is*)। Herodotus সিন্ধুতীরবাসীদের বলছেন *Indoi*। Hiuan Tsang সমগ্র দেশের নাম দিচ্ছেন *In-tou*; তাঁর চৈনিক পূর্বপুরুষেরা বলতেন *Chen-tou* অথবা *Tien-tchou*।

[৩] তার মধ্যে সবার অগ্রগণ্য ছিলেন ভারতেরা। তাঁদের নিবাস ছিল সরস্বতী ও যমুনার মাঝে। এই ভরত জনের নামেই পরে সমস্ত দেশের নাম হয় 'ভারত'। 'ভরতর্ষভ' বিশ্বামিত্র ঋষি বিখ্যাত সাবিত্রমন্ত্রের দ্রষ্টা, যা আজও দ্বিজাতির নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায় বলে গণ্য হয়।

[৪] ঋ. স. চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা য়ে মনীষিণঃ ১।১৬৪।৪৫; °ণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ ৭।৭৫।১০; °ণা ব্রতচারিণঃ ৭।১০৩।১; ৭, ৮; ৮।৫৮।১; ১০।১৬।৬; ৭১।৮,৯; ৮৮।১৯; °ণোঽস্য মুখমাসীৎ ৯০।১২ (এইখানে বর্ণবিভাগ পাওরা যাচ্ছে); ৯৭।২২। অনুরূপ 'ব্রহ্মা' শব্দের অনেক ব্যবহার পাওরা যায়।

[৫] তু. ঋ. স. য়থাবশং নয়তি দাসমার্য়ঃ (ইন্দ্রঃ) ৫।৩৪।৬; য়স্যায়ং বিশ্ব 'আর্য়ো' দাস শেবধিপা অরিঃ ৮।৫১।৯; *য়ো নো দাস °বা পুরুষ্টুতাহদেব ইন্দ্র য়ুধয়ে চিকেতৃতি ১০।৩৮।৩; *বিদদ্ দাসায় প্রতিমানমার্য়ঃ (ইন্দ্রঃ) ১৩৮।৩; দস্যবে হেতিমস্যার্য়ং সহো বর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র ১।১০৩।৩; *ইন্দ্রঃ সমৎসু য়জমানম্ 'আর্য়ং' প্রাবৎ...মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ ১৩০।৮; বেধা (বিষ্ণুঃ)... °ঋতস্য ভাগে য়জমানমাভজৎ ১৫৬।৫; *হত্বী দস্যূন প্র + °বর্ণমাবৎ (ইন্দ্রঃ) ৩।৩৪।৯;

আর্য ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু—এই তিনটি সংজ্ঞাকে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের তিনটি পর্বের দ্যোতক বলে ধরা যেতে পারে। তার মধ্যে আর্যসংস্কৃতিই মূল, তাহতে কালের বিবর্তনে আর-দুটি সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে।

অবশ্য আর্যসংস্কৃতি একটা অখণ্ড বা অবিমিশ্র ভাবনার বাহন ছিল না। তার মধ্যেও অন্তরে-বাইরে দ্বন্দ্ব ছিল এবং তাহতেই তার প্রাণশক্তির যোগান এসেছে। আর্যদের মধ্যে যাঁরা একটা সুনিবদ্ধ সাহিত্যের আকারে তাঁদের সংস্কৃতির পরিচয় রেখে গেছেন, তাঁরা ছিলেন বেদপন্থী। কিন্তু বৈদিক ভাবনা ছাড়া অবৈদিক ভাবনারও একটা বড় স্থান আর্যসমাজে যে ছিল তার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যা-কিছু আর্য তা-ই যে বৈদিক নয়, একথা মনে রাখা উচিত, কেননা এবিষয়ে চিন্তার শৈথিল্য অনেকক্ষেত্রেই আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাছাড়া ছিল অনার্য সংস্কৃতিরও প্রভাব।

প্রাচীন আর্যসংস্কৃতিতে বৈদিক অবৈদিক এবং অনার্য এই তিনটি ভাবনার সংঘাত ছিল। এই সংঘাতকে স্বীকার করে এবং অবৈদিক ভাবনাকে বহুলপরিমাণে আত্মসাৎ করে কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির উদ্ভব—যা মুখ্যত বেদপন্থী। বহু অনার্য এবং বৈদেশিক ভাবনাকে সংস্কৃত এবং আপন অঙ্গীভূত করে আরও পরে হিন্দুসংস্কৃতির উদ্ভব। সেও নিজেকে বেদপন্থী বলেই পরিচয় দেয়, যদিও প্রাচীন বৈদিক ভাবনা হতে আজ সে বহুদূরে সরে এসেছে। তবে এ সরে-আসা গঙ্গোত্রী হতে গঙ্গাপ্রবাহের

---

*ইন্দ্র ৱর্ধন্তো অপ্‌তুরঃ (সোমাঃ) কৃণ্বন্তো ৱিশ্বম্ °৯।৬৩।৫; *ৱিদৎ স্বর্মনৱে জ্যোতির্ °(ইন্দ্রঃ) ১০।৪৩।৪ ন য়ো (ইন্দ্রঃ) রর °নাম দস্যৱে ৪৯।৩; *সাহ্যাম দাসম্ °ত্বয়া য়ুজা ৮৩।১; *অয়মেমি (ইন্দ্রঃ) ৱিচাকশদ্ ৱিচিন্বন্ দাসম্ °৮৬।১৯; *দাসা চ ৱৃত্রা হতমার্য়াণি চ ৭।৮৩।১; (ইন্দ্রঃ) সধমা 'আর্য়স্য' সুদাসঃ) ৭।১৮।৭; °ৱর্ধনমগ্নিম্ ৮।১০৩।১; *দাসস্য ৱা মঘৱন্ + °ৱা ... য়ৱয়া ৱধম্ ১০।১০২।৩; ৪।৩০।১৮; *ত্বং তাঁ ইন্দ্রোভয়াঁ অমিত্রান্ দাসা ৱৃত্রাণি + 'আর্য়া' চ ... ৱধীঃ ৬।৩৩।৩; *হতো ৱৃত্রাণি + °হতো দাসানি ৬০।৬; ধামানি + °শুক্রা ৯।৬৩।১৪; * °ৱ্রতা ১০।৬৫।১১; ১০।৬৯।৬; *তিস্রঃ প্রজা 'আর্য়া (ঃ)' জ্যোতিরগ্রাঃ ৭।৩৩।৭ (তু. ৮।১০১।১৪); ৱিশো ... °১০।১১।৪; ৬।২২।১০; ৮।২৪।২৭; ১।৫১।৮; ৱৈশ্বানর জ্যোতিরিদ্ 'আর্য়ায়' ৫৯।২; *অভি দস্যুং বকুরেণ ধমন্তোরু জ্যোতিশ্চক্রথুর্ °(অশ্বিনৌ) ১১৭।২১; *অপাৱৃণো জ্যোতির্ °নি সৱ্যতো সাদি দস্যুরিন্দ্রঃ ২।১১।১৮; ৪।২৬।২ দস্যূঁরেকঃ কৃষ্টীরৱনোর্ °৬।১৮।৩; ২৫।২; *ত্বং দস্যূঁরোকসো অগ্ন আজ উরু জ্যোতির্জনয়ন্ + ° ৭।৫।৬; তরন্তো ৱিশ্বাঃ স্পৃধ আর্য়েণ দস্যূন্ ২।১১।১৯। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রায় সর্বত্রই আর্য 'প্রজা' বা 'বিশ্'; সেখানে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতই জনবাচী (৭।৩৩।৭, ১০।১১।৪; 'তিস্রঃ প্রজাঃ' অবশ্যই ব্রহ্ম ক্ষত্র এবং বিশ্-এর জ্ঞাপক; দ্র. ৮।৩৫।১৬-১৮)। আর্যের সঙ্গে দস্যু এবং দাসের বিরোধ অধিভূতদৃষ্টিতে দুটি জন বর্ণ (তু. ২।১২।৪, ৩।৩৪।৯) বা সংস্কৃতির সংঘর্ষ সূচিত করছে। তাহতে অতিসহজেই বিরোধ অধ্যাত্মক্ষেত্রেও উপচরিত হয়েছে। দাসের চামড়া কালো (১।১৩০।৮), যে তমঃশক্তির প্রতীক; আর্য জ্যোতির উপাসক, দস্যু ও দাসকে পরাভূত করে তাঁর মাঝে দেবতারা জ্যোতির আবির্ভাব ঘটান (১।১১৭।২১, ২।১১।১৮, ৭।৫।৬; তু. 'দাসীর্ৱিশঃ সূর্য়েণ সহ্যাঃ' ১০।১৪৮।২)। কিন্তু দেখা যায়, আর্যেরাও আর্যের 'বৃত্র' বা শত্রু (৬।২২।১০, ৩৩।৩, ৬০।৬, ৭।৮৩।১, ১০।৬৯।৬, ১০২।৩)। আর্যের সঙ্গে আর্যের বিরোধ যে কেবল ভৌতিক সম্পদ নিয়ে তা নয়, অধ্যাত্মপথ নিয়েও তাঁদের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল। অনেক আর্য ছিলেন, যাঁরা 'অদেব' (৬।১৭।৮, ৮।৫৯।২, ১০।৩৮।৩), 'অনিন্দ্র' (২।১২।৫, ৫।২।৩, ১০।৪৮।৭)। আর্যভাবনার ইতিহাসে এই বিরোধ স্থায়ী হয়ে আছে এবং দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই একটা ঊর্ধ্বতন সমন্বয়ের প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। 'আর্য' শব্দটি কোথাও-কোথাও 'অভিজাত' বা 'সমুন্নত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—যেমন 'আর্য জ্যোতিঃ' 'আর্য ধাম' 'আর্য ব্রত'।

গঙ্গাসাগরের পানে সরে-আসা। এ যেন একই অবিচ্ছিন্ন ধারা বহু শাখা-উপশাখার জলরাশিতে পুষ্ট হয়ে আজ 'মহামানবের সাগরতীরে' এসে পৌঁছেছে।

মূল ধারাটা যে বেদের, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে এইটাই বড় কথা। বৈদিক ভাবনার এই আধিপত্যের বীর্য নিহিত রয়েছে পরকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে। এই ঔদার্যই ভারতবর্ষের জাতীয় প্রগতিসাধনার বৈশিষ্ট্য এবং তা আর্যদের দান। বৈদিক ভাবনার মাঝে এই ঔদার্যের বীজ কোথায় নিহিত ছিল তা যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তাহলেই ভারতীয় সংস্কৃতির অতীত ইতিহাস এবং ভবিষ্য নিয়তির মর্মরহস্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে। বেদার্থের মননের এইদিক দিয়ে বিশেষ একটা মূল্য আছে।

সাধারণ পরিচয়

১

বৈদিক আর্যেরা তাঁদের সংস্কৃতির পরিচয় রেখে গেছেন বেদে। তাঁদের সাহিত্য-কীর্তিকে আমরা বলি 'বেদ', কিন্তু গোড়াতে তাঁরা তা বলতেন না। বস্তুত 'বেদ' শব্দটি ঋক্‌সংহিতায় একটি জায়গায় মাত্র পাওয়া যায়।[১] সেখানে সাধারণ অর্থেই অন্যান্য সাধনাঙ্গের সঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে।[২] এই সাহিত্যকীর্তির মূলে যে-দিব্যশক্তির প্রেরণা রয়েছে বলে বৈদিক ঋষিরা অনুভব করতেন, তাকে তাঁরা বলতেন 'বাক্'। বাক্‌কে তাঁরা দেখেছিলেন মরমীয়ার দৃষ্টিতে। এই দেবীকে নিয়ে তাঁদের চিত্তে সুমধুর রহস্যগম্ভীর উদ্‌বেলতার যেন আর অন্ত ছিল না। বাগ্‌দেবীর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব, কেননা তাঁকে ভাল করে না চিনতে পারলে বৈদিক সাহিত্যের উৎসমুখের পূর্ণ পরিচয় আমরা পাব না।

বাকের প্রেরণায় ঋষির হৃদয় হতে যা উৎসারিত হয়, বেদে তার অনেক নাম। তার মধ্যে ঋক্, মন্ত্র, গির্, উক্‌থ এবং ব্রহ্ম এই কয়টিকে প্রধান বলা যেতে পারে। এর মধ্যে গির্ এবং উক্‌থ আমাদের ততটা চেনা নয়, যদিও ঋক্‌সংহিতায় তারা বহুপ্রযুক্ত সংজ্ঞা। ঋক্ কখনও-কখনও মন্ত্রের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে,[৩] যদিও এখন আমরা ঋক্ বলতে বিশেষ-একটি মন্ত্রমালাই বুঝি। 'মন্ত্র' সংজ্ঞাটি আমাদের

---

[১] য়ঃ সমিধা য় আহুতী য়ো বেদেন দদাশ মর্তো অগ্নয়ে, য়ো নমসা স্বধ্বরঃ ৮।১৯।৫। তু. বেদেন রূপে ব্যপিবৎ সুতাসুতৌ প্রজাপতিঃ বা. স. ১৯।৭৮। বেদ < √ বিদ্ ('জানা'ঃ তু. Lat. *videre*, 'to see'; Gk. *oida* 'know'; O. Slav. *videti* 'to see'; Goth *waitan* 'to know'; 'পাওয়া' ঃ তু. 'বেদঃ' ধন), অর্থ 'জ্ঞান'। অনুরূপ ঃ 'বেদ্যা' (ঋ. ১।১৭১।১, ৩।৫৬।১), 'বিদ্যা'। ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে শেষের শব্দটিরই ব্যবহার বেশী, যদিও ঋক্‌সংহিতাতেই একজায়গায় তার উল্লেখ আছে (ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাম্ ১০।৭১।১১); অথর্বসংহিতায় শব্দটির বেশী দেখা মেলে (৬।১১৬।১, ১১।৭।১০, *৮।২৩)।

[২] অথর্বসংহিতায় শব্দটির যে-কয়টি প্রয়োগ আছে (৪।৩৫।৬, ১০।৮।১৭, ১৯।৯।১২, ১৯।৬৮।১, ১৯।৭২।১), তাও সামান্যত জ্ঞানবাচী। একজায়গায় 'বরদা বেদমাতা'র উল্লেখ পাওয়া যায় (১৯।৭১।১)।

[৩] দ্র. ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ঋ. ১।১৬৪।৩৯; তু. নি. ৭।১, দুর্গের টীকা।

সুপরিচিত, একে আশ্রয় করে আর্য ভাবনা এবং সাধনার একটি উপচীয়মান ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞাটি ঋক্‌সংহিতায় বহুপ্রযুক্ত। উপনিষদে তার ব্যঞ্জনার প্রসার এবং গভীরতা যে বিশিষ্ট ভাবের দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা তাকে ভাল করেই জানি। সংজ্ঞাটির অর্থের এই বিবর্তন এবং স্পষ্টীকরণ নিয়ে অনেক-কিছু বলবার আছে, কেননা এর মধ্যে আমরা আর্য অধ্যাত্ম-ভাবনার একটা মূল সূত্রের সন্ধান পাব।

বৈদিক সাহিত্যকে আমরা 'শ্রুতি' বলি। এই রূপটি ঋক্‌সংহিতায় নাই, আছে 'শ্রুতম্'।[৪] 'শ্লোক' (=*শ্রোক) এবং 'শ্রবস্' শব্দও আছে। এই সংজ্ঞাগুলি প্রণিধান-যোগ্য; কেননা এদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনা এবং দার্শনিক ভাবনার কতকগুলি ব্যাপার জড়িয়ে আছে। আরেকটি সংজ্ঞা 'ছন্দস্'। ঋক্‌সংহিতায় এটি কাব্যবন্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে বৈদিক ভাষা বোঝাতে প্রায় সর্বত্রই এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছেন।[৫]

প্রাচীন সংজ্ঞা যা-ই হ'ক, যে বাক্ বা শব্দরাশি বেদ বা জ্ঞানের বাহন, আমরা তাকেই এখন 'বেদ' বলে জানি। এর প্রাচীনতম অংশগুলি মন্ত্রময়। মন্ত্রগুলি ছন্দে গাঁথা। অধিকাংশই পদ্যচ্ছন্দ; কিন্তু তাছাড়া গদ্যচ্ছন্দও আছে।

মন্ত্রগুলি বিভিন্ন ঋষিদের দ্বারা 'দৃষ্ট'। বেদপন্থীদের বিশ্বাস, ঋষিরা মন্ত্রের কর্তা নন। বেদমন্ত্র যে-শব্দরাশি, তা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। এই মতবাদ নিয়ে বৈদিক এবং অবৈদিক আর্যদের মাঝে যুগ-যুগ ধরে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে, আমরা পরে তার আলোচনা করব। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা কিন্তু নিজেদের 'মন্ত্রকৃৎ' বলতে দ্বিধা করেননি, যদিও বাকের লোকোত্তর মহিমা সম্বন্ধে তাঁরা অত্যন্ত সচেতন।[৬]

যে-বাক্ অধ্যাত্মপ্রেরণার উৎস, প্রত্যেক ধর্মই তাকে দিব্য এবং অলৌকিক বলে মনে করে থাকে। বিশ্বাসীদের মতে অবেস্তা, ত্রিপিটক, বাইবেল, কুর্‌আন্—কোনটিই প্রাকৃত মানুষের উক্তি নয়, প্রত্যেকটিই ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরাবিষ্ট পুরুষের বাক্। এইসব বাক্ যে-ভাবের বাহন, তাকে অপ্রাকৃত এবং লোকোত্তর বলতে বাধা নাই। কিন্তু সেইসঙ্গে ভাবের বাচক বাক্‌ও যে স্থূল অর্থেই লোকোত্তর, বেদপন্থীর এই বিশ্বাস হল মন্ত্রবিদ্যার ভিত্তি। এই বিশ্বাসকে নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত এবং সাধনার দ্বারা ফলিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বহু যুগ ধরে। বেদার্থ আলোচনার সময় এই দীর্ঘযুগবাহিত প্রচেষ্টার ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। কেননা, যে-আবহের মধ্যে মন্ত্রের

---

[৪] ইন্দ্রাবরুণা য়দৃষিভ্যো মনীষাং বাচো মতিং শ্রুতমদত্তমগ্রে, য়ানি স্থানান্যসৃজন্ত ধীরা য়জ্ঞং তন্বানস্তপসাভ্যপশ্যম্ ৮।৫৯।৬। অথর্বসংহিতায় আছে ঃ ময়োবাস্তু ময়ি শ্রুতম্...সং শ্রুতেন গমেমহি, মা শ্রুতেন বি রাধিষি (১।১।২,৪)।

[৫] পাণিনির ব্যবহৃত আর দুটি সংজ্ঞা 'মন্ত্র' এবং 'নিগম'। একজায়গায় 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা (২।৩।৬০) ব্যবহার করায় মনে হয় মন্ত্রের ভাষায় এবং ব্রাহ্মণের ভাষায় তিনি তফাত করে চলেছেন। নিরুক্তকার যাস্ক বৈদিক ভাষাকে 'ছন্দস্' বলছেন (নি. ১।১।৪)। বৌদ্ধশাস্ত্রেও বৈদিক ভাষাকে 'ছন্দস্' বলা হয়েছে, তা লৌকিক ভাষা হতে পৃথক (বিনয়পিটক, চুল্লবগ্‌গ ৫।৬।১)।

[৬] দ্র. মন্ত্রকৃতাং স্তোমৈঃ ৯।১১৪।২; ধীরা মনসা বাচমক্রত ১০।৭১।২; ইন্দ্রং নরঃ স্তুবন্তো ব্রহ্মকারাঃ ৬।২৯।৪; ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা ৭।৩২।২ (৮।৬৬।৬, ১০।৫০।৭, ৫৪।৬); য়ো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠঃ ৭।২৮।৫ (২৯।৫, ৩০।৫); ব্রহ্মকৃতিং জুষাণঃ ৭।২৯।২। কিন্তু দেবগণও 'ব্রহ্মকৃৎ' (৩।৩২।২, ৭।৯।৫, ১০।৬৬।৫); সুতরাং ঋষির মন্ত্রকৃতি দেবতারই প্রেরণায় (তু. ৮।৫৯।৬)।

আবির্ভাব, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে তার মর্মরহস্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

২

আপস্তম্ব বলেন, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুয়ের নাম বেদ।[৭] মন্ত্রই বেদের মূল ভাগ। মন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনার যে-ব্যঞ্জনা রয়েছে, তাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে ব্রাহ্মণে।

প্রসিদ্ধি আছে, এক বেদকেই দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, তা-ই থেকে ঋক্ যজুঃ সাম এবং অথর্ব এই চার বেদ।[৮] বেদের মন্ত্রাংশের নাম তখন হল সংহিতা।

প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তারই অনুযায়ী ব্রাহ্মণভাগ। 'ব্রাহ্মণ' বলতে বোঝায় 'ব্রহ্ম'-সম্পর্কিত বিচার।[৯] এই বিচারের প্রাচীন নাম 'ব্রহ্মোদ্য' বা ব্রহ্মবাদ। যাঁরা এতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাঁরা 'ব্রহ্মবাদী' অথবা 'ব্রহ্মবাদিনী'।[১০]

মীমাংসকেরা ব্রাহ্মণের কোনও স্বতন্ত্র লক্ষণ দেননি। তাঁরা বলেন, যে-বেদবাক্য ইষ্টার্থের প্রচোদক তা-ই 'মন্ত্র', তাছাড়া সবই 'ব্রাহ্মণ'।[১১]

মন্ত্রই বেদের মূল কাঠাম। তাই সংহিতাকারে সংগৃহীত মন্ত্রগুলি প্রথম থেকেই একটা সংহত এবং স্থাণুরূপ পেয়ে গেছে। মন্ত্র সিদ্ধ ক্রিয়া এবং ভাবের বাহন বলে তার একটা অসাধারণ মর্যাদা আছে; এইজন্যই বহুযুগ ধরে তা একভাবেই থেকে যায়। বিশেষত মন্ত্রের শব্দেরও একটা অলৌকিক সামর্থ্য আছে—গোড়াতেই যদি এই ধারণা

---

[৭] 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র ২৪।১।৩১; দ্র. সত্যাষাঢ়-শ্রৌতসূত্র ১।১।৭; শাবরভাষ্য ২।১।৩৩ 'মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণং চ বেদঃ'।

[৮] 'বিব্যাসৈকং চতুর্ধা য়ো বেদং বেদবিদাং বরঃ' মহা. ১।৬০।৫; দ্র. অগ্নিপুরাণ ১৫০, ২৭১; বিষ্ণুপু. ৩।৩-৭; বায়ুপু. ১।৬০। এই জন্যই তিনি 'বেদব্যাস' বা শুধু 'ব্যাস'। বেদ বিভাগ করে তিনি তাঁর চার শিষ্য পৈল বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও সুমন্তুকে যথাক্রমে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ ও অথর্ববেদ পড়িয়ে বেদবিস্তারের ভার দেন। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণকেই বেদবিদ্যা শোনানোর বিধান দিয়ে ব্যাস তাঁর 'বিশালবুদ্ধি'র পরিচয় দিয়েছেন (দ্র. মহা. ১২।৩২৭।৩৩-৫২ 'সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু, শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ')।

[৯] 'ব্রাহ্মণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ক্লীবলিঙ্গ 'ব্রহ্মন্' হতে। শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে বোঝায় 'মন্ত্র' বা 'বিদ্যা', পুংলিঙ্গে 'ব্রহ্মবিৎ'। সংহিতায় ব্রহ্ম 'মন্ত্র' অথবা 'মন্ত্রশক্তি', উপনিষদে 'পরমতত্ত্ব'। স্বভাবতই ভাবনার এই দুটি কোটিতে একটা নিগূঢ় সংযোগ আছে, তার কথা পরে তোলা যাবে।

[১০] ব্রহ্মোদ্যের একটি দৃষ্টান্ত, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৫।২৫। সেখানে অগ্নি বায়ু বা আদিত্যের মধ্যে কে গৃহপতি, তা-ই নিয়ে ব্রাহ্মণদের বাদানুবাদ চলছে এবং সবার শেষে মীমাংসা হচ্ছে আদিত্যই গৃহপতি। উপনিষদে এইধরনের ব্রহ্মোদ্যের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। ব্রহ্মোদ্যের একটি সুন্দর নমুনা বাজসনেয়সংহিতা ২৩।৪৫-৬২; দ্র. ২৩।৯-১২। ঋক্‌সংহিতা ১।১৬৪ সূক্তটি ব্রহ্মোদ্যের প্রাচীনতম উদাহরণ; অনুক্রমণিকাকার মন্তব্য করছেন, 'অল্পস্তরং তু এতৎ, সংশয়োত্থাপন-প্রশ্নপ্রতিবাক্যান্যত্র প্রায়েণ, জ্ঞানমোক্ষাক্ষরপ্রশংসা চ।' এছাড়াও ঋক্‌সংহিতার এখানে-সেখানে কিছু ব্রহ্মোদ্য ছড়িয়ে আছে। কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে 'প্রজাপতেরগুণাখ্যানম্'কে ব্রহ্মোদ্য বলা হয়েছে, এও লক্ষণীয় (১২।৪।১৯, ২০; 'অগুণ' = নির্গুণ, লোকোত্তর)। এই ব্রহ্মোদ্যের পরিনিষ্ঠিত এবং ন্যায়সিদ্ধ রূপ হল 'মীমাংসা'। মীমাংসার উৎপত্তি 'মন্ত্র' হতে। দুটি সংজ্ঞার মূলে একই ধাতু।

[১১] দ্র. মীমাংসাসূত্র ২।১।৩২, ৩৩। মন্ত্রের অব্যাভিচারী লক্ষণ করা কঠিন, একথা মীমাংসকেরাও স্বীকার করেছেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাঁরা বলেছেন, সম্প্রদায়ক্রমে যা মন্ত্র বলে চলে আসছে তা-ই মন্ত্র, তাছাড়া সব ব্রাহ্মণ।

থাকে, তাহলে মন্ত্রকে অবিকৃত রাখবার চেষ্টাটা স্বভাবতই প্রবল হবে। কিন্তু মন্ত্রাশ্রিত ব্রাহ্মণের বেলায় এমনতর স্থাণুত্বের কথা ওঠে না—কেননা ব্রাহ্মণের কাজ হল মন্ত্রের প্রয়োগ এবং তাৎপর্য নিয়ে বিচার করা, বিবৃতি দেওয়া। যখনই মন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে, তখনই তা নিয়ে ব্রহ্মবাদীদের মীমাংসা প্রবর্তিত হয়েছে এবং তা হয়েছে কর্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা দুইই।

ভাষার দিক থেকে বেদের মন্ত্রসাহিত্য আর ব্রাহ্মণসাহিত্যে তফাত দেখা যায়। তাইতে দুয়ের মাঝে কালিক পৌর্বাপর্য অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু তাবলে একসময় শুধু মন্ত্রই রচিত হয়েছে, ব্রাহ্মণ রচিত হয়নি—একথা সত্য হতে পারে না। ব্রাহ্মণ বিবৃতিধর্মী বলেই যুগে-যুগে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে অবশেষে একটা স্থাণুরূপ নিয়েছে। এই চরিষ্ণুতার জন্যই খুব প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি আমরা পাই না। তথাকথিত ব্রাহ্মণযুগেরও অনেক ব্রাহ্মণ হারিয়ে যাওয়ার পর আবার কিছু-কিছু এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগের মত মন্ত্রভাগেরও যে একটা চরিষ্ণুতা ছিল, ঋক্ যজুঃ ও অথর্ব এই তিনখানি সংহিতার ভাষার তুলনা হতে তা বোঝা যায়। ঋক্‌সংহিতার ভাষা সবচাইতে প্রাচীন। কিন্তু সে-যুগেও যে যজুর্মন্ত্র বা অথর্বমন্ত্র ছিল না, তা বলা সঙ্গত হবে না।[১২] সুতরাং মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদকে আমরা আজ যেমন দেখছি, প্রাচীনকালেও তা তা-ই ছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে। ক্রিয়ার বাহুল্য এবং বিবর্তনের দরুন যজুর্মন্ত্রের পরিবর্ধন ও পরিবর্তন হয়েছে, অথর্বমন্ত্রেরও হয়েছে। অথর্বসংহিতার যে-অংশ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক, তার সঙ্গে ঔপনিষদ ভাবনার নিবিড় যোগ আছে। এ-ভাবনা ক্রিয়াপর নয় বলে তার বাহন যে-ভাষা, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আরও সহজে তার পরিবর্তন হয়েছে। যজুঃ- এবং অথর্ব-মন্ত্রের ভাষায় অর্বাচীনতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে এইসব কারণে।

সুতরাং ভাষার বিবর্তন দেখে বৈদিক সাহিত্যে আমরা যখন যুগবিভাগের কল্পনা করব, তখন সেই অনুসারে ভাবেরও বিবর্তন হয়েছে একথা বলা সঙ্গত হবে না। ভাষার বিবর্তন আর ভাবের পল্লবন ঠিক একজাতের পরিণাম নয়। ভাষার স্রোত উজান বয় না, আধুনিক ভাষা থেকে আমরা প্রাচীন ভাষায় ফিরে যেতে পারি না। কিন্তু ভাবের স্রোত উজান বইতে পারে, বিশেষ করে অধ্যাত্মসাধনার বেলায়। 'বাগ্ বৈখরী শব্দঝরী' হতে পশ্যন্তী বাকে ফিরে যাওয়াই হল অধ্যাত্মচেতনার উৎকর্ষের

---

[১২] ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রগুলির কেন্দ্রে রয়েছে সোমযাগ। যজুঃ যাগের মন্ত্র। ঋক্‌সংহিতায় আছে, যজুঃ আদিম দেবযজ্ঞ হতে উৎপন্ন (১০।৯০।৯), অথবা ঋষিদের মনের ধ্যানদ্বারা লব্ধ (১০।১৮১।৩)। আবার সেখানেই দেখি, অথর্বা যজ্ঞের বা অগ্নিবিদ্যার আদি প্রবর্তক (১।৮৩।৫, ৬।১৫।১৭, ৬।১৬।১৩, ৯।১১।২, ১০।২১।৫, ১০।৯২।১০)। অথর্ববেদের আরেক নাম অঙ্গিরোবেদ (দ্র. শ. ব্রা. ১৩।৪।৩।৮। অথর্বা এবং অঙ্গিরা দুজনেই ঋক্‌সংহিতায় সুপ্রাচীন পিতৃপুরুষ বলে পরিগণিত (১০।১৪।৬; তু. অথর্বা মনুষ্পিতা ১।৮০।১৬)। অথর্ববেদকে আবার ব্রহ্মবেদ বলা হয় (তু. তমৃচঃ সামানি য়জূংষি ব্রহ্ম চানুব্যচলন্, অ. ১৫।৬।৮)। নামটি সার্থক, কেননা ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি দুটিদিকেরই পরিচয় আমরা অথর্ববেদে পাই। ঋক্‌সংহিতায় রক্ষোহা অগ্নিকে অথর্বার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যে-অন্ধ সত্যের বিকার ঘটায়, তাঁরা দুজনেই তাকে জ্বালিয়ে মারেন (১০।৮৭।১২)। ঋক্‌সংহিতার কিছু মন্ত্রে অথর্বার এই শক্তির পরিচয় আছে। বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে।

পরিচয়। সুতরাং ভাবের দিক দিয়ে যে-মন্ত্রসাহিত্য বৈদিক ভাবনার গঙ্গোত্রী, সাগর-সঙ্গামী মীমাংসাসাহিত্যের চাইতে তাকেই মর্যাদা দিতে হবে বেশী। অধুনাপ্রচলিত গুরু-লঘু বিচারের ধারা এখানে উল্‌টে যাবে, এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

সংহিতা হিসাবে বেদের মন্ত্রগুলি চারভাগে ভাগ করা হয়েছে, তাই আমরা বলি 'চতুর্বেদ'। কিন্তু বেদকে আবার 'ত্রয়ী'ও বলা হয়। তখন মন্ত্রকে ক্রিয়ার অনুরোধে ঋক্ যজুঃ এবং সাম এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগটি সুপ্রাচীন।[১৩] মীমাংসকেরা বলেন, মন্ত্র পাদবদ্ধ এবং ছন্দোবদ্ধ হলে হয় ঋক্, গীত হলে হয় সাম; তাছাড়া আরসব মন্ত্র যজুঃ।[১৪] মোটের উপর বলা চলে, ঋক্ পদ্য, যজুঃ গদ্য, আর সাম গান। ঋকেই সুর দিয়ে সাম রচিত হত। সুতরাং ঋক্‌সংহিতার সূক্তগুলিতে আমরা পাই গীতিকাব্যের প্রাচীনতম রূপ।[১৫] অথর্বসংহিতায় আমরা যে-মন্ত্রগুলি পাই তাদের অধিকাংশই যখন পাদ ও ছন্দে বদ্ধ, তখন মীমাংসকের লক্ষণ অনুসারে তারাও সামান্যত ঋক্। এমনিতর সামান্যবাচী ঋক্ সংজ্ঞার ব্যবহার ঋক্‌সংহিতাতেও দুর্লভ নয়।[১৬] বস্তুত অথর্ববেদ ঋগ্‌বেদের পরিপূরক। এই দুটি বেদই বেদবিদ্যার উৎস। সুতরাং তাদের একটি সাধারণ বর্গের অন্তর্গত মনে করাই সঙ্গত।

---

[১৩] ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্তে আমরা তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই : তস্মাদ্ য়জ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি য়জ্ঞিরে, ছন্দাংসি য়জ্ঞিরে তস্মাদ্ য়জুস্তস্মাদজায়ত ১০।৯০।৯; দ্র. ঋ. ১০।৭১।১১; তু. অহে বুধিয়় মন্ত্রং মে গোপায়, য়মৃষয়স্ত্রয়ীবিদো বিদুঃ, ঋচঃ সামানি য়জূংষি (তৈ. ব্রা. ১।২।১।২৬)।

[১৪] মী. সূ. ২।১।৩৫-৩৭।

[১৫] ঋকের সঙ্গে গানের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ (তু. ৫।৪৪।১৪-১৫, সেখানে ঋক্ ও সাম সহচরিত)। যাঁরা ঋক্ রচনা করতেন, তাঁরা শুধু কবি নন, তাঁরা 'স্তোতা' বা 'জরিতা' অর্থাৎ গায়ক। নিঘণ্টুতে 'অর্চতি'র পাশেই পাই 'গায়তি' (৩।১৪)। 'অর্ক' ('ঋক্') ঋক্‌সংহিতায় বোঝায় 'গান'। দেবতার উদ্দেশে যে-প্রশস্তি তা যে-গানের সুরে করা হয়, এ-সূচনা ঋক্‌সংহিতায় অনেক জায়গায় আছে (দ্র. ১।৪।১০, ১।৫।১, ৫।৬৮।১, ৬।৪৫।৪, ৭।৩১।১, ৮।১৫।১, ৯।১১।১...)। এই গীতিকবিতার সুপ্রাচীন নাম হল 'গাথা' বা 'গাথ' (দ্র. ১।১৬৭।৬), ৮।৩২।১, গাথয়া পুরাণ্যা ৯।৯৯।৪, সোমায় 'গাথমর্চত' ৯।১১।৪ এখানে 'গাথা' এবং 'ঋক্' একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে)। রুদ্র 'গাথপতি'। ঋক্‌সংহিতায় যে-ছন্দ আদিম এবং যার ব্যবহার বেশী, তার নাম হল 'গায়ত্র'। সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলটি 'প্রগাথ'-মণ্ডল। সুতরাং ঋক্‌সংহিতা মূলত গীতিকবিতার সংগ্রহ। অবশ্য সামসংহিতায় যে-সমস্ত ঋক্ সামের 'যোনি' হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে গায়ত্রচ্ছন্দের মন্ত্রই বেশী। কিন্তু অন্যান্য ছন্দের মন্ত্রও কিছু কম নয়। সামসংহিতার সংকলন যাজ্ঞিকদের প্রয়োজনে, সুতরাং স্বভাবতই ঋকে সামের প্রয়োগ তাঁরা করেছেন সীমাবদ্ধভাবে। কিন্তু 'সামবেদ সহস্রশাখ' এই কিংবদন্তী হতে সব ঋকেরই গানযোগ্যতার একটা ইঙ্গিত মেলে। এই গাথা বা গীতিকবিতা দুদিকেই সংহিতার যুগকে ছাড়িয়ে গেছে। ব্রাহ্মণে অনেক প্রাচীন 'গাথার' উল্লেখ দেখা যায়, যা সংহিতার অন্তর্গত নয়। (দ্র. শ. ব্রা. ১৩।৫।৪।২...)। শতপথব্রাহ্মণ গাথাকে স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত বলছেন : 'তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ, তস্মাদপি ঋচং বা য়জুর্বা সাম বা গাথাং বা কুম্ব্যাং (আচারশিক্ষারূপা ঋক্. ঐ. আ. ২।৩।৬) বাভিব্যাহরেৎ ব্রততস্যাবিচ্ছেদায় (১১।৫।৭।১০)। এখানে ত্রয়ীর অতিরিক্ত গাথার উল্লেখ লক্ষণীয়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণও ঋকে এবং গাথায় তফাত করে বলেছেন, ঋক্ দিব্য আর গাথা লৌকিক (৭।১৮)। কিন্তু ঋক্‌সংহিতাতে দেখছি, ঋক্ আর গাথা সমার্থক। সুতরাং বলা যেতে পারে গাথাই সামান্যত ঋকের উৎস; তবে তার অধিকার ব্যাপ্ত হয়েছে 'পঞ্চম বেদ' ইতিহাস-পুরাণ পর্যন্ত। গাথা বলতে সায়ণ বোঝেন, 'সুভাষিতত্বেন সর্বৈর্গীয়মানা গাথা' (ঐ. ব্রা. ভাষ্য ৫।৩০)। তু. প্রাকৃত 'গাথাসপ্তশতী', মধ্যযুগের 'গাথাভাষা', হিন্দী 'শব্দ', বাংলা 'পদ'। সুপ্রাচীন-কাল হতেই গাথা কবিহৃদয়ের উৎসারণ। গাথাই জগতের আদিম সাহিত্যকীর্তি। অধ্যাত্ম অনুভব ও প্রবচনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুনিবিড়।

[১৬] তু. ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ য়স্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ, য়স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য় ইৎ তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে ১০।১৬৪।৩৯; এখানে ঋক্ স্পষ্টতই সামান্যবাচী।

তাহলে সংহিতা বা সংগ্রহ হিসাবে বেদ চারখানি, কিন্তু মন্ত্রের রকমারি হিসাবে বেদ তিনখানি।

মন্ত্রসংহিতার সঙ্গে যুক্ত যে-ব্রাহ্মণ, তার আবার তিনটি ভাগ করা চলে। প্রথমত শুদ্ধ **ব্রাহ্মণ**, তারপর তার সঙ্গে সংযুক্ত **আরণ্যক** এবং অবশেষে **উপনিষৎ**। তিনটিই ব্রাহ্মণ, কিনা ব্রহ্মমীমাংসা। ব্রহ্ম হল মন্ত্র, অর্থাৎ ঋষির হৃদয়ে স্ফুরিত দিব্যা বাক্। মন্ত্রের তাৎপর্য জ্ঞানেও হতে পারে, কর্মেও হতে পারে। ঋক্‌সংহিতার হিরণ্যগর্ভসূক্ত তার একটি সুন্দর উদাহরণ।[১৭] সূক্তটির ধুবায় আছে, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—আহুতি দিয়ে কোন্ দেবতার প্রতি চলবে আমাদের অভিযান? প্রত্যেকটি মন্ত্রের প্রথম তিনটি চরণে আছে সেই উদ্দিষ্ট দেবতার পরিচিতি। এখানে আহুতিসহ অভিযান হল কর্ম, আর দেবতার পরিচয় লাভ হল জ্ঞান। কর্ম করা হচ্ছে জ্ঞানের জন্যই। যেমন এই কর্ম নিয়ে বিচারের প্রয়োজন আছে, তেমনি জ্ঞান নিয়েও। তাই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মোদ্য কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ল। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ডের ধারক, উপনিষৎ জ্ঞানকাণ্ডের। আরণ্যক দুয়ের মাঝামাঝি।

স্বভাবতই কর্ম আর জ্ঞান সহচরিত। জ্ঞান কর্মের প্রবর্তক; আবার কর্মের পরিণামে জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ হতে উপনিষৎ পর্যন্ত কর্মের এই জ্ঞানাভিমুখীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষৎ ব্রাহ্মণেরই অঙ্গ, তার বিরোধী নয়। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও তার মূলে ঐতিহাসিক এবং যৌক্তিক কারণ আছে, যথাস্থানে তা নিয়ে আলোচনা করব। ভাষার বিচারে ব্রাহ্মণ আর উপনিষদের মাঝে কালিক পৌর্বাপর্য অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি তাহতে ভাবের বিরোধ কল্পনা করা অনুচিত হবে। ভাষা যেখানে ক্রিয়ার দ্যোতক, সেখানে সে কতকটা স্থাণু থাকে। হাজার-হাজার বছরের আগের বিবাহের মন্ত্র আজও অবিকল থাকা আশ্চর্য কিছুই নয়। কিন্তু ভাষা যদি জ্ঞানের বাহন হয়, তাহলে মননের বেগে সে সচল হয়ে ওঠে। ঔপনিষদ ভাবনার সচলতা সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। তার মাঝে বিরোধের নয়, পরিণতির কথাটাই মুখ্য।

৩

তাহলে দেখছি, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ, অথবা মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক আর উপনিষৎ নিয়ে বেদ বা শ্রুতি। কিন্তু বেদপন্থী আর্যের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল শুধু শ্রুতি নিয়েই নয়। শ্রুতির বাইরেও একটা সাহিত্য অতিপ্রাচীন কাল হতেই ছিল। পরে তার সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হল 'স্মৃতি'। শ্রুতি অপৌরুষেয়, স্মৃতি তা নয়। কিন্তু তাবলে তার

আবার একজায়গায় আছে; 'মতয়ো বাচো...ঋচো গিরঃ সুষ্টুতয়ঃ' (১০।৯১।১২)। এখানে মতি থেকে স্তুতি পর্যন্ত মন্ত্রের ধারাবাহিক অভিব্যক্তির একটা বিবৃতি পাওয়া যায়। যা-কিছু কবির 'মনে' জাগে এবং উদ্দীপ্ত 'বাণীতে' স্ফুরিত হয় তা-ই ঋক্, তা-ই সুরে গাওয়া হয়। নিঘণ্টুতে ঋক্ আর বাক্ সমার্থক (১।১১)।

[১৭] ১০।১২১

মর্যাদা শ্রুতির চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। এই স্মৃতির মাঝে বেদপন্থীদের আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক সকল ভাবনাই স্থান পেয়েছে।

শতপথব্রাহ্মণে ব্রহ্মযজ্ঞের একটা বিবরণ আছে।[১৮] তাতে ব্রহ্মবাদীর 'স্বাধ্যায়' বা দৈনন্দিন অধীতব্য বিষয়ের তালিকায় পাই—ঋক্ যজুঃ সাম অথর্বাঙ্গিরস অনুশাসন বিদ্যা বাকোবাক্য ইতিহাস-পুরাণ গাথা এবং নারাশংসী। বলা বাহুল্য, এসমস্তই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। এর মাঝে অনুশাসন বোঝাচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং বেদাঙ্গ। বিদ্যার মাঝে শতপথব্রাহ্মণেই অন্যত্র সর্পবিদ্যা দেবজনবিদ্যা এবং মায়ার উল্লেখ আছে।[১৯] ছান্দোগ্যোপনিষদে বিদ্যার একটি বিস্তৃত তালিকায় পাই ঃ পিত্র্য রাশি দৈব নিধি একায়ন দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা সর্পবিদ্যা দেবজনবিদ্যা।[২০] বাকোবাক্য বা ব্রহ্মোদ্য হতে মীমাংসা এবং তর্কের উৎপত্তি। ইতিহাস এবং পুরাণকে ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ।[২১] গাথার ভিতর দিয়ে মন্ত্ররচনার ধারা বহুদিন অব্যাহত ছিল মনে করা যেতে পারে। নারাশংসী বীরপ্রশস্তি।[২২] এইসব নিয়ে প্রাচীন 'স্বাধ্যায়'। শ্রুতি এবং স্মৃতি দুইই তার অন্তর্ভুক্ত। বোধি হল দুয়ের উৎস। তারও পরে আছে বুদ্ধির দাবি। তাহতে মীমাংসা বা ন্যায়ের উদ্ভব। এমনি করে একই বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতি স্মৃতি এবং ন্যায় এই তিন প্রস্থানে ভাগ হয়ে পড়ল। এই ভাগটি স্বাভাবিক বলেই সুপ্রাচীন।

শ্রুতিকে আয়ত্ত করবার সাধন হল **বেদাঙ্গ**। বেদাঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা ব্যাকরণ ছন্দ নিরুক্ত জ্যোতিষ এবং কল্প। **শিক্ষা** বেদমন্ত্রের উচ্চারণের বিজ্ঞান। **ব্যাকরণে** মন্ত্রান্তর্গত পদের বিশ্লেষণ। **নিরুক্তে** পদের ব্যুৎপত্তি হতে অর্থের নিরূপণ। **কল্পে** বৈদিক অনুষ্ঠান এবং আচারের বিবৃতি। **ছন্দ** আর **জ্যোতিষের** বিষয়বস্তু নামেই বোঝা যায়। বেদাঙ্গগুলি সূত্রের আকারে ছিল,[২৩] যদিও সব সূত্র এখন আর পাওয়া যায় না। অত্যন্ত স্বল্পাক্ষরে একটি সারসত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা হবে, যাতে সংশয়ের কোনও অবকাশ থাকবে না অথচ অর্থের ব্যঞ্জনা হবে বিশ্বতোমুখ—এই হল সূত্রের লক্ষণ। সূত্র-সাহিত্যে আর্যদের বৈজ্ঞানিক মনীষার আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বেদাঙ্গগুলি স্মৃতির অন্তর্গত, সুতরাং তারা অপৌরুষেয় নয়। দুটি মীমাংসাসূত্রকেও[২৪]

---

[১৮] ১১।৫।৬

[১৯] ১৩।৪।৩

[২০] ৭।১।২, ৪; ৭।৭।১। এর মধ্যে কোন্ সংজ্ঞা কি বোঝায় তা নিয়ে মতভেদ আছে।

[২১] ৭।১।২। দ্র. মহা. আদি ১।২৬৭। ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

[২২] নারাশংসীর উল্লেখ ঋক্সংহিতাতে আছে (১০।৮৫।৬)। সেখানে একসঙ্গে 'রৈভী' এবং 'গাথা'র কথাও আছে। সায়ণের মতে নারাশংসী মনুষ্যস্তুতি। নারাশংসী এবং রৈভী কুন্তাপসূক্তের অন্তর্গত (দ্র. অ. স. ২০।১২৭; ঐ. ব্রা. ৬।৩২)। মিতাক্ষরার মতে 'নারাশংসীশ্চ রুদ্রদৈবত্যমন্ত্রান্ গাথা যজ্ঞগাথেন্দ্রগাথাদ্যাঃ' যাজ্ঞ্য ১।৪৫।

[২৩] সূত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে : ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ 'সূত্রাণ্য'নুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি (২।৪।১০, ৪।১।২, ৪।৫।১১)। এসমস্তই স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত।

[২৪] বার অধ্যায়ে জৈমিনির ধর্মসূত্র এবং চার অধ্যায়ে বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র। একটির ভিত্তি হল ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র; আরেকটির ভিত্তি উপনিষদ। দুটি মিলিয়ে এক অখণ্ড মীমাংসাশাস্ত্র। দুটি মীমাংসাসূত্রের অধ্যায়সংখ্যার সমষ্টি ষোল, এটা আকস্মিক নাও হতে পারে। স্মরণীয়,

বেদাঙ্গের অন্তর্গত বলেই ধরা উচিত। এছাড়া কিছু বৈদিক **পরিশিষ্ট** আর **অনুক্রমণিকা** আছে। পরিশিষ্টগুলিতে আছে বৈদিক অনুষ্ঠানের কিছু অতিরিক্ত বিবরণ, আর অনুক্রমণিকাতে বেদমন্ত্রের ঋষি দেবতা ছন্দ ইত্যাদির বিবরণ।[২৫] বেদানুশীলনের সহায়ক বলে এগুলিকেও বেদাঙ্গের শামিল বলা যেতে পারে।

মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ এই নিয়ে যেমন বেদ, তেমনি বেদ আর বেদাঙ্গ নিয়ে বৈদিক সাহিত্য। বেদ বোধির ফল, আর বেদাঙ্গ মননের ফল। তাই বেদ শ্রুতি, বেদাঙ্গ স্মৃতি। বেদ বোঝবার জন্য, তার প্রতিপাদিত বিদ্যাকে আয়ত্ত করবার জন্য বেদাঙ্গ হল সাধন-শাস্ত্র। ছয়টি বেদাঙ্গ মন্ত্রবিদ্যার ছয়টি সাধনার সঙ্কেত বহন করছে এমন মনে করবার কারণ আছে, যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

৪

এই বৈদিক সাহিত্যের আবার শাখাভেদ ছিল। শাখা বলতে কিন্তু অংশকে বোঝায় না, বোঝায় সমগ্রকেই। যে-কোনও বেদের যে-কোনও শাখায় সেই বেদের সমগ্র ভাবনা ও সাধনারই ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। শাখায়-শাখায় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের যে-ভেদ, তা প্রায়শই পাঠ বিন্যাস ইত্যাদির অবান্তর ভেদ মাত্র।

শৌনকের 'চরণব্যূহসূত্রম্' একটি পরিশিষ্ট গ্রন্থ, তাতে বেদের শাখাভেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। শৌনকের মতে ঋগ্বেদের পাঁচ শাখা, যজুর্বেদের ছিয়াশি শাখা, সামবেদের হাজার শাখা এবং অথর্ববেদের নয় শাখা।[২৬] সব শাখার বেদ এখন আর পাওয়া যায় না। প্রত্যেক শাখার নিজস্ব সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র থাকা উচিত। কিন্তু এ-নিয়মের আজকাল ব্যতিক্রম দেখা যায়। এক শাখার সংহিতা তো ব্রাহ্মণ আরেক শাখার এবং কল্পসূত্র তৃতীয় এক শাখার—এমন দৃষ্টান্তও আছে। ঋগ্বেদের আশ্বলায়নশাখার অধ্যেতা পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রে। কিন্তু তাঁদের সংহিতা

বেদের পুরুষ ষোড়শকল। তাই ঋক্সংহিতার পুরুষসূক্তে ষোলটি ঋক্। পনেরটি এক ছন্দে, শেষেরটির ছন্দ আলাদা। এর সঙ্গে তু. চাঁদের ক্ষয়িষ্ণু পনের কলার ঊর্ধ্বে নিত্যা ষোড়শী কলা।

[২৫] পরিশিষ্টেরও পরিশিষ্ট হল নানা 'প্রয়োগ' 'পদ্ধতি' এবং 'কারিকা' গ্রন্থ। এগুলি অবশ্য পরের যুগের রচনা। শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' সুপ্রাচীন গ্রন্থ, তাতে ঋক্সংহিতার দেবতাসূচী এবং দেবতাখ্যান আছে। সূত্রাকারে রচিত না হলেও এটিকে অনুক্রমণিকার অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে। শৌনকেরই 'ঋগ্বিধানম্'এ ঋক্মন্ত্রের লৌকিক বিনিয়োগের সূচী পাওয়া যায়।

[২৬] আধুনিক পণ্ডিতেরা 'চরণব্যূহসূত্রম্'কে অর্বাচীন গ্রন্থ বলে মনে করেন। পতঞ্জলি (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) তাঁর মহাভাষ্যে শাখার যে-সংখ্যা দিয়েছেন, তাতে ঋগ্বেদের নয় আর যজুর্বেদের একশত শাখার কথা বলেছেন। পতঞ্জলির সময় শাখার সংখ্যা বেড়ে গেছে শৌনকের সময় থেকে, এটা লক্ষণীয়। পতঞ্জলি 'সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ' বলতে শাখা বোঝাচ্ছেন না, সামগানের হাজারটা পদ্ধতি এই কথাই বলতে চেয়েছেন—এই হল সত্যব্রত সামশ্রমীর মত। সামতর্পণবিধিতে সামবেদের তেরটি শাখার কথা আছে। ভাগবতপুরাণে (১২।৬-৭) বেদের শাখাভেদের একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। আচার্যের এক-এক শিষ্য এক-এক শাখার প্রবর্তক। এমনি করে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রচারের ফলে এক বেদেরই বহু শাখার উৎপত্তি হয়েছে (ভা. ১।৪।২৩)। ভাগবতের মতে ঋগ্বেদের শাখার সংখ্যা তের, যজুর্বেদের পনের। তু. বিষ্ণুপুরাণ ৩।৩-৭; ব্রহ্মাণ্ডপু. ১।৩৩-৫।

আশ্বলায়নশাখার নয়—শাকলশাখার, ব্রাহ্মণ ঐতরেয়শাখার, কেবল কল্পসূত্র (শ্রৌত এবং গৃহ্য) আশ্বলায়নশাখার। আবার কোনও শাখার সংহিতা পাওয়া যায়, কিন্তু তার অধ্যেতা পাওয়া যায় না—যেমন যজুর্বেদের কাঠকশাখার। আজকাল কোন্ বেদের কোন্ শাখার সংহিতা পাওয়া যায় এবং কোথায় তার প্রচার, তার একটা বিবরণ দেওয়া গেল।

ঋক্‌সংহিতার **শাকল শাংখায়ন**[২৭] ও **বাষ্কল** এই তিনটি শাখা পাওয়া যায়। শাকলসংহিতায় মন্ত্রগুলিকে মণ্ডল এবং সূক্তে ভাগ করা হয়েছে; বাষ্কলসংহিতায় ভাগ করা হয়েছে অষ্টক অধ্যায় এবং বর্গে। তাছাড়া মন্ত্রবিন্যাসেরও সামান্য-কিছু হেরফের আছে। শাকলশাখায় বালখিল্যসংহিতা একটি অতিরিক্ত সংযোজন; কিন্তু শাংখায়নশাখায় তা সংহিতারই অন্তর্গত। সংজ্ঞানসূক্তটি শাকলশাখার পরিশিষ্টে আছে, কিন্তু শাংখায়নশাখায় তাকে সংহিতার মধ্যেই ধরা হয়। বাষ্কলসংহিতায় বালখিল্যমন্ত্রের কয়েকটি মন্ত্র[২৮] ছাড় পড়েছে। ঋগ্‌বেদের শাকলসংহিতাই আজকাল প্রচলিত। আশ্বলায়নশাখার মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই শাখারই অধ্যয়ন-অধ্যাপন চলে, একথা আগেই বলেছি। একটি প্রাচীন শ্লোকের মতে আশ্বলায়ন শাকলেরই শিষ্য।[২৯]

যজুঃসংহিতার দুটি ভেদ—কৃষ্ণযজুঃ এবং শুক্লযজুঃ। কৃষ্ণযজুঃসংহিতার **কঠ** এবং **কঠ-কপিষ্ঠল** এই দুই শাখার সংহিতা পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণসম্প্রদায় দেখা যায় না। আরেকটি শাখা হল **মৈত্রায়ণী** বা কলাপ শাখা। গুজরাত এবং দক্ষিণদেশের কোথাও-কোথাও এই শাখার অধ্যেতা আছেন। যজুঃসংহিতার সবচাইতে বহুল প্রচার হল **তৈত্তিরীয়** শাখার। এই শাখার প্রচলন দক্ষিণেই বেশী।[৩০]

শুক্লযজুঃসংহিতার দুটি শাখা—**কাণ্ব** এবং **মাধ্যন্দিন**। মাধ্যন্দিনশাখার ব্রাহ্মণেরা বেশির ভাগ উত্তরভারতের।[৩১] কিছু-কিছু দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ কাণ্বশাখাধ্যায়ী।

সামসংহিতার তিনটি শাখা পাওয়া যায়—**কৌথুম রাণায়ণীয়** এবং **জৈমিনীয়**। কৌথুমশাখার ব্রাহ্মণসম্প্রদায় পাওয়া যায় গুজরাতে এবং বাংলায়। কিন্তু বাঙালী ব্রাহ্মণেরা বর্তমানে গৃহ্যপদ্ধতি ছাড়া সামবেদের বিশেষ-কোনও খবর রাখেন না বা চর্চা করেন না। রাণায়ণীয়শাখার ব্রাহ্মণ প্রধানত পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রে। কৌথুমশাখার সংহিতা এবং ব্রাহ্মণই তাঁরা মেনে চলেন, কেবল তাঁদের কল্পসূত্র নিজস্ব। জৈমিনীয়-শাখাধ্যায়ী কর্ণাটে কিছু-কিছু পাওয়া যায়। এই শাখার সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র সবই আছে।

অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতে একসময় কিছু ছিলেন, কিন্তু এখন

---

[২৭] শাংখায়ন আর কৌষীতকী একই শাখার নাম, এ-অনুমান ঠিক নয়। কৌষীতকীশাখার একটি গৃহ্যসূত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তা শাংখায়ন-গৃহ্যসূত্র হতে পৃথক দ্র. ঋ. স. ৪।৮৯১ (পুণা তিলকমন্দির সং)।

[২৮] শাকলসংহিতা ৮।৫৬-৫৭, ৮।৫৮।৩; ৮।৫৯; দ্র. ঔন্ধ-সংস্করণ।

[২৯] শিশিরো বাষ্কলঃ সাংখ্যো বাৎস্যশ্চৈবাশ্বলায়নঃ, পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদপ্রবর্তকাঃ। বর্তমান শাকলসংহিতাকে শৈশিরীয়সংহিতাও বলা হয়।

[৩০] পতঞ্জলি কঠ কলাপ এবং চরক এই তিনটি শাখার উল্লেখ করেছেন। আবার বলছেন, 'চরকশাখার অধ্যয়ন-অধ্যাপন গ্রামে-গ্রামে হয়।' শৌনকও চরকশাখাকে সবচাইতে বিশিষ্ট শাখা বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই শাখার কোনও উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

[৩১] তৈত্তিরীয় আর মাধ্যন্দিন শাখায় 'ষ'-এর উচ্চারণ 'খ'। বাংলাতেও ক্ষ = ক্‌খ।

তাঁদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথর্বসংহিতার দুটি শাখা—**পিপ্পলাদ** এবং **শৌনক**। তার মধ্যে শৌনকসংহিতাই আজকাল বিশেষ প্রচারিত।

বেদের অনেক শাখা লোপ পেলেও, এখনও যা অবশিষ্ট আছে তা থেকেই বৈদিক ভাবনা ও সাধনার একটা সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা আগেই বলেছি, শাখাভেদ প্রায়ই অবান্তর ভেদ মাত্র, তাতে আসল বিষয়ের ইতরবিশেষ খুব বেশী হয়নি।

বেদের সংহিতা

১

এইবার প্রত্যেক সংহিতার একটু খুঁটিয়ে পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রথমেই ঋক্‌সংহিতা। সংহিতাগুলির মধ্যে ভাষাতত্ত্বের বিচারে এইটি সবচাইতে প্রাচীন।

ঋক্‌সংহিতা কতকগুলি 'সূক্তের' সমষ্টি। সূক্ত মানে প্রশস্তি, আক্ষরিক অর্থ 'শোভন বচন'।[১] এককেটি সূক্ত কতকগুলি 'ঋকের' সমষ্টি। এগারটি বালখিল্যসূক্ত ধরে শাকলসংহিতায় মোট ১০২৮টি সূক্তে ১০৫৫২টি ঋক্ আছে।

শাকলসংহিতায় সূক্তগুলিকে দশটি 'মণ্ডলে' ভাগ করা হয়েছে, বাষ্কলসংহিতায় ভাগ করা হয়েছে আটটি 'অষ্টকে'। শাকলসংহিতার বিভাগটিই সুপ্রচলিত এবং যুক্তিযুক্ত, কেননা তাতে মন্ত্রসংগ্রহের একটা নিয়ম পাওয়া যায়।[২]

মণ্ডলের উপবিভাগ হল 'অনুবাক' এবং অষ্টকের হল 'অধ্যায়'। বাষ্কলসংহিতার আটটি অষ্টকে আটটি করে ৬৪টি অধ্যায়; শাকলসংহিতায় অনুবাকের সংখ্যা ৮৫। প্রত্যেক অধ্যায়ের সূক্তসংখ্যা প্রায় সমান, কিন্তু অনুবাকের সূক্তসংখ্যা কতকটা অনিয়মিত। অনুবাক আর অধ্যায় দুয়েরই অর্থ হল 'পাঠ' (lesson)।[৩] প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার কতকগুলি বর্গে বিভক্ত। ঋক্‌সংহিতার কোনও মন্ত্রের সূচনা দিতে হলে মণ্ডল ও সূক্ত অনুসারে অথবা অষ্টক অধ্যায় ও বর্গ অনুসারে মন্ত্রের সংখ্যা উল্লেখ করাই রীতি।

ঋক্‌সংহিতার মণ্ডলগুলির বিন্যাস লক্ষ্য করলে কয়েকটি বিষয় নজরে পড়ে। প্রথমত, সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডলে বিভিন্নবংশীয় ঋষিদের মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে এবং দুটি মণ্ডলেই সূক্তসংখ্যা একেবারে সমান-সমান (১৯১)। দ্বিতীয় হতে

---

[১] অন্যতম প্রাচীন সংজ্ঞা 'সূক্তবাক্' (ঋ. ৫।৪৯।৫) বা 'সূক্তবাক'। ঋক্‌সংহিতায় আছে, সূক্তবাক উচ্চারণ করেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত, সূক্তবাক বিশ্বদেবগণের আদিসৃষ্টি এবং হবিঃ (১০।৮৮।৭-৮)। সুতরাং সূক্তবাক ঋষিদের মতে দিব্য আবেশের ফল। অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় তারই প্রেরণায়। আগে ভাব, তারপর কর্ম। মীমাংসকেরাও এই ক্রমটি স্বীকার করেন। তাঁদের মতে মন্ত্রই কর্মের স্মারক।

[২] নিরুক্তকার যাস্কও ঋক্‌সংহিতার শাখাগুলিকে বলেছেন 'দশতয়ী' (৭।৮)।

[৩] পাণিনির একটি সূত্রে আছে 'অধ্যায়ানুবাকয়োর্লুক্' (৫।২।৬০)। সুতরাং অনুবাক বা অধ্যায় অনুসারে পাঠ—দুটিই প্রাচীন। পরবর্তী দুটি সূত্রে দুটি গণের উল্লেখ আছে। তাথেকে প্রাচীন পাঠবিভাগের একটা আভাস পাওয়া যায়।

সপ্তম পর্যন্ত প্রত্যেক মণ্ডলে একেক বংশের ঋষিদের মন্ত্র আছে, সুতরাং এই ছয়টিকে **আর্ষমণ্ডল** বলা চলে। অষ্টম মণ্ডলটি বিভিন্ন ঋষির রচিত প্রগাথের সংগ্রহ, সুতরাং প্রথম ও দশম মণ্ডলের মত এই **প্রগাথমণ্ডলটিও** একটি প্রকীর্ণ মণ্ডল। নবম মণ্ডলটি শুধু সোমমন্ত্রের সংগ্রহ এবং তাও বিভিন্ন ঋষির রচনা। সুতরাং এই **সোমমণ্ডলটিও** আরেকটি প্রকীর্ণ মণ্ডল। আধুনিক পণ্ডিতেরা তাই মনে করেন, আর্যমণ্ডলগুলিই ঋক্‌সংহিতার প্রাচীনতম ভাগ, প্রকীর্ণ মণ্ডলগুলির মধ্যে প্রগাথমণ্ডল এবং সোম-মণ্ডলটি পরিশিষ্ট, আর প্রথম ও দশম মণ্ডলটি পরবর্তীকালের সংযোজন। এই দুটি মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা সমান হল কেন, সে এক রহস্য।

সংযোজন কথাটা ভাষার দিক থেকে সমর্থিত হয় বটে, কেননা প্রথম আর দশম মণ্ডলের ভাষায় ক্রমিক পরিণামের কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা ভাবের দিক দিয়েও ক্রমিক পরিণামের কথা তোলেন, কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। সমস্ত ঋক্‌সংহিতায় ভাবের একটি পরিমণ্ডলই আছে। দশম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তে যে দার্শনিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, তার আভাস যে আর্যমণ্ডলগুলিতে নাই, সেকথা সত্য নয়। এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

আর্যমণ্ডলের ঋষিরা যথাক্রমে গৃৎসমদ বিশ্বামিত্র বামদেব অত্রি ভরদ্বাজ এবং বসিষ্ঠ। তাঁদের প্রত্যেকটি মণ্ডল আরম্ভ হয়েছে অগ্নিসূক্ত দিয়ে। সোমমণ্ডল অবশ্য সোমসূক্ত দিয়ে আরম্ভ, প্রগাথমণ্ডলের প্রথমেও অগ্নিসূক্ত নাই। আবার প্রথম এবং দশম মণ্ডলের গোড়ায় অগ্নিসূক্ত আছে। অর্থাৎ এ-দুটি মণ্ডল আর্যমণ্ডলেরই আদর্শে সংকলিত।

আর্যমণ্ডলে দেবতাবিন্যাসের একটা রীতি আছে। প্রত্যেক মণ্ডলের গোড়াতে আমরা পাই অগ্নিসূক্তের সংগ্রহ, তারপর ইন্দ্রসূক্তের, তারপর অন্যান্য দেবতার সূক্তের। অনুষ্ঠান এবং সাধনার দিক দিয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম ঋগ্‌বেদের তিনটি প্রধান দেবতা, তাই তাঁদের উদ্দিষ্ট মন্ত্রসংখ্যাও ঋক্‌সংহিতায় সবচাইতে বেশী।[৪] প্রত্যেক আর্যমণ্ডলেও তাই অগ্নি আর ইন্দ্রের সূক্তই সংখ্যায় বেশী। সোমসূক্তগুলি সোম-মণ্ডলে আলাদা সঙ্কলিত হয়েছে।

অগ্নি এবং ইন্দ্র ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের আর্যমণ্ডলে সাজানো হয়েছে সূক্তসংখ্যার ক্রম অনুসারে। যে-দেবতার সূক্ত সংখ্যায় সবচাইতে বেশী, তিনি ঠাঁই পেয়েছেন সবার আগে। যেখানে সূক্তসংখ্যা সমান, সেখানে যে-দেবতার প্রথম সূক্তে মন্ত্রসংখ্যা সবচাইতে বেশি, তাঁকে আগে বসানো হয়েছে। আবার প্রত্যেক দেবতার সূক্তগুলি সাজানো হয়েছে ছন্দের ক্রম অনুসারে—জগতীচ্ছন্দের সূক্তগুলি বসেছে সবার আগে, গায়ত্রীচ্ছন্দের সূক্তগুলি সবার শেষে। তারও মাঝে আবার বড় সূক্তগুলি বসেছে আগে, ক্রমশ ছোটগুলি পরপর। এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুব কম। এর ফলে প্রত্যেক আর্যমণ্ডলে

---

[৪] এই দেবত্রয়ীর অনুবৃত্তি পাই তন্ত্রসাধনায় অগ্নি সূর্য ও সোমরূপে। ইন্দ্রকে আমরা সাধারণত বর্ষণের দেবতা বলে জানি; কিন্তু বর্ষণ তাঁর একটি বিভূতি মাত্র। বস্তুত তিনি আদিত্য। এদেশে যখন বর্ষা আরম্ভ হয়, তখন সূর্য উত্তরায়ণের শিরোবিন্দুতে, এই কথাটি মনে রাখতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা 'ইন্দ্র'-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

প্রতিটি সূক্তের স্থান মোটের উপর নির্দিষ্ট থাকায় সংহিতার কাঠামে বিশেষ নড়চড় হওয়া সম্ভব হয়নি।[৫]

প্রগাথমণ্ডলের আরেক নাম **উদ্‌গাতৃমণ্ডল,** কেননা সোমযাগে উদ্‌গাতার কাজে যেসব মন্ত্রের দরকার, এটি তারই সংগ্রহ। এর মাঝে প্রগাথের সংখ্যাই বেশী, যদিও অন্যান্য মণ্ডলেও কিছু প্রগাথ আছে।[৬] এই মণ্ডলের অধিকাংশ ঋষিই কণ্ববংশীয়, সুতরাং এটিও একধরনের আর্ষমণ্ডল। এতে সূক্তগুলি সাজানো হয়েছে প্রধানত ঋষিদের ধরে। তার মাঝে দেবতাদের বিন্যাস করা হয়েছে প্রায়ই প্রথম সূক্তের মন্ত্র-সংখ্যার ক্রমহ্রাস অনুসারে।

সোমমণ্ডলটি সাজানো হয়েছে ছন্দ অনুযায়ী। প্রথমে গায়ত্রী, তারপর জগতী, তারপর ত্রিষ্টুপ্‌ এবং সবার শেষে অন্যান্য ছন্দের সূক্ত। এখানেও প্রত্যেক ছন্দের বেলায় সূক্তগুলি মোটের উপর ঐ ক্রমহ্রস্বতার নিয়মে সাজানো।

আর্ষমণ্ডল প্রগাথমণ্ডল আর সোমমণ্ডলের সঙ্কলন ত্রয়ীবিদ্যার ইঙ্গিত বহন করছে বলে মনে হয়। দেবতার আবাহন ও প্রশস্তি, তাঁর উদ্দেশ্যে গান এবং তাঁকে সোমপান করতে দেওয়া—এই হল যজ্ঞের মূল রীতি। যথাক্রমে হোতা উদ্‌গাতা এবং অধ্বর্যু এই কাজগুলি করে থাকেন।[৭]

আর্ষমণ্ডলগুলি বেশীর ভাগ প্রশস্তিমন্ত্রের সংগ্রহ, প্রগাথমণ্ডলে সামযোনি ঋক্‌-মন্ত্রের। আবার সোমমণ্ডলের দেবতা হলেন শুদ্ধ সোম নন, 'পবমানগুণবিশিষ্ট' সোম।[৮] পার্থিব সোমলতা যখন সংস্কৃত এবং 'পূত' হয়ে অমৃতরসপ্রবাহিণী হয়, তখন তার দেবতা পবমান সোম। সোমের এই পাবন অধ্বর্যুগণের কাজ। তাই সোম-মণ্ডলের সঙ্গে তাঁদের যোগ সুস্পষ্ট।[৯] এমনি করে দ্বিতীয় হতে নবম মণ্ডল পর্যন্ত মন্ত্রসংগ্রহের মাঝে সোমযাগকে আশ্রয় করে ঋক্‌সংহিতার একটি সুসংহত কাঠামের ছবি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১০]

এই আটটি মণ্ডলের ঋষিসূচী দেখলে আরেকটি ব্যাপার চোখে পড়ে। সোমযাগই যদি বৈদিক যজ্ঞসাধনার চরম হয়, তাহলে সোমমণ্ডলে আর্ষমণ্ডলের প্রত্যেক ঋষি-বংশের রচিত সূক্ত থাকবে এবং তা আছেও। কিন্তু সেসব সূক্তের সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে কশ্যপ এবং অঙ্গিরোবংশের ঋষিদের সূক্ত। তারপরেই ভৃগুবংশীয় ঋষিদের

---

[৫] বিন্যাসের এই নিয়মের আবিষ্কর্তা Bergaigne।

[৬] বৃহতী বা ককুভ্‌ ছন্দের একটি মন্ত্রের সঙ্গে সতোবৃহতী ছন্দের একটি মন্ত্র মিলিয়ে 'প্রগাথ' হয়। প্রগাথে 'সাম' বা সুর দিয়ে গাওয়া হয়।

[৭] সোমযাগের যোলজন ঋত্বিকের চারটি গণ—হোতৃগণ, উদ্‌গাতৃগণ, অধ্বর্যুগণ এবং ব্রহ্মগণ। প্রধান চারজন ঋত্বিকেরই নাম ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায় অনেকজায়গায়। একসঙ্গে তাঁদের কাজের বিবৃতি মেলে ১০।৭১।১১ ঋকে।

[৮] সায়ন ঋ. ৯।১।১; 'নবমং মণ্ডলং পাবমানং সৌম্যম্' (সর্বানুক্রমণী)।

[৯] অবশ্য অধ্বর্যুগণের সব কাজই হয় যজুর্মন্ত্র দিয়ে। সোমমণ্ডলটির বিকল্পে আবপন হয় সোমযাগের মাধ্যন্দিনসবনে (দুপুরবেলা লতা ছেঁচে রস বার করবার সময়) লতাগুলি ছড়িয়ে দিয়ে যখন 'গ্রাবা' বা সোম ছেঁচবার পাথরের স্তুতি করা হয়, তখন (আ. শ্রৌ. ৫।১২)। সোমমণ্ডলের প্রায় অর্ধেক মন্ত্রই সামযোনি, এমন-কি এদিক দিয়ে প্রগাথমণ্ডলের চাইতেও সামযোনি মন্ত্রের অনুপাত এই মণ্ডলেই বেশী। সামসংহিতার অর্ধেকের বেশী মন্ত্র এসেছে এই দুটি মণ্ডল থেকে।

[১০] সোমযাগই সমস্ত যাগের শ্রেষ্ঠ, বৈদিক যজ্ঞসাধনার চরম। সোমযাগ বাইরে লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তার ভাবকে নিয়ে সাধনার অনুবৃত্তি এখনও চলছে। সোমবিদ্যা বা মধুবিদ্যারই রূপান্তর হল তন্ত্রের শ্রীবিদ্যায়—যা তান্ত্রিক মন্ত্রসাধনার চরম এবং আজও যার প্রচার সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে।

স্থান। আর্যমণ্ডলের অন্যান্য ঋষিদের রচিত সূক্তসংখ্যা থেকে আবার কণ্ববংশীয় ঋষিদের সূক্তসংখ্যা বেশী। আমরা জানি, প্রগাথমণ্ডলের অধিকাংশই এই বংশের ঋষিদেরই রচিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আর্যমণ্ডলের বাইরে যে-দুটি মণ্ডল বিশেষভাবে সোম-যাগের সঙ্গে যুক্ত, তাদের মাঝে কশ্যপ অঙ্গিরা এবং কণ্ব-বংশীয় ঋষিদেরই প্রাধান্য। এঁদের মাঝে অঙ্গিরা অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক অতি প্রাচীন ঋষি, ঋক্‌সংহিতায় তাঁর বহু উল্লেখ আছে। তিনি অথর্ববেদেরও প্রবর্তক। কণ্ববংশীয় ঋষিরা যজুর্বেদের একটি শাখার প্রবর্তক, তাও আমরা জানি। কশ্যপ সপ্তর্ষির অন্যতম।[১০] সবদিক দিয়ে বিচার করলে আর্যমণ্ডলের ঋষিদের সঙ্গে কশ্যপ অঙ্গিরা এবং কণ্ব-বংশীয় ঋষিদেরও যুক্ত করা উচিত। তাহলে ঋক্‌সংহিতার প্রাচীন কাঠামোর পরিধি নবম মণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সংহিতার সঙ্কলন যদি যজ্ঞকর্মের অনুরোধে হয়ে থাকে, তাহলে এই দৃষ্টিই সমীচীন।

মন্ত্রদ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিবংশের প্রবর্তকরূপে আমরা এই কয়টি নাম পাইঃ ভৃগু বিশ্বামিত্র গোতম অত্রি ভরদ্বাজ বসিষ্ঠ কণ্ব কশ্যপ এবং অঙ্গিরা। প্রথম সাত বংশের ঋষিরা যথাক্রমে ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় হতে অষ্টম মণ্ডলের দ্রষ্টা এবং শেষ দুই বংশের ঋষিরা হলেন সোমমণ্ডলের অর্ধেকের বেশীরও দ্রষ্টা। ঋক্‌সংহিতায় এঁদের সবারই নাম আছে, অধিকন্তু সেখানে অথর্বাও একজন প্রধান ঋষি বলে গণ্য।[১১]

দেখা গেল, ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় হতে নবম মণ্ডল পর্যন্ত মন্ত্রসংগ্রহের মাঝে যজ্ঞভাবনার একটা অনুষঙ্গ আছে। এই অংশটিই সংহিতার প্রাচীন কাঠাম। তার আদিতে আর অন্তে প্রথম আর দশম মণ্ডলটি উপক্রম এবং উপসংহারের মত দুটি সংযোজন। তার মধ্যে উপক্রমটিই প্রাক্তন এবং উপসংহারটি প্রকীর্ণ মন্ত্রের একটি অন্তিম সংযোজন। প্রথম মণ্ডলের আর দশম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা এইজন্যও এক হতে পারে।

প্রথম মণ্ডলটি বস্তুত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কয়েকটি আর্যমণ্ডলের সংগ্রহ। ভৃগু অত্রি এবং ভরদ্বাজ-বংশীয় ছাড়া প্রাচীন ঋষিবংশের সবাই এখানে আছেন। তার মধ্যে আবার অঙ্গিরোবংশীয়দের সূক্তসংখ্যাই সবচাইতে বেশী।[১২]

---

[১০] সপ্তর্ষির উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় এইভাবে আছে : সপ্তঋষয়স্তপসে য়ে নিষেদুঃ ১০।১০৯।৪; তু. ৮২।২; ঋষয়ঃ সপ্ত দৈব্যাঃ ১৩০।৭। সোমমণ্ডলের একটি প্রথাগসূক্ত (১০৭) সপ্তর্ষিগণের রচিত। সেখানে সপ্তর্ষিদের নাম ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গোতম রাহুগণ, ভৌম অত্রি, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব এবং মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে কশ্যপ ছাড়া আর ছয়জনকে আমরা আর্যমণ্ডলের ঋষিদের সঙ্গে যুক্ত দেখি। আবার কশ্যপবংশীয় ঋষিদের পাই সোমমণ্ডলের সর্বাধিক সূক্তের (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) রচয়িতৃরূপে। সামবেদের বংশব্রাহ্মণের মতে ঋষি কশ্যপই সামবেদের আদি প্রবর্তক। তিনি অগ্নি হতে সামবিদ্যা লাভ করেছিলেন।

[১১] অঙ্গিরাঃ যেমন অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক, ইনিও তেমনি প্রথম অগ্নিমন্থনের প্রবর্তন করেন : দ্র. ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ (এখানে মূর্ধন্যকমল মন্থন করে অগ্নি সমিন্ধনের কথা পাই) ৬।১৬।১৩; তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙ্ ঋষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ ১৬।১৪; ইমথু ত্যমথর্ববদগ্নিং মন্থন্তি বেধসঃ ১৫।১৭; অথর্বা মনুষ্পিতা...ধিয়মত্নত ১।৮০।১৬; য়জ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে ৮৩।৫; অগ্নির্জাতো অথর্বণা ১০।২১।৫; ৮৭।১২; য়জ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়ৎ ৯২।১০; ১৪।৬।

[১২] সূক্তসংখ্যা অঙ্গিরোবংশীয়দের ৭০, গোতমবংশীয়দের ২৭, কণ্ববংশীয়দের ২৭, অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির ২৬ (এঁর রচিত মন্ত্র আর কোথাও নাই), বিশ্বামিত্রবংশীয়দের ১৮, পরুচ্ছেপ

আর্ষমণ্ডলগুলির মত প্রায় প্রত্যেকটি উপমণ্ডলেরই আরম্ভ একটি অগ্নিসূক্ত দিয়ে।[১৩] দেবতাদের মধ্যে তেমনি অগ্নি এবং ইন্দ্রেরই প্রাধান্য, যদিও সব উপমণ্ডলেই ঠিক অগ্নির পরেই ইন্দ্রকে আনা হয়নি।

এই মণ্ডলের গোড়ার অনুবাকটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্বামিত্রবংশীয়ের মন্ত্র দিয়ে সংহিতার শুরু। এই বিশ্বামিত্রেরই সাবিত্রমন্ত্র আজ পর্যন্ত এদেশের দ্বিজাতিমাত্রের নিত্যজপ্য স্বাধ্যায় হয়ে আছে। সুদাসের যজ্ঞসভায় বিশ্বামিত্র একবার ঘোষণা করেছিলেন, 'বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মশক্তিই ভারতজনকে রক্ষা করছে' (ঋ. ৩।৫৩।১২)। তাঁর সে উদাত্ত ঘোষণা সত্য হয়েছে। তাঁর প্রভাবের ফলেই কি ঋক্‌সংহিতার সূচনা হয়েছে তাঁর পুত্র মধুচ্ছন্দার অগ্নিমন্ত্র দিয়ে?

তারপর এই অনুবাকের তিনটি সূক্তের আরম্ভ যথাক্রমে অগ্নি বায়ু এবং অশ্বিদ্বয়ের মন্ত্র দিয়ে। বেদে তিনটি লোকের কথা আছে—পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌঃ। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, এই তিনটি লোকেই দেবতাদের স্থিতি (৭।৫)। তার মধ্যে অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতাদের প্রথম, বায়ু (অথবা ইন্দ্র) অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের এবং অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতাদের। এই বিন্যাসের সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার সম্পর্ক আছে, সেকথা পরে। নিঃসন্দেহে এই ক্রমকে লক্ষ্য করেই সূক্তগুলি রচিত এবং সংহিতার গোড়াতেই বিন্যস্ত হয়েছে।

সূক্ত তিনটির বিনিয়োগেরও বৈশিষ্ট্য আছে। অগ্নিষ্টোম একটি সোমযাগ, চলে পাঁচদিন ধরে। শেষের দিনেই হল আসল যাগ। সেদিনের নাম 'সুত্যাদিবস', কেননা এইদিনেই সোমলতা ছেঁচে তার রস আহুতি দেওয়া হয়। সকাল দুপুর এবং সন্ধ্যায় তিনবার আহুতির জন্য 'সবন' বা রস-নিংড়ান হয়। সেদিন ভোরবেলাতেই সূর্যোদয়ের আগে হোতা কতকগুলি প্রশস্তিমন্ত্র পাঠ করেন, এই অনুবাকের প্রথম অগ্নিসূক্তটি তাদের অন্তর্গত। এই প্রাতঃসবনে অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র[১৪] গাওয়া হয়ে গেলে হোতা একটি 'শস্ত্র' বা দেবতার প্রশস্তি পাঠ করেন, তার নাম 'প্রউগশস্ত্র'। শস্ত্রটি গঠিত হয়েছে ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূক্তটি নিয়ে। শস্ত্রের দেবতা যথাক্রমে বায়ু ইন্দ্র-বায়ু মিত্র-বরুণ অশ্বিদ্বয় ইন্দ্র বিশ্বদেব ও সরস্বতী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, এই শস্ত্রটি 'যজমানস্যাধ্যাত্মতমমিরোক্‌থম্'। যজ্ঞের ফলে যজমানের দেবজন্ম হয়, তাঁর দিব্যদেহ লাভ হয়। এর পূর্বে 'আজ্যশস্ত্র' পাঠ করে হোতা যজমানের যে নতুন শরীর উৎপন্ন করেছেন, এই শস্ত্রপাঠের দ্বারা তাকে তিনি সংস্কৃত করেন—যজমানের মুখ্যপ্রাণ প্রাণাপান চক্ষু শ্রোত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বাক্ যথাক্রমে প্রউগশস্ত্রের দেবতাদের আবেশে দিব্যগুণসম্পন্ন হয়।[১৫] সুতরাং এই-

---

দৈবোদাসির ১৩ (এঁর মন্ত্রও আর কোথাও নাই, শুধু সোমমণ্ডলে একটি সূক্ত এঁর ছেলের; তাঁর সব সূক্তই দীর্ঘচ্ছন্দের বলে ঋক্‌সংহিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে), বসিষ্ঠবংশীয়দের ৯, আর কশ্যপের মাত্র একটি। গোতমের পিতা রহূগণ একজন আঙ্গিরস (৯।৩৭, ৩৮)। সুতরাং গোতমের সূক্তগুলি ধরে অঙ্গিরোবংশের সূক্তসংখ্যা প্রথম মণ্ডলে দাঁড়ায় প্রায় অর্ধেক।

[১৩] শুধু সব্য আঙ্গিরস, কক্ষীবান্ দৈর্ঘতমস এবং অগস্ত্য-মৈত্রাবরুণের উপমণ্ডলগুলির গোড়ায় অগ্নিসূক্ত নাই।

[১৪] অগ্না আয়াহি বীতয়ে সা. স. ১(৬৬০)।

[১৫] দ্র. ঐ. ব্রা. ৩১-৩। শস্ত্রটিকে হোতা ইচ্ছা করলে অভিচাররূপেও ব্যবহার করতে পারেন।

দিক দিয়ে শস্ত্রটির গুরুত্ব খুবই বেশী। বলা যেতে পারে, যজ্ঞবিধির চরম তাৎপর্য এই শস্ত্রটিতেই নিহিত। তাই ঋক্‌সংহিতার গোড়াতেই এই শস্ত্রটিকে স্থাপন করার একটা বিশেষ অর্থ আছে।[১৬]

এমনি করে প্রথম মণ্ডলটি দিয়ে ঋক্‌সংহিতার উপক্রম হল। তারপর আটটি মণ্ডলে ত্রয়ীবিদ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রসঙ্কলনের পর দশম মণ্ডল দিয়ে সংহিতার উপসংহার।

দশম মণ্ডলটি আরম্ভ হয়েছে ত্রিত আপ্ত্যের একটি উপমণ্ডল দিয়ে[১৭]—দেবতা অগ্নি। অগ্নিসূক্ত দিয়ে আরম্ভ, এমনতর আরও কয়েকটি উপমণ্ডল হল ত্রিশিরাঃ ত্বাষ্ট্রের[১৮], হবির্ধান আঙ্গিরসের[১৯], বিমদ ইন্দ্রের[২০], বৎসপ্রি ভালন্দনের[২১] সুমিত্র বাধ্র্যশ্বের[২২]। কয়েকটি উপমণ্ডল ইন্দ্রসূক্ত দিয়ে আরম্ভ, যেমন বসুক্র ইন্দ্রের[২৩], কৃষ্ণ আঙ্গিরসের[২৪], ইন্দ্র বৈকুণ্ঠের[২৫], বৃহদুক্‌থ বামদেব্যের[২৬], গৌরীবীতি শাক্ত্যের[২৭]। লক্ষণীয়, উপমণ্ডলগুলির আয়তন ক্ষুদ্র এবং অষ্টম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়[২৮] ছাড়িয়ে তারা যায়নি। এরপর মণ্ডলসমাপ্তি পর্যন্ত একেকজন ঋষির একটিমাত্র করে সূক্তের সংগ্রহ[২৯]।

স্বভাবতই মণ্ডলটি তাহলে দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের ধারা কতকটা প্রথম মণ্ডলেরই মত[৩০] এবং দ্বিতীয় ভাগটি প্রকীর্ণ সূক্তের সঙ্কলন। বিখ্যাত কয়েকটি দার্শনিক সূক্ত পড়েছে এই শেষের ভাগে[৩১], তাছাড়া কিছু আথর্বণসূক্তও এই ভাগে

---

[১৬] প্রউগশস্ত্রের দেবতাবিন্যাসের সঙ্গে তু. ১।২৩ (অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতীর নাই), ২।৪১ (এখানে দেবতাবিন্যাস হুবহু এক)। অবশ্যই এই বিন্যাসের একটা সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য আছে। দ্র. 'সরস্বতী' ঋ. ৩।৪।৮। 'প্রউগ' সংজ্ঞাটি ঋক্‌সংহিতাতেই আছে (১০।১৩০।৩), সেখানে প্রউগ দেবযজ্ঞের উপাদান।

[১৭] অন্যান্য মণ্ডলে এঁর এই কয়টি সূক্ত আছে ঃ ১।১০৫; ৮।৪৭; ৯।৩৩-৩৪, ১০২।

[১৮] ৮-৯

[১৯] ১১-১৩

[২০] ২০-২৬

[২১] ৪৫-৪৬

[২২] ৬৯-৭০ শেষেরটি আপ্রীসূক্ত। তারপর সপ্তি বাজম্ভরের ৭৯-৮০।

[২৩] ২৭-২৯

[২৪] ৪২-৪৪

[২৫] ৪৮-৫০

[২৬] ৫৪-৫৬

[২৭] ৭৩-৭৪

[২৮] ১০।৮৫ সূক্ত পর্যন্ত।

[২৯] ৯১-৯৪ পর্যন্ত বিরূপবংশীয় চারজন ঋষির চারটি সূক্ত। এটিকে একটি উপমণ্ডল বলে গণ্য করা যেতে পারে। আরম্ভ ইন্দ্রসূক্ত দিয়ে।

[৩০] এর মধ্যে একটিমাত্র সূক্ত রচনা করেছেন এমন ঋষি হলেন অভিতপাঃ সৌর্য (৩৭), ইন্দ্র মুষ্কবান্ (৩৮), সপ্তগু আঙ্গিরস (৪৭), সিন্ধুক্ষিৎ প্রৈয়মেধ (৭৫), জরৎকর্ণ সর্প ঐরাবত (৭৬)। আর সবাই একাধিক সূক্তের রচয়িতা। অগ্নি বা ইন্দ্র ছাড়া অন্য দেবতা দিয়ে আরম্ভ এমন উপমণ্ডলের ঋষি হলেন কবষ ঐলূষ (৩০-৩৪), লুশ ধানাক (৩৫-৩৬), ঘোষা কাক্ষীবতী আর তাঁর ছেলে (৩৯-৪১), বন্ধু শ্রুতবন্ধু বিপ্রবন্ধু তিন ভাই (৫৭-৬০; এঁরা সবাই অগস্ত্যের ভাগনে); নাভানেদিষ্ঠ মানব (৬১-৬২), গয় প্লাত (৬৩-৬৪), বসুকর্ণ বাসুক্র (৬৫-৬৬), অয়াস্য আঙ্গিরস (৬৭-৬৮), বৃহস্পতি আঙ্গিরস (৭১-৭২), স্যূমরশ্মি ভার্গব (৭৭-৭৮), বিশ্বকর্মা ভৌবন (৮১-৮২), মন্যু তাপস (৮৩-৮৪)।

[৩১] যথা পুরুষসূক্ত (৯০), বিশ্বদেবসূক্ত (১১৪), হিরণ্যগর্ভসূক্ত (১২১), বেনসূক্ত (১২৩),

আছে।[৩২] প্রসিদ্ধ সংবাদসূক্তগুলিও এখানেই পাচ্ছি।[৩৩] একদিকে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব, আবার আরেকদিকে লৌকিক ভাবনার সমাবেশে এই দ্বিতীয় ভাগটির সঙ্গে অথর্বসংহিতার চেহারার বেশ মিল আছে।

মোটের উপর দশম মণ্ডলে আমরা পাচ্ছি, ঋক্‌সংহিতার মূল অংশে যেসব ঋষির সূক্ত ছাড় পড়েছে তাদের এবং তাছাড়াও কিছু প্রকীর্ণ সূক্তের সংগ্রহ। আবার তাতে আছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত ছাড়াও দার্শনিক এবং লৌকিক ভাবনা অবলম্বনে রচিত অনেকগুলি সূক্ত যার মধ্যে আর্যচিত্তের বিচিত্র সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৪] প্রকীর্ণ সূক্তগুলির কোনও-কোনও ঋষির নাম বা গোত্রনাম দেবতার সঙ্গে অভিন্ন।[৩৫] ঋষি হয়তো সেখানে অজ্ঞাতনামা, সাযুজ্যভাবনায় দেবতার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন বলে দেবতার নামে তাঁর নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এই নামকরণে সূচিত হচ্ছে বৈদিক সাধনার একটি মৌল বিভাব, উপনিষদের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যভাবনায় যার আমরা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।

দশম মণ্ডলে সূক্তসন্নিবেশের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম ভাগের গোড়ায় এবং এবং শেষে ছোট-ছোট সূক্ত দিয়ে মাঝখানটায় বড় সূক্তগুলি রাখা হয়েছে—এই হল মোটামুটি নিয়ম। আর্ষমণ্ডলগুলিতে কিন্তু এ-রীতি অনুসরণ করা হয়নি। দ্বিতীয় ভাগে আবার দেখা যায়, বড় সূক্তগুলি আগে বসিয়ে স্বল্পায়তন সূক্তগুলি ক্রমশ বসানো হয়েছে।

ছন্দের প্রয়োগেও দশম মণ্ডলে বৈশিষ্ট্য আছে। দেখা যাচ্ছে গায়ত্রীচ্ছন্দের ব্যবহার কমে আসছে, কিন্তু সে-তুলনায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের ব্যবহার বেড়েছে। পরবর্তী যুগে অনুষ্টুপ্ বা শ্লোকই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান ছন্দ হয়ে দাঁড়ায়।[৩৬] অথচ ঋক্‌-সংহিতার সর্বপ্রধান ছন্দ যে ত্রিষ্টুপ্, তার ব্যবহার আবার এই মণ্ডলেই সবচাইতে

বাক্‌সূক্ত (বা দেবীসূক্ত ১২৫), রাত্রিসূক্ত (১২৭), নাসদীয়সূক্ত (১২৯), যজ্ঞসূক্ত (১৩০), শ্রদ্ধাসূক্ত (১৫১), যমীসূক্ত (১৫৪), মায়াভেদসূক্ত (১৭৭), সার্পরাজ্ঞীসূক্ত (১৮৯), অঘমর্ষণসূক্ত (১৯০, এটি দ্বিজাতির নিত্যপাঠ্য, ঋষি বিশ্বামিত্রবংশীয়) এবং সর্বশেষে সংজ্ঞানসূক্ত (১৯১)। কিন্তু বৃহস্পতির দুটি প্রসিদ্ধ সূক্ত যাতে বাক্ এবং সৃষ্টির রহস্য বর্ণিত হয়েছে, তা পড়েছে প্রথম ভাগে (৭১, ৭২), দুটি বিশ্বকর্মাসূক্তও এই ভাগেই আছে (৮১-৮২)। যে মুনিসূক্তে (১৩৬) আর্যধারার পাশাপাশি আর্যসংস্কৃতির আরেকটি ধারার পরিচয় মেলে, তা সংগৃহীত হয়েছে দ্বিতীয় ভাগে (তু. অথর্বসংহিতার ব্রাত্যসূক্ত, পঞ্চদশ কাণ্ড)।

[৩২] ওষধিপ্রয়োগ (৯৭), সপত্নীবাধন (১৪৫), অলক্ষ্মীনাশন (১৫৫), যক্ষ্মনাশন (১৬৩), দুঃস্বপ্ননাশন (১৬৪), স্বস্ত্যয়ন (১৬৫), সপত্নুনাশন (১৬৬)। কিছু-কিছু আথর্বণমন্ত্র অন্যান্য মণ্ডলেও আছে : ১।১৯১; ২।৪১-৪২, ৩।৫৩।১৭-২৪, ৬।৭৫, ৭।৫৫।২-৮, ৭।১০৪...।

[৩৩] ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী-বৃষাকপি-সংবাদ (৮৬), উর্বশী-পুরূরবা-সংবাদ (৯৫), পণি-সরমা-সংবাদ (১০৮)। কিন্তু যম-যমীসংবাদটি পড়েছে প্রথম ভাগে (১০) যমগোত্রীয় ঋষিদের উপমণ্ডলের কাছাকাছি। অনেকে এই কথোপকথনগুলিকে পরবর্তী যুগের নাট্যসাহিত্যের বীজ বলে মনে করেন। তবে সংবাদসূক্ত অন্যত্রও মেলে।

[৩৪] অক্ষসূক্তে (৩৪) জুয়াড়ির আত্মবিলাপ এবং অরণ্যানীসূক্তে (১৪৬) অরণ্যরহস্যের বর্ণনা বাস্তবতাধর্মী কবিতার চমৎকার নিদর্শন।

[৩৫] যেমন যম বৈবস্বত (১৪), অভিতপা সৌর্য (৩৭), ইন্দ্র মুষ্কবান্ (৩৮), বিশ্বকর্মা ভৌবন (৮১-৮২), মন্যু তাপস (৮৩-৮৪), বাক্ আম্ভৃণী (১২৫), অনিল বাতায়ন (১৬৮), বিভ্রাট্ সৌর্য (১৭০)।

[৩৬] কিন্তু এও লক্ষণীয়, অগ্নিমণ্ডলে অনুষ্টুপের ব্যবহার অনুপাতে দশম মণ্ডলের চাইতেও বেশী।

বেশী। সুতরাং ছন্দের বিচারেও দশম মণ্ডলটি প্রাচীন এবং অর্বাচীন প্রভাবের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে বলা চলে।

অনেকক্ষেত্রে ভাষায় অর্বাচীনত্বের লক্ষণ এই মণ্ডলে সুস্পষ্ট। কিন্তু তাবলে এর সবটাই যে অর্বাচীন একথা বলা সঙ্গত হবে না। বিশেষত ভাবের বয়সের হিসাব ভাষার প্রমাণে সবসময় ধরা পড়ে না। দশম মণ্ডলের আবহে এমন-কিছু নাই যা অন্য মণ্ডলে পাওয়া যায় না। এর মাঝে আথর্বণ ভাবনার সমাবেশও নতুন কিছু ব্যাপার নয়; তা বৈদিক সংস্কৃতির দার্শনিক ও লৌকিক দিকের স্বাভাবিক স্বীকৃতি মাত্র। দশম মণ্ডলের দ্বিতীয় ভাগে আমরা যার আভাস পাই, অথর্বসংহিতায় পাই তারই বিস্তার।

দেখা যাচ্ছে, ঋক্‌সংহিতার সম্পাদনার মূলে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা কাজ করেছে। প্রথম মণ্ডল হতে দশম মণ্ডলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ভাবের একটা সংহতি আছে। দশম মণ্ডলের দ্বিতীয় ভাগই হল সংহিতার প্রকৃত উপসংহার এবং সংযোজন। প্রথম ভাগের পরে প্রথম মণ্ডলের সঙ্গে সূক্তসংখ্যার সাম্য রেখে সংহিতার সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে যেন ইচ্ছা করেই।

অথচ যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে এই উপসংহারটিও সপ্রয়োজন। সোমযাগের তিনটি ঋত্বিক্‌-গণের কথা আগে বলেছি, যাঁরা ত্রয়ীবিদ্যার প্রয়োগে নিপুণ। কিন্তু চতুর্থগণের নেতা যে-ব্রহ্মা, যজ্ঞে তাঁর দায়িত্বই সবচাইতে বেশী। চারজন প্রধান ঋত্বিকের কি কাজ তার উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে।[৩৭] তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা 'বদতি জাতবিদ্যাম্‌'—তিনি সমগ্র বেদবিদ্যার ধারক এবং প্রকাশক[৩৮], তাঁর নির্দেশে এবং তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের কোথাও অঙ্গহানি ঘটলে আত্মশক্তিতে তিনি তা পূরণ করেন। সুতরাং ব্রহ্মার যেমন জ্ঞান, তেমনি শক্তিও থাকা চাই।[৩৯] এই জ্ঞান ও শক্তি ছিল অঙ্গিরাঃ এবং অথর্বার, যাঁরা অগ্নিবিদ্যা ও যজ্ঞবিধির প্রবর্তক এবং অথর্ববেদের প্রকাশক। তাই ব্রহ্মাকে কখনও-কখনও বলা হয় অথর্ববেদবিৎ। আগেই দেখেছি, ঋক্‌সংহিতায় তিনটি ঋত্বিক্‌-গণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রেরই সংগ্রহ আছে। দশম মণ্ডলের দ্বিতীয় ভাগে যে আথর্বণমন্ত্রের সঙ্কলন, তা হল বিশেষ করে ব্রহ্মার 'জাতবিদ্যা' বা সর্ববিদ্যার সূচক। এইখানেই সংহিতার উপসংহারের সার্থকতা। হোতৃগণের বেদ হয়েও তা চারটি ঋত্বিক্‌-গণেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ঋক্‌সংহিতার সঙ্কলন করা হয়েছে সমগ্র যজ্ঞবিধির একটা আদর্শকে সামনে রেখে।

---

[৩৭] ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌ (হোতা), গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু (উদ্‌গাতা), 'ব্রহ্মা' ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং, য়জ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ (অধ্বর্য়ুঃ) ১০।৭১।১১।

[৩৮] আপস্তম্ব বলেন, ব্রহ্মা হবেন 'ব্রহ্মিষ্ঠ' বা ব্রহ্মবিত্তম (শ্রৌ. সূ. ৩।১৮।১), যজমান ব্রহ্মাকে বরণ করলে পর তিনি জপ করেন : 'অহং ভূপতিঃ, অহং ভুবনপতিঃ, অহং মহতো ভূতস্য পতিঃ... বৃহস্পতির্দেবানাং ব্রহ্মা, অহং মনুষ্যাণাম্‌' (তৈ. ব্রা. ৩।৭।৬)। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আছে : য়দ্‌ ঋচৈব হোত্রং ক্রিয়তে, য়জুষাধ্বর্য়বং সাম্নোদ্‌গীথং, ব্যারব্ধা ত্রয়ীবিদ্যা ভবতি, অথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়তে ইতি ত্রয়্যা বিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ......মনসৈব ব্রহ্মা সংস্করোতি (৫।৩৩)।

[৩৯] তু. ঋ. ব্রহ্মা চকার বর্ধনম্‌ ১।৮০।১; অপামর্থং য়তীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ ১৫৮।৬; ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ১৬৪।৩৫; ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবাহসম্‌ (ইন্দ্রের উপমা) ৬।৪৫।৭। কোথাও-কোথাও অগ্নি এবং ব্রহ্মার সাম্য দেখানো হয়েছে (২।১।২, ৪।৯।৪, ৭।৭।৫; বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে ঘরে আগুন লাগাকে বলে 'ব্রহ্মার কোপ')। সুতরাং অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মাও যজ্ঞের মুখ্য সাধন।

ঋক্‌সংহিতায় যে সব ঋক্‌ই সঙ্কলিত হয়েছে তা নয়। শাকলসংহিতার মন্ত্রগুলির একটা 'পদপাঠ' আছে, তাতে প্রত্যেকটি মন্ত্রের পদবিশ্লেষণ করা হয়েছে। শাকল্য তার প্রণেতা। সংহিতার ছয়টি মন্ত্রের পদপাঠ তিনি দেননি।[৪০] অনুমান করা যেতে পারে, এগুলিকে তিনি সংহিতার মাঝে সংযোজন বলে গণ্য করেছেন।[৪১] আগেই বলেছি, ঋক্‌ই হল সামের যোনি। সুতরাং সামসংহিতার সব মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতায় থাকা উচিত। কিন্তু সামসংহিতার ৯৯টি মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় মেলে না। শাকলশাখায় বালখিল্যসংহিতা একটি সংযোজন বলে গণ্য করা হয়, অথচ শাংখায়নশাখায় তা সংহিতার অন্তর্ভুক্ত, বাষ্কলশাখায়ও তার প্রায় সবটাই ধরা আছে। ব্রাহ্মণগুলিতে এমন মন্ত্রের উল্লেখ আছে, যা সংহিতাতে নাই। সুতরাং শাকলসংহিতায় মন্ত্রসঙ্কলন আংশিক, তার বাইরেও অনেক ঋক্ ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

এইধরনের অতিরিক্ত ঋকের একটি সংগ্রহ 'খিলসূক্তানি' নামে সাধারণত ঋক্‌-সংহিতার পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হয়ে থাকে। খিলসূক্ত বলতে বোঝায় শাকল-সংহিতার বাইরে সেইসব সূক্ত যা অনুক্রমণিকায় স্থান পায়নি, অথচ সম্প্রদায়ক্রমে সংহিতার বিশেষ-বিশেষ অংশে যাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।

প্রথমে মনে করা হয়েছিল, খিলসূক্তগুলি অর্বাচীন যুগের রচনা। কিন্তু গবেষণার ফলে এখন দেখা গেছে, অনেক খিলসূক্তই অতিপ্রাচীন, শুধু শাখাবহির্ভূত বলে তারা 'খিল' বা পরিশিষ্টরূপে গণ্য হয়েছে। খিলসংহিতার অন্তর্গত পুরোরুচ্ এবং প্রৈষ-মন্ত্রগুলি নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম যুগের মন্ত্র, নিবিদ্‌গুলি তো বটেই।[৪২] মহানাম্নী বালখিল্য এবং কুন্তাপসূক্তগুলিও অতিপ্রাচীন। অধিকাংশ খিলসূক্তই তথাকথিত সংহিতার যুগের, ব্রাহ্মণযুগের সূক্ত কম। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে অনেক খিলমন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু সর্বত্রই তারা 'ঋক্' বা নিগম বলেই পরিগণিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে 'খিল' বিশেষণটি কোথাও জুড়ে দেওয়া হয়নি। বস্তুত এই বিশেষণটিই অর্বাচীন।[৪৩]

তাহলে দেখা গেল, ঋষিরা ভাবের আবেশে দেবতার যে-প্রশস্তি রচনা করেছেন[৪৪] যজ্ঞের আদর্শকে সামনে রেখে, ঋক্‌সংহিতায় তারই সঙ্কলন করা হয়েছে। সব

---

[৪০] ৭।৫৯।১২, ১০।২০।১, ১২১।১০, ১৯০।১-৩।

[৪১] প্রথম ঋক্‌টি সূক্তের উপসংহারে খাপছাড়াভাবে বসানো; দ্বিতীয়টি একটি একপদী ঋক্, যেন সূক্তের ভূমিকার মত; তৃতীয়টি সূক্তের উপসংহার, অনেকটা বিবৃতির মত; শেষ তিনটী নিয়ে অঘমর্ষণসূক্ত, যাতে আছে সৃষ্টিক্রমের বর্ণনা।

[৪২] নিবিদের উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে: তান্ পূর্বয়া 'নিবিদা' হূমহে বয়ম্ ১।৮৯।৩; স পূর্বয়া ° কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্মনূনাম্ ৯৬।২; তামনু ত্বা নিবিদং জোহবীমি ১৭৫।৫; ১৭৬।৬; সত্তো হোতা নিবিদঃ পূর্ব্যা অনু ২।৩৬।৬; কিমু স্বিদস্মৈ নিবিদো ভনন্ত ৪।১৮।৭; শংসন্তি কে চিন্নিবিদো মনানাঃ ৬।৬৭।১০। তখনই নিবিৎ 'পূর্ব্যা' বা প্রাচীন, এইটি লক্ষণীয়। খিলসংহিতায় যে নিবিৎ-মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়, তাতে অর্বাচীনত্বের কোনও লক্ষণই নাই। নিবিদের মাঝে আছে দেবতত্ত্বের সংহত রূপ। সূক্তে তার বিস্তার।

[৪৩] দ্র. খিলসংহিতা, Preface 905-906 তিলকবিদ্যাপীঠ সং. খণ্ড ৪। Buhler-এর আবিষ্কৃত ঋক্‌সংহিতার কাশ্মীর পাণ্ডুলিপি হতে Scheftelowitz খিলসংহিতার একটি প্রামাণিক ও সটিপ্পণ সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন। তিলকবিদ্যাপীঠ-প্রকাশিত খিলসংহিতা তারই আধারে সঙ্কলিত।

[৪৪] ঋগ্‌বেদের ভাষায় 'ধীরা মনসা বাচমক্রত' (১০।৭১।২), অর্থাৎ সূক্তবাকের মূলে রয়েছে 'ধী' বা ধ্যানচিত্তের প্রেরণা এবং প্রবুদ্ধ মন হচ্ছে তার সাধন। এই বাকের আবির্ভাব হয় 'হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু' (১০।৭১।৮), অর্থাৎ মন যখন আগুনের শিখার মত (স্মরণীয়, মুণ্ড-

প্রশস্তিই একসময়ে রচিত হয়নি[৪৫] কিংবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডই যে রচনার উপলক্ষ্য তা নয়। বহু সূক্তে দেবতার উদ্দেশে শুধু প্রকাশ পেয়েছে কবিহৃদয়ের একটা উদ্দীপনা। বহু সূক্তের শুধু প্রাতরনুবাকে বিনিয়োগ থেকে বোঝা যায়, তাদের উদ্দেশ্য যজ্ঞের ভূমিকারূপে একটা চিন্ময় আবহ সৃষ্টি করা। জপে বিনিয়োগের সাধারণ বিধিরও তা-ই উদ্দেশ্য। ঋক্‌কে সামে পরিণত করার মাঝেও দেখি সেই কবিহৃদয়েরই প্রেরণা। মোট কথা, কর্মকে লক্ষ্য করে যে-মন্ত্র রচিত হয়েছে, তা হল যজুঃ। ঋক্‌ বা সামের বেলায় কর্ম উপলক্ষ্য মাত্র। এই তফাতটুকুর সম্বন্ধে গোড়া থেকেই সচেতন হওয়া উচিত, নইলে ঋষিহৃদয়ের মূল প্রবর্তনাকে ভুল বুঝে বৈদিক ভাবনার ইতিহাসকে আমরা বিকৃত করতে পারি। ঋকের রচনা হয়েছে কবিহৃদয়ের অবন্ধন প্রেরণায়, কিন্তু তার সংকলন হয়েছে যাজ্ঞিকদের প্রয়োজনে। তাই সব ঋক্‌ একটি শাখায় সংকলিত হয়নি, কিংবা সম্প্রদায়ভেদে তাদের শাখাভেদও ঘটেছে—এ আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু একবার সংকলিত হওয়ার পর তাকে অবিকল রাখবার দায় নিলেন যাজ্ঞিকেরা। এই দায় তাঁরা কীরকম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন তার পরিচয় পাই, যখন দেখি, হাজার-হাজার বছর ধরে ঋক্‌সংহিতার কাঠামের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি কিংবা তার পাঠের বিশেষ নড়চড় হয়নি। অথচ এই প্রায়-অসম্ভব কাজটি সম্ভব হয়েছে শুধু স্মৃতির সহায়ে। সমগ্র বেদসংহিতাই আবহমান কাল আচার্য হতে শিষ্যের পরম্পরায় মুখে-মুখে চলে এসেছে, তারা লিপিবদ্ধ হয়েছে বলতে গেলে সেদিন।[৪৬]

সংহিতার কাঠামটি অবিকৃত রাখবার জন্য নানারকম **পাঠের** প্রবর্তন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে মূল হল **সংহিতাপাঠ**। দুটি বর্ণের খুব কাছাকাছি আসাকে বলে ‘সংহিতা’। সংহিতার ফলে বর্ণের এবং স্বরের (accent) বিকার হয়, ব্যাকরণে সন্ধির নিয়মে সেগুলি ধরা আছে। ঋকের পদগুলিকে এমনি করে সন্ধির নিয়মে জুড়ে পড়ার নাম হল ‘সংহিতাপাঠ’। সন্ধি ভেঙে পদগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে পড়লে তার নাম **পদপাঠ**। শাকলসংহিতার পদপাঠ রচনা করেছিলেন শাকল্য, একথা আগেই বলেছি।[৪৭] পদগুলি ভেঙে দেওয়াতে পদপাঠ মন্ত্রের অর্থ বুঝতে খুব সাহায্য করে। সংহিতাপাঠ আর পদপাঠ দুটি মিলিয়ে হল **ক্রমপাঠ**। তাতে মন্ত্রের পাঠগুলিকে জোড়ায়-জোড়ায় অথচ জুড়ে-জুড়ে পড়তে হয়, ফলে প্রথমটি ছাড়া প্রত্যেকটি পদই দুবার করে পড়া হয়—একটি সংহিতাপাঠ অনুযায়ী, আরেকটি পদপাঠ অনুযায়ী।[৪৮] ক্রমপাঠ থেকে

কোপনিষদে অগ্নির তৃতীয় শিখার নাম ‘মনোজবা’ [১।২।৪] অর্থাৎ চেতনার অন্ধতা এবং বিক্ষোভ কাটিয়ে উঠে উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দীপ্ত প্রকাশ) দ্যুলোকের দিকে ছুটে চলে এবং সেইসঙ্গে তার আবেগ হৃদয়ের মাধ্যমে পায় শিল্পরূপ, তখন।

[৪৫] নতুনতর প্রশস্তি রচনা করার কথা ঋষিরা অনেক জায়গাতেই উল্লেখ করেছেন।

[৪৬] অল্‌-বিরুনী একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এসে একটি সংহিতাকে কাশ্মীরে সেই প্রথম লিপিবদ্ধ হতে দেখেন। এই সেদিনও এক বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন ঋক্‌সংহিতার শুধু অনুলোম-বিলোমক্রমে যে-কোনও স্থান হতে আবৃত্তি করেই নয়, যে-কোনও পদ কোথায়-কোথায় আছে স্থানসূচীসহ তার উল্লেখ পর্যন্ত করে।

[৪৭] শাকল্য ‘নিরুক্ত’-প্রণেতা যাস্ক এবং ‘ঋক্‌প্রাতিশাখ্য’-প্রণেতা শৌনক হতে প্রাচীন। পদপাঠের উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যকে পাওয়া যায়; সেখানে সংহিতাপাঠকে বলা হয়েছে ‘নির্ভুজ’ এবং পদপাঠকে ‘প্রতৃণ্ণ’ (৩।১।৩)। শাকল্যের উল্লেখও ঐখানেই পাই (৩।১।২, ৩।২।৬); তাঁর পুরা নাম ‘স্থবিরঃ শাকল্যঃ’।

[৪৮] এই পাঠটিও প্রাচীন, ঐতরেয় আরণ্যকের উপরিউক্ত অধ্যায়ে তার উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন.

আরও আটটি পাঠের সৃষ্টি হয়েছে—জটা মালা শিখা রেখা ধ্বজ দণ্ড রথ এবং ঘন। প্রত্যেকটিতে নানা জটিল রীতিতে পদের বিন্যাস করা হয়েছে এবং সে-জটিলতা চরমে উঠেছে ঘনপাঠে।[৪৯] এমনি করে পাঠের বিচিত্র ব্যবহার দ্বারা অতিপ্রাচীন কাল হতেই মন্ত্রগুলিকে যথাযথ ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল।[৪৯]

২

এই গেল ঋক্সংহিতার কাঠামের মোটামুটি পরিচয়। তারপর ধরা যাক সাম-সংহিতা, কেননা ঋক্সংহিতার সঙ্গে তার যোগ সবচাইতে ঘনিষ্ঠ।

সামসংহিতার মাত্র তিনটি শাখা আজকাল পাওরা যায়, একথা আগেই বলেছি। তার মধ্যে রাণায়ণীয় এবং কৌথুম শাখার[৫০] মধ্যে মন্ত্রভেদ নাই, শুধু মন্ত্রগণনার পদ্ধতিতে ভেদ আছে। রাণায়ণীয়েরা মন্ত্রগণনা করেন প্রপাঠক অর্ধপ্রপাঠক দশতি অনুসারে, আর কৌথুমেরা অধ্যায় এবং খণ্ড অনুসারে। দুটি শাখায় কিছু স্বরভেদ এবং পাঠভেদও আছে। জৈমিনীয় (বা তলবকার) সংহিতায় মন্ত্রের সংখ্যা কিছু কম, কিন্তু গানের সংখ্যা বেশী, মন্ত্রবিন্যাসের ধারাও আলাদা।

কৌথুমসংহিতাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—**আর্চিক** এবং **গান**। আগেই বলেছি, ঋক্-মন্ত্রে সুর বসিয়ে গান করা হত, সেই সুরকে বলা হত **সাম**। ঋকের পারিভাষিক সংজ্ঞা তখন হত 'সামযোনি' বা 'যোনি'। আর্চিক সামযোনি ঋক্-মন্ত্রের সংগ্রহ, আর গান হল তার স্বরলিপি।

আর্চিকের প্রায় সব মন্ত্রই শাকলসংহিতা থেকে নেওরা। পুনরুক্তি বাদ দিলে কৌথুমসংহিতার মোট ১৬০৩টি মন্ত্রের মধ্যে ৯৯টি মন্ত্র শাকলসংহিতায় পাওরা যায় না।[৫১] তারা সম্ভবত অন্য শাখা হতে সংগৃহীত। দুটি সংহিতার মন্ত্রে কিছু পাঠভেদও আছে, কিন্তু তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঋক্সংহিতার সব মণ্ডল হতেই সামসংহিতার মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে অষ্টম এবং নবম মণ্ডলের মন্ত্রই বেশী, একথা আগেও বলেছি। ছন্দের মধ্যে আবার গায়ত্রীর প্রয়োগ সবচাইতে বেশী।

সংহিতার আর্চিক অংশটির দুটি ভাগ—**পূর্বার্চিক** আর **উত্তরার্চিক**। পূর্বার্চিকে স্বতন্ত্রভাবে একটি-একটি করে মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। তার এককেটি মন্ত্রে এককেটি সাম উৎপন্ন হয়। এই মন্ত্রগুলিই সামের যোনি। বিশেষ করে যোনিমন্ত্রের সংগ্রহ বলে আর্চিকের আরেক নাম 'যোনিগ্রন্থ' বা 'ছন্দোগ্রন্থ'। কিন্তু যজ্ঞে সাধারণত তিনটি ঋকে

বলেন, 'ক্রমঃ স্মৃতিপ্রয়োজনঃ'—ক্রমপাঠের দরকার হয় মন্ত্রটিকে অবিকলভাবে মনে রাখবার জন্য (প্রা. সূ. ৪।১৮)।

[৪৯] ছাপার বইএ সংহিতাপাঠ এবং পদপাঠই দেওয়া হয়। কিন্তু ঘনপাঠী ব্রাহ্মণ এখনও বিরল নন।

[৫০] কেউ-কেউ মনে করেন, শাখার নাম কৌথুমী নয় কৌসুমী, কেননা সামপ্রাতিশাখ্যের নাম 'পুষ্পসূত্রম্' 'কুসুমসূত্রম্' বা 'কৌসুমসূত্রম্'।

[৫১] ঔন্ধসংস্করণ অনুযায়ী।

বা একটি তৃচে একটি সাম গাওয়া হয়। যোনি ছাড়া বাকী দুটি ঋকের নাম হল 'উত্তরা'। উত্তরাসুদ্ধ পুরো তৃচটি আমরা পাই 'উত্তরার্চিকে'।

পূর্বার্চিকে মন্ত্রগুলি দেবতা ও ছন্দ অনুসারে সাজানো। আর্চিকটি চারটি কাণ্ডে বিভক্ত—আগ্নেয় ঐন্দ্রেয় পাবমান এবং অরণ্য। প্রথম তিনটিতে ঋগ্‌বেদের প্রধান তিন দেবতা অগ্নি ইন্দ্র এবং পবমান সোমের মন্ত্রসংগ্রহ, আর অরণ্যকাণ্ডে নানা দেবতার মন্ত্র। এই কাণ্ডটি আবার অর্ক দ্বন্দ্ব ব্রত এই তিনটি পর্বে বিভক্ত। সবশেষে মহানাম্নী আর্চিক নামে ছোট একটি পরিশিষ্ট আছে। প্রথম তিনটি কাণ্ডে গায়ত্রী বৃহতী ত্রিষ্টুপ্‌ অনুষ্টুপ্‌ জগতী উষ্ণিক্‌, তারপর অন্যান্য ছন্দ—সাধারণত এই ক্রম অনুসারে মন্ত্রগুলি সাজানো।

উত্তরার্চিকে মন্ত্রগুলি সাজানো হয়েছে যাগবিধি অনুসারে। পূর্বার্চিকের মন্ত্রগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, কিন্তু উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলি রয়েছে সূক্তের আকারে। মোটের উপরে ১২২৫টি মন্ত্রে ৪০০টি সূক্ত আছে—তার মধ্যে তিনটি মন্ত্রে রচিত সূক্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশী।[৫২] উত্তরার্চিকের সূক্তগুলির প্রথম মন্ত্রটি প্রায়ই পূর্বার্চিকে দেওয়া আছে, সুতরাং পূর্বার্চিকটিকে গানের কথার সূচী বলে ধরা যেতে পারে। পূর্বার্চিকের মন্ত্রটি যে-সামে গাইতে হবে, বুঝতে হবে উত্তরার্চিকের সমস্ত সূক্তটিতে সেই সাম বসবে।[৫৩]

বৈদিকেরা বলেন, ঋকের মত সাম বা সুরও ঋষিদের দ্বারা 'দৃষ্ট'। প্রায়ই ঋক্‌টি যদি একজন ঋষির তো তাতে সাম বসিয়েছেন আরেকজন ঋষি। এককেটি ঋকে একাধিক সুর দেওয়া হয়েছে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে।[৫৪] সুরগুলির নাম প্রায়ই রচয়িতা ঋষির নামে, যদিও এখনকার মত সুরের আলাদা নামও অনেক আছে।[৫৫]

পূর্বেই বলেছি, সুরগুলির স্বরলিপি সংহিতার যে-অংশে সঙ্কলিত হয়েছে তাকে বলে 'গান'। চারটি গানসংহিতা আছে—গ্রামগেয় অরণ্যগেয় উহ এবং উহ্য (অথবা রহস্য)। পূর্বার্চিকের প্রথম তিনটি কাণ্ডের স্বরলিপি আছে গ্রামগেয় গানে।[৫৬] পূর্বার্চিকের অরণ্যকাণ্ড ও পরিশিষ্টের স্বরলিপি আছে অরণ্যগেয় গানে।[৫৭]

---

[৫২] তিনটি ঋকের একটি গুচ্ছকে বলে 'তৃচ'। সামগানের সময় 'স্তোম' রচনার এইটি ভিত্তি। একটি মন্ত্র দিয়ে একটি সূক্ত রচিত হয়েছে, উত্তরার্চিকে এমন সূক্তের সংখ্যা ১৩; দুটি মন্ত্রের সূক্ত বা 'প্রগাথ' আছে ৬৬টি। সবচাইতে বড় সূক্ত আছে দুটি—বারোটি মন্ত্রের।

[৫৩] এইজন্যে সামসংহিতার মন্ত্রগুলিতে অনেক পুনরুক্তি আছে। মোট ১৮৫৭টি মন্ত্রের মধ্যে পুনরুক্তের সংখ্যা ২৭২। উত্তরার্চিকে এমন সূক্ত আছে যার সূচী পূর্বার্চিকে নাই। আবার পূর্বার্চিকে এমন মন্ত্র আছে, যার অনুযায়ী সূক্ত উত্তরার্চিকে নাই। উত্তরার্চিকের এই সূক্তগুলি প্রায়ই গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত; সুতরাং বুঝতে হবে, এগুলিতে 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্‌'এর সুর বসবে। আবার উত্তরার্চিকের যাগবিধির বাইরে কোনও সাম যদি গাইতে হয়, স্বভাবতই পূর্বার্চিকে তার উল্লেখ থাকবে, কিন্তু উত্তরার্চিকে তার অনুযায়ী কোনও সূক্ত থাকবে না।

[৫৪] একটি ঋকে ২৫টি কিংবা তারও বেশী সুর বসানো হয়েছে এমন ঋকের সংখ্যা ১৭। 'পুনানঃ সোম ধারয়া' (৯।১০৭।৪) এই ঋকটিকে সুর বসানো হয়েছে ৬১টি! এমনি করে গানগ্রন্থে সবসুদ্ধ ২৬৩৭টি সুরের স্বরলিপি পাওয়া যায়। 'সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ' এই কথায় এই সুর-বৈচিত্র্যেরই ইঙ্গিত।

[৫৫] যেমন সামসংহিতার প্রথম মন্ত্রটি বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের রচনা, তাতে গোতম দুটি সুর বসিয়েছেন, কশ্যপ বসিয়েছেন একটি। গোতমের সুরের নাম 'পর্ক', কশ্যপের সুরের নাম 'বার্হিষ্য'। দ্বিতীয় মন্ত্রটিও ভরদ্বাজের, তাতে সুর বসিয়েছেন সুপর্ণ, তাই সুরের নাম 'সৌপর্ণ'।

[৫৬] অপর নাম 'বেয়গান' বা 'প্রকৃতিগান'।

[৫৭] এটিও প্রকৃতিগানেরই অন্তর্গত। এতে অর্ক দ্বন্দ্ব ব্রত শুক্রিয় ও মহানাম্নী এই পাঁচটি পর্ব

উত্তরার্চিকের স্বরলিপি আছে 'ঊহগানে'। উত্তরার্চিকের সামযোনি সূক্তগুলি যজ্ঞবিধি অনুসারে সাতটি পর্বে সাজানো—দশরাত্র সংবৎসর একাহ অহীন সত্র প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষুদ্র। বলা বাহুল্য, ঊহগান বা স্বরলিপিতেও এই ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।[৫৮]

'উহ্য'গানের আরেক নাম ঊহরহস্য গান। রহস্য বোঝায় আরণ্যককে। উহ্যগানেও স্বরলিপিবিন্যাস ঊহগানেরই মত যজ্ঞবিধি অনুসারে করা হয়েছে, কিন্তু তার ভিত্তি হল আরণ্যকসংহিতা এবং অরণ্যগেয়গান। যজ্ঞে যেসব রহস্যগান গাইতে হবে, এটি তারই স্বরলিপি।

একটি ঋকে একটি সাম বা সুর। কিন্তু সামটি গাইতে হয় একটি তৃচে বা তিনটি ঋকে। তৃচটিকে ফিরে ফিরে গাইলে হয় একটি **স্তোত্র**। যতবার গাইতে হবে, তার সংখ্যার নাম **'স্তোম'**। নয়রকম স্তোম আছে—ত্রিবৃৎ পঞ্চদশ সপ্তদশ একবিংশ চতুর্বিংশ ত্রিণব ত্রয়স্ত্রিংশ চতুশ্চত্বারিংশ অষ্টচত্বারিংশ। ত্রিবৃতে ফিরে-ফিরে গাওয়ার দরুন তিনটি ঋক্ বা গানের কলি হয়ে যায় নয়টি, ত্রিণবে সাতাশটি। আরগুলিতে কলির সংখ্যা নাম হতেই বোঝা যায়।[৫৯] স্তোত্রগুলিতে দেবতার প্রশস্তিই সুরে গাওয়া হয়। আগে স্তোত্র গেয়ে তারপর দেবতার প্রশস্তি পাঠ করা হল বিধি। অর্থাৎ দেবতার প্রশস্তিবাচক ছোট্ট একটি সূক্তকে সুরে লহরিত করে একটা আবহ রচনা করা আগে, তারপর দীর্ঘ সূক্তে দেবতার গুণবর্ণন করা।

সামের পাঁচটি ভাগ আছে, তাদের বলে 'ভক্তি'। প্রথম ভাগের নাম 'প্রস্তাব', সেটি গা'ন প্রস্তোতা; দ্বিতীয় ভাগ 'উদ্‌গীথ', গা'ন উদ্‌গাতা; তৃতীয় ভাগ 'প্রতিহার', গা'ন প্রতিহর্তা; চতুর্থ ভাগ 'উপদ্রব', গা'ন আবার উদ্‌গাতা; তারপর সবাই

আছে। যে-গান গ্রামগেয়, তা সর্বসমক্ষে গাওয়া যায়। যা অরণ্যগেয়, তা নির্জনে গাইতে হয়। সুতরাং এই শেষেরটির একটি অলৌকিক সামর্থ্য আছে। উপনিষদে আছে, যাঁরা গ্রামবাসী, তাঁরা ইষ্টাপূর্ত এবং দানের উপাসনা করে পিতৃযানপথে গিয়ে আবার সংসারে ফিরে আসেন। যাঁরা অরণ্যবাসী, তাঁরা শ্রদ্ধা তপঃ এবং সত্যের উপাসনা করে দেবযানপথে যান, আর সংসারে ফিরে আসেন না। অরণ্যবাসীরা তৃতীয় ব্রহ্মলোকে অপরাজিতা পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হন, 'অর' এবং 'ণ্য' নামে দুটি অর্ণবে অবগাহন করেন (ছা. উ. ৫।১০।১০; ৮।৫।৩-৪; বৃ. উ. ৬।২।১৫-১৬)। এই থেকেই গ্রাম আর অরণ্যের তফাত এবং অরণ্যের মহিমা বোঝা যাবে। গ্রামীণ জীবন প্রাকৃত, আরণ্যক জীবন অপ্রাকৃত। অরণ্যগেয় সামেরও মহিমা এইজন্যই। অরণ্যকাণ্ডের ৬৫টি মন্ত্রের মধ্যে ১২টি উত্তরার্চিকে পাওয়া যায়। আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়। অরণ্যকাণ্ডে যোনিমন্ত্র ৬৫টি, কিন্তু আরণ্যকগানে তার সংখ্যা উদ্বয়াম এবং ভারুণ্ডু সামের যোনিমন্ত্র ধরে দাঁড়ায় ১৯১। স্মরণীয়, এটি ঋক্‌সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডলেরও সূক্তসংখ্যা।

[৫৮] ঊহ শব্দের অর্থ তর্ক বা অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা। সাধারণত সামগান হল 'তৃচগান' অর্থাৎ একটি সুর তিনটি ঋকে বসিয়ে গাওয়া। কিন্তু যোনিগ্রন্থে শুধু যোনিমন্ত্রটিই আছে, উত্তরামন্ত্র দুটি নাই। তাই কোন্-কোন্ ঋক্ কি করে বসিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তৃচ করতে হবে এবং তাতে কি সুর বসবে, এ-সমস্তই পূর্বাচার্যেরা ঊহের দ্বারা নিরূপণ করে স্বরলিপি বেঁধে দিয়ে গেছেন। এই হল ঊহগ্রন্থের স্বরূপ। মীমাংসকেরা ঊহগ্রন্থকে এই জন্য পৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্যরচিত বলে থাকেন (মী. সূ. ৯।২।২)।

[৫৯] ধরা যাক, মাধ্যন্দিন পবমান নামে একটি স্তোত্র। স্তোত্রটি পঞ্চদশস্তোম অর্থাৎ তিনটি ঋককেই তিন পর্যায়ে পনেরটি কলি করে গাইতে হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রথম ঋক্‌টি তিনবার আর বাকী দুটি একবার করে মোট পাঁচটি কলি গাওয়া হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় ঋক্‌টি তিনবার এবং আর দুটি একবার করে গাওয়া হল। আবার তৃতীয় পর্যায়ে তৃতীয় ঋক্‌টি তিনবার এবং আর দুটি একবার করে গাওয়া হল। প্রত্যেকটি ঋক্ তাহলে পাঁচবার করে গাওয়াতে গানের কলি মোটের উপর দাঁড়াল পনেরতে। স্তোত্রটি হল পঞ্চদশস্তোম বা পনেরটি কলির একটি স্তবক। সুর একই থাকল।

মিলে গা'ন শেষভাগ 'নিধন'। গানের আরম্ভে সব ঋত্বিকরা মিলে ওঙ্কার উচ্চারণ করেন এবং হুঙ্কারধ্বনি করেন—যাকে বলে 'হিঙ্কার'। ওঙ্কার আর হিঙ্কার নিয়ে সাম সপ্তভক্তি।[৬০]

গানের সময় স্বভাবতই ঋক্‌টি অবিকল থাকে না, সুরের টানে তাতে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে বলে 'সামবিকার'। সামবিকার ছয়টি—বিকার বিশ্লেষণ বিকর্ষণ অভ্যাস বিরাম এবং স্তোভ।[৬১] এদের মধ্যে 'স্তোভ' হল ঋকের বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ—যেমন হাউ, হাই, ঔহোৱা ইত্যাদি। কখনও-কখনও একটি পদ কিংবা একটি বাক্যও স্তোভরূপে ব্যবহৃত হয়।[৬২]

বেদে তিনটি স্বর আছে—উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত। সামসংহিতার আর্চিক গ্রন্থপাঠের সময় এই তিনটি স্বরই লাগানো হয়। কিন্তু গানের সময় লাগে ক্রুষ্ট প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মন্দ্র এবং অতিস্বার্য এই সাতটি স্বর। শিক্ষাকার নারদের মতে এই স্বরগুলি যথাক্রমে লৌকিক পঞ্চম মধ্যম গান্ধার ঋষভ ষড়্‌জ ধৈবত ও নিষাদ স্বরের সমান।

৩

এই গেল সামসংহিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তারপর যজুঃসংহিতা, যা ত্রয়ীবিদ্যার অন্যতম আধার।

যজুর্বেদকে কখনও-কখনও বলা হয় কর্মবেদ বা অধ্বর্যুবেদ। যজ্ঞই কর্ম। দেবতার উদ্দেশ্যে যে-দ্রব্যত্যাগ, তা-ই যজ্ঞ। যিনি ত্যাগ করেন, তিনি যজমান। ত্যাগের অনুষ্ঠানটি জটিল। যাঁরা যজমানের হয়ে এই জটিল অনুষ্ঠানটি নিষ্পন্ন করেন, তাঁরা 'ঋত্বিক্'। দেবতার আবাহন ও প্রশস্তি পাঠ, তাঁর স্তুতিগান এবং তাঁর উদ্দেশে হোমদ্রব্য আহুতি দান—এই তিনটি হল যজ্ঞের মুখ্য সাধন। ঋত্বিকদের মধ্যে যিনি প্রশস্তি পাঠ করেন, তিনি 'হোতা'; তাঁর পাঠ্যমন্ত্রের সঙ্কলন হল ঋক্‌সংহিতা। যিনি স্তুতিগান করেন, তিনি 'উদ্‌গাতা'; তাঁর গেয় মন্ত্রের সঙ্কলন হল সামসংহিতা। যিনি আহুতি দেন, তিনি 'অধ্বর্যু'। প্রত্যেকটি কাজ মন্ত্র স্মরণ করে করতে হয়। এই মন্ত্রের সঙ্কলন

---

[৬০] পঞ্চভক্তি এবং সপ্তভক্তি নামে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দৃষ্টিতে উপাসনার কথা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে (২।২-২০) সেখানে গোড়ায় হিঙ্কারকে ধরে এবং উপদ্রবকে বাদ দিয়ে পঞ্চভক্তির এবং তার সঙ্গে আদি ও উপদ্রব যোগ করে সপ্তভক্তির কল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্তা উদ্‌গাতৃগণের ঋত্বিক্। চতুর্থ ঋত্বিক্ হলেন 'সুব্রহ্মণ্য'।

[৬১] যেমন পূর্বার্চিকে প্রথম মন্ত্রটি হল : 'অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥' গোতম ঋষি যখন এতে পর্কসুর বসালেন, তখন এটি দাঁড়াল : 'ওগ্নাই (বিকার) আয়াহী বোইতোয়াই (বিশ্লেষণ) তোয়াই (অভ্যাস বা পুনরুক্তি) গৃণানো হ (বিরাম) ব্যদাতোয়াই তোয়াই (অভ্যাস)। নাই (বিকর্ষণ) হোতাসা ত্ত্সাই বা 'ঔহোৱা' (স্তোভ) হীষী॥'

[৬২] যেমন পৃথিবীব্রত সামের গোড়াতেই 'প্রতিষ্ঠাসি প্রতিষ্ঠা, বর্চোসি, মনোসি, এহী' এই স্তোভগুলির পর মূল ঋক্‌পদগুলি আরম্ভ হয়েছে এবং শেষও হয়েছে আবার ঐ স্তোভগুলি দিয়ে। মারো আকারে 'এহী' এই স্তোভটিও আছে (আরণ্যকগান ১৩৮)। এমনিতর পদস্তোভ ও কাব্যস্তোভের সঙ্গে তুলনীয় বাংলায় কীর্তনের আথর।

হল যজুঃসংহিতা। ঋক্‌সংহিতার ভাষায়, অধ্বর্যু যজ্ঞের শরীর নির্মাণ করেন।[৬৩] যে-মন্ত্রের সহায়ে তিনি এই কাজটি করেন, তা-ই হল 'যজুঃ'।[৬৪]

যজুর্মন্ত্রের লক্ষণ করতে গিয়ে মীমাংসক বলেন, ঋক্ আর সাম ছাড়া আর-যত মন্ত্র সবই যজুঃ।[৬৫] ঋক্ 'মিত' অর্থাৎ পাদবদ্ধ, সাম সুরে বাঁধা, আর যজুঃ 'অমিত' অর্থাৎ তাতে ঋকের মত পাদব্যবস্থা নাই।[৬৬] কিন্তু তাহলেও যজুর গদ্যে একটা ছন্দ আছে।[৬৭] যজুর্মন্ত্রে ধ্বনির সংঘাতে যে একটি গম্ভীর মহিমা ফুটে ওঠে, তাতে তাদের গদ্যচ্ছন্দে রচিত কবিতা বলা যেতে পারে। শুদ্ধ যজুর্মন্ত্র ছাড়া যজুঃসংহিতাতে বহু ঋক্‌ও সংকলিত হয়েছে।[৬৮]

যজুঃসংহিতার দুটি ধারা—কৃষ্ণ আর শুক্ল। যে-সংহিতায় মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ একসঙ্গে মেশানো তা 'কৃষ্ণ', আর যে-সংহিতায় শুধু মন্ত্রের সংগ্রহ তা 'শুক্ল'—সংজ্ঞা দুটির এই ব্যাখ্যাই প্রচলিত। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা মনে হয় উপরভাসা। শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণের শেষে আছেঃ 'আদিত্যানীমানি শুক্লানি য়জূংষি রাজসনেয়েন য়াজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে'—রাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্য হতে এই শুক্ল যজুঃ পেয়ে তার ব্যাখ্যা করছেন।[৬৯] সুতরাং এই যজুর্মন্ত্রগুলি আদিত্যভাবনার দ্বারা ভাস্বর বলেই শুক্ল। একই মন্ত্র ভাবনা এবং তাৎপর্যনিরূপণের দিক থেকে এক সম্প্রদায়ে কৃষ্ণ, আরেক সম্প্রদায়ে শুক্ল। শুক্ল-যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদের বংশব্রাহ্মণ হতেও দেখা যায়, এই বেদের দুটি সম্প্রদায় ছিল—ব্রহ্মসম্প্রদায় এবং আদিত্যসম্প্রদায়।[৭০] ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য-শিষ্য-পরম্পরা ব্রহ্ম—প্রজাপতি—কাবষেয় ইত্যাদিক্রমে চতুর্দশ পুরুষে সাঞ্জীবীপুত্র; আর

---

[৬৩] ১০।৭১।১১

[৬৪] যজুর্মন্ত্রের মহিমাসম্পর্কে ঋক্‌সংহিতায় কয়েকটি রহস্যোক্তি পাওয়া যায় ঃ 'স সমুদ্রো অপীচ্যস্তুরো দ্যামিব রোহতি নি য়দাসু য়জুর্দধে'—বরুণ হলেন রহস্যময় সমুদ্র, কারণসলিলে যখন তিনি যজুর্মন্ত্র নিহিত করেন, তখনই তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আরোহণ করেন দ্যুলোকে (৮।৪১।৮); 'বিশ্বে দেবা অনু তৎ তে য়জুর্গুর্দুহে য়দেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ'—চিত্রবর্ণা পৃশ্নি যখন দ্যুলোকের জ্যোতির্ধারা ঝরিয়ে দিলেন, তখন হে অগ্নি, বিশ্বদেবগণ তোমারই সেই যজুর্মন্ত্রের অনুসরণ করলেন (১০।১২।৩); 'তেহবিন্দন্ মনসা দীধ্যানা য়জুঃ স্কন্নং প্রথমং দেবয়ানম্'—মন দিয়ে ধ্যান করে তাঁরা পেলেন সেই প্রথম যজুর্মন্ত্র, যা নেমে এসেছে দেবযানরূপে (১০।১৮১।৩)। অধ্বর্যু যজুঃ দিয়ে যজ্ঞের শরীর নির্মাণ করেন, সুতরাং যজুঃ সৃষ্টির মন্ত্র। যজুর আয়তন ক্ষুদ্র, ক্রমে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে বীজমন্ত্রে দাঁড়িয়েছে। প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতিগুলি বীজরূপী যজুর্মন্ত্র। তৈত্তিরীয়ারণ্যকের মতে ওঙ্কার যজুর্মন্ত্র ঃ 'ওমিতি প্রতিপদ্যতে, এতদ্ বৈ য়জুঃ' (২।১১)। আবার ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখছি, ওঙ্কার হল সামের সার উদ্‌গীথ। ওম্‌এর সাধারণ অর্থ হল স্বীকৃতি বা শংসন। তাহলে হোতৃপাঠ্য শস্ত্রেরও সার হল ওম্, অতএব ওঙ্কারই ত্রয়ীবিদ্যার সার।

[৬৫] শেষে য়জুঃশব্দঃ (মী. সূ. ২।১।৩৭)।

[৬৬] ঋগ্ গাথা কুম্ব্যা তন্মিতং, য়জুর্নিগদো বৃথাবাক্ তদমিতং, সামাথো য়ঃ কশ্চ গেষ্ণঃ স্বরঃ (ঐ. আ. ২।৩।৬)।

[৬৭] পিঙ্গল বলছেন, যজুর্মন্ত্রে গায়ত্রী হতে শুরু করে সাতটি ছন্দই আছে। যাজুষী গায়ত্রীতে দুটি অক্ষর, তারপর ক্রমে একটি করে অক্ষর বেড়ে উষ্ণিক্ অনুষ্টপ বৃহতী পঙক্তি ত্রিষ্টুপ্ আর জগতী এই ছ'টি ছন্দ (ছ. সূ. ২।৬, ১২)।

[৬৮] যেমন বাজসনেয়সংহিতার অর্ধেক মন্ত্র যজুঃ, অর্ধেক ঋক্। ঋকের মধ্যে প্রায় ৭০০টি (সমস্ত সংহিতার সিকি ভাগ) ঋক্‌সংহিতা থেকে নেওয়া। অথর্বসংহিতার কিছু মন্ত্রও পাওয়া যায়। আকৃতিতে এই মন্ত্রগুলি ঋক্, কিন্তু প্রকৃতিতে যজুঃ—এই কথাই তাহলে মেনে নিতে হয়। সুতরাং যজুর্মন্ত্রের লক্ষণ করা উচিত প্রয়োগের দিক থেকে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণও তা-ই করেছেন (৫।৩৩)।

[৬৯] ১৪।৯।৪।৩৩

[৭০] ৬।৫

আদিত্যসম্প্রদায়ের আদিত্য—অম্ভিনী—বাক্—কশ্যপ—নৈধ্রুবি ইত্যাদিক্রমে চতুর্দশ পুরুষে যাজ্ঞবল্ক্য, তারপর তাঁর শিষ্য আসুরি, তাঁর শিষ্য আসুরায়ণ, তাঁর শিষ্য প্রাশ্নীপুত্র আসুরিবাসী, তাঁর শিষ্য সাঞ্জীবীপুত্র। সাঞ্জীবীপুত্র হতে আবার দুটি ধারা এক হয়ে গেল। সাঞ্জীবীপুত্র দুটি সম্প্রদায়েরই আচার্যের কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছেন দেখা যায় এবং তাঁর পর থেকে পুরুষানুক্রমে সেই বিদ্যাসমন্বয়ই প্রচারিত হয়ে এসেছে।

এই বংশব্রাহ্মণের আলোচনায় কয়েকটি ব্যাপ্যার চোখে পড়ে। সাঞ্জীবীপুত্রের আচার্যের পরিচয় তাঁর মায়ের নাম দিয়ে; তারপর থেকে তালিকার শেষপর্যন্ত এইভাবে মায়ের নামেই আচার্যদের পরিচিতি চলেছে। আবার আদিত্যসম্প্রদায়ের প্রথম দুজন আচার্য নারী। অম্ভিনীই তাহলে আদিত্যভাবনাযুক্ত[৭১] শুক্লযজুর্বেদের প্রবর্তিকা। অম্ভিনীকন্যা বাক্ ঋক্‌সংহিতার প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের ঋষিকা। দেবীসূক্তে তাঁর সর্বাত্মভাবনার যে-উল্লাস দেখতে পাই, তা-ই যদি যজুর্বেদসাধ্য কর্মের প্রেরণা যোগায়, তাহলে আদিত্যদ্যুতিতে কর্মসাধনা বস্তুতই 'শুক্ল' হয়ে ওঠে। আদিত্যসম্প্রদায়ের আচার্যেরা তা-ই চেয়েছিলেন। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের তুলনায় এই সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে বিপ্লবী মনোভাবের বাহন। বেদমন্ত্রকে তাঁরা 'অযাতযাম' বা অপর্যুষিত (অর্থাৎ যা বাসী-পচা নয়) রাখতে চেয়েছিলেন জ্ঞানের দীপ্তিকে অন্তরে জ্বালিয়ে রেখে। যাজ্ঞবল্ক্য এই সম্প্রদায়ের একজন মহাবিপ্লবী আচার্য।

পুরাণে আছে, যাজ্ঞবল্ক্য বিদগ্ধ শাকল্যের কাছে ঋগ্‌বেদ পড়তে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে ছেড়ে আসেন। তারপর বৈশম্পায়নের কাছে যজুর্বেদ পড়তে গিয়ে তাঁকেও ছেড়ে যান। অবশেষে নিজেই আদিত্যের উপাসনা করে তাঁর কাছ থেকে 'অযাতযাম' চতুর্বেদ লাভ করেন।[৭২] আত্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের মতে যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্যের কাছ থেকে চতুর্বেদই লাভ করেছিলেন, শুধু যজুর্বেদ নয়।[৭৩] শঙ্করাচার্যও বৃহদারণ্যকভাষ্যে যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্বেদী বলেছেন।[৭৪] সমগ্র চতুর্বেদেরই ব্রহ্মসম্প্রদায় আর আদিত্যসম্প্রদায় নামে দুটি সম্প্রদায়ের কথা জাবালসংহিতায় আছে। আদিত্য-সম্প্রদায়কে সেখানে বলা হয়েছে 'অয়াতয়ামসংজ্ঞোঽয়ং কৃৎস্নকর্মপ্রকাশকঃ'। 'কৃৎস্নকর্ম' কথাটি গীতায় পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে-যোগী কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই কৃৎস্নকর্মকৃৎ।[৭৫] এই দর্শনের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রবর্তিত বাজসনেয়-সংহিতায় উল্লিখিত দর্শনের মিল আছে। সে-দর্শন ত্যাগ ও ভোগের বিদ্যা ও অবিদ্যার সম্ভূতি ও বিনাশের সমন্বয়ের দর্শন, কর্ম করেও তার দ্বারা লিপ্ত না হওয়ার দর্শন।[৭৬] বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের যে-পরিচয় আমরা পাই, তাতে নিঃসন্দেহে তিনি ব্রহ্মবিত্তম, তাঁর দর্শনে মানুষের অধ্যাত্মচেতনা তার তুঙ্গতম শিখরে পেঁৗছেছে। যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদই পরবর্তী যুগে বৌদ্ধভাবনার পরিপোষক।

[৭১] তু. ঋ ৮।৪১।৮
[৭২] বিষ্ণু ৩।৫, ভাগবত ১২।৬, দেবী-ভাগবত ৯।৫। দ্র. কান্বসংহিতা, ঔন্ধ সং. ভূমিকা।
[৭৩] আত্ম ৭।৩৮-৪৫, স্কন্দ না. খ. ২৭৮
[৭৪] ৩।১।২
[৭৫] ৪।১৮
[৭৬] ৪০।১-২, ৯-১৪

বৌদ্ধভাবনার মূলে আছে সাংখ্যের প্রেরণা। সাংখ্যপ্রবর্তক কপিলের শিষ্য হলেন আসুরি। বংশব্রাহ্মণে দেখছি, যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যও আসুরি। দুই আসুরি কি এক? হতেও পারে। বলা চলে, যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য আসুরি কপিলশিষ্যও এই অর্থে যে তিনি কপিলমতের সমর্থক এবং প্রচারক। আর এ-মত নিশ্চয় তাঁর গুরু যাজ্ঞবল্ক্যেরই মত। সাংখ্যমত মূলত অবৈদিক হলেও অনার্য নয়। আর্যভাবনার দুটি মূল ধারা—একটি ঋষিপ্রবর্তিত, আরেকটি মুনিপ্রবর্তিত। কপিল মুনিধারার প্রবর্তক, তিনি সিদ্ধ,[৭৭] তাঁর দর্শন সাংখ্যদর্শন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডটি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের অক্ষরব্রহ্মবাদে এই সাংখ্যভাবনা কতখানি অনুপ্রবিষ্ট। মুনিধর্ম এবং প্রব্রজ্যা দুইই তাঁর অঙ্গীকৃত[৭৮]; সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত[৭৯]; সাংখ্যযোগের নাড়ীবিজ্ঞান তাঁর জানা[৮০]; প্রত্যক্-দৃষ্টিতে তাঁর অক্ষর-ব্রহ্মবাদ এবং সাংখ্যের কৈবল্যবাদ একই মৌন-অনুভবের দুটি দিক্। অথচ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিধারারই বাহক। তবে কিনা কুরু-পাঞ্চালের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা যে সুস্পষ্ট,[৮১] তা জনকের সভায় তাঁদের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হতেই বোঝা যায়। বস্তুত যাজ্ঞবল্ক্য বিপ্লবী বলেই শ্রীকৃষ্ণের মত আর্যভাবনায় একটা সমন্বয় আনতে পেরেছিলেন। তাঁর তিন পুরুষ পরেই সাঞ্জীবীপুত্রের মাঝে এই সমন্বয়ের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল, যজুর্বেদের ব্রহ্মসম্প্রদায় আর আদিত্যসম্প্রদায় এক হয়ে গেল।

সাঞ্জীবীপুত্রের আচার্য প্রাশ্নীপুত্রের সময় থেকেই মায়ের নামে পরিচয় দেওয়ার রেওয়াজ হল। আদিত্যসম্প্রদায়ের আদি দুজন আচার্য নারী বলেই কি তাঁদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার জন্য এই ব্যবস্থা? যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনে স্ত্রীপ্রজ্ঞা কাত্যায়নী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী আর ব্রহ্মবিদুষী গার্গী এই তিনটি নারীর আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের কথা বাদ দিলে উপনিষদের মাঝে এক কেনোপনিষদে হৈমবতী উমা ছাড়া আর কোথাও নারীর প্রসঙ্গ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য কি কোনও শাক্তভাবনার প্রবর্তক ছিলেন, যাঁতে তাঁর শিষ্যপরম্পরার মাঝে নারীর সম্বন্ধে এই গৌরবের ভাব দেখা দিয়েছে? লক্ষণীয়, বংশব্রাহ্মণটি আছে সুপ্রজননসম্পর্কিত দুটি ব্রাহ্মণের পরেই। শঙ্করাচার্য বলেন, বংশব্রাহ্মণে যে সম্প্রদায়পরম্পরা আছে তা এই সুপ্রজননবিদ্যা সম্পর্কে, সুপ্রজননে নারীর প্রাধান্য বলে আচার্যদের এখানে মাতৃনামে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বংশ-ব্রাহ্মণকে শুধু এই বিদ্যার সম্পর্কিত বললে তার শেষে 'ইমানি শুক্লানি য়জূংষি' কথাটির অধিকারকে সঙ্কুচিত করা হয়। সুতরাং বংশব্রাহ্মণটি সমগ্র যজুর্বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করাই সমীচীন। সুপ্রজননবিদ্যাও তারই অন্তর্গত, কেননা গর্ভাধানকে ঋষিরা যজ্ঞরূপেই গণ্য করতেন।[৮২] এই বিদ্যার মুখবন্ধে রহস্যবিদ্‌রূপে যাজ্ঞবল্ক্যের আচার্য আরুণি উদ্দালকের উল্লেখ আছে। সুতরাং উপনিষদে উল্লিখিত অনুষ্ঠানের

[৭৭] তু. সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ (গী. ১০।২৬)
[৭৮] বৃ. উ. ৩।৫।১, ৪।৪।২২, ৪।৫।২
[৭৯] ঐ ৪।৪।১৭
[৮০] ঐ ৪।২।৩, ২০
[৮১] ঐ ৩।৯।১৮
[৮২] সুপ্রজননের আরেক নাম 'পুত্রমন্থ'। দ্র. ছা. উ. তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ৫।৮।

বিশিষ্ট রীতিটির প্রবর্তক উদ্দালক, একথা মনে করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানের এক-জায়গায় আদিমিথুনের সঙ্গে দম্পতীর সাযুজ্যভাবনার উপদেশ আছে: ভাবতে হবে নারী পৃথিবী, নারী ঋক্, নারী সেই আদ্যাশক্তি (সা)। এই ভাবনার পুষ্টি আমরা পাই তন্ত্রে। যাজ্ঞবল্ক্যও কি এই ভাবনাকে পুষ্ট করেছিলেন, তাই তাঁর শিষ্যানুশিষ্যেরা 'মায়ের ছেলে' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন?

সুপ্রজননবিদ্যায় আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, পিতার মনে 'পণ্ডিতা' দুহিতার কামনা।[৮৩] এটিও অসাধারণ। শঙ্করাচার্য অবশ্য 'পণ্ডিতা'কে গৃহকর্মনিপুণা বলে ব্যাখ্যা করে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু পরের অনুচ্ছেদে পণ্ডিত পুত্রের কামনার সঙ্গে তুলনা করলেই এ-ব্যাখ্যা যে সঙ্গত নয় তা বোঝা যায়। নারীর সম্বন্ধে গৌরবের ভাব পোষণের এটিও একটি নিদর্শন। এসবই কি অম্ভৃনী এবং বাকের প্রভাব? আবার দেখি, বাক্ 'সসর্পরী' বা বিদ্যুৎবিসর্পিণীরূপে বিশ্বামিত্রের ইষ্ট-দেবতা।[৮৪]। শুনঃশেপ দেবরাত তাঁর পোষ্যপুত্র। শঙ্করাচার্য যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন 'দৈবরাতি'। সুতরাং বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের যোগ ঘনিষ্ঠ।[৮৫] বাক্ বা শক্তি-সাধনার পরম্পরা এইদিক থেকেও আসতে পারে। পুরাণে বিশ্বামিত্রও বিপ্লবীরূপে চিত্রিত। এ-বিপ্লব কিসের বিরুদ্ধে? বেদের যাতযামত্বের বিরুদ্ধে? যা-ই হ'ক, শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, আদিত্যসম্প্রদায়ই শুক্লযজুর্বেদের ধারক এবং বাহক।

যজুঃসংহিতার বিভিন্ন শাখার উল্লেখ আগেই করেছি। কৃষ্ণযজুঃসংহিতার কাঠক বা চারায়ণীয়-কঠশাখায় মোটের উপর ৫টি 'গ্রন্থ' বা ৫৩টি 'স্থানক'; কপিষ্ঠলশাখায় ৮টি 'অষ্টক' বা ৪৮টি 'অধ্যায়'; মৈত্রায়ণীশাখায় ৪টি 'কাণ্ড' বা ৫৪টি 'প্রপাঠক'; তৈত্তিরীয়-শাখায় ৭টি 'কাণ্ড' বা ৪৪টি 'প্রপাঠক'। এই শাখাটিই সবচাইতে বেশী প্রচারিত। শুক্লযজুঃ- বা বাজসনেয় সংহিতার কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন দুটি শাখায় ৪০টি 'অধ্যায়'।[৮৬] তৈত্তিরীয় মৈত্রায়ণী এবং বাজসনেয়ী সংহিতার পদপাঠও পাওয়া যায়।

সমস্ত শাখাগুলির মধ্যেই বিষয়বস্তুর মোটামুটি একটা মিল আছে। কেবল শুক্লযজুঃ- বা বাজসনেয়-সংহিতায় কাম্যযাগগুলি বাদ পড়েছে, সেগুলি আছে কৃষ্ণযজুঃসংহিতায়—এইটি লক্ষণীয়। বাজসনেয়সংহিতার 'শুক্ল' সংজ্ঞার এটিও একটি কারণ হতে পারে। যজুঃসংহিতায় উল্লিখিত যাগগুলি হল অগ্ন্যাধান (পুনরাধেয়), অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পশুযাগ, দীক্ষা, সোমযাগ, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, সৌত্রামণী এবং অগ্নিচয়ন। এই শেষেরটিতেই যাগরহস্যের একটা বিস্তৃত বিবৃতি পাওয়া যায়।

বাজসনেয়সংহিতার শেষদিকে আছে পুরুষসূক্ত সর্বমেধমন্ত্র এবং শিবসঙ্কল্পাদি-

---

[৮৩] 'অথ য় ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত' বৃ. উ. ৬।৪।১৭।

[৮৪] দ্র. ঋ. ৩।৫৩।১৫ টীকা।

[৮৫] কাণ্বসংহিতা, ঔন্ধ সং ভূমিকা পৃঃ ১৬।

[৮৬] পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, বাজসনেয়সংহিতার প্রথম আঠারটি অধ্যায় আদিম, বাকীগুলি পরের সংযোজন। অনুমানের হেতু, এই আঠারটি অধ্যায়ের মন্ত্রগুলিই তৈত্তিরীয়সংহিতায় পাওয়া যায়, বাকীগুলি পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকে; শতপথব্রাহ্মণের প্রথম নয় কাণ্ডে এই অংশেরই আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা আছে; ভাষ্যকারেরাও ২৬ হতে শেষ পর্যন্ত অধ্যায়গুলিকে 'খিল' বলে গণ্য করেছেন।

মন্ত্র, যেগুলি গভীর অধ্যাত্মবোধের পরিচায়ক। বিখ্যাত ঈশোপনিষৎ দিয়ে সংহিতাটি শেষ করা হয়েছে। বাজসনেয়সংহিতার শুক্লত্বের এগুলিও একটা প্রমাণ।

৪

এই গেল যজুঃসংহিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তারপর অথর্বসংহিতা, যাকে ত্রয়ীবিদ্যার পরিশিষ্ট এবং প্রপূরক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

অথর্ববেদের প্রবর্তকরূপে আমরা তিনজন ঋষির নাম পাই—অথর্বা অঙ্গিরাঃ ও ভৃগু।[৮৭] তিনজন ঋষিই ঋক্‌সংহিতার সুপ্রাচীন পিতৃপুরুষরূপে পরিগণিত।[৮৮] ঋক্‌সংহিতার সঙ্গে অথর্বসংহিতার যোগ ঘনিষ্ঠ। অথর্বসংহিতার মন্ত্রের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ঋক্‌সংহিতা থেকে নেওয়া। এতে যেসব পাদবদ্ধ মন্ত্র আছে, সেগুলির সাধারণ নামও ঋক্। আবার অথর্বসংহিতার একষষ্ঠাংশ যজুর্মন্ত্রের মত গদ্যে রচিত। দেখা যাচ্ছে মন্ত্ররচনার যে-ধারা আমরা ত্রয়ীবিদ্যাতে পাই, অথর্বসংহিতায় চলছে তারই অনুবৃত্তি। কিন্তু দুয়ের বিনিয়োগ আলাদা। ত্রয়ীর বিনিয়োগ শ্রৌতকর্মে—যার মধ্যে প্রধান হল সোমযাগ, লক্ষ্য হল দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের দ্বারা অমৃতত্বলাভ; আর অথর্ববেদের প্রধান বিনিয়োগ হল গৃহ্যকর্মে—নানা শান্তিক এবং পৌষ্টিক ক্রিয়ায়, যার লক্ষ্য হল দেবশক্তির সহায়ে অভ্যুদয়লাভ। কিন্তু তাছাড়াও অথর্বসংহিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ঔপনিষদ ভাবনা।

অথর্বসংহিতার শৌনকশাখার[৮৯] ৭৩১টি সূক্তে ৫৯৮৭টি মন্ত্র আছে। সূক্তগুলি ২০টি কাণ্ডে এবং কাণ্ডগুলি প্রপাঠক এবং অনুবাকে বিভক্ত। সংহিতার সম্পাদনায় একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম হতে পঞ্চম কাণ্ড পর্যন্ত প্রত্যেক কাণ্ডে প্রায়শ একই দৈর্ঘ্যের সূক্ত সংগৃহীত হয়েছে এবং তাদের দৈর্ঘ্যও ক্রমে বেড়ে চলেছে। কিন্তু ষষ্ঠকাণ্ডে সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা কমে গিয়ে প্রায়ই তিনটিতে

---

[৮৭] তু. অ. স. ১০।৭।২০; গোপথ ব্রা. ৩।৪। সংহিতায় অথর্বার মন্ত্রসংখ্যাই সবচাইতে বেশী (১৬১২; অথর্বাচার্যের ১২৪); তারপরেই ব্রহ্মাকে বাদ দিলে ভৃগ্বঙ্গিরার (২৩১) এবং ভৃগুর (২২৪) নাম করতে হয়। অঙ্গিরার মন্ত্রসংখ্যা ৮৮, অথর্বাঙ্গিরার ৫২। সব মিলে এঁদের মন্ত্রের সংখ্যা ২৩৩১ অর্থাৎ সমগ্র সংহিতার প্রায় পাঁচভাগের দুভাগ। ঋক্‌সংহিতার আর্ষমণ্ডলের সব ঋষির মন্ত্রই কিছু-কিছু অথর্বসংহিতায় সঙ্কলিত হয়েছে। তার মধ্যে অত্রির মন্ত্র শুধু একটি।

[৮৮] তু. অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সৌম্যাসঃ, তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম (১০।১৪।৬)। অথর্বা এবং অঙ্গিরা দুজনেই যজ্ঞবিধির এবং অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক বলে খ্যাত (ঋ. স. ১।৮৩।৫, ৫।১১।৬, ১০।৬৭।২, ৬।১৬।১৩, ১০।৯২।১০...)। ভৃগুরা দ্যুলোকের অগ্নিকে ভূলোকে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন (ঋ. স. ১।৫৮।৬, ২।৪।২; তু. ১।৬০।১, ৩।৫।১০)। অথর্বা এবং ভৃগু অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক, কিন্তু অগ্নি স্বয়ংই অঙ্গিরাঃ। তিনটি নামের মূলেই অগ্নিদীপ্তির ধ্বনি আছে ঃ অথর্বা < অথর্ (অগ্নি, তু. 'অথর্যু' ঋ. ৭।১।১; অবেস্তা 'আথ্রবন' অগ্নিযাজী, 'আতর' > 'আতশ' আগুন, যেমন আতশবাজী); অঙ্গিরঃ <√ অগ্ > অগ্নি; ভৃগু <√ ভ্রাজ।

[৮৯] পৈপ্পলাদশাখার মাত্র একটি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়েছিল কাশ্মীরে। তাতে সূক্তের বিন্যাস অন্যরকম, অনেক পাঠভেদ আছে। কিছু-কিছু নতুন মন্ত্রও পাওয়া যায়। সম্প্রতি উড়িষ্যাতেও পৈপ্পলাদসংহিতা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে।

দাঁড়িয়েছে। সপ্তম কান্ডটি অনেকটা পরিশিষ্টের মত, তাতে একটি কি দুটি মন্ত্রের সূক্তসংখ্যাই বেশী, আবার কিছু-কিছু দীর্ঘতর সূক্তও আছে।

সপ্তম কান্ড পর্যন্ত নানা আভ্যুদয়িক কর্মের মন্ত্রই বেশী। সুতরাং সংহিতার এই ভাগটি গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের পোষক এবং লোকহিতের অনুকূল। এইসব আভ্যুদয়িক কর্ম হল আয়ুষ্য (দীর্ঘায়ুলাভের জন্য), ভৈষজ্য (আরোগ্যলাভের জন্য), শান্তিক (ভূতাবেশ ইত্যাদি দূর করবার জন্য), পৌষ্টিক (শ্রীলাভের জন্য), সাংমনস্য (পরস্পরের মৈত্রীসম্পাদনের জন্য), আভিচারিক (শত্রুনাশের জন্য), প্রায়শ্চিত্ত এবং রাজকর্ম (রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং উন্নতির জন্য)। এছাড়া বিবাহ গর্ভাধান ইত্যাদির মন্ত্রও এইভাগে পাওয়া যায়।

অষ্টম হতে দ্বাদশ কান্ড নিয়ে হল অথর্বসংহিতার দ্বিতীয় ভাগ। এই ভাগেও আভ্যুদয়িক কর্মের মন্ত্র আছে। কিন্তু ঔপনিষদভাবনাই হল এই ভাগের বৈশিষ্ট্য। বেদের ব্রাহ্মণের আরণ্যক অংশে যেমন নানা যজ্ঞাঙ্গ নিয়ে রহস্যোক্তির প্রাচুর্য দেখা যায়, এখানেও তেমনি। সামান্য একটা প্রতীককে অবলম্বন করে ঋষির কবিহৃদয় রহস্যমুখর হয়ে উঠেছে।[২০] তাই সূক্তের আয়তনও প্রায়শই খুব দীর্ঘ, ঋক্‌সংহিতার গীতিকাব্যের চাইতে গাথাকাব্যের ধরনটাই তাদের মধ্যে বেশী এসে গেছে। তাছাড়া উপনিষদের ব্রহ্মবাদের কাব্যরূপও আমরা এইখানেই পাই।[২১] ব্রাহ্মণগুলিতে 'য় এবং রেদ' এই ভণিতা দিয়ে বেদনপ্রশংসা বা বিদ্যাস্তুতির পরিচয় পাই পদে-পদে। এই ভণিতাটিও এখানে প্রথম পাওয়া যায়।[২২] কামসূক্ত[২৩] বা প্রাণসূক্তকেও[২৪] কোনও ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না, এগুলি দার্শনিক কবিচিত্তের স্বাধীন উচ্ছ্বাস। তেমনি ভূমিসূক্ত[২৫], যা পৃথিবীস্তুতিরূপে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অতুলন, বোধহয় পৃথিবীর কোনও সাহিত্যেই তার জুড়ি নাই। ব্রহ্মচর্যসূক্তে[২৬] ব্রহ্মচারীর মহিমা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে, মানুষের গৌরব তার মধ্যে দেবতাকেও ছাপিয়ে উঠেছে। বন্ধ্যা গাভীর উপর দুটি সূক্তে[২৭] এক রহস্যবাদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, যাকে বাউলের সন্ধাভাষার আদিজননী বলতে পারি।

ত্রয়োদশ হতে বিংশ কান্ড নিয়ে হল অথর্বসংহিতার তৃতীয় ভাগ, তার মধ্যে ঊনবিংশ আর বিংশ কান্ড দুটি হল পরিশিষ্ট। এই ভাগের বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রত্যেকটি কান্ডের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট। কান্ডগুলি ক্রমেই ক্ষুদ্রায়তন হয়েছে, কেবল অষ্টাদশ কান্ডটি কিছু বড়। ত্রয়োদশ কান্ডে আছে 'রোহিত' নামে আদিত্যের প্রসঙ্গ। আদিত্য

---

[২০] দ্র. ঋষভসূক্ত ৯।৪, অজসূক্ত ৯।৫, গোসূক্ত ৯।৮, ১০।৯, ওষধিসূক্ত ৮।৭, ব্রহ্মৌদনসূক্ত ১১।১, অনড়ুৎসূক্ত ৪।১১, ব্রহ্মগবীসূক্ত ১২।৫, বশাসূক্ত ১০।১০, ১২।৪ ('বশা' অর্থে বন্ধ্যা-গাভী, এটি অসম্ভূতির প্রতীক)।

[২১] দ্র. বিরাট্‌সূক্ত ৮।৯-১০, মধুবিদ্যা ৯।১, আত্মসূক্ত ৯।৯-১০ (এটি ঋক্‌সংহিতার ব্রহ্মোদ্যসূক্ত ১।১৬৪ হতে নেওয়া), পার্ষ্ণিসূক্ত ১০।২ (এখানে যোগের চক্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায়), স্কম্ভসূক্ত ১০।৭, জ্যেষ্ঠব্রহ্মসূক্ত ১০।৮, উচ্ছিষ্টব্রহ্মসূক্ত ১১।৭, মন্যুসূক্ত ১১।৮। আরও দ্র. বরুণসূক্ত ৪।১৬, যা বৈদিক সাহিত্যে অতুলন।

[২২] দ্র. ৮।১০

[২৩] ৯।২

[২৪] ১১।৪

[২৫] ১২।১

[২৬] ১১।৫

[২৭] ১০।১০, ১২।৪

বৈদিক দেববাদের মূলাধার। কাণ্ডটির শেষের দিকে একটি বেদনপ্রশংসা আছে, সুতরাং এটি একটি উপনিষৎ বা গুহ্যতত্ত্বের প্রকাশক। চতুর্দশ কাণ্ডটি বিবাহপ্রকরণ। পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যপ্রশংসা আগাগোড়া যজুর ছন্দে রচিত।[৯৮] ষোড়শ কাণ্ডে নানা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র—বিশেষ করে কতকগুলি দুঃস্বপ্ননাশন সূক্ত। এই কাণ্ডটিও গদ্যে রচিত। সপ্তদশ কাণ্ডে মাত্র একটি দীর্ঘ সূক্তে আদিত্যের স্তুতি। তারপরে অষ্টাদশ কাণ্ডে পিতৃমেধপ্রকরণ। তার অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতা থেকে নেওয়া।[৯৯]

তার পরের দুটি কাণ্ডের কোনও উল্লেখ অথর্বপ্রাতিশাখ্যে পাওয়া যায় না বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ও-দুটি সংহিতায় পরবর্তী কালের সংযোজন। ঊনবিংশ কাণ্ডটি অনেকগুলি ছোট-ছোট প্রকীর্ণ সূক্তের সংগ্রহ। তার মধ্যে ভৈষজ্যবিষয়ক সূক্ত মাত্র তিনটি,[১০০] দুঃস্বপ্ননাশন সূক্ত দুটি। কতকগুলি মণিধারণসূক্ত এই কাণ্ডটির একটা বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মোটামুটি বিষয়বস্তু হল যজ্ঞ দর্ভ কাল রাত্রি নক্ষত্র আকূতি অভয় শান্তি শর্ম ইত্যাদি। ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্ত একটু পরিবর্তিত আকারে এখানে সংগৃহীত হয়েছে। একটি আত্মসূক্তে[১০১] 'অয়ুতোহং সর্বঃ' এই মন্ত্রাংশে সর্বাত্মভাবের উল্লেখ আছে। 'বরদা বেদমাতার' উল্লেখও এই কাণ্ডেই পাওয়া যায়, তাতে গায়ত্রী-উপাসনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।[১০২] মোটের উপর অথর্বসংহিতার এই উপসংহারটি উপক্রমের চাইতে উঁচুসুরে বাঁধা। এর শেষ মন্ত্রটি একটি সমাপ্তিসূচক প্রার্থনার মত শোনায়।

বিংশ কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য হল, তার অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতা থেকে, বিশেষ করে তার অষ্টম মণ্ডল থেকে নেওয়া। দুটি সংহিতায় এক্ষেত্রে পাঠভেদও নাই। সূক্তগুলির প্রায় সবই সোমযাগে ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠ করা হত।[১০৩] সংহিতার মৌলিক অংশ হল ১০টি 'কুন্তাপসূক্ত'[১০৪], এগুলি অনেকাংশে দুর্বোধ। এগুলিও সোমযাগে পাঠ করা হত। পাঠ করতেন ব্রাহ্মণাচ্ছংসী আগ্নীধ্র এবং পোতা—বিশেষ করে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। এঁরা সবাই ব্রহ্মার সহকারী।

অথর্বসংহিতায় স্মার্তকর্মেরই প্রাধান্য। অথচ সংহিতার পরিশেষে শ্রৌত সোমযাগ এবং ব্রহ্মগণ ঋত্বিকদের প্রাধান্য দেওয়াতে অথর্বসংহিতার সঙ্গে ব্রহ্মার নিবিড় যোগ সূচিত হচ্ছে। আগেই বলেছি, যিনি ব্রহ্মা তিনি সর্ববিৎ। তাঁর 'ব্রহ্ম' একাধারে প্রজ্ঞা এবং শক্তি দুইই। শ্রৌতকর্মের লক্ষ্য প্রজ্ঞার উন্মেষ, দেবতার সাযুজ্যে অমৃতত্ব বা

---

[৯৮] ব্রাত্যরা আর্য, কিন্তু বৈদিক ধর্মের বাইরে। তাঁদের কথা তাণ্ড্যব্রাহ্মণ পরিচয়ে বলব।

[৯৯] এই কাণ্ডটি পৈপ্পলাদসংহিতায় নাই।

[১০০] যক্ষ্মানাশনম্ ৩৮, কুষ্ঠনাশনম্ ৩৯, ভৈষজ্যম্ ৪৪।

[১০১] ৫১।

[১০২] স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা, প্র চোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্। আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চসম্। মহ্যং দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্ ॥ (৭১)। অনুক্রমণিকায় সূক্তটির দেবতা গায়ত্রী। 'প্রচোদয়ন্তাং' ক্রিয়াপদটি লক্ষণীয়। দুটি ক্রিয়াই বহুবচন, কর্তার উল্লেখ নাই। সায়ণ বলেন, 'পূজায়াং বহুবচনম্।' শেষাংশের ব্যাখ্যায় তাঁর মন্তব্য ঃ 'শব্দারগম্যব্রহ্মাকারং পরিত্যজ্য বাঙ্-মনসাতীতব্রহ্মরূপা ভবেতি মন্ত্রদর্শিনা ঋষিণা সাক্ষাৎকৃতপরত্বেন উচ্যতে।'

[১০৩] বিংশকাণ্ডের মোট ১৪৩টি সূক্তের ১৭৭টিই ইন্দ্রের উদ্দেশে। এছাড়া অগ্নিসূক্ত আছে তিনটি (১০১-১০৩), বৃহস্পতিসূক্ত চারটি (১৬, ৮৮, ৯০, ৯১), সূর্যসূক্ত একটি (১২৩), অশ্বিসূক্ত পাঁচটি (১৩৯-১৪৩)।

[১০৪] ১২৭-১৩৬। এগুলি পৈপ্পলাদসংহিতায় নাই, এদের পদপাঠও পাওয়া যায় না।

নিঃশ্রেয়সলাভ। স্মার্তকর্মের লক্ষ্য অভ্যুদয়লাভ। নিঃশ্রেয়সে আর অভ্যুদয়ে কোনও বিরোধ নাই, দুইই ব্রহ্মবিদ্যার ফল। সোমযাগের অধ্যক্ষ ব্রহ্মা 'বদতি জাতবিদ্যাম্', তিনি সর্বতোভাবে ব্রহ্মবিৎ। তিনি ভুক্তি মুক্তি দুয়েরই বিধাতা। ঋগ্‌বেদ আর অথর্ববেদ এক অখণ্ড বেদবিদ্যারই প্রকাশক। তাই, অথর্বসংহিতার শেষে ব্রহ্মগণ ঋত্বিকদের পাঠ্য এবং সোমযাগে বিনিযুক্ত মন্ত্রের সন্নিবেশ—এটি একটি অর্থবহ ইঙ্গিত, যেমন ইঙ্গিত আছে শুক্লযজুঃসংহিতার শেষে ঈশোপনিষদের সন্নিবেশে। ভুক্তি মুক্তির সমন্বয়ের ভাবনা আমরা তন্ত্রেও পাই। এটি আথর্বণ বিদ্যাসম্প্রদায়েরই অনুবৃত্তি।

অথর্বসংহিতায় ঋক্‌সংহিতার যেসব মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে তা প্রায়ই প্রথম অষ্টম এবং দশম মণ্ডল থেকে, অর্থাৎ আর্ষমণ্ডলের বাইরে থেকে। আবার অষ্টম মণ্ডলের মন্ত্রগুলির বেশীর ভাগই পড়েছে বিংশ কাণ্ডে। সুতরাং ঋক্‌সংহিতার উপক্রম ও উপসংহারের যে-আবহ, অথর্বসংহিতারও তাই। আর্ষমণ্ডলগুলিতে বৈদিক ভাবনার যে-সম্পুটটি আমরা পাই, তারই পরিবেষ রচনা করছে ঋক্‌সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডলটি। এই পরিবেষেরই বিচ্ছুরণ হল অথর্বসংহিতা।

স্বভাবতই এই বিচ্ছুরণে খানিকটা সংহতির অভাব থাকবে, কেননা প্রাকৃতমানসের খুব কাছাকাছি আসার ফলে তার মাঝে একটা বিস্তার ও স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হবে। আর্ষমণ্ডলে যে-ভাব খাতবন্দী হয়ে বইছিল, এই পরিবেষে তা কূল ছাপিয়ে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। অথর্বসংহিতার ভাষায় এবং ছন্দেও এই কূলছাপানোর পরিচয় মেলে। তার ভাষার মধ্যে আর্ষমণ্ডলের তুলনায় অর্বাচীনতার লক্ষণ পাওয়া যায়, যদিও তাতে প্রমাণ হয় না যে অথর্বসংহিতার বিষয়বস্তুও ঋক্‌সংহিতার চাইতে অর্বাচীন। একের ভাষাকে সযত্নে আগলে রাখা হয়েছে শ্রৌতকর্মের খাতিরে, তাই তা অনেকটা অবিকৃত থেকে গেছে। স্মার্তকর্মের প্রয়োজনে অপরের ভাষা লোকায়ত হয়েছে বেশী। তাই তার রূপান্তরও ঘটেছে—লোকের মুখে-মুখে ফিরে চণ্ডীদাস বা কৃত্তিবাসের ভাষায় যেমন বদল হয়েছে। অথর্বসংহিতায় বাগ্‌ভঙ্গীরও বৈচিত্র্য কম নয়। তাতে পদ্য আছে, গদ্যও আছে। যজুর গদ্য এবং ব্রাহ্মণের গদ্য দুইই তাতে পাওয়া যায়। উপনিষদের শ্লোক বা গাথার ঢঙে দার্শনিক রহস্যোক্তিরও অভাব নাই। পদ্যাংশের ছন্দেও ঋক্‌সংহিতার চাইতে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বেশী পাওয়া যায়।

মোটের উপর অথর্বসংহিতায় আমরা পাই বৈদিক ভাবনার চরিষ্ণু রূপ। ত্রয়ীতে যে-বিদ্যা সংহত, অথর্ববেদে তা উল্লসিত। এই উল্লাস প্রাণ ও শক্তিরই পরিচয়। অবশ্য এ-শক্তি সিদ্ধেরই শক্তি। ত্রয়ীবিদ্যা সাধকের উপজীব্য, আর অথর্ববিদ্যা সিদ্ধের বিভূতি। এমনি করে চারটি সংহিতায় বেদবিদ্যার পূর্ণ সঙ্কলন।[১০৫]

---

[১০৫] ছান্দোগ্যোপনিষদের মধুবিদ্যাতে (৩।১-১১) সন্ধাভাষায় বেদবিদ্যার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আদিত্যের রশ্মিকে মধুনাড়ীরূপে বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, ঋক্ যজুঃ সাম অথর্বাঙ্গিরস এবং গুহ্য-আদেশেরা মধুকর হয়ে যথাক্রমে পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর এবং ঊর্ধ্ব মধুনাড়ীতে মধুসঞ্চয় করছে। ইতিহাস-পুরাণ হল অথর্বাঙ্গিরসের পুষ্প আর ব্রহ্ম গুহ্য-আদেশের পুষ্প। স্পষ্টই বোঝা যায়, আদিত্যবিদ্যা বা মধুবিদ্যার এখানে দুটি ভাগ কল্পিত হয়েছে—একটি ত্রয়ীবিদ্যা, আরেকটি গুহ্যবিদ্যা। অথর্বাঙ্গিরস এই গুহ্যবিদ্যার ধারক। এই বিদ্যা উত্তরে এবং ঊর্ধ্বে আছে, এটিও লক্ষণীয়। ইতিহাস-পুরাণ (যাকে অন্যত্র পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে, ছা. ৭।১।২) গণভাবনার

বেদের ব্রাহ্মণ

১

বেদের সংহিতাভাগের মোটামুটি একটা পরিচয় পেলাম। এইবার তার ব্রাহ্মণভাগের কথা।

'ব্রাহ্মণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি আদ্যুদাত্ত ক্লীবলিঙ্গ 'ব্রহ্ম' শব্দ হতে। এই ব্রহ্মের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বৃহতের চেতনা বা শক্তি।[১] তার প্রকাশ মন্ত্রে। মন্ত্র এবং মন্ত্রশক্তি দুইই ব্রহ্ম। বেদের সংহিতাভাগ ব্রহ্মের আধার। ব্রহ্মকে আশ্রয় করে প্রবর্তিত যে বিদ্যা ও প্রয়োগবিজ্ঞান, তা-ই 'ব্রাহ্মণ'। এই শব্দটিও আদ্যুদাত্ত এবং ক্লীবলিঙ্গ।[২]

যাস্ক 'ব্রহ্ম' বলতে কর্মও বুঝেছেন।[৩] আমরা আধুনিক ভাষায় তাকে বলব 'সাধনা'। মন্ত্রচেতনা মন্ত্রশক্তি এবং মন্ত্রসাধনা এই তিনটি নিয়ে বেদ। চেতনা ও শক্তির পরিচিতি পাই আমরা বেদের সংহিতাভাগে, আর সাধনার বিবৃতি ব্রাহ্মণভাগে। এই সাধনার সাধারণ সংজ্ঞা 'যজ্ঞ'। তার উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্রহ্মকে বা বৃহৎকে লাভ করা। ঋক্‌সংহিতায় এই বৃহতের অনেক নাম আছে : স্বঃ, জ্যোতিঃ, পরমং ব্যোম, পরমং পদম্, উরুলোকঃ, অনিবাধঃ, অভয়ম্, অমৃতম্ ইত্যাদি।[৪]

বাইরে থেকে দেখতে গেলে যজ্ঞ ক্রিয়া। কিন্তু ক্রিয়া বস্তুত ভাবের দ্যোতক। ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যই ক্রিয়া। তাইতে যজ্ঞ যেমন দ্রব্য বা বাইরের উপকরণ দিয়ে করা

বাহন। এই ফুল হতেই অথর্বাঙ্গিরস মধু আহরণ করে, এই উক্তিটি ব্যঞ্জনাবহ। অথচ এরই সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে গুহ্য-আদেশ, যারা ব্রহ্মপুষ্প হতে মধু আহরণ করে। এদেশে বহু মরমীয়ার আবির্ভাব হয়েছে গণসমাজ হতে। অথর্ববেদই তাঁদের ভাবধারার বাহন। অথর্বসংহিতার ব্রাত্যপ্রশস্তিতে তার একটা বড় প্রমাণ আছে।

[১] <√ বৃহ্ (বেড়ে চলা, বৃহৎ হওরা)। ব্রহ্ম মূলত চেতনার বিস্ফারণ। এই বিস্ফারণ ঘটে দেবশক্তির আবেশে। পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকে দেবশক্তির লীলায়ন দেখে মর্ত্য-চেতনার উদ্দীপনা হয়। এই উদ্দীপনই ব্রহ্ম। বৈদিক চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের মূলেও এই তত্ত্ব, তার কথা যথাস্থানে বলব। ব্রহ্মের আবির্ভাবে মানুষ কবি হয়, তার চেতনায় স্ফুরিত হয় বাক্। ব্রহ্ম আর বাক্ অবিনাভূত : 'য়াবদ্‌ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্' (ঋ. ১০।১১৪।৮)। সব মন্ত্রই ব্রহ্ম অর্থাৎ উদ্দীপিত এবং বিস্ফারিত চেতনায় বাকের স্ফুরণ। আবার বলা যায়, বাকের প্রকাশই মানুষকে করে 'ব্রহ্মা' ঋষি এবং সুমেধা (ঋ. ১০।১২৫।৫)।

[২] ঋক্‌সংহিতায় ব্রাহ্মণ শব্দটি প্রায়শ পুংলিঙ্গ এবং অন্তোদাত্ত (শুধু একটি জায়গায় আদ্যুদাত্ত ৬।৭৫।১০)। আদ্যুদাত্ত ক্লীবলিঙ্গ ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যবহার আছে দুটি জায়গায় (১।১৫।৫, ২।৩৬।৫), বোঝায় ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর সোমপাত্র। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মশক্তি অর্থে অথর্বসংহিতায় শব্দটির একাধিক প্রয়োগ আছে : *উদ্যমানং তদ্ ব্রাহ্মণং পুনরস্মানুপৈতু ৭।৬৮।১; *পুন-র্মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণং চ ৭।৬৯।১০; *জ্যেষ্ঠং য়ে ব্রাহ্মণং বিদুস্তে স্কম্ভমনুসংবিদুঃ ১০।৭।১৭; স বিদ্বান্ জ্যেষ্ঠং মন্যেত, স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ ১।৮।২০; অপূর্বেণেষিতা বাচস্তা বদন্তি য়থায়থম্, বদন্তীর্যত্র গচ্ছন্তি তদাহুর্ব্রাহ্মণং মহৎ ১০।৮।৩৩; সূত্রং সূত্রস্য য়ো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ ১০।৮।৩৭ (৩৮); তস্মাজ্ (ব্রহ্মচারিণঃ) জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠম্ ১১।৫৫।৫, ২৩। 'ব্রহ্মবাদ' বোঝাতে বেদের ব্রাহ্মণভাগে শব্দটির ব্যবহার আছে অনেকজায়গায়।

[৩] নি. ১২।৩৪।

[৪] ঋক্‌সংহিতার সোমমণ্ডলের শেষের দিকে যজ্ঞসাধ্য এই পরম ধামের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে : 'য়ত্র জ্যোতিরজস্রং, য়স্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্...য়ত্রাবরোধনং দিবঃ...। য়ত্রানুকামং চরণম্... লোকা য়ত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ। য়ত্র কামা নিকামাশ্চ য়ত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্, স্বধা চ য়ত্র তৃপ্তিশ্চ...য়ত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে, কামস্য য়ত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামৃতং কৃধি (৯।১১৩।৭-১১)।

যায়, তেমনি জ্ঞান বা অন্তরের ভাব দিয়েও করা যায়। ব্রাহ্মণে এর সুস্পষ্ট সূচনা আছে। ক্রিয়ার বিধান সেখানে দেওয়া হয়েছে কোনও রহস্যভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে এবং ফলের বেলায় বলা হয়েছে, এ-ফল সেও পায় 'য় এবং বেদ'।[৭]

বেদের ব্রাহ্মণভাগ সুতরাং কর্ম এবং জ্ঞানের সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্রিয়ার যেমন রহস্য জানা চাই, তেমনি তার উপনিষদ্‌ও জানা চাই। রহস্য হল প্রয়োগবিজ্ঞান, আর উপনিষদ্ তত্ত্ববিদ্যা। দুটি নিয়েই ব্রাহ্মণ। তার মাঝে কর্ম ও জ্ঞানে কোনও বিরোধ নাই। ব্রাহ্মণে যেমন প্রয়োগের মীমাংসা আছে, তেমনি তত্ত্বের মীমাংসাও আছে। তারই ন্যায়সিদ্ধ রূপ আমরা পাই পরবর্তী যুগের পূর্বমীমাংসায় এবং উত্তরমীমাংসায়। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক পরিশেষ। ওতেই বেদবিদ্যার অন্ত বা 'বেদান্ত'।

আধুনিক পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন, সংহিতার যুগের পর ব্রাহ্মণের যুগ। ভাষার বিচারে তা-ই মনে হয়। কিন্তু ভাষার সাক্ষ্যে অথর্বসংহিতা ঋক্‌সংহিতার চাইতে অর্বাচীন প্রমাণিত হলেও অথর্ববিদ্যার যেমন ত্রয়ীবিদ্যার সামসময়িক হতে বাধা নাই, এক্ষেত্রেও তা-ই হতে পারে। মন্ত্র ছিল অথচ কোনও জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছিল না, এ হতে পারে না। তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মোদ্যের অনেক উদাহরণ আমরা ঋক্‌সংহিতাতেই পাই। ঋক্‌সংহিতার বুনিয়াদ হল সোমযাগ, যা সকল যাগের শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যজুর্মন্ত্র ছাড়া হয় না, সুতরাং যজুর্মন্ত্র বরাবরই ছিল। যজুঃসংহিতায় দেখি, মন্ত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ জড়িয়ে আছে—কৃষ্ণযজুঃসংহিতায়। যজুর্বেদ কর্মবেদ, সুতরাং প্রয়োগবিজ্ঞান তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে, এ স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণের ধাঁচে রচিত কিছু মন্ত্র অথর্বসংহিতাতেও পাওয়া যায়।[৮] কাজেই মন্ত্রসাহিত্যের সামসময়িক ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অভাব ছিল না, এ-অনুমান অসঙ্গত নয়।

ব্রাহ্মণসাহিত্য স্থাণু ছিল না কেন, তা সহজেই বোঝা যায়। পদ্যবন্ধের স্থাণুত্ব আমরা গদ্যবন্ধে আশা করিতে পারি না, বিশেষত তা যদি মীমাংসা বা বিতর্কের বাহন হয়। বিতর্ক চরিষ্ণু মনের ধর্ম, যুগে-যুগে তার রূপ বদলাবেই। অনেক ব্রাহ্মণ নষ্ট হয়ে গেছে, এখানে-সেখানে উল্লেখ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা যে-ব্রাহ্মণগুলি পাচ্ছি, তা হল একটা প্রবহমান ধারার শেষ পর্বের। সূত্রসাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে-সঙ্গে কর্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণের ধারা রুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ বা উপনিষদের ধারা অব্যাহতই রইল। কেননা, কর্মকে বিধিবদ্ধ করতে পারলেই তা স্থাণুরূপ ধরে এবং মানুষের রক্ষণশীল মন তাতে আশ্বস্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানের এষণা

---

[৭] এই উক্তিটি ব্রাহ্মণের যত্র-তত্র। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছেঃ 'উভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি (১।১।১০)। ঋক্‌সংহিতার পূর্বোল্লিখিত সূক্তটিতেও আছে, 'ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব' (৯।১১৩।২)। অবিদ্বানের সোমযাগের প্রতি কটাক্ষ করে অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 'সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিষন্ত্যোষধিম্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন' (১০।৮৫।৩)। দ্রব্যযজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ, এইগুলি তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণের এই মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্যঃ 'তত্তদ্ বিধিসমীপে "য় এবং বেদ" ইতি বচনানি বেদনাদেব ফলং ব্রুবতে।...বেদনফলবচনানি তু নানুবাদকানি, নাপি বাধ্যানি। তস্মাদর্থবাদত্বেঽপি অন্যেষাং স্বার্থে প্রামাণ্যম্।' (আনন্দাশ্রম সং পৃঃ ৫)।

[৮] দ্র. ৮।১০, ১১।৩, ১৫।৪; ব্রাহ্মণের 'য় এবং বেদ' এই ভণিতাটিও এগুলিতে পাওয়া যায়।

তাকে নিত্য-নূতনের পথে ছোটায়। হিন্দু-সমাজও আচারে স্থাণু, কিন্তু বিচারে চরিষ্ণু —এ তার একটা বৈশিষ্ট্য। বোধহয় সব সমাজই অল্প-বিস্তর তা-ই।

মোটের উপর মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাচীনেরাও দুয়ের সমাহারকেই বেদ বা শ্রুতি বলতেন। ব্রাহ্মণসাহিত্যের শেষ পর্বেও মন্ত্ররচনার বিরতি ঘটেনি। ব্রাহ্মণের মাঝে-মাঝে অনেক গাথা পাওয়া যায়। এগুলি প্রাচীন মন্ত্রসাহিত্যেরই সগোত্র।[৭]

ব্রাহ্মণসাহিত্যের তিনটি ভাগ—ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষৎ। তিনটি ওতপ্রোত। শুধু ভাষার বিচারে তাদের মধ্যে ক্রমিক পরিণামের কল্পনা করা অযৌক্তিক, এ-ইঙ্গিত আগেই করেছি। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি ভাগকে আলাদা-আলাদা করে ধরা যাক্।

শুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রধান বিষয়বস্তু হল যজ্ঞবিধি। সোমযাগে চার শ্রেণীর ঋত্বিক্ দরকার হয়। তাঁদের বিনিযোজ্য মন্ত্রের সংগ্রহ আছে চারটি সংহিতায়। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে যুক্ত আছে তার ব্রাহ্মণ। সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরাপুরি বিবৃতি একটি ব্রাহ্মণ হতে পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণে আমরা পাই প্রধানত হোতৃগণের কর্তব্যের পরিচয়; তেমনি সামবেদের ব্রাহ্মণে উদ্‌গাতৃগণের এবং যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে অধ্বর্যুগণের। অথর্ববেদে শ্রৌতকর্মের প্রাধান্য নাই। অথচ সোমযাগে ব্রহ্মগণের ঋত্বিক্‌ও দরকার হয় এবং তাঁদের বিনিযোজ্য কিছু মন্ত্র অথর্বসংহিতাতেও আছে। সংহিতার একটি ব্রাহ্মণও আছে, যাকে ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলে মনে করা হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মণে যজ্ঞবিধির বিবরণ সোজাসুজি নাই, তার সঙ্গে আরও-কিছু প্রসঙ্গ জুড়ে দেওরা হয়েছে। সেগুলির নাম হল **অর্থবাদ**। আবার কখনও-কখনও একটা বিধি সম্পর্কে যখন বিকল্প বা মতভেদ দেখা দেয়, তখন তার **মীমাংসা** দরকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, তার লক্ষ্য কি, সে-লক্ষ্যের স্বরূপই-বা কি, এসব তত্ত্বের বিজ্ঞান বা **উপনিষদ্**ও ব্রাহ্মণের অঙ্গ। সুতরাং সবশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু দাঁড়াল বিধি অর্থবাদ মীমাংসা এবং উপনিষদ্।[৮] ব্রাহ্মণের মাঝে যা আমরা নানা অর্থবাদ দ্বারা পল্লবিত আকারে দেখি, তারই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাই সূত্রে।

---

[৭] এই ধারার অনুবৃত্তি আমরা দেখতে পাই মহাভারতেও : তু. উপমন্যুর অশ্বিদ্বয়স্তুতি (আদি ৩।৫৭-৬৮)। মহাভারতকার এগুলিকে 'ঋক্' বলছেন—'বাগ্‌ভির্ঋগ্‌ভিঃ'। কিছু পরে উতঙ্কের সর্পস্তুতিকে বলা হচ্ছে 'শ্লোক', তারপরেই তাঁর পুরুষাদিস্তুতিকে বলা হচ্ছে 'মন্ত্রবৎ শ্লোক'। ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ বলছেন, 'মন্ত্রবদ্ বেদগতঋগ্‌ভাগবৎ।' এর পরের ধাপই হল পৌরাণিক দেবস্তোত্র।

[৮] ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু নিয়ে আচার্যদের মধ্যে মতভেদ আছে। জৈমিনির সূত্র হতে মনে হয়, তাঁর মতে বিধি আর অর্থবাদ এই দুই নিয়ে ব্রাহ্মণ। ন্যায়সূত্রকার গৌতমের বিভাগ হল বিধি অর্থবাদ এবং অনুবাদ (২।১।৬২)। অর্থবাদকে আবার তিনি চার ভাগ করেছেন—স্তুতি নিন্দা পরকৃতি এবং পুরাকল্প। মীমাংসকেরা করেছেন তিন ভাগ—গুণবাদ অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদ। আবার ভূতার্থবাদের বিভাগ হল স্তুত্যর্থবাদ নিন্দার্থবাদ ফলার্থবাদ পরকৃতি পুরাকল্প এবং মন্ত্র। মাধবাচার্যের মতে অর্থবাদ বোঝাতে পারে হেতু নির্বচন নিন্দা প্রশংসা সংশয় বিধি পরকৃতি পুরাকল্প এবং অবধারণকল্পনা। এদের মধ্যে পরকৃতি হল অন্য কোনও সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার বর্ণনা। পুরাকল্পে থাকে কোনও অতীত কাহিনীর বিবৃতি। এইগুলিই পরে ইতিহাস-পুরাণে পল্লবিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক দার্শনিক তত্ত্বেরও বীজ পাওয়া যায়। মীমাংসকদের মধ্যে যাঁরা বেদকে কেবল বিধিপর বলতে চান, তাঁরা উপনিষদকেও অর্থবাদের মধ্যে ফেলেন।

ব্রাহ্মণের বিধিভাগ হতে 'কল্পসূত্র'গুলির উদ্ভব, আর তার মীমাংসা ও উপনিষদ্ অংশ অবলম্বন করে যথাক্রমে গড়ে উঠেছে পূর্বমীমাংসাসূত্র আর উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত-সূত্র। ব্রাহ্মণ এবং তার অনুবৃত্তি আরণ্যক অন্যান্য বেদাঙ্গের মূল।

মোটের উপর বৈদিক সাহিত্যের শেষযুগে আমরা যা-কিছু পাই, সেসবেরই বীজ ছিল তার আদিযুগেই। কালক্রমে বিষয়বস্তুর বিস্তার এবং পারিপাট্য ঘটেছে, কিন্তু তার স্বরূপের কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। প্রাণের পরিণামও এইভাবেই ঘটে—যেমন ভ্রূণ হতে শিশু, শিশু হতে যুবা, যুবা হতে বৃদ্ধ। বোঝবার সুবিধার জন্য প্রাণপরিণামকে আমরা পর্বে-পর্বে ভাগ করতে পারি, কিন্তু সে-ভাগ কৃত্রিম। আগা-গোড়া প্রাণের একটানা একটা প্রবাহ চলছে, এই হল আসল সত্য। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করবার বেলায় এই কথাটি মনে রাখতে হবে, কেননা সে-সাহিত্য মৃত নয়, জীবন্ত। যে-বীজভাবের প্রেরণা এই সাহিত্যের গোড়ায়, তার পরিণাম এখনও শেষ পর্বে গিয়ে পৌঁছয়নি। সেকথা যথাস্থানে আলোচনা করব।

২

এইবার প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণগুলির আলাদা-আলাদা পরিচয় নেওয়া যাক্।

প্রথমেই ধরা যাক্ ঋক্‌সংহিতার ব্রাহ্মণ। ঋক্‌সংহিতা প্রধানত দেবতার প্রশস্তি-মন্ত্রের সঙ্কলন, সুতরাং তার ব্রাহ্মণে রয়েছে যজ্ঞের হোতৃকর্মের বিবৃতি এবং ব্যাখ্যা। ঋক্‌সংহিতার দুটি ব্রাহ্মণ এখনও পাওয়া যায়—**ঐতরেয়** এবং **শাঙ্খায়ন**। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের সঙ্কলয়িতা মহিদাস ঐতরেয়। ব্রাহ্মণটিতে মোটের উপর চল্লিশটি অধ্যায়, পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে একেকটি 'পঞ্চিকা'। প্রথম ষোল অধ্যায়ে আছে 'অগ্নিষ্টোম' যাগের বিবরণ। অগ্নিষ্টোম একটি সোমযাগ, যা সমস্ত সোমযাগের প্রকৃতি বা আদর্শ। চারদিন ধরে ভূমিকা করে আসল যাগটি হয় একদিনে। তারপর দুটি অধ্যায়ে আছে 'গবাময়ন'-যাগের বিবরণ। এটিও সোমযাগ, কিন্তু চলে ৩৬০ দিন বা এক চান্দ্র সংবৎসর ধরে। তারপর ১৯ হতে ২৪ অধ্যায় পর্যন্ত 'দ্বাদশাহে'র বিবরণ। এও একটি সোমযাগ, চলে বার দিন ধরে। তারপর ২৫ হতে ৩২ অধ্যায় পর্যন্ত 'অগ্নিহোত্র'-যাগের বিবরণ, যা শ্রৌতযাগের মধ্যে সবচাইতে সরল। অগ্নিহোত্রীকে সারাজীবন ধরে প্রত্যহ এই যাগ করতে হয়। ব্রাহ্মণের বাকী অংশটুকু 'রাজসূয়'-যজ্ঞের বিবরণ। যজমান ক্ষত্রিয়। এই অংশেই হরিশ্চন্দ্র-রোহিত-শুনঃশেপের উপাখ্যানটি আছে। 'চরৈব'-গাথাটি তার অন্তর্গত।[১] আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন, প্রথম পাঁচটি পঞ্চিকাই ব্রাহ্মণটির প্রাচীনতম অংশ।

শাঙ্খায়নব্রাহ্মণও একই ধাঁচের। তার অধ্যায়সংখ্যা ত্রিশ। প্রথম ছয় অধ্যায়ে আছে

[১] কাহিনীটির বীজ ঋক্‌সংহিতাতেই পাওয়া যায় (৫।২।৭; ১।২৪।১২, ১৩, ২৫।১১)। শেষের ঋক্‌গুলি শুনঃশেপের উপমণ্ডলের অন্তর্গত (১।২৪-৩০)।

অগ্ন্যাধান অগ্নিহোত্র দর্শ-পৌর্ণমাস এবং চাতুর্মাস্য যাগের বিবরণ। এগুলি হবির্যজ্ঞ, এতে সামগানের দরকার হয় না। বিশেষভাবে অগ্ন্যাধান করে বা আহিতাগ্নি হয়ে শ্রৌতযজ্ঞের অধিকার পাওরা যায়। অগ্নিহোত্র যেমন প্রতিদিন করতে হয়, দর্শ এবং পৌর্ণমাস তেমনি করতে হয় অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমাতে। এই দুটি যাগ হল সমস্ত ইষ্টিযাগের প্রকৃতি বা আদর্শ। চাতুর্মাস্য-যাগ[১০] চারপর্বে সারাবছরে চারবার করতে হয় চারমাস পর-পর। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (এখনকার দোলের দিনে)। তারপর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় (গুরুপূর্ণিমায়) দ্বিতীয় পর্ব, কার্তিকী পূর্ণিমায় (রাসে) তৃতীয় পর্ব। তারপর ফাল্গুনের শুক্লপ্রতিপদে চতুর্থ পর্ব। শাংখায়নব্রাহ্মণের সপ্তম অধ্যায় হতে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত সোমযাগের বিবরণ। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিশেষ গরমিল নাই। এই ব্রাহ্মণটিতে শ্রৌতযজ্ঞগুলি বেশ শৃংখলার সঙ্গে সাজানো। লক্ষণীয়, এই যজ্ঞগুলি অনুষ্ঠিত হয় আদিত্যের গতিকে অনুসরণ করে—অহোরাত্র, পক্ষদ্বয়, মাস বা ঋতুপর্যায় এবং সংবৎসরকে কালমানের একক ধরে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব।

আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন, ঋক্‌সংহিতার দুটি ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐতরেয় প্রাচীনতর। দুটি ব্রাহ্মণেরই আরণ্যক এবং উপনিষৎ অংশ এখনও পাওরা যায়।[১১]

৩

সামবেদের নয়টি ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনটি প্রধান—জৈমিনীয়শাখার **জৈমিনীয়** বা তলবকার ব্রাহ্মণ, কৌথুমীয় এবং রাণায়ণীয়শাখার **তাণ্ড্য** বা পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র বা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ[১২] বাকী ব্রাহ্মণগুলিকে 'অনুব্রাহ্মণ'ও বলা হয়।

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণকে পণ্ডিতেরা একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ বলে মনে করেন।[১৩] ব্রাহ্মণটি মোটের উপর আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অধ্যায় কর্মকাণ্ড। চতুর্থ হতে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত ভাগটির নাম 'উপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ'[১৪]—এটি আরণ্যক এবং উপনিষদের সংমিশ্রণ। প্রসিদ্ধ তলবকার বা কেনোপনিষদ্‌ সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডে আরম্ভ হয়ে একবিংশ খণ্ডে শেষ হয়েছে। এরপর আরও সাতটি খণ্ডে সপ্তম অধ্যায় শেষ হয়ে

---

[১০] এই যাগটি সৌমিকও হতে পারে। দ্র. তা. ব্রা. ১৭।১৩-১৪।

[১১] আপস্তম্ব তাঁর শ্রৌতসূত্রে একটি 'বহ্বৃচব্রাহ্মণ' বা ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ হতে কিছু উদ্ধরণ দিয়েছেন, যা ঐতরেয় বা শাংখায়ন ব্রাহ্মণে পাওরা যায় না। এইখানে তাহলে একটি লুপ্ত ব্রাহ্মণের উদ্দেশ মিলছে।

[১২] এছাড়া নানাজায়গায়, বিশেষত সায়ণের ভাষ্যগ্রন্থে 'শাট্যায়নব্রাহ্মণ' হতে অনেক উদ্ধরণ পাওরা যায়। উদ্ধরণগুলি জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের সঙ্গে কোথাও-কোথাও মেলে। এটি জৈমিনীয়শাখারই একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ ছিল, এখন লুপ্ত হয়ে গেছে।

[১৩] নামান্তর 'তলবকার ব্রাহ্মণ'। তলবকার একজন প্রাচীন শাখাপ্রবর্তক ঋষি, পাণিনির গণ-পাঠে (৪।৩।১০৬) তাঁর উল্লেখ আছে। সামবেদের এই শাখার নাম জৈমিনীয় কেন হল বলা যায় না।

[১৪] নামান্তর 'গায়ত্রোপনিষৎ'। তু. 'এবং বা এতং গায়ত্রস্যোদ্‌গীথমুপনিষদমমৃতম্‌ (৪।১৬), সৈষা শাট্যায়নী গায়ত্রস্যোপনিষদেবমুপাসিতব্যা (৪।১৭)'

গেছে। অষ্টম অধ্যায়টির নাম 'আর্ষেয়ব্রাহ্মণ', তাতে সামসংহিতার গ্রামগেয় এবং অরণ্যগেয় গানের সামসমূহের ঋষি ছন্দ ও দেবতা প্রভৃতির একটি অনুক্রমণী আছে। আর্ষেয়ব্রাহ্মণকে একটি অনুব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়।[১৫]

তারপর **তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ**। সঙ্কলয়িতা ঋষি তাণ্ড্য। ব্রাহ্মণটিতে পঁচিশটি অধ্যায় আছে বলে তার আরেক নাম 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ'। তাণ্ড্যব্রাহ্মণের আর জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু প্রায় একই, তবে কিনা জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের আখ্যানভাগ তাণ্ড্যব্রাহ্মণের চাইতে বেশী সমৃদ্ধ এবং তার একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। কিছু-কিছু অতিপ্রাচীন 'তান্ত্রিক' অনুষ্ঠানের বিবরণ জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, যা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে বর্জিত হয়েছে—সম্ভবত শিষ্টাচারবিগর্হিত বলে। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়টি যজুর্মন্ত্রের একটি সংহিতা, আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়টিতে 'বিষ্টুতি' বা স্তোমরচনার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে অনুরূপ কিছুই নাই।

সামগান সোমযাগেই হয়। সুতরাং সামবেদীয় ব্রাহ্মণে কেবল সোমযাগেরই বিবরণ পাওয়া যায়। যে-সোমযাগ একদিনে নিষ্পন্ন হয়, তার নাম **'একাহ'**—যেমন জ্যোতিষ্টোম[১৬] গোষ্টোম আয়ুষ্টোম অভিজিৎ বিশ্বজিৎ সর্বজিৎ ইত্যাদি। দুদিন হতে এগার দিন পর্যন্ত লাগলে সে-যাগকে বলে **অহীন**—যেমন কয়েকরকমের অতিরাত্র-সংস্থাক যাগ, দ্বিরাত্র, ত্রিরাত্র, চতুরাত্র **পঞ্চরাত্র, নবরাত্র**, এগার দিনে সাধ্য পৌণ্ডরীক যাগ ইত্যাদি। তাণ্ড্যব্রাহ্মণ অগ্নিষ্টোমকে—যা জ্যোতিষ্টোমেরই প্রকারভেদ—বলছেন 'জ্যেষ্ঠযজ্ঞ'।[১৭] এইটিই সব একাহ এবং অহীনযাগের প্রকৃতি বা আদর্শ। তারপরে বারদিনে সাধ্য **দ্বাদশাহ** যাগ, যাকে মীমাংসকেরা অহীন এবং সত্র দুইই বলেন। **সত্র** হল যে-সোমযাগ করতে বার দিনের বেশী লাগে। সত্র তের দিন থেকে একশ' দিন, এক বছর, তিন বছর, বার বছর—এমন-কি একশ' বছর, হাজার বছর পর্যন্ত চলতে পারে। শেষের দুটি অবশ্য রূপক। মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ অথবা বিশ্বের সৃষ্টি-ব্যাপারটাই প্রজাপতির যজ্ঞ, এই তার অর্থ। সংবৎসরসাধ্য 'গবাময়ন' হল সমস্ত সত্রের প্রকৃতি। তাণ্ড্য এবং জৈমিনীয় দুটি ব্রাহ্মণে একাহ অহীন দ্বাদশাহ এবং সত্রের বিবরণ আছে—অবশ্য উদ্গাতৃগণের দিক থেকে। তাছাড়া তাণ্ড্যব্রাহ্মণের নবম অধ্যায়ে সোম-প্রায়শ্চিত্তের বিবরণও আছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে চারটি 'ব্রাত্যস্তোম' নামে একাহের কথা আছে।[১৮] এই যাগগুলির উদ্দেশ্য ব্রাত্যদের বৈদিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা। এসম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি।

ব্রাত্য কারা, তা ব্রাহ্মণে স্পষ্ট করে কোথাও বলা হয়নি। বৈদিক সাহিত্যের নানা-জায়গায় ব্রাত্যদের সম্বন্ধে যেসব কথা ছড়িয়ে আছে, সেগুলি গুছিয়ে নিলে ভারতবর্ষের

---

[১৫] আচার্য শঙ্কর তাঁর কেনোপনিষদ্ভাষ্যের ভূমিকায় জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে অধ্যায়ক্রম অন্যরকম। শঙ্কর বলছেন, প্রথম আট অধ্যায়ে কর্মকাণ্ড, প্রাণোপাসনা, কর্মাঙ্গ-সামোপাসনা, গায়ত্রসামবিষয়ক দর্শন এবং বংশক্রমের কথা আছে, নবম অধ্যায় হতে পরব্রহ্মবিষয়ক কেনোপনিষৎ আরম্ভ হল।

[১৬] অগ্নিষ্টোম এরই অন্তর্গত।

[১৭] ৬।৩।৮

[১৮] জৈ. ব্রা. তিনটির কথা বলেছেন।

আর্যসাধনার বিবর্তনের একটা সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ভাবনাকে বোঝবার পক্ষে তার উপযোগিতা অসীম।

অন্যত্র বলেছি, আর্যভাবনার দুটি ধারা—একটি বৈদিক, আরেকটি অবৈদিক। রাজশক্তির পোষকতায় বৈদিক ধারাটি ক্রমে আভিজাত্যের মর্যাদা অর্জন করে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম নামে পরিচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম মূলত দেববাদী, তার আচারানুষ্ঠানের পরিচয় আমরা পাই বৈদিক শ্রৌত- গৃহ্য- এবং ধর্ম-সূত্রে। ধর্মসূত্র হতেই ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির উদ্ভব, যা আজ পর্যন্ত হিন্দুসমাজকে শাসন করছে। ব্রাহ্মণ্যভাবের বাহন হল সংস্কৃতভাষা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম জীবন্ত, সুতরাং প্রাণশক্তির প্রেরণায় তার গণ্ডির বাইরে থেকে অনেক-কিছু সে আত্মসাৎ করেছে। যাকেই সে আত্মসাৎ করতে চেয়েছে, তাকেই সে 'সংস্কৃত' করে নিয়েছে, এই তার একটা চিরাচরিত রীতি।

ব্রাহ্মণ্যসমাজের অভিজাত অংশ গড়ে উঠল বেদের ভাষায় বলতে গেলে 'ব্রহ্ম' এবং 'ক্ষত্র'কে নিয়ে। তারই অনভিজাত অংশ হল 'বিশ্' বা সাধারণ গণ। এই থেকে ত্রৈবর্ণিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব। বিশেরা বেদপন্থী হলেও অভিজাতদের থেকে দূরে থাকার ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাসে এবং ধর্মাচরণে খানিকটা সরলতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, যেমন এযুগেও আমরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বেলায় দেখি। এই বেদপন্থী অথচ অনভিজাত আর্য-গণসমাজের সাধনা-ভাবনার বাহন হল 'ইতিহাস-পুরাণ', যা প্রাচীন ব্রাহ্মণে 'পঞ্চম বেদ' বলে গণ্য হয়েছে। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৈদিক ধর্মের পরের যুগে দেখা দিয়েছে, এ-ধারণাটা ভুল। অথর্ববেদ যেমন ভাবের দিক দিয়ে ঋগ্‌বেদের সমকালীন, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ত্রয়ীবিদ্যায় হল বৈদিক ভাবনার একটা দিকের প্রকাশ, অথর্বাঙ্গিরস এবং ইতিহাস-পুরাণে হল আরেকটা দিকের। সর্বত্রই গণসমাজ হয় ক্ষেত্র এবং তার রস শোষণ করে আভিজাত্যের বনস্পতি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বেদের তৈত্তিরীয়সংহিতাও একথা স্বীকার করেছেন।[১১]

একই সমাজের মধ্যে বৈদিক ভাবনার পাশে অবৈদিক ভাবনার একটা খরস্রোত বয়ে চলেছিল। অবৈদিকেরাও আর্য, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে এবং ধর্মাচরণে বৈদিকদের থেকে একান্ত পৃথক। এঁরা দেববাদী নন, ক্রিয়াবিশেষবহুল আচারানুষ্ঠানকেও মানেন না। আধুনিক যুগে বাংলাদেশের ব্রাহ্ম এবং হিন্দুর মাঝে যে-তফাত, অবৈদিক এবং বৈদিক আর্যের মাঝেও সেই তফাত। ব্রাহ্মরাও হিন্দু, কিন্তু তারা বুদ্ধিবাদী। বুদ্ধিবাদীদের একটা প্রাচীন সংজ্ঞা হল 'বৌদ্ধ' (Rationalist)। সংজ্ঞাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে বলতে পারি, আর্যভাবনা প্রাচীনতম যুগ হতে দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে—একটি ব্রাহ্মণ্য, আরেকটি বৌদ্ধ। একটির দর্শনের নাম 'মীমাংসা', আরেকটির দর্শন 'তর্ক'। একটির সৃষ্টি 'বেদান্ত', আরেকটির 'সাংখ্য' বা 'সিদ্ধান্ত'। একটির সাধন 'শ্রদ্ধা', আরেকটির 'তপঃ'। একটির সাধনা 'যাগ', আরেকটির 'যোগ'। একটি 'ব্রহ্মবাদী', আরেকটি 'আত্মবাদী'। একটির সাধক 'ঋষি', আরেকটির সাধক 'মুনি'। একটি ভজে 'দেবতাকে', 'মানুষগুরুকে'—নেপালী ভাষায় তারা আজও 'দে-ভাজু'। একটির চরম

---

[১১] তু. বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তস্মাত্ত আদ্যাঃ...ভূয়াংসোঽন্যেভ্যঃ ৭।১।১।৫। দ্র. তা. ব্রা. ৬।১।১০।

অনুভব 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', আরেকটির 'মানুষাৎ পরতরং নহি'। তাই একটির চরম প্রমাণ হল 'শ্রুতি', আরেকটির 'আপ্ত'। একটির মাধ্যম 'সংস্কৃত', আরেকটির 'প্রাকৃত'।

আবহমানকাল এই দুটি ধারার যুক্তবেণী ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তারা পরস্পরকে আঘাত করেছে, আবার দিয়েছে-নিয়েছেও। দুটিতে ভারতবর্ষের সাধনা-ভাবনায় এমনভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে যে আজ তাদের পৃথক্ করা অসম্ভব।

স্বভাবতই বিশেরা ছিল বৈদিক এবং অবৈদিক উভয় ভাবনার প্রচারক্ষেত্র। বিশেরা বৈদিক এবং অবৈদিক দুজনকেই মেনেছে, দুয়ের সাধনা-ভাবনাকেই সরল করে নিজেদের উপযোগী করে নিয়েছে। তাইতে ভারতবর্ষে কয়েকটি বিরাট গণধর্মের উদ্ভব হয়েছে। এই ধর্মগুলির পরিচয় পাই যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ইতিহাস-পুরাণে বা পঞ্চম বেদে, তেমনি নানা 'বৌদ্ধ'শাস্ত্রে। মোটের উপর বলতে পারি, গণধর্মের দুটি প্রধান ধারা, একটি 'ভাগবত', আরেকটি 'শৈব'। শাক্তধর্ম দুয়ের মাঝামাঝি, দুটির মাঝেই শক্তি সঞ্চার করে তাদের পল্লবিত এবং পুষ্পিত করেছে। ভাগবত ধারাটি বৈদিক-ভাবঘেঁষা, আর শৈবধারাটি অবৈদিক-ভাবঘেঁষা। কিন্তু দুটি ধারাই আর্য এবং অতি আদিম। ভাগবতদের কথা পরে হবে, এবার শুধু ব্রাত্যদের নিয়ে আলোচনা করে শৈবধারার ইতিহাসের উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করব।

ব্রাত্য সংজ্ঞাটি সংঘ বা গণবাচী 'ব্রাত' শব্দ[২০] থেকে এসেছে। মনে হয়, ব্রাত্যেরা দলবদ্ধ হয়ে থাকত, এবং তাদের দলকে-দল ব্রাত্যস্তোমের অনুষ্ঠানের ফলে যাজ্ঞিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত—অনেকটা আধুনিক 'শুদ্ধীকরণে'র মত। কাত্যায়নের ভাষায় তখন ব্রাত্যেরা 'ব্যবহার্য্যা ভবন্তি'—তাদের সঙ্গে বৈদিকদের ব্যবহার চলত।[২১]

তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে চারটি ব্রাত্যস্তোম যথাক্রমে হীন নিন্দিত কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ ব্রাত্যদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ব্রাত্যদের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বর্ণনাটির কোনও-কোনও শব্দের অর্থ অস্পষ্ট। তাহলেও মোটামুটি বোঝা যায়, 'ব্রাত্যেরা ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না, কৃষি বা বাণিজ্যও করে না। তারা জনসাধারণের কাছ থেকে ব্রাহ্মণের অন্ন জোর করে খায়, তাদের ভাষা অমার্জিত, অদণ্ড্যকে তারা দণ্ড দিয়ে আঘাত করে অর্থাৎ জোরজবরদস্তি করা তাদের স্বভাব, অদীক্ষিত হয়েও তারা দীক্ষিতের মত কথা বলে।...তাদের থাকে মাথায় পাগড়ি, হাতে পাচনবাড়ি আর খালি ধনু, তাদের রথের আসন বেশ চওড়া আর সেগুলি পথে-বিপথে যেতে পারে, তাদের কাপড়ের রং কালো, তার পাশে কালো আর সাদা ভেড়ার চামড়া সেলাই করা থাকে, গলায় থাকে রূপার হাঁসুলি। কারও-কারও কাপড়ের লাল পাড় কিন্তু আঁচলের দিকটা মুড়ি দেওয়া নয়, পায়ে জুতা, কোমরে তেমনি সাদা-কালো চামড়া জড়ানো। কোনও কোনও ব্রাত্য গৃহপতি অর্থাৎ তারা মোড়ল।'

এই ব্রাত্যদের বেশভূষাগুলিকে ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে 'ব্রাত্যধন'। ব্রাত্যস্তোমের শেষে এই ব্রাত্যধন দক্ষিণাস্বরূপে যাকে দেওয়া হয়, ব্রাত্যদের সমস্ত পাপ তার ঘাড়ে গিয়ে

---

[২০] তু. ঋ. স. অনুব্রাতাসস্তর সখ্যামীয়ুঃ ১।১৬৩।৮; ব্রাতং-ব্রাতং গণং-গণম্ ৩।২৬।৬, ৫।৫৩।১১; রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব ১০।৩৪।১২; জীরং ব্রাতং শকেমহি ১০।৫৭।৫...।

[২১] শ্রৌ. সূ. ২২।৪।৩০

চাপে। লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রে আছে 'ব্রাত্যেভো ব্রাত্যধনানি য়ে ব্রাত্যচর্যায়া অবিরতাঃ স্যুঃ, ব্রহ্মবন্ধবে বা মাগধদেশীয়ায়'[২২]—ব্রাত্যধন দিতে হবে তাদের, যারা ব্রাত্যাচার এখনও ছাড়ে নি, কিংবা মগধদেশের কোনও ব্রহ্মবন্ধুকে।

অথর্বসংহিতায় একটি ব্রাত্যকাণ্ড আছে (১৫)। সেখানে ব্রাত্য হীন বা নিন্দিত নন, পরন্তু অতি প্রশস্ত। ব্রাত্য সেখানে পরম-পুরুষ। 'ব্রাত্য ৱা ইদ্ অগ্র আসীৎ, ঈয়মান এর প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ'[২৩]—সৃষ্টির আদিতে এই ব্রাত্যই ছিলেন, তিনিই প্রজাপতিকে প্রেরণা দেওয়াতে প্রজাপতি তাঁর আত্মনিহিত সুবর্ণ জ্যোতি হতে বিশ্বের মূলতত্ত্বরূপে সৃষ্টি করলেন তপঃ সত্য এবং ব্রহ্ম, তার ফলে এই জগৎ উৎপন্ন হল। তাতে এই ব্রাত্য আবির্ভূত হলেন মহাদেব ঈশান একব্রাত্যরূপে। ইন্দ্রধনুই তাঁর ধনু, তাঁর উদর নীল এবং পৃষ্ঠ লোহিত (১৫।১)। তারপর এই একব্রাত্য চরিষ্ণুরূপে পূর্বে দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণাবর্তগতিতে ছড়িয়ে পড়লেন। বিজ্ঞান হল তাঁর বাস বা আচ্ছাদন, রাত্রির অন্ধকার তাঁর কালো চুল, দিনের আলো তাঁর উষ্ণীষ, বজ্র আর বিদ্যুৎ তাঁর কুণ্ডল, নক্ষত্রের ঝিকিমিকি তাঁর মণিভূষণ। শ্রদ্ধা উষা ইরা এবং বিদ্যুৎ তাঁর নর্মসহচরী। তিনি চলেছেন মনের রথে, মাতরিশ্বা আর সোম তাঁর রথের বাহন, বাতাস সারথি, ঝড় প্রতোদ বা চাবুক। সাম দেবতা সপ্তর্ষি যজ্ঞ যজমান পশু—সবাই তাঁর অনুচর (১৫।২) তারপর তিনি দিকে-দিকে আবির্ভূত হলেন কাল বা ঋতুপর্যায়রূপে (১৫।৩, ৪)। ভব শর্ব পশুপতি উগ্র রুদ্র মহাদেব এবং ঈশান ধানুকী হয়ে যথাক্রমে পূর্বে দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে ধ্রুবে ঊর্ধ্বে এবং দিগন্তরে তাঁর অনুগামী হলেন (১৫।৫)। তারপর শুরু হল তাঁর উত্তরায়ণ—ধ্রুবা দিক্ বা পৃথিবী হতে ঊর্ধ্বদিকে, উত্তমদিকে, বৃহৎদিকে, পরমদিকে, অনাদিষ্টদিকে, অনাবৃত্তদিকে, দিকে-দিকে, দিগন্তরে। পার্থিবভূত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বেদজ্ঞান ইতিহাস-পুরাণাদিজ্ঞান, যজ্ঞ কাল এবং দেবগণ হলেন তাঁর অনুচর (১৫।৬)। তারপর তিনি সমুদ্র হয়ে সব-কিছু আচ্ছাদিত করলেন (১৫।৭)।

ব্রাত্যকাণ্ডের প্রথম অনুবাকটি এমনি করে একব্রাত্যের মহিমাবর্ণনে শেষ হয়েছে। এই একব্রাত্য যে পরম-পুরুষ, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একব্রাত্যকে যিনি জানেন, তিনি 'বিদ্বান্ ব্রাত্য।'[২৪] তাঁর মহিমার বর্ণনা রয়েছে দ্বিতীয় অনুবাকে। ঋষিদের যিনি উপাস্য তিনি যেমন একর্ষি (সূর্য), তেমনি ব্রাত্যদের যিনি উপাস্য তিনি 'একব্রাত্য' (মহাদেব)। তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যলাভই ব্রাত্য-সাধকের লক্ষ্য। ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন; তেমনি একব্রাত্যকে যিনি জানেন তিনিও একব্রাত্যই হন।

বিদ্বান্ ব্রাত্যের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যেই যেন বেশী ছিল। ব্রাত্যকাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের গোড়াতেই বলা হচ্ছে, 'সেই একব্রাত্য আরক্ত হলেন, তাইতে

---

[২২] ৮।৬।২৮

[২৩] অ. পৈপ্পলাদশাখা ১৮

[২৪] তু. 'দিব্যব্রাত্য' (জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ ২।৩)। সেখানে 'দিবঃস্তম্ভনী স্থূণা'র (স্তম্ভের মত দ্যুলোককে ধরে আছে এমন-একটি খুঁটি) কথা আছে, যা শিবলিঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাজন্যের (ক্ষত্রিয়বর্ণের) উৎপত্তি হল।...তিনি জনসাধারণের মধ্যে ('বিশঃ') ছড়িয়ে পড়লেন; সভা, সমিতি সেনা এবং সুরা তাঁকে অনুসরণ করল (১৫।৮, ৯)।

এইটুকু ভূমিকার পর শুরু হল বিদ্বান্ ব্রাত্যের কথা। বিদ্বান্ ব্রাত্য যে-রাজার বাড়িতে এসে অতিথি হন, সে-রাজা তাঁকে নিজের চাইতে বড় বলে মান দেবেন—কেননা ব্রহ্ম এবং ক্ষত্র (অর্থাৎ প্রজ্ঞা এবং বীর্য) এই ব্রাত্য হতেই উৎপন্ন হয়েছে (১৫।১০।১-৩)। বিদ্বান্ ব্রাত্য যার বাড়িতেই এসে অতিথি হন না কেন, সে-ই অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর পরিচর্যা করবে, তাঁর কোনও ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখবে না, তাতেই তার সর্বার্থ সিদ্ধ হবে (১৫।১১)। এমন-কি, বাড়িতে যদি অগ্নিহোত্রের আয়োজন হয়ে থাকে, আর এমন সময় বিদ্বান্ ব্রাত্য সে-বাড়িতে অতিথি হন, তাহলে তাঁর অনুমতি নিয়েই যাগ করতে হবে, তিনি নিষেধ করলে যাগ হবে না (১৫।১২) বিদ্বান্ ব্রাত্য যত বেশীদিন কারও ঘরে অতিথি হয়ে থাকবেন, ততই তার পুণ্য হবে। এমন-কি, কেউ যদি বিদ্বান্ না হয়েও ব্রাত্য-পরিচয়ে কারও অতিথি হয়, তারও অবমাননা না করে দেবতার মত পরিচর্যা করা উচিত (১৫।১৩)। বিদ্বান্ ব্রাত্যও একব্রাত্যের মত আত্ম-মহিমায় দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েন (১৫।১৪)। তাঁর সাতটি প্রাণ, সাতটি অপান, সাতটি ব্যান; তারাই দেবতা মানুষ জীবজন্তু পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোক দীক্ষা যজ্ঞ ইত্যাদি সব হয়েছে (১৫।১৫-১৭)। সূর্য এই ব্রাত্যের দক্ষিণ নয়ন, বাম নয়ন চন্দ্র, দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি, বাম কর্ণ সোম, অহোরাত্র নাসিকা, দিতি আর অদিতি শীর্ষ এবং কপাল। দিনের বেলায় তিনি পশ্চিমমুখী, রাত্রে পূবমুখী অর্থাৎ তিনি সূর্যস্বরূপ (১৫।১৮)।

অথর্বসংহিতার এই ব্রাত্যকাণ্ডটি ব্রাহ্মণের মত গদ্যে রচিত, এমন-কি ব্রাহ্মণের বেদনপ্রশংসাও এতে আছে। ব্রাত্যদের প্রতি তাণ্ড্যব্রাহ্মণের এবং অথর্বসংহিতার মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ একই ব্রাত্য যে উভয়ের লক্ষ্য, তাতে সন্দেহ নাই। সোমযাজী অভিজাতদের কাছে যারা নিন্দিত, গণধর্মের ধারকদের কাছে তারা যে প্রশস্ত হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই।

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের আমরা যে-পরিচয় পাই, তাতে মনে হয় ব্রাত্যেরা আর্য, তবে বেদপন্থী নয়। তারা আর্যভাষাভাষী, কিন্তু তাদের ভাষা অমার্জিত। তারাও 'দৈব' অর্থাৎ তাদেরও দেবতা আছেন। কিন্তু সে-দেবতা কে, তা তাণ্ড্যব্রাহ্মণ স্পষ্ট করে বলেননি। এই দেবতা রুদ্র হওয়া খুবই সম্ভব, কেননা ব্রাহ্মণে ও সংহিতায় অনেকসময় সোজাসুজি রুদ্রের নাম না করে তাঁকে 'অয়ং দেবঃ' বলে উল্লেখ করা হয়।[২৫] ব্রাত্যেরা কৃষি বা বাণিজ্যকে জীবিকার জন্য অবলম্বন করেনি। বৈশ্য বা জনসাধারণের তিনটি জীবিকা আছে—কৃষি, বাণিজ্য (শিল্পকর্ম তার অন্তর্ভুক্ত) এবং গোরক্ষা বা পশু-পালন।[২৬] সুতরাং তাণ্ড্যব্রাহ্মণের উক্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ব্রাত্যদের অন্যতম জীবিকা পশুপালন। রুদ্র সংহিতাতেও পশুপতি, সুতরাং তিনি স্বচ্ছন্দে ব্রাত্যদের দেবতা হতে পারেন। অথর্বসংহিতার ব্রাত্যকাণ্ডে একব্রাত্যকে বিশেষ করে ভব শর্ব পশুপতি উগ্র রুদ্র মহাদেব এবং ঈশান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋক্-

---

[২৫] তা. ১৪।৯।১২, ঐ. ৩।৩৪, কাঠক ১০।৬, ২২।১২...।
[২৬] তু. গীতা ১৮।৪৪।

সংহিতাতে রুদ্রের বিশেষ প্রহরণ ধনু—যেমন ইন্দ্রের বজ্র, মরুদ্‌গণের ঋষ্টি বা বর্শা। ব্রাত্যেরা ধানুকী, ব্রাত্যকাণ্ডের উপরিউক্ত দেবতারাও তা-ই। বাজসনেয়সংহিতার রুদ্রাধ্যায়ে (১৬) রুদ্র ধানুকী তো বটেনই, উপরন্তু তিনি পশুপতি (১৭) ব্রাত এবং ব্রাতপতি (২৫), তাঁকে 'উত গোপা অদৃশ্রন্'—গোপালকেরাও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।[২৭] একব্রাত্য নীল-লোহিত; রুদ্রাধ্যায়ের রুদ্রেরও এই বিশেষণ (৪৭), তিনি 'নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ' (৭)। উব্বট এবং মহীধর দুজনেই বলেন, নীলগ্রীব অস্তসূর্যের বর্ণনা, তখন চারদিক কালো হয়ে আসে বলে। মনে পড়ে, বিষ্ণু যেমন আলো এবং জীবনের দেবতা, শিব তেমনি অন্ধকার এবং মরণের দেবতা। ব্রাত্যদের কাপড়েও কালো এবং লাল রংএর সমাবেশ লক্ষণীয়। মোটের উপর বলা যেতে পারে, ব্রাত্যদের দেবতা বৈদিকদের রুদ্র। তিনি তাদের কাছে শিব, যেমন বৈদিকদের 'সবিতা ভগঃ' হয়েছেন পৌরাণিক 'ভগবান্'। শৈবধর্ম এবং ভাগবতধর্ম যে যজ্ঞবিরোধী গণধর্ম, তার প্রমাণ ইতিহাস-পুরাণে অজস্র পাওরা যায়।

এই গণধর্মীদের প্রাণভরে গাল দিয়েছেন তাণ্ড্যব্রাহ্মণ। সে-গালের মাঝে খেদ এবং আক্রোশের ভাবটি বেশ ফুটে উঠেছে। ব্রাত্যেরা ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না, সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাদের কোনও অনুরাগ নাই। অথচ তারা ব্রাহ্মণের অন্ন কেড়ে নেয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পাওনায় ভাগ বসায়। কেমন করে, তা দেখি অথর্বসংহিতার বিদ্বান্ ব্রাত্যের বিবরণে। বিদ্বান্ ব্রাত্য ইচ্ছা করলে যাগযজ্ঞ বন্ধ করে দিতে পারেন। কেন, তা সহজেই বোঝা যায়। বিদ্বান্ ব্রাত্যেরা জ্ঞানবাদী, অতএব কর্মকাণ্ডের বিরোধী। তাঁরাই আর্যভাবনায় সাংখ্যধারার বাহক। তাঁরাও প্রবক্তা এবং উপদেষ্টা; কিন্তু তাণ্ড্যব্রাহ্মণের মতে সেটা তাঁদের অনধিকারচর্চা—'তারা অদীক্ষিত হয়েও দীক্ষিতের মত কথা বলে।' দীক্ষা এখানে অবশ্যই সাবিত্রী দীক্ষা বা উপনয়ন। পৈতা নেয় না অথচ জ্ঞানের কথা বলে, এরা কারা তা বেশ বোঝা যায়। প্রাচীন যুগের তীর্থঙ্কর ও বৌদ্ধ হতে শুরু করে মধ্য যুগের নাথ এবং আধুনিক যুগের আউল বাউল পর্যন্ত সবাই প্রাচীন ব্রাত্যের দলে পড়ে। চিরকালই এরা অমার্জিত প্রাকৃতভাষায় তত্ত্বকথা বলে এসেছে।

বৈদিক সমাজবিন্যাসে ব্রাত্যদের স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে তাণ্ড্যব্রাহ্মণ বলছেন, তারা ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যের মাঝে পড়ে না। তাহলে তাদের কি ক্ষত্রিয়ের মাঝে ফেলা যেতে পারে? অথর্বসংহিতা কথাটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন 'রাজন্য' এবং 'বিশের' সঙ্গে একব্রাত্যকে যুক্ত করে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে আর রাজন্যে একটু তফাত করেন: 'রাজন্য' হল দ্বিতীয় বর্ণের যে-কোনও ব্যক্তি, আর 'ক্ষত্রিয়' ভূম্যধিকারী রাজা।[২৮] পুরুষসূক্তে চাতুর্বর্ণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে দ্বিতীয় বর্ণকে 'রাজন্য' বলা হয়েছে।[২৯] সম্ভবত দ্বিতীয় বর্ণের প্রাচীন নাম 'রাজন্য' বা রাজার জাত। রাজা যে-কোনও কৌমের অধিপতি।[৩০] কোন জনের ছড়িয়ে পড়াটা এইভাবে হতে পারে : প্রথমত জনের লোক

---

[২৭] মহীধর এখানে 'গোপাঃ' বলতে বুঝেছেন 'গোপালা বেদোক্তসংস্কারহীনাঃ', এটি লক্ষণীয় (১৬।৭)। ব্রাত্যেরাও তা-ই।

[২৮] ৭।২০

[২৯] ঋ. ১০।৯০।১২

[৩০] তু. ঋ. ১০।৯৭।৬।

একটা নতুন দেশে ঢুকে পড়ে (যেমন এই যুগেই দেখছি, মৈমনসিংহের মুসলমানেরা আসামে ঢুকে পড়ছে অনাবাদী জমির আকর্ষণে), তখন তারা 'বিশ্'। চাষবাস করে এবং আদিবাসীদের বশে এনে একটু গুছিয়ে বসলে তারা হয় 'রাজন্য'। নতুন সমাজ খানিকটা সুব্যবস্থিত হলে ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয় এবং রাজন্য রূপান্তরিত হয় 'ক্ষত্রিয়ে'। সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা যেমন বিশ্ থেকে দূরে সরে যায়, রাজন্যেরা তেমনি তাদের কাছাকাছি থাকে। এখনও চাষী 'রাজপুত' বা চাষী 'ছত্রী' পুরাপুরি অভিজাত ক্ষত্রিয় নয়। আর্যদের আভিজাত্যের কেন্দ্র হল কুরু-পাঞ্চাল, সেখানে সমাজ সুব্যবস্থিত। ব্রাহ্মণ সেখানে যাজ্ঞিক, ক্ষত্রিয় মূর্ধাভিষিক্ত রাজা, বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্যে রত। এই সমাজমণ্ডলের বাইরে যে-আর্যজন এখনও অনেকটা অব্যবস্থিত রয়েছে, তাদের সমাজে মুখ্যস্থান অধিকার করবে ব্রাহ্মণেরা নয়, রাজন্যেরা। এই রাজন্যদের মধ্য হতেই 'বিদ্বান্ ব্রাত্যদের' আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণ্য হয়েছেন।

অথর্বসংহিতা একনিঃশ্বাসে রাজন্য বিশ্ সভা সমিতি সেনা এবং সুরার নাম করছেন, তাতে ব্রাত্যদের দেশের একটি ছবি ফুটে উঠছে। এই সভা এবং সমিতি প্রাচীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান।[৩১] মনে হয়, সভা নির্বাচিত ব্যক্তিদের স্থায়ী পরিষৎ, আর সমিতি সর্বসাধারণের অস্থায়ী পরিষৎ। প্রথম-প্রথম দুটি একসঙ্গেই চলতে পারে (তু. গ্রামের পঞ্চায়েত আর চণ্ডীমণ্ডপ); কিন্তু রাষ্ট্র যতই বড় এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা কেন্দ্রীকৃত হয়, ততই সভা থেকে সমিতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত রাজার সভা হয় একটা পৌর প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সমিতি ছোট-ছোট জানপদ প্রতিষ্ঠান। ব্রাত্যদের সভা-সমিতিতে ব্রাহ্মণ্যযুগের পূর্বকার ধারাই বজায় ছিল। রাজন্যদের সভায় সবাই রাজা। এইধরনের গণতন্ত্র গৌতম বুদ্ধের সময়েও ছিল।

ব্রাহ্মণ সোমরস পান করেন, কিন্তু সুরাপান করেন না; অর্থাৎ মানুষের নেশা করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে তিনি সংযত এবং রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। কিন্তু ব্রাত্যদের দেশে সুরা অবাধে চলতে পারে। এটা সমাজের আদিম সংস্কৃতির অনুবর্তন।

ব্রাত্যদের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা তাণ্ড্যব্রাহ্মণের ভাল লাগেনি। তাই ব্রাহ্মণকার অবজ্ঞার সঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'ওরা অদণ্ড্যদেরও দণ্ড দেয়' অর্থাৎ ওদের দেশে ব্রাহ্মণদের সাত খুন মাপ নয়।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। পরবর্তী যুগে শক হূন পারদ খশ পৌণ্ড্র পুলিন্দ প্রভৃতি যেসব বহিরঙ্গ জনকে আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে, তারা সবাই ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা পেয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে, ভিন্ন জনকে নিজেদের করে নিয়েছেন ব্রাত্যেরাই, সবাইকে তাঁরা রাজন্যের মর্যাদা দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ অনু-শাসনকার এই ব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত এদেশের স্বাভাবিক ঔদার্যবশে স্বীকার করে নিয়েছেন মাত্র।

প্রশ্ন হবে, ব্রাত্যদের আদি দেশ কোথায়? ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দেশ হল কুরু-পাঞ্চাল। ব্রাত্যেরা তার বাইরে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ক্রমে পূবের দিকে ছড়িয়েছে। ছড়াতে গিয়ে বাধা পেয়েছে যাদের কাছে, তারাই ব্রাত্য। সংঘর্ষ ক্রমে সমন্বয়ে পরিণত

---

[৩১] দ্র. *The Vedic Age*, pp 353-54.

হয়, দেখা দেয় সংস্কৃতির রূপান্তর। বৈদিক আর্য এবং ব্রাত্য আর্যদের বেলাতেও তা-ই হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, মথুরার কৃষ্ণ, কোশলের রাম, বিদেহের বুদ্ধ—সবাই ক্ষত্রিয়, গণধর্মের নায়ক, লোকের চোখে অবতার এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঠিক অনুবর্তী নন, বরং বিরোধী। রামের বেলায় বিরোধটা সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু রাজ্য হতে তাঁর নির্বাসনটা ভাববার মত। গুহক চণ্ডাল আর বনের বানরের তিনি মিতা, এটাও লক্ষণীয়। শতপথব্রাহ্মণ স্পষ্টই বলছেন, যজ্ঞের আগুন সদানীরার (গণ্ডকের) ওপারে যায়নি।[৩২] এই পূবদেশ বৌধায়নের মতে ব্রাহ্মণবর্জিত, সেদেশে গেলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।[৩৩] এদেশের তিনটি প্রাচীন নাম পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতায় নাম হল 'কীকট'।[৩৪] ঋষি দুঃখ করে বলছেন, ওদেশে অনেক গরু আছে, কিন্তু থেকেই-বা কি, তারা যজ্ঞের কোনও কাজেই লাগে না। খেদোক্তিটা অর্থপূর্ণ। দ্বিতীয় নাম শতপথব্রাহ্মণের 'বিদেহ'। তৃতীয় নাম 'মগধের' উল্লেখ আছে অথর্ব-সংহিতায় জ্বরের দেশ বলে।[৩৫] ব্রাত্যস্তোমে একব্রাত্যের নিত্যসহচর মাগধ। ঐতরেয়া-রণ্যকে মগধের জায়গায় আছে 'বগধ';[৩৬] বগধেরা পাখির মত।[৩৭] পরবর্তী যুগে মাগধ বলতে বোঝাত চারণ-কবিদের। বাজসনেয়সংহিতার পুরুষমেধাধ্যায়ে মাগধের উল্লেখ আছে, সঙ্গে-সঙ্গে উল্লেখ আছে পুংশ্চলী কিতব এবং ক্লীবের।[৩৮] বলা হচ্ছে এরা শূদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। অর্থাৎ এরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মানে না, তবু এদের শূদ্রও বলা চলে না।[৩৯] একব্রাত্যের সহচরী পুংশ্চলী। আবার ঐ পুরুষমেধাধ্যায়েই দেখতে পাই, ব্রাত্যদের দেবতা (অবশ্য আলঙ্কারিক অর্থে) গন্ধর্ব এবং অপ্সরা। অর্থাৎ ব্রাত্যদের একশ্রেণী গানবাজনায় নিপুণ ছিল এবং তাদের মেয়েরা ছিল নটী। গন্ধর্ব-বৃত্তি মাগধ এবং অপ্সরোবৃত্তি পুংশ্চলীদের দেবতা যদি হন একব্রাত্য, তাহলে তাদের মধ্যে আমরা পূবদেশের বহুপরবর্তী যুগের গণসংস্কৃতির একটা আভাস পাই না কি? ব্রাত্যদের আচার-ব্যবহারের এইদিকটা ব্রাহ্মণদের ভাল না লাগবারই কথা। সর্বদিক মিলিয়ে বলা যেতে পারে, ব্রাত্যদের সংস্কৃতিই পরের যুগে একটা বিশিষ্ট

---

[৩২] ১।৪।১।১৪...

[৩৩] ১।১।৩১

[৩৪] ৩।৫৩।১৪

[৩৫] ৫।২২।১৪

[৩৬] ২।১।৬

[৩৭] এই অংশটির তাৎপর্য নিয়ে মতভেদ আছে। সায়ণ বলেন 'অবগধ' (বগধ নয়) বলতে বোঝায় ওষধি। প্রসঙ্গটা উঠেছে ঋক্‌সংহিতার একটি মন্ত্র-ব্যাখ্যা নিয়ে : 'প্রজা তু তিস্রো অত্যায়মীয়ুঃ' (৮।১০১।১৪)। তিনটি প্রজা (creature) কি? ঐ. আ. বলেন 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ', যার অর্থ সায়ণ করছেন পাখি, ওষধি-বনস্পতি (বঙ্গ = বৃক্ষ) এবং ইরপাদ বা সাপ। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, পাখি, ক্ষুদ্র সরীসৃপ এবং সাপ (২।৫।১১-২)। 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' জাতি বা দেশের নাম কেউ বলেন না, আধুনিক পণ্ডিতদের মত পদবিচ্ছেদও করেন না। তবে মূল ঋক্‌টির 'তিস্রঃ প্রজাঃ' অবৈদিক জন হওয়া সম্ভব, কেননা এরা অর্ক অথবা অগ্নির (শ. ব্রা. ২।৫।১।৪) উপাসনা করে না বলে উচ্ছন্ন যায়, এমন উক্তি ঋক্‌টিতে স্পষ্টই আছে।

[৩৮] ৩০।২২। তিনটি সংজ্ঞাই গালিগালাজ হওয়া বিচিত্র নয়।

[৩৯] লক্ষণীয়, পরবর্তী যুগের ধর্মশাস্ত্রে 'মাগধ' একটি প্রতিলোম সংকর জাতি, বাপ বৈশ্য (বা শূদ্র) কিন্তু মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা (বৈশ্যের) মেয়ে। তাদের বৃত্তি বণিকের বা ভাটের (দ্র. Kane, *History of Dharmashastra,* Vol. II pp, 90-91)

রূপ নিয়েছে মগধের সংস্কৃতিতে, বাঙালী যার উত্তরাধিকারী। এই সংস্কৃতিও আর্যসংস্কৃতিপ্রধান, কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে তার গরমিল প্রচুর।

তাণ্ড্যব্রাহ্মণের চারটি ব্রাত্যস্তোম চার শ্রেণীর ব্রাত্যদের জন্য—হীন নিন্দিত কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ। যারা আচারভ্রষ্ট, তারা 'হীন', আর যারা 'নৃশংসাঃ পাপ্মনা গৃহীতাঃ' তারা 'নিন্দিত'। নিন্দিতেরা হীনের চাইতেও আচার-ব্যবহারে নেমে গেছে, বোধ হয় এই কথারই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কিন্তু 'কনিষ্ঠ' ব্রাত্য কারা? হীন এবং নিন্দিতেরাও তো কনিষ্ঠ (ভাষ্যকারের ভাষায় 'যুবতম') হতে পারে। 'জ্যেষ্ঠে'র ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণকার বলছেন, এরা 'শমনীচমেঢ্রঃ'—শমের জন্য এদের মেঢ্র বা পুরুষাঙ্গ নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। ভাষ্যকার শম বলতে বুঝেছেন যৌবনোপরম। কিন্তু মনে হয়, শম বলতে এখানে বোঝাচ্ছে 'প্রশম' বা 'শমথ'; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমজনিত প্রশান্তি, যা মুনিপন্থীদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। এরাই সূত্রকারদের 'অর্হৎ',[৪০] অবৈদিকদের ভাষায় 'জিন'। এরা সন্ন্যাসী, স্ত্রীসঙ্গ করে না, ঋক্‌সংহিতার মুনিসূক্তের এরা 'মুনয়ো বাতরশনাঃ'—দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়ায়।[৪১] খুব সম্ভবত এদেরই বাজসনেয়-সংহিতায় কিতব এবং ক্লীব বলে গাল দেওরা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে সপত্নীক যজ্ঞ করতে হয়। যারা অব্রাহ্মণ অথচ শূদ্রও নয়, সেই ব্রাত্যেরা যজ্ঞ করে না, সন্ন্যাসীর ভেক ধরে লোক ঠকিয়ে খায়, গালিগালাজের এই হল তাৎপর্য। লক্ষ্য অবশ্য বিদ্বান্ ব্রাত্য।

বাজসনেয়সংহিতায় তাহলে ব্রাত্যদের মোটামুটি দুটি ভাগ পাচ্ছি—এক ভাগের মধ্যে পড়ে মগধ-পুংশ্চলীরা, আরেক ভাগে কিতব-ক্লীবেরা। পরবর্তী কালে একটা থেকে এসেছে তন্ত্রের ধারা, আরেকটা থেকে যোগের ধারা যার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়ে-ছিলেন পূবদেশের নাথযোগীরা। জ্যেষ্ঠ ব্রাত্যেরা যদি সূত্রকারদের 'অর্হৎ' হয়ে থাকেন, তাহলে কনিষ্ঠেরা হলেন তাঁদের চেলা। এঁরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতেন বলে 'ব্রাত্য'। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ এবং তীর্থিকদের 'সংঘ' স্মরণীয়। ব্রাহ্মণদের 'পরিষৎ' এবং 'কুল' ছিল; কিন্তু তাদের একটি সাময়িক, আরেকটি স্থাণু। অনিকেত হয়ে ঘুরে বেড়ানোটা মনে হয় ব্রাত্যদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তী যুগের মুনিপন্থী ব্রাত্যদের কিছু পরিচয় মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়ে পাওরা যায়।

বিরোধের ভিতর দিয়েই মানুষ আবার সমন্বয়ে পেঁছিয়। প্রতীচ্য ব্রাহ্মণ আর প্রাচ্য ব্রাত্যেও শেষপর্যন্ত একটা মিশ্রণ হয়ে গিয়েছিল। আপস্তম্বের ধর্মসূত্রে দেখি অথর্বসংহিতার বিদ্বান্ ব্রাত্যকে পরিচিত করা হচ্ছে 'শ্রোত্রিয়' বলে। ব্রাত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হচ্ছে সেখানে 'ব্রত' থেকে। ব্রাত্যের বিদ্যাগৌরবের এটা পরোক্ষ স্বীকৃতি। কিন্তু প্রাচীন বিরূপভাব একেবারে মিলিয়ে যায়নি। পরবর্তীযুগের ব্যাখ্যা-কারদের মতে ব্রাত্য তাই সাবিত্রীপতিত। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, মহাভারতাদিতে বৈদিক আর্যদের আওতায় এসেছে যেসব অবৈদিক আর্য অথবা অনার্য, তাদের সবাইকে

[৪০] দ্র. *The Vedlc Age* p. 256. লক্ষণীয়, বৌদ্ধ শ্রমণরা 'স্থবির'।
[৪১] ১০।১৩৬।২
[৪২] ২।৩।৭।১৩-১৭

ক্ষত্রিয়সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তারাও সাবিত্রীপতিত। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার এমনি করেই হয়েছে—পরকে আপন করে নিয়ে।[৪৩]

তাণ্ড্যব্রাহ্মণের একটি পরিশিষ্ট আছে—পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের পরিশেষ বলে তার নাম **'ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ'**। তার পাঁচটি প্রপাঠক। বিষয়বস্তুতে প্রায়শ তাণ্ড্যব্রাহ্মণেরই অনুবৃত্তি, কেবল তৃতীয় প্রপাঠকে পাঁচটি নতুন যাগের বিধান আছে—শ্যেন ইষু সন্দাংশ বজ্র এবং বৈশ্বদেব।[৪৪] আগের চারটি শত্রুনির্যাতনের জন্য অভিচার, তন্ত্রের ভাষায় রৌদ্রকর্ম। চতুর্থ প্রপাঠকে ব্রাহ্মণের প্রাতঃসন্ধ্যা অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে।[৪৫] পঞ্চম প্রপাঠকটির নাম 'অদ্ভুতব্রাহ্মণ', কেননা এতে অদ্ভুত অনৈসর্গিক বা অপ্রত্যাশিত আপদের শান্তির উপায় আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তন্ত্রের শান্তিকর্ম তুলনীয়। এই প্রপাঠকের দশম খণ্ডে দেবতার মন্দির (আয়তন) যদি কেঁপে ওঠে, কিংবা দেবতার প্রতিমা যদি হাসে কাঁদে নাচে ফেটে যায় বা পলক ফেলে, তাহলে কি করতে হবে তার বিধান আছে।

সামবেদের আরেকটি প্রধান ব্রাহ্মণ হল **ছান্দোগ্য** বা মন্ত্র বা উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ। এটির দশটি প্রপাঠক। তার প্রথম দুটি প্রপাঠকে গৃহ্যকর্মের **মন্ত্রের** সংগ্রহ এবং বাকী আটটি প্রপাঠকে বিখ্যাত ছান্দোগ্য **উপনিষৎ**। তার কথা পরে বলব।

এই তিনটি প্রধান ব্রাহ্মণ ছাড়া সামবেদের ছোট-ছোট আরও পাঁচটি ব্রাহ্মণ আছে, তারা সাধারণত 'অনুব্রাহ্মণ' বলে পরিচিত। তাদের মধ্যে **সামবিধানব্রাহ্মণে** যজ্ঞের বিধান নাই, আছে পাপক্ষয়ের জন্য কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের বিধান। এই উপলক্ষে কোথাও-কোথাও হোমের বিধানও আছে। সামের অধ্যয়নেই পাপক্ষয় হয়, এই হল বিধির তাৎপর্য। ব্রাহ্মণটির তিনটি প্রপাঠক। তারপর তিনটি প্রপাঠকে **আর্ষেয়ব্রাহ্মণ**—সামবেদের জৈমিনীয় এবং কৌথুম দুই শাখাতেই আছে।[৪৬] তারপর **দৈবতব্রাহ্মণ** বা দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণ—তিন খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে সামের 'নিধন' বা অন্ত্যভাগের দেবতার বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে ছন্দের দেবতার বিবরণ এবং তৃতীয় খণ্ডে ছন্দের নামের নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি দেওরা হয়েছে। তারপর **সংহিতোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ**—পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। বিষয়বস্তু হল সংহিতা অধ্যয়নের রীতি ও ফল, আচার্যদক্ষিণা ইত্যাদি। সবার শেষে **বংশব্রাহ্মণ**—তিন খণ্ডে। এতে সামবেদের সম্প্রদায়প্রবর্তক আচার্যদের বংশধারার বিবরণ আছে। এই বংশ যোনিবংশ নয়, বিদ্যাবংশ বা আচার্য-অন্তেবাসীর পরম্পরা। এই ব্রাহ্মণের মতে সামবেদের আদিপ্রবক্তা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, শ্রোতা প্রজাপতি। প্রজাপতি

[৪৩] বাংলার জনসংস্থানের বিশ্লেষণ হতেও ব্রাত্যদের খানিকটা নিশানা মেলে। বাঙালী মিশ্র জাতি। তার সংস্কৃতিও পুরাপুরি বৈদিক আর্য সংস্কৃতি নয়—যদিও তার মধ্যে বৈদিক প্রভাবই আর-সব প্রভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে। নৃতত্ত্বের বিচারে আল্‌পাইন্ ও নর্ডিক আর্য এবং মেডিটেরানীয়ান ও অস্ট্রিক অনার্য, মুখ্যত এই চারটি উপাদান দিয়ে বাঙালী জাতি এবং সংস্কৃতি গড়া। বাংলার ব্রাহ্মণের সঙ্গে পশ্চিমের ব্রাহ্মণের মিল নাই, এটা লক্ষণীয়। এই গরমিলটা আল্‌পাইন্ আর নর্ডিকের গরমিল। আল্‌পাইন্ আর্যেরাই নর্ডিকদের কাছে ব্রাত্য। রক্তসংমিশ্রণ ব্রাত্যদের মাঝেই বেশী হয়েছে। 'কালো বামুন কটা শুদ্দুর' বাংলার এই লোকোক্তি তারই পরোক্ষ স্বীকৃতি। পূবদেশের এই ব্রাত্য সংস্কৃতির আওতায় পড়ে আধুনিক বাংলা বিহার উড়িষ্যা এবং আসাম, যাদের মধ্যে নানা দিক দিয়েই একটা মৌলিক ঐক্য আছে।

[৪৪] ৩।৮-১২

[৪৫] ৪।৪

[৪৬] দ্র. জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের বিবরণ। কৌথুমশাখার আর্ষেয়ব্রাহ্মণের উপর সায়ণের ভাষ্য আছে।

থেকে এই বেদবিদ্যা লাভ করেন মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বায়ু, বায়ু থেকে ইন্দ্র, ইন্দ্র থেকে অগ্নি। অগ্নির কাছ থেকে কশ্যপ প্রথম বিদ্যালাভ করে মানুষের মাঝে তা প্রচার করেন। কশ্যপ থেকে বংশব্রাহ্মণের প্রবক্তা পর্যন্ত ৫৫ পুরুষের নাম পাওরা যায়।[৪৭]

৪

তারপর যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণসাহিত্যের উৎস হল যজুর্বেদ, একথা আগেই বলেছি। 'মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ, দুই মিলিয়ে বেদ'—বেদের এই সংজ্ঞার সোজাসুজি নিদর্শনও আমরা পাই কৃষ্ণযজুঃসংহিতায়, যেখানে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ পরস্পর জড়িয়ে আছে। মন্ত্র আগে, ব্রাহ্মণ পরে—একথা আর-দুটি বেদের বেলাতে যদি খাটে, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের বেলায় কিন্তু খাটে না। এমন-কি ভাষার বিচারেও কৃষ্ণযজুর্বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণভাগ যে সামসময়িক একথা ইওরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন।[৪৮] সূত্রকারেরা স্বভাবতই এক্ষেত্রে সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভাগ এবং সংহিতার সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ- ও আরণ্যক-ভাগের মধ্যে কোনও কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ করেননি, নির্বিচারে সবকেই তাঁরা ব্রাহ্মণ বলেছেন।[৪৯] কেবল ব্রাহ্মণের উপনিষদ্‌ভাগকে তাঁরা আলাদা করে রেখেছেন, এটা লক্ষণীয়। অর্থাৎ যজুর্বেদের কর্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে আপাত-দৃষ্টিতে ভেদ থাকলেও কর্মকাণ্ডের মাঝে বিলক্ষণ কোনও অবান্তরভেদ নাই—এই তাঁদের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণযজুর্বেদে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ একসঙ্গে জড়িয়ে আছে, শুক্লযজুর্বেদে তারা আলাদা-আলাদা সঙ্কলিত হয়েছে, এর ভিতরের কারণটা কি তা আগেই বলেছি। ব্রাহ্মণ যদি মোটের উপর বেদবিদ্যার মীমাংসাশাস্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে কি কর্মকাণ্ডে কি জ্ঞানকাণ্ডে দুদিক থেকেই একে পুষ্ট করবার গৌরব যজুর্বেদীদের, বিশেষ করে শুক্লযজুর্বেদীদেরই প্রাপ্য। বৈদিক ভাবনায় যে কর্ম আর জ্ঞানে কোনও আত্যন্তিক বিরোধ ছিল না, বিরোধটা ক্রমে উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে বাইরের চাপে—এ তার একটা প্রমাণ।

কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠকসংহিতার আলাদা কোনও ব্রাহ্মণ পাওরা যায় না। কিন্তু তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের শেষ তিনটি প্রপাঠককে বৈদিকেরা **কাঠকব্রাহ্মণ** বলে মনে করে থাকেন।[৫০] মৈত্রায়ণীসংহিতারও আলাদা কোনও ব্রাহ্মণ পাওরা যায় না। তার চতুর্থ বা শেষকাণ্ডটি খিলকাণ্ড। একেই ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

---

[৪৭] কেউ-কেউ মনে করেন, কৌথুমশাখার সামব্রাহ্মণ একটিই। তার চল্লিশটি অধ্যায়—পঁচিশ অধ্যায়ে তাণ্ড্যব্রাহ্মণ, পাঁচ অধ্যায়ে ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ, আট অধ্যায়ে ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ এবং দুই অধ্যায়ে গৃহ্যকর্মপ্রধান মন্ত্রব্রাহ্মণ। বাকী পাঁচটি অনুব্রাহ্মণ মাত্র।

[৪৮] দ্র. Keith, *The Vedas of the Black Yajus School.* Introduction pp. lxxii ff., lxxvi ff.

[৪৯] তু. আপস্তম্ব ১৯।১৫।১৬, ১৮; বৌধায়ন ১৪।৪......।

[৫০] ভট্টভাস্কর তাঁর তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ-ভাষ্যের ঐ জায়গায় বলছেন, 'এবমশ্বমেধান্তানি তিত্তিরি-প্রোক্তানি কাণ্ডানি ব্যাখ্যাতানি, অথ কাঠকাগ্নিকাণ্ডান্যষ্টৌ।' এই অংশে নাচিকেত-অগ্নিচয়ন উপলক্ষ্যে

এক তৈত্তিরীয়সংহিতারই আলাদা ব্রাহ্মণ আছে, যদিও সন্দর্ভের দিক দিয়ে সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক এক্ষেত্রে অন্যান্য বেদের মত আলাদা-আলাদা নয়। **তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের** তৃতীয় কাণ্ডের একাদশ প্রপাঠকে নচিকেতার উপাখ্যানটি লক্ষণীয়। সেটি এই।

> কামনা করে বাজশ্রবস সব বিত্ত দিয়ে দিলেন। তাঁর নচিকেতা নামে একটি পুত্র ছিল। সে ছেলেমানুষ। দক্ষিণা দেবার সময় তার মাঝে শ্রদ্ধা আবিষ্ট হল। সে বলল, বাবা, আমায় কাকে দেবে? দুবার বলল, তিনবার বলল। তার দিকে ফিরে বাজশ্রবস বললেন, তোকে দেব যমকে। ছেলে উঠে দাঁড়াতেই বাক্ বললেন, গৌতম, তোমার বাবা বললেন, যমের বাড়ি যাও, যমকে তোমায় দিয়েছি। বাক্ আরও বললেন, যম যখন বাড়ি থাকবেন না, তখন তুমি যাবে। তার ঘরে না খেয়ে তিন দিন থাকবে। তিনি যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করেন, বাছা, কয় রাত্রি ছিলে? জবাব দেবে, তিন রাত্রি। 'প্রথম রাত্রিতে কি খেলে?' 'আপনার ছেলেপুলে।' 'দ্বিতীয় রাত্রিতে?' 'আপনার যত পশু।' 'তৃতীয় রাত্রিতে?' 'আপনার সুকর্ম।'
>
> যম যখন বাড়িতে নাই, নচিকেতা তখন গেল, আর না খেয়ে তিন রাত্রি তাঁর বাড়িতে থাকল। যম ফিরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাছা, কয় রাত্রি ছিলে? সে জবাব দিল, তিন রাত্রি। 'প্রথম রাত্রিতে কি খেলে?' 'আপনার ছেলেপুলে।' 'দ্বিতীয় রাত্রিতে?' 'আপনার যত পশু।' 'তৃতীয় রাত্রিতে?' 'আপনার সুকর্ম।' যম বললেন, ঠাকুর, তোমায় প্রণাম, বর নাও। নচিকেতা বলল, জীবন্ত যেন বাবার কাছে যেতে পারি। 'আর একটি বর নাও।' 'বলুন, আমার ইষ্টাপূর্ত অক্ষয় হবে।' যম তাকে এই নাচিকেত অগ্নির কথা বললেন। তাতে তার ইষ্টাপূর্তের ক্ষয় হবে না। যে নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে, তার ইষ্টাপূর্তের ক্ষয় হয় না। যে এই অগ্নি এমনি করে জানে, তারও হয় না। যম বললেন, তৃতীয় একটি বর নাও। 'বলুন, আমি যেন পুনর্মৃত্যুকে জয় করতে পারি।' তাকে এই নাচিকেত অগ্নির কথাই বললেন যম। তাইতে সে পুনর্মৃত্যুকে জয় করেছিল। যে নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে, সে পুনর্মৃত্যুকে জয় করে, যে এই অগ্নিকে এমনি করে জানে, সেও।

কঠোপনিষদের আখ্যায়িকাটি প্রায় এইরকম, তবে তাতে রাত্রিবাসের বিবরণটি সংক্ষেপে দিয়ে বরের বিবরণটিকে ফলাও করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণে যা মাত্র একটি কথায় সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, উপনিষদে তারই বিস্তৃত দার্শনিক ভাষ্য। কিন্তু একটি বিষয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে উপনিষদের তফাত আছে বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণে দেখছি, পুনর্মৃত্যুজয়ের উপায় নাচিকেত-অগ্নিচয়ন। তার অর্থ, কর্মদ্বারাই

কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানটিও পাওবা যায়। বসিষ্ঠধর্মসূত্রে (১২।২৪, ৩০।৫), পাতঞ্জল-মহাভাষ্যে (৭।১।১৩), যাজ্ঞবল্ক্য এবং মনুস্মৃতির টীকায় কাঠকব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। সায়ণ তাঁর ঋগ্বেদভাষ্যে চরকব্রাহ্মণের নাম করেছেন (৮।৬৬।১০)। কাঠক এবং চরক ব্রাহ্মণ এক হওরাই সম্ভব। ভাষাতত্ত্বের বিচারেও ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের এই অংশকে এবং তৈত্তিরীয়রণ্যকের প্রথম দুটি অংশকে কাঠক শাখার অন্তর্গত বলে মনে করেন (দ্র. Macdonell, *Sanskrit Literature* p. 212)

অমৃতত্ব লাভ করা যেতে পারে। জ্ঞানদ্বারাও যে তা লাভ করা যায়, ব্রাহ্মণ অবশ্য তা অস্বীকার করছেন না। ব্রাহ্মণসুলভ বেদনপ্রশংসা বা 'য় এবং বেদ' উক্তিই তার প্রমাণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎভাবে দিচ্ছেন অগ্নিচয়নের বিধান। উপনিষদে কিন্তু বলা হচ্ছে, নাচিকেত অগ্নির দ্বারা স্বর্লোকে গিয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, নচিকেতা দ্বিতীয় বরে তা-ই চেয়েছিল।[৫১] কিন্তু তৃতীয় বরে নচিকেতা চাইল প্রেত্যভাবের সম্বন্ধে বিজ্ঞান।[৫২] প্রেত্যভাব বলতে সাধারণতঃ বোঝা হয়—মৃত্যুর পর (প্রেত্য) আবার জন্ম (ভাবঃ)। কিন্তু নচিকেতা যে প্রেত্যভাব এই অর্থে বোঝেনি, তা মনে করবার কারণ আছে।

প্রেতি (<প্র√ই) শব্দের মূল অর্থ হল এগিয়ে যাওৱা। সুতরাং মৃত্যুকে যদি 'প্রেতি' বলি, তাহলে তার অর্থ বিনাশ হয় না, হয় জীবনের পরে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওৱা। অর্থাৎ মৃত্যু বস্তুত উত্তরায়ণের দ্বার। মৃত্যুতীর্ণ লোকের বর্ণনা আমরা পাই ঋক্‌সংহিতার সোমমণ্ডলের উপান্ত্য সূক্তটিতে—সোমযাগের ফলশ্রুতিরূপে।[৫৩] এই অমৃতলোকের দিকে এগিয়ে যাওয়াই 'প্রেতি'। অগ্নিকে ঋক্‌সংহিতায় একজায়গায় বলা হয়েছে 'প্রেতীষণি' (প্রেতি+ইষণি): এই অগ্রসরণের মূলে তাঁরই প্রেষণা।[৫৪] নচিকেতার প্রশ্ন, এই লোকোত্তরে 'প্রেত্য' ব্যক্তির সত্তা থাকে কি থাকে না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।[৫৫] বুদ্ধদেবকেও মালুঙ্কপুত্ত ঠিক এইধরনের প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তার উত্তরে হাঁ-না কিছুই বলতে রাজী হননি।[৫৬] তৈত্তিরীয়োপনিষৎ এবিষয়ের একটি সুন্দর মীমাংসা করেছেন : 'ব্রহ্ম অসৎ' এই যিনি জানেন, তিনি অসৎ-স্বরূপই হন; আবার 'ব্রহ্ম অস্তি' এই যিনি জানেন, তাঁকে সবাই সৎ বলেই জানেন।[৫৭] অর্থাৎ "প্রেত্য অস্তি বা নাস্তি" দুটি পক্ষই গ্রহণ করা যেতে পারে। মনে হয়, যমও নচিকেতার প্রশ্নের জবাব এই-ভাবেই দিয়েছেন। একটি জবাব পাই কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর শেষে।[৫৮] যম সেখানে শান্ত আত্মাকেই পরা-গতি বলেছেন : সেখানে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কিছুই নাই, অথচ ধ্রুব সত্তা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লীর শেষে বলা হচ্ছে, এ যেন জলে জল মিশে যাওৱার মত।[৫৯] দ্বিতীয় বল্লীর শেষে যম বললেন, সেখানে কোনও আলোই নাই, কিন্তু এমন-কিছু আছে যার অনু-ভা হল এই আলো।[৬০] তৃতীয় বল্লীর শেষে বললেন, সেখানে বাক্ মন বা চোখ কিছুই যায় না, তবে শুধু বলা যায় যে 'অস্তি'।[৬১] সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, জীবনের এদিক থেকে দেখলে 'প্রেত্য

[৫১] ১।১।১৩
[৫২] ১।১।২০
[৫৩] ৯।১১৩।৬-১৩
[৫৪] ৬।১।৮, তু. অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ১।১৮৯।১। এই মন্ত্রটিকে বলা হয় ব্রহ্মযোগীর অন্তিম প্রার্থনা। দ্র. বা. স. ৪০।১৭,১৮ উব্বট ও মহীধরের ভাষ্য।
[৫৫] ৪।৫।১৩
[৫৬] মজ্‌ঝিমনিকায়, সুত্ত ৬৩
[৫৭] ২।৬।১
[৫৮] ১।৩।১৩,১৫।
[৫৯] ২।১।১৫
[৬০] ২।২।১৫
[৬১] ২।৩।১২

নাস্তি' বটে, কিন্তু ওদিক থেকে 'অস্তি'; তবে কি 'অস্তি', তা বলা যায় না। তাকে বলতে পারি 'শুক্রমমৃতম্' বা অমৃত জ্যোতিঃ।[৬২]

এই অমৃতজ্যোতিকে পাওবার উপায় কি? উপনিষৎ বলেন, একে তর্ক প্রবচন মেধা বা বহুশ্রুত—কিছু দিয়েই পাওরা যায় না, পাওরা যায় দুশ্চরিত হতে বিরত হয়ে শান্ত সমাহিত ও শান্তমানস হয়ে প্রজ্ঞানের দ্বারা।[৬৩] তার জন্য প্রেয় এবং শ্রেয়ের মাঝে তফাত করতে জানা চাই।[৬৪] কামনা ত্যাগ করা চাই।[৬৫] অর্থাৎ পথটা হল জ্ঞানের পথ। কিন্তু কর্মদ্বারা যে তাকে পাওরা যায় না, উপনিষৎ এমন কথাও বলছেন না। যম স্পষ্টই বলছেন, 'আমি জানি, যাকে লোকে "শেবধি" মনে করে তা অনিত্য, যা ধ্রুব তাকে অধ্রুব দিয়ে কখনও পাওরা যায় না, তাইতে আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে অনিত্য দ্রব্য দিয়ে নিত্যকে পেয়েছি।' এই উক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণের উক্তির সামঞ্জস্য আছে। ব্রাহ্মণও বলছেন, নাচিকেত-অগ্নিচয়নের ফলে যেমন ইষ্টাপূর্ত অক্ষয় হয়, তেমনি পুনর্মৃত্যুও জয় করা যায়। আবার, যে অগ্নি চয়ন করে অথবা অগ্নিরহস্য যে জানে, দুয়েরই একই ফল লাভ হয়। সায়ণ তাঁর ভাষ্যে বিষয়টির সুন্দর মীমাংসা করেছেন। বলছেন, 'মানুষের বর্তমান শরীরের একবার মৃত্যু হবেই হবে। তারপর আবার যদি সে জন্ম স্বীকার করে, তাহলে তার পুনর্মৃত্যু হবে। জন্ম স্বীকার না করে যদি মুক্তি হয়, তাহলে পুনর্মৃত্যুকে পরাজিত করা হল। মৃত্যুর পরাজয় পুরুষেরই হয়। "এমনি করে পুনর্মৃত্যুর পরাজয় কি করে হতে পারে তা-ই আমায় বলুন" এই হল নচিকেতার তৃতীয় বরপ্রার্থনা। নচিকেতা এই বর চাইলে যম পুনর্মৃত্যুজয়ের উপায় স্বরূপ সেই নাচিকেত-অগ্নির কথাই দুভাবে বললেন। অগ্নির যেমন চয়ন তেমনি উপাসনাও হতে পারে। তার মধ্যে যে-পুরুষ চয়নকে প্রধান ক'রে উপাসনাকে গৌণ করে তার ইষ্টাপূর্তই অক্ষয় হয়, কিন্তু সে দীর্ঘকাল পুণ্যলোকে বাস ক'রে আবার পুনর্জন্ম স্বীকার করে। কিন্তু যে উপাসনাকে গ্রহণ ক'রে চয়নকে গৌণ করে, তার ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলে মুক্তিই হয়, আর জন্মান্তর হয় না। সুতরাং সে মৃত্যুকে জয় করে। দুটি বরের তফাত এইখানে।'[৬৬]

জ্ঞানকে বড় ক'রে কর্মকে খাটো করবার প্রবৃত্তি আমাদের মাঝে মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ব্রাহ্মণে আর উপনিষদে আমরা একটা বিরোধের কল্পনা করি। 'অনিত্য দ্রব্য দিয়ে আমি নিত্যকে লাভ করেছি'—যমের এই স্পষ্ট উক্তিকে আমরা তাই সমুচ্চয়বাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিই। কিন্তু তার কোনও দরকার হয় না। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের নাচিকেত-অগ্নিচয়নের বিবরণটি পড়লে সহজেই বোঝা যায়, অগ্নিচয়ন ব্যাপারটা বিজ্ঞানীরই অনুষ্ঠান—অজ্ঞানীর নয়। এসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলছি।

ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের একাদশ প্রপাঠকের ছয়টি অনুবাক গেছে অগ্নিচয়নের

---

[৬২] ২।৩।১৭

[৬৩] ১।২।৯, ২৩,২৪।

[৬৪] ১।২।২

[৬৫] ১।২।৪

[৬৬] তৈ. ব্রা. ৩।১১।৮।৬

মন্ত্রের সংগ্রহে। মন্ত্রের পর ব্রাহ্মণ। প্রপাঠকের বাকী কয়েকটী অনুবাক ব্রাহ্মণগ্রন্থ, তাতে অগ্নিরহস্য এবং চয়নরহস্যের বিবৃতি আছে। নাচিকেত অগ্নিকে আমরা বায়ুরূপে[৬৭] অথবা সংবৎসররূপে দেখতে পারি।[৬৮] অগ্নিচয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল লোকজয় অর্থাৎ সর্বাত্মভাবদ্বারা চেতনার ক্রমিক উত্তরণ। আদিত্যের নীচে যেসব লোক আছে, ব্রাহ্মণ তাদের বলছেন সামান্যত 'উরুলোক' অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় 'মহাভূমি'।[৬৯] কিন্তু তাদের চাইতেও মহত্তর ভূমি আছে আদিত্যের ওপারে। ব্রাহ্মণ তাদের বলছেন 'বরীয়াংসঃ লোকাঃ'। আদিত্যের নীচের লোকগুলি অন্তবান্ এবং ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু তার ওপারের লোক অনন্ত অপার অক্ষয়। এই অক্ষয়লোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নাচিকেত-অগ্নিচয়নের মুখ্য লক্ষ্য। তখন অগ্নিচিৎএর কি অবস্থা হয়? ব্রাহ্মণ বলছেন, রথের উপরে থেকে রথী যেমন দেখে রথের দুদিকে দুটি চাকা ঘুরছে, তেমনি আদিত্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বে থেকে তিনি দেখেন অহোরাত্রের আবর্তন হচ্ছে তার নীচে, অহোরাত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। উপনিষদের ভাষায়, তিনি সূর্যদ্বার ভেদ করে চলে যান,[৭০] অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে যায় বলে তাঁর দিনও থাকে না রাতও থাকে না।[৭১] এই হল কালজয় বা মৃত্যুজয় অথবা অমৃতত্বলাভ। দেখতে পাচ্ছি, ব্রাহ্মণ আর উপনিষদে সাধনার লক্ষ্য একই, দুয়ের মাঝে কোনও বিরোধ বা ছোট-বড়র কথা নাই।

নাচিকেত অগ্নিকে যদি বায়ুরূপে দেখি, তাহলে সাধনার প্রকার হবে আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ প্রাণবায়ুকেই তখন জানব নাচিকেত অগ্নি বলে। বায়ুর সঙ্কোচ বা প্রসারণই[৭২] হবে সাধনার উপায়। এমনতর অগ্নি-উপাসনাকে ব্রাহ্মণ বলছেন 'সম্পদুপাসনা' অর্থাৎ অধ্যাত্মপ্রাণ নাচিকেত অগ্নিরই সম্পদ্ বা বিভূতি এই বোধে উপাসনা। প্রাণকে ধরে অগ্নিস্বরূপে উজিয়ে যেতে বা ছড়িয়ে পড়তে হবে। সঙ্কোচ-প্রসারের উল্লেখে আমরা যোগের প্রাণায়ামের মুখ্য দুটি ধারার ইঙ্গিত পাই। আবার জানতে হবে, হিরণ্যই নাচিকেত অগ্নির আয়তন প্রতিষ্ঠা বা শরীর। প্রাণস্রোত তাহলে হিরণ্যজ্যোতির্ময়—এই ভাবনা করতে হবে। বায়ুস্রোত রূপান্তরিত হবে সূক্ষ্মতর নাড়ীস্রোতে। ব্রাহ্মণ বলছেন, ইহলোকে বা লোকোত্তরে অগ্নিচিৎ পুরুষ তখন হন তেজে এবং ঈশনায় (য়শসা) তপ্তসুবর্ণের মত।

নাচিকেত অগ্নিকে যদি সংবৎসররূপে ধ্যান করি, তাহলে উপাসনার প্রকার হবে অধিদৈবত এবং বিশ্বাত্মক। সংবৎসর হল পার্থিব কালের বৃহত্তম একক। পৃথিবীতে ঋতুপর্যায় ঘুরে-ঘুরে আসছে, একই ভৌতিক লীলার আবর্তন হচ্ছে বছরে-বছরে। তার মূলে আছে আদিত্যের প্রেরণা। অহোরাত্রের আবর্তনের মত এই সংবৎসরের আবর্তনেরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে অগ্নিচিৎকে। আদিত্যভাবনার দ্বারা তা সিদ্ধ হতে পারে। ব্রাহ্মণ বলছেন, এমনিতর অগ্নি-উপাসনার ফলে অগ্নিবিৎ আদিত্যের সাযুজ্য

[৬৭] ৩।১১।৭
[৬৮] ৩।১১।১০
[৬৯] কঠ ১।১।২৪
[৭০] মুণ্ডক ১।২।১১
[৭১] শ্বেতাশ্বতর ৪।১৮
[৭২] ৩।১১।৭।২

লাভ করেন, অগ্নিময় এবং পুনর্ণব (জরারহিত) হয়ে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহলোকে তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।[৭৩]

দুটি উপাসনাতেই অগ্নিকে কল্পনা করা হয়েছে পক্ষিরূপে। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও আত্মা পক্ষিরূপে কল্পিত (ব্রহ্মানন্দবল্লী)। যজ্ঞবেদিও রচিত হত পক্ষীর আকারে। এক পক্ষী দ্যুলোকসঞ্চারী সুপর্ণ বা হংস—আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যাকে বলি সূর্য।[৭৪] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সেই পক্ষীই আমার অন্তরপুরুষ। নাচিকেত অগ্নি আমার মাঝে আছেন জীবচৈতন্যরূপে, আবার দ্যুলোকে আছেন বিশ্বচৈতন্যরূপে। তিনি বৈশ্বানর। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বলছেন, যিনি এই পুরুষে অর্থাৎ জীবে এবং যিনি আদিত্যে, তিনি একই; যিনি তা জানেন, তিনি এই লোক হতে অর্থাৎ প্রাকৃত চেতনার ভূমি হতে আরও এগিয়ে গিয়ে (অস্মাৎ লোকাৎ 'প্রেত্য') যথাক্রমে অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় আত্মায় উপসংক্রান্ত হয়ে অভয় হন, দ্বন্দ্বাতীত হন, এই বিশ্বভুবনে কামান্নী এবং কামরূপী হয়ে আনন্দসাম গেয়ে বেড়ান।[৭৫] দেখছি, সংহিতায় ব্রাহ্মণে উপনিষদে একই তত্ত্বের প্রকাশ। ব্রাহ্মণ তাকে বিবৃত করছেন রূপকের ভাষায়, উপনিষদ্ দর্শনের ভাষায়।

নচিকেতার উপাখ্যানটি বহু পুরাতন, ঋক্‌সংহিতার একটি সূক্তে তার বীজ রয়েছে।[৭৬] অনুক্রমণিকাকারের মতে সূক্তটির ঋষি যমগোত্রীয় 'কুমার', দেবতা যম। সাক্ষাৎভাবে যম প্রথম এবং সপ্তম মন্ত্রের দেবতা। তৃতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রে কুমারের সঙ্গে যমের কথা আছে। সূক্তটি রূপকের ভাষায় রচিত। এই রূপকের পিছনে সায়ণ নচিকেতা-উপাখ্যানের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা সবাই তাঁর সঙ্গে একমত নন। একমাত্র Geldner কতটা সায়ণের অনুগামী। Oldenberg পূর্ব-বর্তীদের মতের সমালোচনা করে রূপকটির একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা প্রচুর।[৭৭] তার চাইতে সায়ণের ব্যাখ্যা মনে হয় বেশী সুসঙ্গত। সায়ণ সূর্যপক্ষেও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৈবস্বত যমের সঙ্গে সূর্যের যোগ আছে। বাজসনেয়সংহিতার মতে একর্ষি পূষা এবং প্রাজাপত্য সূর্যের মণ্ডল ভেদ করলে তবে যমের দেখা মেলে এবং তিনিই বলে দিতে পারেন, পূষা যে হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ ঢেকে রেখেছেন তার স্বরূপ কি। ঈশোপনিষদে এবং কঠোপনিষদে এই রহস্যটিই বিবৃত হয়েছে। সুতরাং সূক্তটিকে সূর্যপক্ষে ব্যাখ্যা করবার একটা যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু মনে হয়, অনুক্রমণিকাকারের কথা মেনে যমপক্ষে ব্যাখ্যা করাই এক্ষেত্রে সঙ্গত।

সূক্তটির অনুবাদ এই: সুন্দর পাতায় ছাওয়া যে-গাছের তলায় দেবতাদের সঙ্গে পান করছেন যম (সোমরস), সেইখানেই আমাদের 'বিশ্‌পতি পিতা' প্রাচীনদের সঙ্গে

---

[৭৩] ৩।১১।১০

[৭৪] ঋ. স. ১।১৬৪।৪৬, ১০।১১৪।৪, ৫

[৭৫] ২।৮।৪-৫, ৩।১০।৪-৫; তু. তৈ. ব্রা. কামচারো হ বা অস্যোরুষু চ বরীয়ঃসু চ লোকেষু ভবতি, য়োঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে, য় উ চৈনমেবং বেদ ৩।১১।১০।২।

[৭৬] ১০।১৩৫

[৭৭] দ্র. Geldner, *Der Ṛgveda*, সূক্তভূমিকা ও টীকা।

[৭৮] বা. স. ৪০।

প্রেম করছেন(১)। প্রাচীনদের সঙ্গে প্রেম করছেন, (অথচ) চলছেন এমনতর খারাপ ধরনে! আমি অসূয়া নিয়ে তা দেখলাম, আবার তাঁর জন্য আনচানও করতে লাগলাম(২)। 'কুমার, মন দিয়ে করেছ যে নতুন রথ, যার চাকা নাই, যার একটিমাত্র "ঈষ্" অথচ সর্বদিকে যা চলছে, সেই রথে তুমি চেপে আছ কিন্তু কিছুই দেখছ না(৩)। বিপ্রদের কাছ থেকে যে-রথকে ছোটালে কুমার, তার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল সাম; এইখান থেকেই ঐ নৌকায় তা চাপান হয়েছিল(৪)।' কে কুমারকে জন্ম দিল? রথকে কে ছোটাল? কে-ই বা সেকথা আজ আমাদের বলবে, 'অনুদেয়ী' হল কি করে(৫)? অনুদেয়ী হল যখন, তারপরেই জন্মাল 'অগ্র'। সামনে 'বুধ্ন' ছড়িয়ে আছে, পিছনটা করা হয়েছে 'নিরয়ণ'(৬)। এই-যে যমের সদন, যাকে বলে 'দেবমান'। এই যে তাঁর 'নালীতে' ফুঁ দেওবা হচ্ছে। তাঁকে বাণী দিয়ে সাজানো হয়েছে(৭)।

সূক্তটির সম্ভাবিত তাৎপর্য সংক্ষেপে এই : কুমার বলছে, ব্রহ্মবৃক্ষের তলায় যমের সভা বসেছে, দেবতাদের নিয়ে যম আনন্দ করছেন সেখানে। মানুষ মৃত্যুর পর এইখানেই যায়। আমাদের পিতৃপুরুষেরাও এইখানেই আছেন, মৃত্যুর দ্বারাই তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেছেন। যেমন বৈবস্বত মনু আমাদের পিতা এবং রাজা, তেমনি বৈবস্বত যমও। এক আদিত্যচেতনারই একদিকে আলো, আরেকদিকে অন্ধকার।[৭৯] পার্থিবচেতনায় যম বিভীষণ, অনুক্ষণ তাঁর দূতেরা মানুষের মাঝে বিচরণ করছে, কখন কাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যাবে তার স্থিরতা নাই।[৮০] একথা যখন মনে হয়, তখন এই অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য যমের প্রতি জাগে অসূয়া। কিন্তু যখন তাঁর অমৃত আনন্দ-রূপের কথা ভাবি, যখন ভাবি আমার পিতৃপুরুষেরা তাঁকে ভালবেসে আবার ফিরে পেয়েছেন তাঁরই ভালবাসা, তখন তাঁর জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।[৮১]

কুমারের এই আকূতির পর একটা বিরতি। অনুমান করা যেতে পারে, কুমার ততক্ষণে যমের সভায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তখন তাকে দেখে যম বলছেন, 'কুমার, তুমি মনের রথে চড়ে আমার কাছে এসেছ, কিন্তু আসবার সময় চোখ মেলে দেখনি, এ রথ কেমন।[৮২] এ এক নতুন ধরনের রথ। এর চাকা নাই, এর একটি মাত্র "ঈষ্" (shaft) তবুও এ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে যায়।[৮৩] কুমার, বিপ্র-পরিষৎ থেকে তুমি এই মনোরথ হাঁকাতে শুরু করেছিলে, তাঁরাই তোমাকে প্রথম "মহান্ সাম্পরায়ের"[৮৪] সন্ধান

---

[৭৯] 'বিশ্পতি পিতা' এখানে যমকেই বোঝাচ্ছে, কুমারের পিতাকে নয়। বিশ্পতির সহজ অর্থ রাজা। যমসূক্তে যমকে বারবার রাজা বলা হয়েছে (দ্র. ১০।১৪)।

[৮০] ঋ. স. ১০।১৪।১১

[৮১] এই আকুলতাই নচিকেতার অভীপ্সা। না মরলে অমৃত পাওবা যাবে না, তাই মরণকে বরণ করে নেওবা।

[৮২] তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে এবং কঠোপনিষদে একেই বলা হয়েছে, নচিকেতার তিন 'রাত্রি' কাটানো যমের বাড়িতে। 'প্রেত্যসংজ্ঞাভাবের' এই প্রথম পর্ব। মনের রথের কথা অথর্বসংহিতার ব্রাত্য-কাণ্ডেও আছে (১৫।২।৬)।

[৮৩] স্পষ্টতই যোগিচেতনার বর্ণনা। সূর্যের রথ একচক্র (ঋ. স. ১।১৬৪।২), কিন্তু তারও ওপারে যদি যেতে হয় তাহলে যেতে হবে 'অচক্র রথে' (তু. 'অচক্রয়া স্বধয়া' ঋ. স. ৪।২৬।৪, ১০।২৭।১৯), স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রতিষ্ঠার বীর্য দিয়ে। বিশ্বোত্তীর্ণ যোগিচেতনা অচক্র, একাগ্র; তাই রথের একটিমাত্র 'ঈষ্'। অথচ তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। তু. 'বিশ্বাচী ধীঃ' ঋ. ৯।১০১।৩, ৭।৪৩।৩।

[৮৪] মহাপ্রস্থান, The Great Departure, দ্র. কঠ. ১।২।৬।

দেন। কিন্তু ঐ রথযাত্রার পিছনে ছিল যে রথন্তর সামের প্রেরণা[৮৫], যে সৌষম্যের সুর-মূর্চ্ছনা, তা কিন্তু এখান থেকেই নিহিত হয়েছিল, তোমার আধারের তরণীতে।'[৮৬]

কাহিনীর এইখানেই শেষ। শেষের তৃচ্‌টিতে ঋষি নিজেই কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, আমাদের মাঝে লোকোত্তরের অভীপ্সাবাহী এই কুমারকে কে জন্ম দেয়, কে-ই বা তার মনোরথকে অনন্তের পানে ছোটায়, কে তা আজ আমাদের বলে দেবে?[৮৭] কে-ই বা তার অনুদেয়ী হল?[৮৮] কঠোপনিষদ্‌ বলে দিচ্ছেন, এই অনুদেয়ী বা কুমারের সঙ্গিনী হল 'শ্রদ্ধা'।[৮৯] ঋক্‌সংহিতা বলছেন, হৃদয়ের আকূতি হতে শ্রদ্ধার জন্ম এবং তা আলো-কে পাইয়ে দেয়।[৯০] শ্রদ্ধা উৎপন্ন হতেই জন্মাল 'অগ্র'।[৯১] যোগীর মৃত্যুকালে তা-ই হয় হৃদয়ের 'প্রদ্যোত'।[৯২] তারই আলোকে কুমার দেখতে পায়, তার সম্মুখে ছড়িয়ে আছে 'বুধ্ন' বা বোধির অতল রহস্য, আর পিছনে 'নিরয়ণ' অর্থাৎ আর সেখানে ফিরে যাবার উপায় নাই।[৯৩] এমনি করে কুমার যেখানে পৌঁছল, তা-ই যমলোক, 'দেবমান' বা পরম দেবতার স্বধাম। সেখানে নিয়ত বাজছে তাঁর বাঁশির সুর, নিত্য উঠছে বাণীর গুঞ্জন।[৯৪]

তারপর শুক্লযজুর্বেদের **শতপথব্রাহ্মণ**। ব্রাহ্মণটির আয়তন অতিবিপুল; একশত অধ্যায় আছে বলে নাম 'শতপথ'। কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন দুশাখায় ব্রাহ্মণটি পাওয়া যায়। উত্তরভারতে মাধ্যন্দিন শাখাই প্রচলিত। প্রথম দিক দিয়ে দুটি শাখায় ভাষার কিছু ভেদ আছে। মাধ্যন্দিন শাখায় ১৪টি কাণ্ড, কাণ্বশাখায় ১৭টি। দুটিতে বিষয়-সন্নিবেশেরও কিছু পার্থক্য আছে। মাধ্যন্দিন শাখায় ১০০টি অধ্যায়, কাণ্বশাখায় ১০৪টি।

বৈদিক সাহিত্যে শতপথব্রাহ্মণের গুরুত্ব ঋক্‌সংহিতার পরেই। ঋক্‌সংহিতায় যেমন বৈদিক ঋষির মন্ত্রচেতনার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাই, তেমনি শতপথব্রাহ্মণে পাই তাঁর মননের পরিচয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা ভাষার বিচারে শতপথব্রাহ্মণকে প্রাচীন এবং প্রধান ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কনিষ্ঠ বলে মনে করেন। তা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে, ঋক্‌সংহিতায় যে অধ্যাত্মভাবনার শুরু হয়েছিল, তার পর্যবসান

---

[৮৫] তু. রথন্তরে সূর্যং পর্যপশ্যৎ ঋ. স. ১।১৬৪।২৫।

[৮৬] নৌকায় ভবসমুদ্র পার হওবার উপমা ঋক্‌সংহিতার অনেক জায়গায় আছে। এই নৌকা কখনও 'ঋত' (৯।৮৯।২), কখনও 'যজ্ঞ' (১০।৪৪।৬), কখনও-বা 'দিব্যচেতনা' (১০।৬৩।১০)।

[৮৭] এই কুমারই কঠোপনিষদের 'নচিকেতা'—যে জানেনি (ন চিকেত), অথচ যে জানতে চায়। আমাদের মধ্যে সে কৈশোরের অগ্নিচেতনা। পুরাণে উমা-মহেশ্বরের পুত্র। 'কুমারসম্ভব' স্মরণীয়।

[৮৮] নববধূর সঙ্গে বাপের বাড়ি থেকে যে-সঙ্গিনী যেত, তাকে বলা হত অনুদেয়ী, কেননা কন্যাদানের সঙ্গে-সঙ্গে কন্যার পিতা তাকেও দিয়ে দিতেন। (দ্র. ঋ. স. ১০।৮৫।৬)

[৮৯] ১।১।২

[৯০] দ্র. শ্রদ্ধাসূক্ত ১০।১৫১

[৯১] কঠোপনিষদের 'সূক্ষ্মা অগ্র্যা বুদ্ধি' (১।৩।১২) যা দিয়ে সূক্ষ্মদর্শীরা গূঢ় আত্মতত্ত্ব দর্শন করে থাকেন। <র্ণ অজ্‌, অগ্নিশিখার সূক্ষ্ম অগ্রভাগের ধ্বনি আছে। অভীপ্সার গতিও তেমনি।

[৯২] বৃ. ৪।৪।২

[৯৩] তু. সংসারের বা কামনার 'নির্বাণ', উপনিষদের 'অপুনরাবৃত্তি'। সুতরাং মরা এই একবারই, আর মরবার দরকার হয় না। এই 'অপুনর্মৃত্যু'ই অমৃত।

[৯৪] 'নালী' মূলত নল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই 'নাড়ী', চেতনার স্রোত উজান বয় যার ভিতর দিয়ে। তখন অনাহত গুঞ্জন শোনা যায়। এখানে তারই ব্যঞ্জনা।

আমরা পাচ্ছি শতপথব্রাহ্মণে। এই ব্রাহ্মণের শেষ অংশে নিবদ্ধ বৃহদারণ্যকে আমরা দেখি, শুধু বৈদিক ভাবনাই নয়, মানুষের দার্শনিক ভাবনা চেতনার যে তুঙ্গতম শিখরে উঠতে পারে, তারই পরিচয়। বৈদিকসাধনার গঙ্গোত্রী হতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র প্রবাহটি ধরা রয়েছে ঋক্‌সংহিতা আর শতপথব্রাহ্মণের মধ্যে।

একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় এবং শতপথ দুটি ব্রাহ্মণই স্বরাঙ্কিত (accented)। তৈত্তিরীয়ে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত তিনটি স্বরই আছে, শতপথে আছে শুধু উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই দুটি। আর-কোনও ব্রাহ্মণই সংহিতার মত স্বরাঙ্কিত নয়। যজুর্বেদীরাই যে ব্রাহ্মণসাহিত্যের প্রবর্তক ধারক এবং পোষক, এটা তার একটা প্রমাণ। ভাষার বিচারে যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ দুটি অপরের তুলনায় অর্বাচীন হতে পারে, কিন্তু এই অর্বাচীনতা ব্রাহ্মণ্য ভাবনাকে বহতা রাখারই ফল। সংহিতার সঙ্কলন মুখ্যত কর্মকে অবলম্বন করে হয়েছে, এই কথা মনে রাখলে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। কর্মকান্ডীরাই বরাবর বেদকে রক্ষা করবার এবং ব্যাখ্যা করবার ভার নিয়েছেন, একথা আগেও বলেছি। সুতরাং ব্রহ্মোদ্য বা ব্রাহ্মণের প্রবর্তক তাঁরাই। তাঁদেরই উৎসাহে ব্রাহ্মণসাহিত্য স্থাণু না থেকে চরিষ্ণু হয়েছে বলে যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ দুটিতে আমরা অর্বাচীনতার ছাপ দেখতে পাই। কিন্তু তাদের উৎস যে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রাক্তন হবে, এইটাই যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভাবিত।

দুটি শাখার মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখারই প্রাধান্য এবং প্রচলন বেশী বলে তাকে ধরেই ব্রাহ্মণটির বিষয়বস্তুর আলোচনা করা যাক।

আগেই বলেছি, বাজসনেয়সংহিতার প্রথম আঠারটি অধ্যায়ের আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা পাওরা যায় শতপথব্রাহ্মণের প্রথম নয়টি কাণ্ডে। তাই ব্রাহ্মণের এই অংশটিকেই পণ্ডিতেরা প্রাক্তন বলে মনে করেন। দ্বাদশ কাণ্ডের নাম 'মধ্যম'; তাতেও এই অনুমানের সমর্থন মেলে। ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের বিষয়বস্তু হল, দর্শপূর্ণমাস যাগ যা সমস্ত যাগের প্রকৃতি বা আদর্শ। দ্বিতীয় কাণ্ডে আছে অগ্নিহোত্র পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ দাক্ষায়ণযজ্ঞ নবান্ন-ইষ্টি এবং চাতুর্মাস্য। তৃতীয় আর চতুর্থ কাণ্ডে সোমযাগ, পঞ্চমে বাজপেয় এবং রাজসূয়। ষষ্ঠ হতে দশম কাণ্ড পর্যন্ত অগ্নিচয়ন।[২৫] একাদশ কাণ্ডে

[২৫] শতপথব্রাহ্মণের প্রায় একতৃতীয়াংশের বেশী স্থান অধিকার করে আছে অগ্নিচয়ন। দশম কাণ্ডটীর নাম 'অগ্নিরহস্য'। অগ্নিচয়ন বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বোধ হয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়। জীব-জগৎ-ব্রহ্মের যে তাদাত্ম্যবোধে ঔপনিষদ সাধনার পর্যবসান, আমরা তারই সূচনা পাই অগ্নিচয়নে। অগ্নিরহস্যকাণ্ডে তার কিছু-কিছু বিবৃতি পাওরা যায়। অনুষ্ঠানটির বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচুর দার্শনিক ভাবনার সমাবেশে এই অংশটি প্রায় উপনিষদের পর্যায়ে উঠেছে। অগ্নিচয়ন হল অগ্ন্যাধানের জন্য বেদি তৈরি করা। কঠোপনিষদের নচিকেতা যমের কাছে দ্বিতীয় বরে অগ্নিচয়নের বিদ্যা চেয়েছিলেন, একথা আমরা জানি। অগ্নিচয়ন বস্তুত পরমপুরুষের বিশ্বসৃষ্টির অনুকরণ। ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্তে (১০।৯০) আছে, বিরাট পুরুষের আত্মাহুতিতে কি করে বিশ্বের সৃষ্টি হল। দেবতার যজ্ঞ হল বিসৃষ্টি বা বিসর্গ—উপর হতে নীচে নেমে আসা, আর মানুষের যজ্ঞ হল উৎসর্গ—নীচে থেকে উপরে উঠে যাওরা। উঠতে গিয়ে সে এক দিব্যজগৎ সৃষ্টি করে। শতপথব্রাহ্মণ তাকে বলেছেন মানুষের প্রাজাপত্য কর্ম্ম (৬।২।২।২১)। এই দিব্যজগতের প্রতীক হল বেদি। বেদিটি প্রায়ই রচিত হয় একটি পাখির আকারে। পাখি অগ্নির প্রতীক। অগ্নির ছন্দ গায়ত্রী। গায়ত্রী পাখি হয়ে গন্ধর্বলোক হতে সোম আহরণ করেছিলেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই পাখি প্রতি আধারে স্থিত চিদগ্নি বা জীবাত্মা। পাখি উড়ে চলেছে দ্যুলোকের পানে। অবশেষে সে দেবতার সাযুজ্য লাভ করছে। এই হল যজ্ঞের রহস্য। অগ্নিচয়নে তাকেই রূপ দেওরা হয়েছে। বিস্তৃত আলোচনা যজ্ঞপ্রসঙ্গে করা যাবে।

আছে পশুবন্ধ পঞ্চমহাযজ্ঞ[৯৬] মিত্রবিন্দেষ্টি দর্শ-পূর্ণমাসের আরও-কিছু বিধি। দ্বাদশ কাণ্ডে দ্বাদশাহসত্র সংবৎসরসত্র এবং সৌত্রামণিযাগ। ত্রয়োদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ পুরুষমেধ সর্বমেধ এবং পিতৃমেধ। চতুর্দশ কাণ্ডে প্রবর্গ্য এবং বৃহদারণ্যক।[৯৭]

শতপথব্রাহ্মণে দুজন ঋষি প্রধান—শাণ্ডিল্য আর যাজ্ঞবল্ক্য। শাণ্ডিল্য যাজ্ঞবল্ক্য হতে প্রাচীন। তাঁর আচার্যের আচার্য কুশ্রি ব্রহ্ম এবং আদিত্য দুই সম্প্রদায় হতেই বিদ্যাগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁহতে দুটি সম্প্রদায়ের ধারাই কিছুদূর পর্যন্ত প্রবহন্ত থেকে অবশেষে সাঞ্জীবীপুত্রের মাঝে এক হয়ে যায়। কুশ্রি হতে যাজ্ঞবল্ক্য পঞ্চম পুরুষ। তিনি আদিত্যসম্প্রদায়ের, একথা আগেই বলেছি। শাণ্ডিল্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের।[৯৮] লক্ষণীয়, যে-অগ্নিরহস্য যজ্ঞবিদ্যার সার এবং শতপথব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রধান, তার সম্পর্কে কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পর্যন্ত নাই। সেখানে প্রমাণপুরুষ হচ্ছেন শাণ্ডিল্য। অগ্নিরহস্যাধ্যায়গুলি ছাড়া ব্রাহ্মণের আর সব জায়গায় যাজ্ঞবল্ক্যই প্রমাণপুরুষ, বিশেষত বৃহদারণ্যকে তাঁর ব্রহ্মবাদকে বৈদিক তত্ত্ববিদ্যার শিরোবিন্দু বলা যেতে পারে। আবার দেখি, শাণ্ডিল্য এবং যাজ্ঞবল্ক্য দুটি মুখ্য ঔপনিষদসিদ্ধান্তের আচার্য—শাণ্ডিল্য ইতিবাদের, যাজ্ঞবল্ক্য নেতিবাদের।[৯৯]

---

[৯৬] 'পঞ্চৈব মহায়জ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতয়জ্ঞো মনুষ্যয়জ্ঞঃ পিতৃয়জ্ঞো দেবয়জ্ঞো ব্রহ্ময়জ্ঞ ইতি। অহরহর্ভূতেভ্যো বলিং হরেৎ, তথৈতং ভূতয়জ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহর্দদ্যাদ্ ওদপাত্রাৎ (ভাতের হাঁড়ি থেকে)। তথৈতং মনুষ্যয়জ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বধাকুর্যাদ্ ওদপাত্রাৎ, তথৈতং পিতৃয়জ্ঞং সমাপ্নোতি। অথ ব্রহ্ময়জ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্ময়জ্ঞঃ' (১১।৫।৬।১-২)। পঞ্চ মহাযজ্ঞ শ্রৌতযজ্ঞ নয়, সুতরাং তার জন্য ঋত্বিকের দরকার হয় না। গৃহস্থ নিজে-নিজেই এ-যজ্ঞ করতে পারেন। এটি গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় নিত্যযজ্ঞ। সর্বভূতকে অন্নদান, যে-কোনও অতিথির সৎকার, পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন, দেবতাতে আত্মাহুতি এবং ব্রহ্মবিদ্যার ধারাকে প্রবহন্ত রাখা—এই হল পঞ্চমহাযজ্ঞের তাৎপর্য। লক্ষণীয়, শতপথব্রাহ্মণ চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষের হিসাবে যজ্ঞগুলিকে সাজিয়েছেন, যদিও অনুষ্ঠানের সময় এই ক্রম ঠিক বজায় রাখা হয় না। ইহলোকে তরু-লতা কীট-পতঙ্গ মানুষ সবাই আমার আপন, আবার লোকোত্তর পিতৃগণ এবং দেবগণও আমার আপন—এই সর্বাত্মভাবের উপর পঞ্চমহাযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। সবার মাঝে নিজেকে এমনি করে বিলিয়ে দেবার সুন্দর বিধান বোধ হয় আর-কোথাও নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই পঞ্চমহাযজ্ঞ আর বৌদ্ধধর্মের (বৌদ্ধ শব্দটি এখানে ব্যাপক-অর্থে ব্যবহার করছি) চারটি ব্রহ্মবিহার, মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা—এই নয়টি বিধানের মাঝে মনুষ্যত্বসাধনার যে পরম আদর্শ পাই, তাকে আর্যভাবনার সার বলা যেতে পারে। পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান তৈত্তিরীয়ারণ্যকেও পাওয়া যায় (২।১০)। সেখানে মনুষ্যযজ্ঞ হল ব্রাহ্মণকে অন্নদান। অনুষ্ঠানটির ইঙ্গিত অথর্বসংহিতাতেও আছে মনে হয় (৬।৭১।২); ভূতযজ্ঞ সেখানে উল্লিখিত হয়নি। মনু বলেন, মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে 'ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ'—এই দেহকে ব্রহ্মময় করা হয় (২।২৮)।

[৯৭] এই কাণ্ডের শেষ ছয়টি অধ্যায় বৃহদারণ্যক। তা-ই বৃহদারণ্যকোপনিষৎ নামে পরিচিত। শঙ্কর এই উপনিষদের কাণ্বশাখার উপর তাঁর বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করেছেন। কাণ্বশাখার বিষয়-বিন্যাস এইরকম: প্রথম কাণ্ডে অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, দাক্ষায়ণযজ্ঞ এবং চাতুর্মাস্য। দ্বিতীয় কাণ্ডে দর্শপূর্ণমাস। তৃতীয় কাণ্ডে অগ্নিহোত্র এবং দর্শপূর্ণমাসের অর্থবাদ। চতুর্থ ও পঞ্চম কাণ্ডে সোমযাগ। ষষ্ঠ কাণ্ডে বাজপেয়। সপ্তম কাণ্ডে রাজসূয়। অষ্টম কাণ্ডে উখাসম্ভরণ। নবম হতে দ্বাদশ কাণ্ড পর্যন্ত অগ্নিচয়ন। ত্রয়োদশ কাণ্ডে অগ্ন্যাধানকাল পথিকৃৎ শংযুবাক পত্নীসংযাজ এবং পশুবন্ধ। চতুর্দশ কাণ্ডে সৌত্রামণী। পঞ্চদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ। ষোড়শ কাণ্ডে প্রবর্গ্য। সপ্তদশ কাণ্ডে বৃহদারণ্যক। শতপথব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষৎ সব মিলিয়ে একটি সন্দর্ভ, এইটি লক্ষণীয়।

[৯৮] বৃহদারণ্যক ৬।৫; তু. শ. ব্রা. ১০।৬।৫।৯, ১৪।৯।৪।৩৩।

[৯৯] অগ্নিরহস্যের শেষের দিকে শাণ্ডিল্যবিদ্যার উপদেশ আছে। তার মন্ত্র হল, 'সত্যং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত' (১০।৬।৩।১); তু. ভাগবত 'সত্যং পরং ধীমহি' (১।১।১)। এই ব্রাহ্মণটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে ছান্দোগ্যোপনিষদেও পাওয়া যায় (৩।১৪)। সেখানে আছে, 'সর্বং খল্বিদং

শতপথব্রাহ্মণে শ্রমণের উল্লেখ আছে।[১০০] তৈত্তিরীয়ারণ্যকে এ'দের বলা হচ্ছে 'বাতরশনা হ বা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ'।[১০১] বাতরশন মুনিদের উল্লেখ ঋক্-সংহিতাতেও আছে;[১০২] মন্থী তাঁরা ঊর্ধ্ব বা ঊর্ধ্বস্রোতা অর্থাৎ ঊর্ধ্বরেতা।[১০৩] শ্রমণেরা আর্য মুনিধারার বাহন। এ'রাই ব্রাহ্মণের 'প্রব্রাজী',[১০৪] মুনিধারার 'অর্হৎ', বৌদ্ধ 'ভিক্ষু', বৈদান্তিক 'সন্ন্যাসী'।

এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত ব্রাত্যদের কথা স্মরণীয়। ব্রাত্যেরা পূবদেশের। শতপথ-ব্রাহ্মণে বৈদিকসভ্যতার পূর্বদিকে বিস্তৃত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি আখ্যায়িকায় বলা হচ্ছে, 'বিদেঘ মাথব[১০৫] বৈশ্বানর অগ্নিকে মুখে ধারণ করতেন। ঋষি গোতম রাহূগণ[১০৬] ছিলেন তাঁর পুরোহিত। বিদেঘ মাথবের মুখ হতে অগ্নি পৃথিবীতে পড়লেন। মাথব ছিলেন তখন সরস্বতীর তীরে। বৈশ্বানর অগ্নি সেখান থেকে পৃথিবীকে দগ্ধ করতে-করতে চললেন পূর্বদিকে। মাথব আর গোতম তাঁর পিছনে-পিছনে চললেন। বৈশ্বানর সব নদী পার হয়ে এসে ঠেকলেন সদানীরাতে।[১০৭] তারপর তিনি আর এগ'লেন না। তাইতে অনেক ব্রাহ্মণই সদানীরার পূবের দেশ অগ্নিহীন বলে নদী পেরিয়ে সেখানে যেতে চাইতেন না। দেশটা ছিল জলাভূমি, চাষবাসও বিশেষ হত না। ক্রমে ব্রাহ্মণেরা দেশটাকে অগ্নিশুদ্ধ ও চাষের যোগ্য করে নিলেন। সদানীরা তখন হল কোশল আর বিদেহের সীমা। মাথব সদানীরার পূবেই রইলেন।'[১০৮] বোঝা যায়, মাথব সদানীরার ওপারে উপনিবেশ স্থাপন করে কুরুপাঞ্চাল হতে বৈদিক সংস্কৃতির আমদানি করেছিলেন বিদেহে। তাঁর আগেই ব্রাত্যদের এদেশে

ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত (তু. ভাগবতধর্মের 'বাসুদেবঃ সর্বম্' গীতা ৭।১৯)।' ইতি-বাদের এইটিই চরম অনুভব। আত্মা সেখানে 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ কামরূপী সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যধৃতিঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ।' যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ, 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' (১৪।৭।২।২৭)। কিন্তু তাঁর নেতিবাদ ইতিবাদের প্রতিষেধ নয়, তার উত্তরপর্ব। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের এবং আদিত্যসম্প্রদায়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষণীয়। এই হতেই পরবর্তী যুগে বেদান্তে দেখা দিয়েছে জগৎসম্পর্কে পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদ।

[১০০] ১৪।৭।১।২২।

[১০১] ২।৭।১; অন্যত্র বলা হচ্ছে, বাতরশন ঋষিরা অরুণ- এবং কেতু-নামক ঋষিসংঘের সঙ্গে সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি হতে উৎপন্ন হলেও তাঁরা যে-অগ্নি চয়ন করেছিলেন, তার নাম কিন্তু 'আরুণকেতুক'ই থাকল (২।২৩।২, ২৪।৪)। বাতরশনদের নাম অগ্নিচয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকল না, এটি লক্ষণীয়। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা যাজ্ঞিক না হয়েও অগ্নিচয়ন করতে পারতেন। বাতরশন শব্দের অর্থ দিগম্বর, 'বাতাস যাঁদের লাগাম', রহস্যার্থ যাঁরা প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণসংযম করতে জানেন। তাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান না করেও বিদ্যার দ্বারা যজ্ঞসাধ্য ফল লাভ করতেন বলা যেতে পারে। আগেও দেখেছি, ব্রাহ্মণে এই দুরকম সাধনারই ইঙ্গিত আছে।

[১০২] মুনিসূক্ত ১০।১৩৬।

[১০৩] তু. শ্রীমন্থ, পুত্রমন্থ (১৪।৯।৩, ৪)। একটির মূলে বিত্তৈষণা বা লোকৈষণা, অপরটির মূলে পুত্রৈষণা। ঊর্ধ্বমন্থ স্পষ্টতই তাহতে পৃথক।

[১০৪] শতপথ ১৪।৭।৩।২৫; প্রব্রজ্যার কথা শতপথব্রাহ্মণেই বেশী করে পাওয়া যায়।

[১০৫] 'বিদেঘ' বিদেহের প্রাচীন নাম।

[১০৬] গোতম রাহূগণের নাম ঋক্সংহিতাতেই আছে। প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি উপমণ্ডল (৭৪-৯৩) তাঁর রচিত, নবম মণ্ডলেও তাঁর রচনা আছে (৩১, ৬৭।৭-৯) দশম মণ্ডলের একটি আথর্বণ মন্ত্রের তিনি ঋষি (১৩৭।২)। গোতমবংশীয়দের উল্লেখ ঋক্সংহিতাতে অন্যত্রও আছে। চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা বামদেব একজন গোতম।

[১০৭] আধুনিক গণ্ডক, পাটনার কাছে।

[১০৮] ১।৪।১।১০-১৭।

বসবাস করাটা অসম্ভব নয়। ব্রাত্যসংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির মিশ্রণে যে দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল, তাকে বহুপরে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন বিদেহের যাজ্ঞবল্ক্য এবং জনক। বৃহদারণ্যকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই পূবদেশই হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যপ্রতিদ্বন্দ্বী নানা মতবাদের জন্মভূমি। আজও তার জের চলছে, বিশেষ করে বাংলার সংস্কৃতিতে।

শতপথব্রাহ্মণে অনেক আখ্যায়িকা আছে। তার মধ্যে দুটি আখ্যায়িকা উল্লেখযোগ্য—একটি প্রজাপতির দুহিতৃগমন,[১০৯] আরেকটি পৃথিবীব্যাপী এক জলপ্লাবন।[১১০]

অথর্বসংহিতার একটিমাত্র ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়—**গোপথব্রাহ্মণ**। ব্রাহ্মণটির দুটি ভাগ। পূর্বভাগে পাঁচটি প্রপাঠক, উত্তরভাগে ছয়টি। বিষয়বস্তুর অনেকখানিই অন্যান্য ব্রাহ্মণ হতে ধার-করা, অথর্বসংহিতার সঙ্গে তার যোগ বিশেষ-কিছুই নাই, বিবৃতির ধরন অনেকটা আরণ্যক এবং উপনিষদের মত। এইজন্য পণ্ডিতেরা এটিকে অর্বাচীন যুগের রচনা বলে মনে করেন।

আগেই বলেছি, অনেক ব্রাহ্মণ লুপ্ত হয়ে গেছে। নানা জায়গায় এইসমস্ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায় : চরক শ্বেতাশ্বেতর কাঠক জাবাল খাণ্ডিকেয় ঔখেয় হারিদ্রবিক আহ্বরক কঙ্কতি গালব তুম্বরু আরুণেয় পৈঙ্গায়নি সৌলভ শৈলালি পরাশর মাষশরাবি কাপেয় অন্বাখ্যান ভাল্লবি শাট্যায়ন কালববি রৌরুকি।

বেদের আরণ্যক

ব্রাহ্মণের পর **আরণ্যক**। সংহিতার প্রধান ব্রাহ্মণগুলির শেষ অংশই আরণ্যক—কখনও ব্রাহ্মণের অঙ্গীভূত, কখনও-বা পৃথক। 'আরণ্যক' সংজ্ঞাটি সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় না।[১] বিদ্যার দিক দিয়ে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক পরিণতি আরণ্যকে, যেমন আরণ্যকের পরিণতি উপনিষদে। ব্রাহ্মণে আছে যজ্ঞবিদ্যা, আরণ্যকে রহস্যবিদ্যা, আর উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রাহ্মণে দ্রব্যযজ্ঞের বিধান, আরণ্যকে তারই সূক্ষ্মভাবনা, উপনিষদে তত্ত্বজ্ঞান। সবটাই এক অখণ্ড বেদবিদ্যা। ব্রাহ্মণ আরণ্যক আর উপনিষদে রয়েছে একই সাধনার অনুবৃত্তি এবং অধিকারের পারম্পর্য। আরণ্যকে এবং উপনিষদে একটা নতুন প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম দেখা দিয়েছে, ইওরোপীয় পণ্ডিতদের এ-প্রকল্প অযৌক্তিক।

---

[১০৯] ১।৭।৪।১-৪। আখ্যায়িকার মূল রয়েছে ঋক্‌সংহিতায়। অধ্যাত্ম তাৎপর্যের জন্য দ্র. ৩।৩১।১-২ টীকা।

[১১০] ১।৮।১।১-৬। এই প্লাবনের কাহিনী পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুরাণকথাতেও পাওয়া যায়। কাহিনীগুলি স্থানীয় বলেই পণ্ডিতদের অনুমান।

[১] শতপথব্রাহ্মণের চতুর্দশকাণ্ডের শেষ ছয়টি অধ্যায়ের নাম 'বৃহদারণ্যকম্'। আরণ্যক সংজ্ঞার এই উল্লেখই বোধ হয় সর্বপ্রাচীন। মৈত্রায়ণসংহিতায় আছে, মরুদ্‌দের সাতটি গণের মধ্যে একটির নাম 'অরণ্যেঽনুবাক্যাঃ', তাঁরাই মরুদ্‌গণের মধ্যে 'ক্ষত্র' বা সবচাইতে বলবান্‌ (৩।৩।১০; দ্র. কাঠক ২১।১০)। সামসংহিতার অরণ্যগেয় গানের কথা আগেই বলেছি, গ্রামে এবং অরণ্যে কেন তফাত করা হয় তাও বলেছি। আরণ্যকের সঙ্গে যুক্ত আছে রহস্যের ভাবনা—এহতে তা-ই বোঝা যায়। সায়ণ তাঁর তৈত্তিরীয়ারণ্যক-ভাষ্যের গোড়ায় বলছেন, বেদের এই অংশ অরণ্যে পড়তে হয় বলে তার নাম 'আরণ্যক'। ব্রতচারী হয়ে আরণ্যকভাগ শুনতে হয়, এই নিয়ম। আরণ্যকের বিদ্যা 'রহস্য-বিদ্যা' (occult science) এইমাত্র। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা তার মধ্যে 'uncanny' বা 'dangerous'-এর গন্ধ কোথায় পেলেন, তা দুর্বোধ্য।

ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণের পরিশেষে হল **ঐতরেয়ারণ্যক**, আর শাঙ্‌খায়নব্রাহ্মণের **শাঙ্‌খায়নারণ্যক**। ঐতরেয়ারণ্যকের পাঁচভাগ, প্রত্যেকটি ভাগের নাম 'আরণ্যক'। আরণ্যকগুলি আবার অধ্যায় এবং খণ্ডে বিভক্ত। 'গবাময়ন' নামে সংবৎসরসাধ্য একটি সোমযাগ আছে। তার উপান্ত্য দিনটিতে 'মহাব্রত' যাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। বৈদিক যাগের মধ্যে মহাব্রত একটি গুরুত্বপূর্ণ যাগ। তার মধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত ঠেকে। ঐতরেয়ারণ্যকের প্রথম এবং শেষ আরণ্যকে মহাব্রতের রহস্যভাবনা আছে। সায়ণের মতে এইটি আরণ্যকের কর্মকাণ্ড, আর বাকী ক'টি আরণ্যক **জ্ঞানকাণ্ড**। জ্ঞানকাণ্ডে পুরুষ প্রাণ সংহিতা ইত্যাদির রহস্যভাবনা আছে, আর আছে **ঐতরেয়োপনিষৎ**।[২] প্রথম তিনটি আরণ্যকই ঐতরেয়ারণ্যকের মূল অংশ। চতুর্থ আরণ্যকটি খুব ছোট—নয়টি মহানাম্নী ঋক্ আর নয়টি পুরীষপদের সংগ্রহ। পঞ্চম আরণ্যকটি সূত্রের আকারে। সায়ণ এর অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে রহস্যগ্রন্থহিসাবে অধ্যয়ন করতে হয় বলে একে আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শাঙ্‌খায়নারণ্যক পনের অধ্যায়ে বিভক্ত। বিষয়বস্তু ঐতরেয়ারণ্যকের অনুরূপ। তার তৃতীয় হতে ষষ্ঠ অধ্যায় হল **কৌষীতক্যুপনিষৎ**।[৩] দশম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের এবং একাদশ অধ্যায়ে স্বপ্নফলের বর্ণনা আছে। দুটিই চিত্তাকর্ষক। ত্রয়োদশ অধ্যায়টিতে সংক্ষেপে বেদবিদ্যার সারস্বরূপ সর্বাত্মভাবের উপদেশ আছে।

সামবেদের আরণ্যক গ্রন্থ দুটি—একটি জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের অন্তর্গত **উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ**,[৪] আরেকটি ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অংশ, যাতে সামকে আশ্রয় করে নানা কর্মাঙ্গ উপাসনার অবতারণা করা হয়েছে।[৫]

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের পরিশেষরূপে আমরা পাই **তৈত্তিরীয়ারণ্যক**। ব্রাহ্মণ আর আরণ্যকের মাঝে এক্ষেত্রে তফাতটা যে খুবই কম, একথা আগেও বলেছি। আরণ্যকটিতে দশটি 'প্রপাঠক'। সপ্তম থেকে নবম প্রপাঠক পর্যন্ত **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ**। অনেকে এটিকে খিল বা পরবর্তী সংযোজন মনে করেন। আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকে আছে আরুণকেতুক অগ্নিচয়নের বিবরণ, দ্বিতীয়ে স্বাধ্যায়বিধি, তৃতীয়ে চাতুর্হোত্রচিতি। চতুর্থ আর পঞ্চম প্রপাঠকে প্রবর্গ্যবিধি।[৬] চতুর্থ প্রপাঠকটি আরণ্যক, আর পঞ্চমটি ব্রাহ্মণ; এইজন্য সায়ণ দুটিকে একসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। ষষ্ঠ প্রপাঠকে আছে পিতৃমেধবিধি।[৭]

---

[২] ২।৪-৭।

[৩] এই উপনিষদের নাম হতে কেউ-কেউ ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের নামও 'কৌষীতকী' বলে ভুল করছেন। বস্তুত ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের নাম শাঙ্‌খায়নই হওয়া উচিত, কেননা আরণ্যকের শেষ অধ্যায়ে যে-বিদ্যাবংশের উল্লেখ আছে, তাতে শাঙ্‌খায়নের নামই প্রথমে আছে। কৌষীতকি কহোল ছিলেন শাঙ্‌খায়নের আচার্য। তিনি এই আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের (আরণ্যক ৪) প্রবক্তা।

[৪] জৈ. ব্রা. ৪-৭; প্রসিদ্ধ কেনোপনিষদ্ এরই অন্তর্গত।

[৫] অধ্যায় ১-২। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। শতপথব্রাহ্মণের মতই ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদ্ অন্যোন্যসম্পৃক্ত হয়ে একটি অখণ্ড বেদবিদ্যাকে প্রকাশ করছে।

[৬] এটি একটি বৈদিক রহস্যযাগ। এর কথা পরে বলব।

[৭] সদ্যোবিধবাকে চিতায় স্বামীর কাছে শুইয়ে দেবার, আবার সেখান থেকে নতুন স্বামীর হাত ধরে তার উঠে আসার বিধান এইখানে পাওয়া যায় (অনুবাক ১; দ্র. অ. স. ১৮।৩।১, ঋ.

কাঠকশাখার আলাদা আরণ্যক পাওয়া যায় না। সায়ণ তৈত্তিরীয়ারণ্যকের ভাষ্যের প্রস্তাবনায় এর কোনও-কোনও অংশকে কাঠকশাখার মধ্যে ধরেছেন। মৈত্রায়ণশাখার একটি আরণ্যক আছে, তার সাতটি প্রপাঠক। এটিকে 'মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্'ও বলা হয়।

শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণের শেষ চতুর্দশকাণ্ডের নাম **'বৃহদারণ্যক'**। তার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আছে প্রবর্গ্যবিধি, বাকী ছয়টি অধ্যায়ে বিখ্যাত 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্'।

বেদের উপনিষদ্

১

বেদের আরণ্যকের পর 'উপনিষৎ'। ব্রাহ্মণের শেষ পর্ব যেমন আরণ্যক, তেমনি আরণ্যকের শেষ পর্ব উপনিষৎ। আরণ্যক এবং উপনিষৎ দুই-ই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদ—এই প্রাচীন লক্ষণটি আবার স্মরণ করতে বলি। মন্ত্রকে যদি সামান্যত বলি 'ব্রহ্ম',[১] তাহলে ব্রাহ্মণ হল 'ব্রহ্মোদ্য' বা 'ব্রহ্মবাদ'।[২] ব্রাহ্মণগুলি ব্রহ্মবাদীদের বাকোবাক্য বা ব্রহ্মোদ্যের ফল। তাতে যেমন কর্মের মীমাংসা আছে, তেমনি আছে শক্তি এবং জ্ঞানেরও মীমাংসা। আরণ্যকপ্রসঙ্গে একথার উল্লেখ আগেই করেছি। উপনিষদ্ এই মীমাংসার চরম পরিণাম।

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত, তার অন্তর্গত প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিও তা-ই। কিন্তু

১০।১৮।৮। মন্ত্র দুটির তাৎপর্য নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে (দ্র. Kane, *History of Dharma-Shastras* Vol II. pp. 617 ff).

[১] এই সংজ্ঞা ঋক্‌সংহিতায় বহুপ্রযুক্ত। তাতে কবির মন্ত্রচেতনা এবং তার বাঙ্ময় স্ফূর্তি দুই-ই বুঝিয়েছে। মন্ত্রচেতনার সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রশক্তির দ্যোতনাও আছে। দ্র. 'ব্রহ্ম' ঋ. ৩।৮।২ টীকা।

[২] শতপথব্রাহ্মণে 'ব্রহ্মোদ্য' 'বাকোবাক্য' আর 'ব্রাহ্মণ' তিনটি সংজ্ঞা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৪।৬।৯।২০)। 'বাকোবাক্যং ব্রাহ্মণম্'—শতপথব্রাহ্মণের এই উক্তি হতে ব্রাহ্মণের স্বরূপ বোঝা যায়। বাকোবাক্য হল 'সংবাদ' বা প্রশ্নোত্তর, উক্তি-প্রত্যুক্তি। 'ব্রহ্মোদ্যমাহ্বয়ামহে' (শ. ১১।৪।১।২, ১১।৬।২।৫), 'ব্রহ্মোদ্যমগ্নিহোত্রং বিবিদিষ্যামি' (শ. ১১।৫।৩।১) 'ব্রহ্মোদ্যং জেতা' (শ. ১৪।৬।৮।১, ১২ গার্গীর উক্তি)—এইসব বাক্য হতেও ব্রহ্মোদ্য এবং ব্রাহ্মণের স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। ব্রাহ্মণে উল্লিখিত কয়েকটি ব্রহ্মোদ্যের বিবরণ ঃ গৃহপতি কে? (ঐ. ৫।২৫); অশ্বমেধযজ্ঞ (তৈ. ৩।৯।৫); হোতা ও ব্রহ্মার ব্রহ্মোদ্য (শ. ১৩।২।৬।৯...); হোতা ও অধ্বর্যুর, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতার, যজমান ও অধ্বর্যুর (শ. ১৩।৫।২।১১...)। ব্রহ্মোদ্য শুধু কর্মমীমাংসাই নয়, জ্ঞানমীমাংসাও। প্রমাণ উপরি-উক্ত ব্রহ্মোদ্যগুলিতেই পাওরা যায়—(তু. তা. ৪।৯।১২ সায়ণভাষ্য)। শতপথের এই মন্তব্যটি লক্ষণীয় : 'সর্বাপ্তির্বা এষ বাচো য়দ্ ব্রহ্মোদ্যম্' (১৩।৫।২।২২)। ব্রহ্মবাদ সংজ্ঞাটি শুধু একবার পাওরা যায় : 'দেবানাং ব্রহ্মবাদং বদতাম্' (তৈ. ব্রা. ১।২।১।৬)। কিন্তু 'ব্রহ্মবাদী' সংজ্ঞাটির বহুল ব্যবহার পাওরা যায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং আরণ্যকে, উপনিষদেও। ব্রহ্মোদ্যের স্থান হল 'সভা'। সেখানে যে-ধরনের আলোচনা হত, তার একটি সুন্দর ছবি পাই বৃহস্পতির জ্ঞানসূক্তে (ঋ. ১০।৭১)। ব্রহ্মোদ্যে যিনি সবাইকে হারিয়ে দেন, তাঁকে সেখানে বলা হয়েছে 'সভাসহ্' (১০।৭১।১০; তু. সভেয়ঃ বিপ্রঃ ২।২৪।১৩; বীরং...বিদথ্যং সভেয়ং [পুত্রম্] ১।৯১।২০)। একজায়গায় বাক্‌কে বলা হয়েছে 'গুহা চরন্তী মনুষো ন য়োষা, সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্' (১।১৬৭।৩; এইখানে রহস্যবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা আলোচনার স্পষ্ট উল্লেখ পাই)। সুতরাং ব্রহ্মবাদী বা ব্রহ্মোদ্যের অভাব বৈদিক যুগের কোনকালেই ছিল না। পরিপ্রশ্নের আকাঙ্ক্ষাটা উপনিষদের যুগে হঠাৎ দেখা দিয়েছে ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিরাগের ফলে, ইওরোপীয় পণ্ডিতদের এই প্রকল্প একেবারেই ভিত্তিহীন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবাদী আর উপনিষদের ব্রহ্মবাদী দুয়ের জাত আলাদা নয়। জ্ঞান আর কর্মে কোনও বিরোধ ছিল না বেদের যুগে। জ্ঞানের জন্যই কর্ম, এ-বুদ্ধি তখন সজাগ ছিল।

তাদের মধ্যে-মধ্যে গাথা বা শ্লোক আছে। ব্রাহ্মণেও কিছু-কিছু আছে। যখন বিচার-বিতর্ক আশ্রয় করে মীমাংসা চলে, তখন গদ্যের ব্যবহার। আর, একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে তাকে গাঁথা হয় মন্ত্র শ্লোক বা গাথার আকারে। সংহিতার অনেক মন্ত্র এমনি করে উপনিষদেও আবার উদ্ধৃত হয়েছে। এইদিক দিয়ে উপনিষদ্‌গুলিকে বেদের তত্ত্বার্থের ভাষ্য বলা যেতে পারে। সিদ্ধান্তগুলি যখন লোকাতত হয়েছে, তখন থেকে পাচ্ছি শ্লোকে গাঁথা উপনিষৎ—যা ঠিক ঋক্‌সংহিতার মত। এইধরনের শ্লোকে গাঁথা ঔপনিষদ ভাবনা আবার দেখতে পাই মহাভারতে—যা ইতিহাস-পুরাণের আদিগ্রন্থ। এমনি করে বেদের তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

অনুষ্ঠানের মাঝে বিধিনিষেধের কড়াকাড়ি আছে। কিন্তু ভাবনা বা বিদ্যার বেলায় তা নাই। তাইতে জীবন্ত মননের বেগে সে তার নিজের পথ নিজেই কেটে চলে। শ্রুতির ব্রাহ্মণভাগ এমনি করে ক্রমে স্থাণু হয়ে পড়ল, কিন্তু উপনিষদ্‌ভাগ বরাবর বহতা থেকে গেল। যে অথর্বসংহিতার মধ্যে বৈদিক ভাবনার চরিষ্ণু রূপের পরিচয় পাই, বেশীর ভাগ অর্বাচীন উপনিষদ্‌গুলির সে-ই হল আশ্রয়। এমনি করে উপ-নিষদ্ হল 'বেদান্ত'—যার অর্থ বেদের শেষপর্ব হতে পারে, আবার বেদবাদও হতে পারে।

'উপনিষৎ' সংজ্ঞাটি নিয়ে এ-যুগে অনেক বিতর্ক হয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি উপ-নি√সদ্ (বসা) হতে; সুতরাং তার মৌলিক অর্থ দাঁড়ায় 'কাছে নিবিড় হয়ে বসা।' এই থেকে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, অরণ্যে আচার্যের কাছে একান্তে বসে যে-বিদ্যা গ্রহণ করা হত, তার নাম 'উপনিষৎ'।[৩] কিন্তু লক্ষণীয়, আচার্যের কাছে গিয়ে বিদ্যাগ্রহণের কথা উপনিষদের বহু জায়গায় থাকলেও 'বসা' অর্থে উপ-নি√সদ্ কি নি√সদ্-এর ব্যবহার প্রাচীন উপনিষদগুলির কোথাও নাই।[৪] সব বিদ্যাই আচার্যের কাছে গিয়ে পরিচর্যাদ্বারা গ্রহণ করতে হত, সুতরাং সামান্যার্থে সব বিদ্যাকেই তো উপনিষদ্ বলা চলে। তাইতে বোঝা যায়, 'উপনিষৎ'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখানে খাটছে না, শব্দটি একান্তভাবেই পারিভাষিক।[৫]

---

[৩] Oldenberg 'উপনিষৎ' বলতে বুঝেছেন 'উপাসনা'। অধিকাংশ ইওরোপীয় পণ্ডিত এ-মত গ্রহণ করেননি। Bodus বলেন, বসা আচার্যের কাছে নয়, যজ্ঞাগ্নির কাছে। Hauer বলেন, তপস্যা- ও ধ্যান-লভ্য রহস্যজ্ঞানই উপনিষৎ। Deussen ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হতে বুঝেছেন 'রহস্যবিদ্যা'।

[৪] একমাত্র উপ√সদ-এর ব্যবহার আছে ছান্দোগ্যের কয়েক জায়গায় (১।১১।৪, ৬, ৮; ৬।৭।২, ৪; ৬।১৩।১, ২; ৭।১।১), অর্থ 'কাছে যাওয়া'। কিন্তু এই উপনিষদেরই একজায়গায় ধাতুটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : 'স য়দা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি, পরি-চরন্নুপসত্তা ভবতি, **উপসীদন্** দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি' (৭।৮।১)। এখানে বিদ্যাগ্রহণের জন্য গুরুর কাছে যাওয়া অর্থ খাটে না, কেননা তার আগেই পরিচরণের উল্লেখ আছে। শঙ্কর অর্থ করছেন, 'গুরুর সমীপস্থ হয়, তাঁর প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ হয়'; তার পরেই আবার বলছেন, 'হয়ে গুরু প্রভৃতিকে দর্শন করে শ্রবণ করে' ইত্যাদি। কিন্তু স্পষ্টতই দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি এখানে লক্ষ্য করছে আত্মতত্ত্বকে (তু. বৃ. ২।৪।৫, ৪।৫।৬)। সুতরাং উপ √ সদ্-এর অর্থ এখানে তত্ত্বাভ্যাস। এই বিশেষ অর্থটি মনে রাখতে হবে।

[৫] 'কাছে বসা' অর্থে উপ-নি √ সদ্-এর ব্যবহার যে উপনিষদে নাই, তা Keithও লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু বলছেন, 'উপসদ্' একটি বিশিষ্ট বৈদিক অনুষ্ঠান, তার সঙ্গে যাতে ঘুলিয়ে না যায় সেইজন্য 'উপ √ সদ্' ধাতুর ব্যবহার সত্ত্বেও বিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'উপনিষদ্' (*RPVU*, p. 492)। এ কেবল গাজুরি যুক্তি। সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে উপ-নি√সদ্-এর যে-কয়টি ব্যবহার

'উপনিষৎ' শব্দের সবচাইতে প্রাচীন উল্লেখ পাই শাকলসংহিতার একটি খিল-সূক্তে, সেখানে একসঙ্গে 'নিষৎ' এবং 'উপনিষৎ'-এর উল্লেখ আছে।[৬] অনুরূপ উল্লেখ মহাভারতেও পাই।[৭] পারিভাষিক অর্থে 'নিষৎ' শব্দ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, অর্থ 'দেবতার আবেশের অনুভব'।[৮] তেমনি আবার ঋক্‌সংহিতায় 'উপসৎ' শব্দও বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[৯] ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকেও উপনিষৎ সংজ্ঞা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বুঝিয়েছে 'নিগূঢ়' তত্ত্ব।[১০] সর্বদিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তই হয়, উপনিষদের যা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, তার উদ্দিষ্ট মানুষ নয়—দেবতা। দেবতা এসে আচার্যের হৃদয় নিষণ্ণ হলে তাঁর মাঝে যে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তা-ই 'উপনিষৎ'। এই অর্থই স্বাভাবিক এবং পরম্পরাগত। আচার্যের কাছে বসে বিদ্যাগ্রহণ অর্থটা গৌণ এবং আনুষঙ্গিকমাত্র।

শঙ্করাচার্য উপনিষদের অর্থ করেছেন, 'যা অবিদ্যা নাশ করে'[১১]; তার জন্য

আছে, তাও বিশেষ অর্থের জ্ঞাপক (তু. ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে অ. স. ১৯।৪১ ;অদিতিরির ত্বা সুপুত্রা উপনিষদেয়ম্ কা. স. ১।১০; উদ্‌গীথং...সহস্রপুত্রমুপনিষেদুঃ জৈ. উ. ২।২।৪।১১; অথ স উপনিষসাদ জ্যোতিরুক্‌থমিতি...আয়ুঃ...গৌঃ...জৈ. উ. ৩।১।৩।৯, ১১, ১৩। একমাত্র ঐতরেয়ারণ্যকে সামান্যার্থে ধাতুটির একটি প্রয়োগ আছে (উপনিষসাদ ২।২।৩)।

[৬] 'এরা নিষচ্চোপনিষচ্চ রিপ্রা যুবাং রেভত্যৌ সয়ুজা সুপর্ণ্যৌ। ব্রহ্মাণ্যক্রতুর্বিদথেষু শক্রা ধত্তং তয়োস্তনয়ং তোকমগ্র্যম্' (১।৩।৭)। ঋক্‌টির ঠিক-ঠিক অর্থ বোঝা যায় না। 'অক্রতুঃ' পদটি অনুদাত্ত সুতরাং ক্রিয়া। লঙ্-এর অডাগম এবং লিটের বিভক্তি মিলিয়ে এরকম পদ আর কোথাও পাওয়া যায় না। নিষৎ এবং উপনিষৎ সুপর্ণী রেভতী এবং ব্রহ্মকৃৎ, এই বিশেষণগুলি লক্ষণীয়। এগুলি গায়ত্রীর সম্পর্কেও প্রযুক্ত হতে পারে।

[৭] 'স্বং বাকেম্বনুবাকেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ, গৃণন্তি সত্যধর্মাণম্ (শান্তি ৯৯ ? দ্র. বাচস্পত্যম্)। এখানে বাক মন্ত্র, অনুবাক ব্রাহ্মণ, নিষৎ আরণ্যক। নীলকণ্ঠ বলেন, কর্মাঙ্গাববদ্ধ দেবতাবিজ্ঞান বাক্য নিষৎ, কেবলাত্মজ্ঞাপক বাক্য উপনিষৎ। Keith মহাভারতের এই উক্তিকে 'absurd' বললেন কি যুক্তিতে বোঝা যায় না (*RPVU* p. 492, n. 1)।

[৮] তু. অভিস্বরা নিষদা...ইন্দ্রে হিন্বানা দ্রবিণান্যাশতুঃ (ঋ. ২২৩।৫; এখানে 'অভিস্বর্' মন্ত্রের উচ্চারণ, 'নিষদ্' ভাবনা, যেন দেবতা আধারে 'নিষণ্ণ' হয়েছেন এই ভাব); অরাধি হোতা নিষদা য়জীয়ান্ ঋ. ১০।৫৩।২; রণা বা য়ে নিষদি (ঋ. ৬।২৭।১, ২; দেবতার আবেশে যে-আনন্দ); য়া বৈ দীক্ষা সা নিষৎ (শ. ব্রা. ৪।৬।৮।১, ২); ইন্দ্রং নিষদ্‌বরম্ (তৈ. ব্রা. ২৬।৭।২; বর্হিতে নিষণ্ণ হন বলে দেবতারা 'নিষৎ' (সায়ণ)। এই প্রসঙ্গে 'নিষত্তি' শব্দটিও লক্ষণীয় ঃ 'কা তে নিষত্তিঃ' (ঋ. ৪।২১।৯)।

[৯] তু. ইমাং মে অগ্নে সমিধম্ ইমামুপসদং বনেঃ (২।৬।১; 'সমিধ্' দেবতায় নিবেদিত আধারের প্রতীক; 'উপসদ্' তাঁর নিত্যসামীপ্যের ভাবনা। Geldnerও এখানে 'উপসদ্' বলতে বুঝেছেন die Hulding or 'homage'। তু. 'উপাসনা'।

[১০] তু. শ. ব্রা. য়জুষঃ রস এব উপনিষৎ ১০।৩।৫।১২, অগ্নেঃ বাক্ এব উপনিষৎ ১০।৫।১।১, সংবৎসরস্য উপনিষৎ ১২।২।২।২৩; জৈ. উ. ব্রা. গায়ত্রস্য উপনিষৎ ৪।৮।৫।৩, ৪।৯।১।১, ৪।৯।২।২; ঐ. আ. সংহিতায়া উপনিষৎ ৩।১।১, বাচ উপনিষৎ ৩।২।৫, এতস্যামুপনিষদি ৩।১।৬ (অনুরূপ শা. আ. 'তস্য উপনিষৎ, ন য়াচেদিতি ৪।১, ২)। উপনিষৎকে বেদশিরঃ বলা হয়েছে ঃ শা. আ. 'উপনিষদং বেদশিরো ন য়থাকথঞ্চন বদেৎ, তদেতদ্ ঋচা অভ্যুদিতম্ : ঋচাং মূর্ধানং য়জুষামুত্তমাঙ্গং সাম্নাং শিরোঽথর্বণাং মুণ্ডমুণ্ডং নাধীতেঽধীতে বেদমাহুস্তমজ্ঞং শিরশ্ছিত্বাসৌ কুরুতে কবন্ধম্। স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদ্ অধীত্য বেদং ন বিজানাতি অর্থম্, য়োঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্‌মা (১৩।১, ১৪)। এই শেষের ঋক্‌টি যাস্কও তাঁর নিরুক্তের উপোদ্‌ঘাতে উল্লেখ করেছেন (১।১৮)। এই ভাবের মূল রয়েছে ঋক্‌সংহিতাতে (তু. ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ য়স্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ, য়স্তন্ন বেদ কিম্ ঋচা করিষ্যতি য় ইত্তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে ১।১৬৪।৩৯)।

[১১] দ্র. ভাষ্যভূমিকা, বৃহদারণ্যক, কঠ, মুণ্ডক।

আধুনিক পণ্ডিতেরা সবাই তাঁর প্রতি কটাক্ষ করেছেন। শঙ্করের অর্থ ব্যুৎপত্তিলভ্য না হতে পারে; কিন্তু মনে হয়, তারও একটা বৈদিক ভিত্তি আছে। সোমযাগে 'উপসৎ' নামে একটি ইষ্টির বিধান আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেন, অসুরেরা তিনটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল—পৃথিবীতে লোহার, অন্তরিক্ষে রূপার, আর দ্যুলোকে সোনার। দেবতারা যে-ইষ্টির সহায়ে এই তিনটি দুর্গ ভেঙে দিয়েছিলেন, তা-ই হল 'উপসৎ'।[১২] বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাপারটা হল অবিদ্যার দুর্গ ভাঙা, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে 'অবিদ্যাগ্রন্থির বিকিরণ'।[১৩] দেবতা উপসন্ন বা আধারে আবিষ্ট হলেই তা হতে পারে।[১৪] এই 'উপসৎ' আর 'উপনিষৎ' একই ভাবনার দুটি সংজ্ঞা। সুতরাং শঙ্করের ব্যাখ্যা অমূলক নয়।

আজপর্যন্ত যতগুলি উপনিষদ্ পাওয়া গেছে, তাদের সংখ্যা দু'শ'র উপরে। এদের বেশীর ভাগই অর্বাচীন। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮টি উপনিষদের একটা নাম-তালিকা পাওয়া যায়। তাতে ১০টি উপনিষদ্‌কে ঋগ্‌বেদের, ১৯টিকে শুক্লযজুর্বেদের, ৩২টিকে কৃষ্ণযজুর্বেদের, ১৬টিকে সামবেদের এবং ৩১টিকে অথর্ববেদের অন্তর্গত বলা হয়েছে। এই বিভাগের প্রামাণ্য কতটুকু বলা কঠিন।

যথার্থ বৈদিক উপনিষদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বেদের আরণ্যকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত উপনিষদ্ হল এই কয়খানি—ঐতরেয় কৌষীতকী তৈত্তিরীয় বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য এবং কেন। মহানারায়ণোপনিষদ্‌ও তৈত্তিরীয়ারণ্যকের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রাচীন কাল হতেই এটিকে খিল বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং ঐতরেয় প্রভৃতি ছয়টি উপনিষদ্‌ই ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গীর বিচারে সর্বপ্রাচীন বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই ক'খানি উপনিষদ্‌ই ব্রাহ্মণের মত গদ্যে রচিত, কেবল কেনোপনিষদের প্রথম দুটি খণ্ড পদ্যে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই উপনিষদ্‌গুলি সবই বুদ্ধপূর্ব যুগের।

আর কয়েকটি উপনিষদ্‌ও প্রায়শ পদ্যে রচিত এবং কোনও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে যুক্ত না হলেও বুদ্ধপূর্ব যুগের বলেই অনেকে মনে করেন। তাদের নাম হল কঠ শ্বেতাশ্বতর প্রশ্ন ও মুণ্ডক। পূর্বোক্ত মহানারায়ণোপনিষদ্‌কে এই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে।

মৈত্রায়ণীয় এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ গদ্যে রচিত, কিন্তু সে-গদ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণের গদ্য নয়। উপনিষদের বৈদিক ধারা সাক্ষাৎভাবে এইখানে এসে শেষ হয়েছে বলা চলে।

---

[১২] ১।২৩; তু. শাং. ব্রা. ৮।৮; শ. ব্রা. ৩।৪।৪।১, সেখানে আছে, 'এতাভির্দেবা উপসদ্‌ভিঃ পুরঃ প্রাভিন্দন্, ইমাঁল্লোকান্ প্রাজয়ন্, (৫)। উপসদের দেবতা অগ্নি সোম এবং বিষ্ণু (ঐ. ৩।৩২); সোম এখানে স্পষ্টতই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। আধারে আগুন জ্বালিয়ে হৃদয় গলিয়ে মূর্ধন্যচেতনায় আরূঢ় হতে পারলে ত্রিপুর ভেদ করা যায়, সাধক তাতে বিশ্বজিৎ হয়। শতপথব্রাহ্মণ বলছেন, উপসৎ হচ্ছে তপঃশক্তি (৩।৬।২।১১, ১০।২।৫।৩), স্বধা বা স্বপ্রতিষ্ঠার বীর্য হতেই তার সৃষ্টি (১২।১।২।১)।

[১৩] মুণ্ডক ২।১।১০

[১৪] তু. ঐ. ব্রা. 'তে দেবা অব্রুবন্, উপসদ উপায়াম, উপসদা বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি' (১।২৩)। এখানে 'উপসৎ' বলতে বোঝাচ্ছে দুর্গাবরোধ, সংজ্ঞাটির আক্ষরিক অর্থ ধরে। তাহতে অসুরগৃহীত আধারে দেবশক্তির আবেশের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট।

সব উপনিষদের মধ্যে ঈশোপনিষদ্‌টি স্বতন্ত্র। এটি কোনও ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নয়, সোজাসুজি সংহিতারই পরিশেষ।

মোটের উপর এই চৌদ্দটি উপনিষদ্‌কে সম্প্রদায়াগত বৈদিক তত্ত্বভাবনার বাহন বলা যেতে পারে।

উপনিষদের বৈদিকধারা লোকাতত হয়েছে ইতিহাস-পুরাণের ভিতর দিয়ে। তখন উপনিষদ্‌কে শ্রুতি না বলে বলা হয়েছে স্মৃতি। যেমন মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্-গীতাকে একদিক দিয়ে বলা হয় স্মৃতি, আরেকদিক দিয়ে উপনিষদ্। উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মনে রেখে বলতে পারি, গীতার এই সংজ্ঞা নিরর্থক নয়। লোকোত্তরের আবেশে চেতনায় পরমার্থের যে-স্ফুরণ, তার বাণীরূপই উপনিষদ্। সে-স্ফুরণ বৈদিক যুগ বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাই পরবর্তী যুগেও বৈদিক এবং অবৈদিক সব সম্প্রদায়প্রবর্তকেরাই তাঁদের পরম উপলব্ধিকে নাম দিয়েছেন উপনিষদ্। উপনিষদ্ সংজ্ঞাটিই এমনি করে ভারতবর্ষের বিচিত্র অধ্যাত্মসিদ্ধির মাঝে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত করে তুলতে সাহায্য করেছে, এটি কম লাভের কথা নয়।

বেদোত্তর উপনিষদ্‌গুলিকে আধুনিক পণ্ডিতেরা বিষয়বস্তু অনুসারে মোটামুটি ছয়ভাগে ভাগ করেছেন—(১) সামান্যবেদান্ত (২) যোগ (৩) সন্ন্যাস (৪) বৈষ্ণব (৫) শৈব (৬) শাক্ত। বলা বাহুল্য, এ-বিভাগটা কাজচলা-গোছের, এতে অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি দুইই আছে। গাছের ডালপালার মত ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধন-সম্প্রদায় একই কাণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে, সুতরাং তাদের মধ্যে অন্যোন্যপ্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক।

বেদোত্তর উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে এদেশের প্রধান-প্রধান সাধনসম্প্রদায়ের সব-গুলিকেই আমরা পাই। প্রাচীন ঔপনিষদ ধারার অনুবৃত্তি চলেছে সামান্য-বেদান্তোপ-নিষদ্‌গুলিতে। ব্রহ্মবাদী ঋষিদের পাশাপাশিই ছিলেন আত্মবাদী মুনিরা, তাঁদের মুখ্য সাধন হল যোগ।[১৫] বৈদিক উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর এই দুটি যোগোপনিষদ্। যে-নাড়ীবিজ্ঞান পরবর্তী যুগে হঠযোগের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়, তার উল্লেখ আমরা ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক কঠ মুণ্ডক এবং মৈত্রায়ণীয় উপ-নিষদেও পাই।[১৬] যোগোপনিষদ্‌গুলিতে এই যোগবিদ্যার বিস্তার। তাতে বৈদিক ধী-যোগ[১৭], সাংখ্যোক্ত রাজযোগ এবং শৈব হঠযোগ এই তিনটি ধারারই সংমিশ্রণ ও

---

[১৫] অবশ্য যোগের কথা সংহিতাতেও আছে, প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে তো আছেই। যে-অদ্বৈতভাবনা বেদবাদের মূল, স্বাভাবিক রীতিতেই তা হতে যোগের উৎপত্তি হয়। দেবতা শুধু বাইরে নন, তিনি আমাতেও আছেন; আমাতে তিনি আবিষ্ট হন, আমি তাঁর সাযুজ্য লাভ করি। তাই একই তত্ত্ববস্তু যেমন ব্রহ্মাণ্ডে অধিদৈবত, তেমনি পিণ্ডে অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্মবোধ বা তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টিই যোগের ভিত্তি। এই বোধটি বৈদিক ভাবনার সব পর্বেই জাগ্রত ছিল। বৈদিক যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাবে।

[১৬] 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' কঠোপনিষদের একটি সুপরিচিত শ্লোক (২।৩।১৬)। এটি ছান্দোগ্যেও উদ্ধৃত হয়েছে একটি প্রাচীন শ্লোকরূপে। এর মূল বাজসনেয়সংহিতার এই মন্ত্রটি 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ' ইত্যাদি (১৮।৪০; দ্র. নি. ২।৬।৩)। তারও মূলে ঋক্‌সংহিতার এই মন্ত্রটি ঃ 'অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্, ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে' ১।৮৪।১৫; দ্র. নি. ৪।৫। এই মন্ত্রটিই যোগবীজ।

[১৭] দ্র. ঋ. ৩।৩।৮ টীকা।

সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। ঋষিপন্থা এবং মুনিপন্থা দুয়ের মাঝেই সন্ন্যাসের বিধি ছিল।[১৮] বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যার কথা আমাদের জানা আছে। মুণ্ডকোপ-নিষদেরও ঝোঁক সন্ন্যাসের দিকে, যদিও তাতে কর্মমার্গকে অস্বীকার করা হয়নি, কর্মপথ ও জ্ঞানপথ দুটিকেই 'সত্য' বলা হয়েছে।[১৯] সাংখ্যোপনিষদ্গুলিতে পাওয়া যায় এই সন্ন্যাসমার্গেরই বিস্তৃত বিবরণ।

বর্তমানে তন্ত্রকেই ভারতবর্ষের লোকাতত ধর্ম বলা যেতে পারে। তন্ত্রে পঞ্চ-দেবতার উপাসনার বিধি আছে। পাঁচটি দেবতা হলেন শিব বিষ্ণু শক্তি গণপতি এবং সূর্য। তার মধ্যে সূর্যোপাসনা মূলত বৈদিক।[২০] গণপতির উপাসনা দক্ষিণদেশেই বিশেষ করে প্রচলিত। তাঁর নামে একখানা উপনিষদ্ও পাওয়া যায়। বস্তুত শিব বিষ্ণু আর শক্তির উপাসনাই সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। এঁদের অবলম্বন করে এক বিরাট্ অধ্যাত্মশাস্ত্রেরও সৃষ্টি হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে তাঁদের স্থান খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও ইতিহাস-পুরাণের একটা বড় অংশ তাঁরা জুড়ে আছেন। তাঁদের নিয়ে দার্শনিক ভাবনাও হয়েছে সুপ্রচুর। এইসব ভাবনার একটা অপৌরুষেয় উৎস কল্পনা করতে গিয়েই বেদোত্তর শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত উপনিষদ্গুলির সৃষ্টি। কিন্তু এগুলিকে যেমন 'শ্রুতি' বলে গণ্য করা হয়, তেমনি আবার শৈব 'আগম' বৈষ্ণব 'সংহিতা' ও শাক্ত 'তন্ত্র'গুলিকেও বলা হয় 'শ্রুতি', যদিও রচনারীতিতে তারা পৌরাণিক সাহিত্যেরই সগোত্র।[২১] বৈদিক উপনিষদ্গুলির মাঝে শ্বেতাশ্বতর একখানি শৈব উপনিষদ্, যেমন মহানারায়ণোপনিষদ্খানি অংশত বৈষ্ণব।

প্রাচীন অর্বাচীন সব মিলিয়ে এই একশ' আটখানি উপনিষদের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের চিত্ত অজ্ঞাতসারে এক ধর্মসমন্বয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কোনও শ্রুতিকেই কেউ অমান্য করতে পারে না, সুতরাং নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে অপরের ভাবনার সমন্বয়ের চেষ্টাটা আপনা থেকেই এসে পড়ে। ঔপনিষদ ভাবনা তাই ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনার একটি অপরিহার্য সাধন।

এইবার প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন বৈদিক উপনিষদ্গুলির একে-একে পরিচয় নেওয়া যাক। উপনিষৎসাহিত্য আমাদের সবারই কম-বেশী জানাশোনা আছে; তাই এই উপলক্ষ্যে পরিচয়টিকে একটু বিস্তৃত করবার চেষ্টা করব, যাতে সংহিতার

---

[১৮] 'যতি' বা সন্ন্যাসীর উল্লেখ ঋক্সংহিতাতে আছে ঃ ইন্দ্রের সুবীর্য আনে 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের চেতনা, তাই যতিদের ইষ্টসিদ্ধির সহায়ক হয় (৮।৩।৯)। এখানে যতিই স্পষ্টতই দেববাদী। মুনিধারার সন্ন্যাসীদের বিবরণ পাই মুনিসূক্তে (১০।১৩৬)। তবে সেখানেও দেবতাদের সঙ্গে মুনিদের কোনও বিরোধের কথা নাই। বিরোধটা প্রকট হয়েছে পরে।

[১৯] তু. ১।২।১ ও ২।১।১

[২০] লক্ষ্মণদেশিকেন্দ্র তাঁর শারদাতিলকতন্ত্রের চতুর্দশ পটলে সৌরপ্রকরণে অগ্নি সূর্য সোম এই তিনটি দেবতারই মন্ত্র আর উপাসনা বিধির পরিচয় দিয়েছেন। অগ্নি ইন্দ্র (=সূর্য) সোম এই তিনজন ঋক্সংহিতারও প্রধান দেবতা।

[২১] কুল্লুক মনুসংহিতার টীকায় হারীত থেকে উদ্ধরণ দিয়েছেন, 'শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ' (২।১)। শ্রুতি সংজ্ঞার এই অর্থব্যাপ্তি লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ্য ভাবনা প্রাকৃতকেও সংস্কৃত করে জাতে তুলতে চাইছে সবসময়, এটা তার একটা মস্ত গুণ। সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ঐক্য এসেছে এই থেকেই।

ভাবনার সঙ্গে উপনিষদের ভাবনার যোগটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ-সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি ভুল ধারণা ভেঙে যায়।

২

ঋগ্বেদের দুটি উপনিষদ্—ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত **ঐতরেয়োপনিষদ্** আর শাঙ্খায়নারণ্যকের অন্তর্গত **কৌষীতক্যুপনিষদ্**। দুটিই গদ্যে রচিত।

ঐতরেয়োপনিষদের তিনটি অধ্যায়।[২২] মূল প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যটি এই উপনিষদের অন্তর্গত। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে এইটিই সর্ব-প্রাচীন উপনিষদ্।[২৩]

উপনিষদের প্রথম অধ্যায়টিতে আছে সৃষ্টিরহস্যের বর্ণনা। বর্ণনা অবশ্য মরমীয়াদের মত সন্ধাভাষায়। তার সারসংক্ষেপ এই : আত্মা হতেই এই যা-কিছু সবার সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির মূলে আছে আত্মার 'ঈক্ষা' বা সংকল্পযুক্ত দর্শন। তাইতে প্রথম সৃষ্টি হল 'লোক' বা ভুবনসমূহ। সবার উপরে যে-লোক, তার নাম হল 'অম্ভঃ' বা নীহারিকা, আর সবার নীচে 'অপ্' বা মহাপ্রাণের সমুদ্র। দুয়ের মাঝে 'মরীচি' বা আলোর ঝিলিমিলি আর 'মর' বা মর্ত্য পৃথিবী। তারপর আত্মা ঐ মহাপ্রাণের সমুদ্র হতে এক পুরুষকে মূর্ত করে তুললেন। সেই পুরুষের বিভিন্ন অবয়বরূপে লোকপাল দেবতারা অভিব্যক্ত হলেন। এই দেবতারা বস্তুত আমাদের ইন্দ্রিয়গোলক ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান-চৈতন্য[২৪], এখানে বর্ণিত হয়েছে বিলোমক্রমে। তারপর সেই দেবতাদের মধ্যে জাগল ক্ষুধা আর তৃষ্ণা, তাঁরা তার তর্পণের জন্য চাইলেন 'আয়তন' বা আশ্রয়। 'পুরুষ' বা মানুষ হল সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়তন, দেবতারা অনুলোমক্রমে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সেই আবিষ্ট আয়তনকে আশ্রয় করল। তখন আত্মা প্রাণসমুদ্রকে অভিতপ্ত করে এক 'মূর্তি'র সৃষ্টি করলেন, তা-ই হল অন্ন। পুরুষ মৃত্যুর দ্বারা অধিষ্ঠিত অপানবায়ু দিয়ে সেই অন্নকে গ্রহণ করল। মরলোকে জীবযাত্রা শুরু হয়ে গেল। আত্মা 'সীমা' বা ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে 'বিদৃতি' নামের দুয়ার দিয়ে আধারে প্রবেশ করলেন ও দুয়ারটি হল 'নান্দন' কিনা আনন্দের হেতু।[২৫] এই আবেশের পর আধারে আত্মার তিনটি 'আবসথ' বা অধিষ্ঠান-ভূমি সৃষ্ট হল। তারপর আত্মা জীবযাত্রা যাপন করে ক্রমে আধারে নিজেকে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে দর্শন করলেন। দর্শন করলেন ইন্দ্রকেই।[২৬]

---

[২২] ঐ. আ. ২।৪-৬।

[২৩] আবার কেউ-কেউ বৃহদারণ্যককে সর্বপ্রাচীন বলে থাকেন।

[২৪] এইখানে সাংখ্যের ত্রিগুণের অনুরূপ কল্পনা পাওয়া যাচ্ছে।

[২৫] এইখানে সুষুম্ণপথের উদ্দেশ পাওয়া গেল। ঋক্সংহিতায় 'সুম্ন' অর্থে 'সুখ'; 'সুষুম্ণ' পরম সুখ। তাই এখানে নান্দন-দুয়ার। তু. য়াভির্ (পারমানীভিঃ) গচ্ছতি নান্দনম্ ঋ. খিল. ৩।১০।৬ (দ্র. ঋ. ৯।৬৭।৩১,৩২)।

[২৬] সুতরাং ঋক্সংহিতার ইন্দ্র ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই এই আধারে অনুপ্রবিষ্ট। এই হল ঋগ্বেদের উপনিষদ্ বা সারবস্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার তিনটি জন্মের কথা বলা হচ্ছে। তাঁর প্রথম জন্ম পুরুষ দ্বারা স্ত্রীতে নিষিক্ত বীর্য হতে ভ্রূণরূপে। দ্বিতীয় জন্ম স্ত্রীর গর্ভ হতে পৃথিবীতে কুমাররূপে। তৃতীয় জন্ম মৃত্যুর পর উৎক্রান্তির ফলে ঐ স্বর্গলোকে এক আপ্তকাম অমৃতসম্ভূতি—যেমন ঋষি বামদেবের হয়েছিল।[২৭]

তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হচ্ছে আত্মার স্বরূপের কথা। আত্মা হতেই জগৎসৃষ্টি, আত্মা হতেই জীবজন্ম। এই আত্মা তা হলে কি? আত্মা স্বরূপত প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞানই আমাদের লৌকিক চেতনার নানা বৃত্তিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। শুধু অন্তর্জগৎ নয়, বহির্জগৎও এই প্রজ্ঞানই। প্রজ্ঞানই সব-কিছুর প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই প্রজ্ঞানদ্বারাই আপ্তকাম অমৃতপদ লাভ করা যায়।[২৮]

শাঙ্খায়নারণ্যকের তৃতীয় হতে ষষ্ঠ পর্যন্ত চারিটি অধ্যায় নিয়ে **কৌষীতক্যুপ-নিষদ্**। প্রতিপাদ্য দেবযান ও পিতৃযাণ, প্রাণবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়ে দেবযান ও পিতৃযাণের কথা আছে। অধ্যায়টি আরম্ভ হয়েছে একটি উপাখ্যান দিয়ে। ঋষি আরুণির ছেলে শ্বেতকেতু রাজা চিত্র গাঙ্গ্যায়নির কাছে গেলে পর রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা নিগূঢ় (সংবৃতম্) তত্ত্ব আছে বিশ্বে, তার আরেকটি পথও আছে; তুমি আমায় সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবে?' শ্বেতকেতু এই প্রশ্নের মর্ম বুঝতে না পেরে বাবার কাছে ফিরে এলেন। তারপর বাপ-বেটা দুজনে গিয়ে রাজার কাছ থেকে বিনীত শিষ্যের মত দেবযানপথের ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির রহস্য-বিদ্যা অর্জন করলেন।[২৯]

---

[২৭] 'ইতঃ প্রয়ন্নের পুনর্জায়তে' (২।১।৪) বলতে পুনর্জন্ম বোঝাচ্ছে। কিন্তু এই পুনর্জন্ম ইহলোকে নয়, 'অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে', নইলে বামদেবের উদাহরণের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। 'প্রয়ন্নের'—এখানে 'এর' পদটি লক্ষণীয়। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই লোকান্তরে জন্ম হয়। বৌদ্ধ ভাবনাতেও অনুরূপ কথা আছে, যেমন ইহলোক হতে 'তুষিতস্বর্গে জন্ম'। মৃত্যুক্ষণটিকে সেখানে বলা হয় চ্যুতিক্ষণ। একই আত্মা পুত্ররূপে লোকসন্ততির জন্য নিজের বিভূতির একটি ধারাকে এখানে রেখে আরেকটি ধারায় অমৃতলোকে চলে গেলেন—এই হল অধ্যায়টির তাৎপর্য। বস্তুত প্রচলিত পুনর্জন্ম-বাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না কিন্তু। তু. 'ত্রির্বৈ গৃহপতে পুরুষো জায়তে, পিতুরেবাগ্রেঽধি-জায়তেঽথ মাতুরথ য়জ্ঞাৎ (জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রা. ৩।২।৩)।

[২৮] কি করে, তার কোনও নির্দেশ এই উপনিষদ্‌টিতে নাই। কঠোপনিষদে প্রজ্ঞানকে আত্মোপলব্ধির সাধন বলা হয়েছে (১।২।৪)। তার পূর্বের মন্ত্রটিতেই বলা হচ্ছে, এই আত্মাকে প্রবচন মেধা বা শ্রুতি দিয়ে পাওয়া যায় না, তিনি যাকে বরণ করেন সে-ই তাঁকে পায়। সুতরাং প্রজ্ঞান এখানে বোধি (spiritual intuition) বা সহজ জ্ঞান। ঋক্‌সংহিতায় 'প্রজানৎ' এই বিশেষণটির ব্যবহার আছে কয়েক জায়গায়। কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষণীয় : হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্ ৩।২৬৮; 'প্রজানন্ বিদ্বাঁ' উপ য়াহি সোমম্ ৩।২৯।১৬, ৩৫।৪ (৮); বিশ্বামবিন্দন্ পথ্যামৃতস্য প্রজানন্নিত্তা নমসা বিবেশ ৩।৩১।৫, (পূষা) আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ১০।১৭।৬; (উষঃ) প্রজানতীব দিশো ন মিনাতি ১।১২৪।৩, ৫।৮০।৪। প্রজ্ঞানের সঙ্গে অগ্নির বিশেষ যোগ দেখতে পাচ্ছি। প্রজ্ঞানই বিদ্যা এবং হৃদয় তার সাধন। দেবোপাসনায় চেতনার যে-বৈশারদ্য, যার ফলে হৃদয়ে তাঁর সাযুজ্য অনুভূত হয়, তা-ই প্রজ্ঞান। এইজন্যই প্রজ্ঞান ব্রহ্ম। সংহিতার ভাবনার অনুবৃত্তি উপনিষদে হয়েছে এইভাবে।

[২৯] এই কাহিনীটি একটু উলটে-পালটে পাওয়া যায় ছান্দোগ্যে (৫।৩-১০) এবং বৃহদারণ্যকে (৬।২)। দুটি উপনিষদেই রাজার নাম প্রবাহণ জৈবলি। তিনি পঞ্চালদের রাজা। আরুণি এবং শ্বেতকেতুর প্রসঙ্গ আবার আছে ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সমস্ত অধ্যায়টি জুড়ে আছে আরুণির 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের' উপদেশ। প্রসিদ্ধ মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'র উল্লেখও এখানেই আছে। আরুণি এখানে নিঃসন্দেহে ব্রহ্মবিৎ। মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণনা খুব সংক্ষেপে তিনিও দিয়েছেন (৬।৭।৬), কিন্তু সেখানে পিতৃযাণ-দেবযানের প্রসঙ্গ নাই। মনে হয়, এই তথ্যটির একটি বিবৃতি তিনি সংগ্রহ করেন একজন রাজার কাছে—সে-রাজা এক মতে চিত্র, আরেক মতে প্রবাহণ। এই

রাজা চিত্র তাঁদের যা বললেন, তার মর্ম এইঃ মৃত্যুর পর সবাই চন্দ্রমাতে যায়। চন্দ্রমা হলেন স্বর্গলোকের দ্বার। তাঁর কাছে গেলে সবাইকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' যে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তাকে তিনি পথ ছেড়ে দেন, যে পারে না তাকে আবার কৃষ্ণপক্ষের সহায়তায় বৃষ্টিধারার সঙ্গে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেন। প্রশ্নটির জবাবে ঋতুদের সম্বোধন করে বলতে হবে, 'হে ঋতুগণ, পৃথিবীতে জন্মে বিদ্যা-অবিদ্যার মাঝে দোল খেয়েছি, এখন আমায় অমৃতে নিয়ে যাও। সত্য আর তপস্যার জোরে বলছি, আমিই ঋতু, আমিই আর্তব (ঋতুজাত)'।[৩০] চন্দ্রমা আবার জিজ্ঞাসা করেন 'তুমি কে?' সে বলে, 'আমি তুমিই'। তখন চন্দ্রমা তাকে পথ ছেড়ে দেন।

মুক্ত (উপনিষদের ভাষায় 'অতিসৃষ্ট' অর্থাৎ মর্ত্যলোকের আকর্ষণ কেটে যাঁকে ছুঁড়ে দেওরা হয়েছে লোকোত্তরের দিকে) আত্মা তখন দেবযানের পথ ধরে যথাক্রমে অগ্নি বায়ু বরুণ ইন্দ্র ও প্রজাপতির লোক পেরিয়ে চলেন ব্রহ্মলোকের দিকে।[৩১] ব্রহ্মলোকে আছে 'অরি' হ্রদ, 'যেষ্টিহা' মুহূর্ত, 'বিজরা' নদী, 'ইল্য' বৃক্ষ, 'সালজ্য' নগর, 'অপরাজিত' পুরী, 'ইন্দ্র-প্রজাপতি' দ্বারপাল[৩২], 'বিভু' সভা, 'বিচক্ষণ' বেদি, 'অমিতৌজাঃ' পর্যঙ্ক। আর আছেন 'মানসী' আর 'চাক্ষুষী' নামে দুটি প্রিয়া, যাঁরা বিশ্বভুবনের ফুল দিয়ে মালা গাঁথছেন।[৩৩] তিনি বিজরা নদীর কাছে আসতেই ব্রহ্মা তা জানতে পারেন। তখন পাঁচশ' অপ্সরা ছুটে এসে তাঁকে ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করে।[৩৪] তারপর তিনি মনোবলে অরিহ্রদ পার হয়ে যান, 'সম্প্রতিবিদ্‌রা' যেখানে

উপলক্ষ্যে উপনিষদে ক্ষত্রিয়প্রভাব নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মাঝে অনেকে খানিকটা কোলাহলের সৃষ্টি করেছেন। অন্তত দেবযান-পিতৃযাণ পথের তত্ত্বটা যে বিশেষ করে ক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ের আবিষ্কার নয়, তার প্রমাণ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। তার কথা পরে তুলছি।

[৩০] এখানে ঋতুর উল্লেখটি লক্ষণীয়। ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে দেবযান ও পিতৃযাণের বিবৃতি দেওরা হয়েছে মুখ্যত কালকে আশ্রয় করে। ঋক্‌সংহিতায় কালের প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে 'ঋতু'। সেখানে একজায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে, 'বিদ্বান্ পথে ঋতুশো দেরয়ানান্'—(১০।৯৮।১১) এখানে দেবযানের সঙ্গে ঋতু বা কালের স্পষ্ট উল্লেখ পাচ্ছি। দেবযানের পথে চলতে হলে কাল বুঝে চলতে হবে। অগ্নি সে-কালের খবর রাখেন। উত্তরায়ণে যজ্ঞ করতে হবে, কেননা তখন দিনের আলো বেড়ে চলে। আর দিনের আলোই প্রত্যক্ষ দেবতা। মরবার সময়ও যদি মানুষ উত্তরায়ণে মরতে পারে, তাহলে চিতার আগুন তাকে দেবযানের পথে নিয়ে যাবে। মন্ত্রটিতে ঋতুর উল্লেখ থেকে এই ভাবনাগুলি উদ্ধার করা যায়। কৌষীতক্যুপনিষদেও এইজন্য বিশেষ করে ঋতুকে সম্বোধন করেই লোকান্তরিত জীব কথা বলছে।

[৩১] তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দমীমাংসায় লোকসংস্থান দেওরা হয়েছে এইরকম ঃ মনুষ্য, মনুষ্যগন্ধর্ব, দেবগন্ধর্ব, পিতৃ, আজানজদেব, কর্মদেব, দেব, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি, ব্রহ্ম।

[৩২] বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈদিক ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের বিজয় দেখাতে গিয়ে প্রায়ই শক্র ব্রহ্ম বা ইন্দ্র-প্রজাপতিকে বুদ্ধের তাঁবেদাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদেও দেখি ইন্দ্র-প্রজাপতি ব্রহ্মলাভের দ্বার, সংহিতায় কিন্তু তাঁরা পরমপুরুষ। এই পুরুষের যখন কোনও সংজ্ঞা দেওরা হয় না, তখন সংহিতায় তিনি শুধু 'পুরুষ' বা 'দেব'; যখন তিনি নিরুপাধিক, তখন 'একং তৎ' বা 'একং সৎ'। সংহিতার এই ভাবগুলিই উপনিষদের ব্রহ্মবাদের ভিত্তি।

[৩৩] এ'রা স্পষ্টতই ব্রহ্মশক্তি। তু. কেনোপনিষদের 'হৈমবতী স্ত্রী' (৩।১২)। শক্তিবাদের বীজ পাওরা যাচ্ছে এখানে।

[৩৪] তু. ক. ১।১।২৫-২৬। সেখানে যম নচিকেতাকে আত্মবিদ্যা দেবার আগে 'রামাদের' দিয়ে লুব্ধ করতে চাইলে নচিকেতা তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। যোগদর্শনে আছে, যোগী মধুমতী ভূমিতে উপস্থিত হলে পর তাঁকে নানা প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়, তিনি বৈরাগ্যবলে সেসব প্রলোভন জয় করেন (পাত. ৩।৫১ ব্যাসভাষ্য)।

এলে পর ডুবে যায়।[৩৫] যেষ্টিহা মুহূর্তগুলি তারপর তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে যায়, তিনি বিজরা নদীও পার হয়ে যান মনোবলে। তখন আর তাঁর পাপ-পুণ্য বলে কিছু থাকে না। তিনি দ্বন্দ্বাতীত হয়ে দেখেন, তাঁর পায়ের তলায় রথচক্রের আবর্তনের মত অহোরাত্রের আবর্তন চলছে।[৩৬] তখন থেকেই তাঁর আধারের ব্রাহ্ম-রূপান্তর হতে থাকে। তিনি ক্রমে-ক্রমে ইল্য বৃক্ষাদি পার হয়ে অমিতৌজা পর্যঙ্কের কাছে এসে উপস্থিত হন, যার উপর ব্রহ্মা বসে আছেন। এই পর্যঙ্ক হল প্রাণ, আর যে 'বিচক্ষণ' বেদির উপর ওটি বসানো, তা হল প্রজ্ঞা। মুক্ত ব্রহ্মপর্যঙ্কে আরোহণ করতে ব্রহ্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' তিনি উত্তর দেবেন, 'আমি ঋতু, আমি আর্তব। আমি আকাশ হতে উৎপন্ন। আমি সংবৎসরের তেজ, সর্বভূতের আত্মা। তুমিও সর্বভূতের আত্মা। তুমি যা, আমিও তা।'[৩৭] ব্রহ্মা বলেন, 'আমি কে?' তিনি বলবেন, 'তুমি সত্য।' 'সত্য কি?' 'যা দেবতা এবং প্রাণ থেকে আলাদা তা হল সৎ, আর দেবতা এবং প্রাণ হল ত্যম্। সব মিলিয়ে এই সবই সত্যম্। তুমিই এই সব। প্রাণ মন বাক্ চক্ষু শ্রোত্র[৩৮] হস্ত পদ উপস্থ শরীর এবং প্রজ্ঞা দ্বারা আমি তোমাকেই পাই।'

চিত্রের বিবৃতির সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম অধ্যায়ও এখানে শেষ হয়ে গেছে। চিত্রকথিত এই ব্রহ্মবিদ্যার এক নাম 'পর্যঙ্কবিদ্যা'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছোট-ছোট কয়েকটি বিদ্যার উপদেশ আছে। প্রথমে আছে প্রাণবিদ্যা। কৌষীতকি আর পৈঙ্গ্য এই দুজন ঋষি তার প্রবক্তা। দুজনের মতেই প্রাণ ব্রহ্ম। কৌষীতকি বলেন, বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন প্রাণেরই বৃত্তি; আর পৈঙ্গ্য বলেন, বাক্ হতে চক্ষু, চক্ষু হতে শ্রোত্র, শ্রোত্র হতে মন এবং মন হতে প্রাণ হল অন্তরতর; অতএব প্রাণই সবার কেন্দ্র। অর্থাৎ প্রাণকে ব্রহ্ম বলে একজন দেখাচ্ছেন উন্মেষের দিক্, আরেকজন নিমিষের দিক্। দুয়েরই মতে প্রাণ-ব্রহ্মকে পেতে হলে অযাচক হতে হবে।[৩৯]

এই প্রাণবিদ্যার দুটি প্রয়োগ আছে কামনাসিদ্ধির জন্য—একটির নাম 'একধনাবরোধন' আরেকটি 'দৈবস্মর।' দুটিতেই পুণ্যতিথিতে প্রাণাঙ্গ পঞ্চদেবতা এবং প্রজ্ঞার উদ্দেশে হোম করতে হয়। ক্রিয়ার মূলে স্পষ্টতই রয়েছে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত এবং একাগ্র করে সঙ্কল্পশক্তিকে সুতীব্র করা, যাতে শুধু ইচ্ছার জোরেই অভীষ্ট লাভ হয়। সমস্ত কাম্যকর্মেরই এইটি মূল রীতি। প্রাণ ছাড়া প্রজ্ঞাকেও আহুতি দেওবার বিধান থেকে বোঝা যায়, এমনিতর ইষ্টসিদ্ধি প্রজ্ঞাবানেরই হয়। আসল শক্তি হল

[৩৫] যারা শুধু বর্তমানটাই দেখে অর্থাৎ ইহলোককেই জানে, পরলোক বা লোকোত্তরকে জানে না বা মানে না, তারা 'সম্প্রতিবিদ্'। এরাই বলে 'প্রেত্য নাস্তি' (কঠ, ১।১।২০), 'অয়ং লোকো নাস্তি পরঃ' (কঠ ১।২।৬)। এরা অহোরাত্রের আবর্তনের মধ্যেই আটকে আছে।

[৩৬] তু. তৈ. ব্রা. ৩।১১।৭।৪।

[৩৭] ব্রহ্মাসি, সোঽহমস্মি।

[৩৮] এই কয়টি ব্রহ্মপুরুষ বা স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলে বিখ্যাত (দ্র. ৩।১৩)। উপনিষদের অনেকজায়গায় তাদের উল্লেখ আছে। কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ, তা ছাড়া প্রাণ এবং মন—এই পাঁচটি ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য সাধন। যাজ্ঞবল্ক্য তাদের সঙ্গে যোগ করেছেন হৃদয়কেও (বৃ. ৪।১)।

[৩৯] তু. 'অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্'—যার কিছুতে লোভ নাই, সব ভাল-ভাল জিনিস এসে তার কাছে হাজির হয় (পাত. ২।৩৭)

প্রজ্ঞায়। বৈদিক ভাবনায় তাই ব্রহ্ম বলতে যুগপৎ জ্ঞান এবং শক্তি দুইই বোঝায়। যার জ্ঞান আছে, তারই শক্তি আছে। উপরি-উক্ত অযাচকবৃত্তির সঙ্গে এই ভাবনাটির তুলনা করা যেতে পারে। একটিতে সাধক উদাসীন বা কেবল, আরেকটিতে বিভূতি-মান্।

আরেকটি সাধনা হল প্রতর্দনের[৪০] 'সংযমন' বা 'আন্তর অগ্নিহোত্র'। এটিও প্রাণ-বিদ্যার অন্তর্গত। সাধনাটি এই : মানুষ যখন কথা বলে তখন সে নিশ্বাস নিতে পারে না, যখন সে নিশ্বাস নেয় তখন কথা বলতে পারে না। এই ব্যাপারটিকে ভাবনা করতে হবে, যেন কথা বলবার সময় সে প্রাণকে বাকে আহুতি দিচ্ছে, আবার চুপ করে থাকবার সময় বাককে প্রাণে আহুতি দিচ্ছে। এই দুটি আহুতিই হল অন্তহীন অমৃত আহুতি, যা মানুষ জেগে বা ঘুমিয়ে সবসময় দিয়ে চলেছে। এ-ই হল সত্যকার অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র করতেন বলে প্রাচীনেরা আর কর্মময় অগ্নিহোত্র করতেন না।[৪১]

তারপর শুষ্কভৃঙ্গারের 'উক্থবিদ্যা'। এটিও প্রাণবিদ্যার অন্তর্গত। শুষ্কভৃঙ্গার বলেনঃ উক্থই ব্রহ্ম, ঋক্ যজুঃ সাম এই তিনটিরই পর্যবসান উক্থে; উক্থই ধনু; প্রাণই উক্থ; আবার প্রাণই ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা।[৪২]

তারপর সর্বজিৎ কৌষীতকির ভোরে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় আদিত্যের উপাসনা—পাপ দূর করে নির্মল হবার জন্য।[৪৩]

তারপর প্রাণ সন্তান ও পশুর কল্যাণ কামনা করে কয়েকটি গৃহ্যকর্মের উপদেশ আছে। তারপর আবার একটি প্রাণবিদ্যার উপদেশ। প্রাণের নাম তখন 'দৈবঃ পরিমরঃ' অর্থাৎ যার মাঝে সমস্ত দেবশক্তির পর্যবসান ঘটে। এ-বিদ্যার দুটি ধারা—একটি অধিদৈবত, আরেকটি অধ্যাত্ম। অধিদৈবত বিবৃতিটি এই: ব্রহ্ম জ্বলে ওঠেন অগ্নি-রূপে; কিন্তু আগুন নিবে গেলে ব্রহ্মও মরে যান। তখন আগুনের তেজ প্রবেশ করে সূর্যে, ব্রহ্ম সূর্য হয়ে জ্বলে ওঠেন। এমনি করে সূর্যের তেজ যায় চন্দ্রে, চন্দ্রের তেজ বিদ্যুতে, বিদ্যুতের তেজ দিক্সমূহে অর্থাৎ শূন্যে। কিন্তু প্রত্যেকবার তাদের প্রাণ থেকে যায় বায়ুতে, সেই বায়ু হতেই আবার তাদের আবির্ভাব হয়। সুতরাং বায়ুরূপী প্রাণই সর্বাধার। আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে বাক্ প্রবেশ করে চক্ষুতে, চক্ষু শ্রোত্রে, শ্রোত্র মনে এবং মন প্রাণে; কিন্তু এদের প্রাণ প্রতিবারই প্রবিষ্ট হয় প্রাণে। সুতরাং প্রাণই সর্বাধার।[৪৪] প্রাণ থাকলেই তবে বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মনের সার্থকতা।

---

[৪০] প্রতর্দন ছিলেন কাশীর রাজা। এই উপনিষদেরই তৃতীয় অধ্যায়ে আবার তাঁকে দেখতে পাব।

[৪১] এই সাধনাতে আহুতির ভাবনাটি সবসময় অন্তরে জাগিয়ে রাখতে হবে, আবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিও সবসময় দৃষ্টি রাখতে হবে। এর সঙ্গে তুলনীয়, গীতার সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্মের হোম (৪।২৬-২৭)।

[৪২] উক্থ (<√বচ্; তু. 'বিদ-থ' বিদ্যা) বাকের নামান্তর। ধনুর সঙ্গে তুলনা করায় বোঝা যাচ্ছে, উকথ্ প্রণব। তু. মুণ্ডক 'প্রণবো ধনুঃ' (২।২৪)। এখানে উকথ্ যেমন ঋক্-যজুঃ-সামের সার, প্রণবও তা-ই ছা. ১।১।৯, ২।২৩।২-৩; তু. ঋচ : প্রণব উক্থশংসিনাম্ তৈ. স. ৩।২।৯।৬)। অনুমান করা যেতে পারে, 'বিদথ' যেমন বিদ্যার সাধনা, 'উক্থ'ও তেমনি বাকের সাধনা এবং এই বাক্ প্রণব। শুষ্কভৃঙ্গারের সাধনাটি তাহলে প্রাণকে অবলম্বন করে প্রণবজপের সাধনা।

[৪৩] প্রচলিত ত্রিসন্ধ্যায় সাবিত্রোপাসনার সঙ্গে তুলনীয়।

[৪৪] এটি নিবৃত্তি বা প্রলয়ের সাধনা। বিশ্বের লয় হয় প্রাণে। সুতরাং প্রাণই সর্বযোনি ব্রহ্ম।

এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা অর্থাৎ প্রাণ এবং প্রজ্ঞা একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ।[৪৫] মৃত্যুর পর বাক্‌ প্রভৃতি প্রাণবৃত্তি বায়ুতে প্রবেশ করে আকাশ হয়ে যায়, আর এমনি করে স্বর্লোকে উৎক্রান্ত হয়।[৪৬]

তারপর 'পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদান' দিয়ে অধ্যায়টি শেষ হয়েছে। মৃত্যু আসন্ন দেখে পিতা তাঁর ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণের সমস্ত বৃত্তি এবং প্রজ্ঞা পুত্রে নিহিত করেন, পুত্রও তা গ্রহণ করেন। এরপর পিতা যদি ভাল হয়ে ওঠেন, তাহলে তিনি পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে যাবেন কিংবা যতদিন সংসারে থাকবেন পুত্রের অধীন হয়েই থাকবেন।[৪৭]

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মবিদ্যার উপদেশ। উপদেষ্টা ইন্দ্র, শ্রোতা দিবোদাসের পুত্র রাজা প্রতর্দন।[৪৮] ইন্দ্র বলছেন, 'আমি প্রাণ। প্রাণের স্বরূপ হল প্রজ্ঞা। সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রাণেরই আশ্রিত। ঘুমের সময় ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি প্রাণে প্রবেশ করে, আবার জাগ্রদবস্থায় প্রাণ হতেই বেরিয়ে আসে। মৃত্যুর সময়ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি প্রাণে লীন হয়ে যায়, আর প্রাণ তাদের নিয়ে "উৎক্রমণ" করে। প্রাণ থেকেই ইন্দ্রিয়েরা বিষয়কে দোহন করে বাইরে স্থাপন করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাণই বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়।[৪৯] প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় এবং তার সঙ্গে জীবের ব্যবহার সিদ্ধ করে।[৫০] প্রজ্ঞা ছাড়া জ্ঞান বা ব্যবহার কোনটাই সিদ্ধ হতে পারে না।

অধ্যাত্ম বিবৃতিটিতে পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষের উল্লেখ পাচ্ছি। অধিদৈবত বিবৃতির সঙ্গে তু. 'ন তত্র সূর্যো ভাতি' ইত্যাদি (ক. ২।২।১৫)।

[৪৫] তু. ব্রহ্মসূত্রে আকাশ-প্রাণের মিথুন (১।১।২২-২৩)

[৪৬] পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌঃ, তারপরে তুরীয় লোক হল 'স্বঃ' যা বিষ্ণুর 'পরম ধাম' (দ্র. ৩।২।৭ টীকা)। এখানে উৎক্রান্তির বিবরণটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং প্রাঞ্জল। ব্যষ্টিপ্রাণ সমষ্টিপ্রাণে মিশে শূন্যবৎ হয়ে যায়, আর সেই শূন্য স্বর্জ্যোতিতে ঝলমল করতে থাকে। আলো-ঝলমল আকাশেই ফিরে যাব মৃত্যুর পর। বৈদিক চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের দিক থেকে জীবনমরণ-রহস্যের এর চাইতে সুন্দর ও বিকল্পহীন সমাধান আর হতে পারে না।

[৪৭] বৃদারণ্যকে এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয়েছে 'সংপ্রত্তি' (<সম্‌প্র√দা+তি)। দ্র. ১।৫।১৭।

[৪৮] এখানেও দেখছি, ইন্দ্রই ব্রহ্ম। ঋগ্‌বেদের দুখানি উপনিষদেই পরমদেবতা হলেন ইন্দ্র, এটা লক্ষণীয়। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধপ্রভাবে ইন্দ্র স্বমহিমা হতে চ্যুত হয়েছেন, তাঁর স্থান অধিকার করেছেন রুদ্র এবং ভগ বা বিষ্ণু। এখানে বলা হচ্ছে, সত্যই ইন্দ্র। ইন্দ্র প্রতর্দনকে বললেন, 'আমাকেই বিশেষ করে জান, এই বিজ্ঞানকেই আমি মানুষের পক্ষে কল্যাণতম বলে মনে করি।' তারপর ইন্দ্রের তিনটি কীর্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ত্রিশীর্ষবধ, দ্বিতীয়টি অরুর্মুখ যতিদের নেকড়েবাঘের মুখে ফেলে দেওয়া (দ্র. ঐ. ব্রা. ৭।২৮, সেখানে যতিদের নাম 'অরুর্মঘ')। এই 'অরুর্মুখ' বা লালমুখো যতি কারা? বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা ইন্দ্রদ্বেষী, অতএব দেববাদী নন। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে আছে, আরুণ-কেতুক অগ্নিচয়ন করেছিলেন যে-ঋষিরা তাঁদের মধ্যে এক সম্প্রদায় ঋক্‌সংহিতার মুনিসূক্তের (১০।১৩৬) মুনিদের মতই 'বাতরশন' অর্থাৎ নগ্ন (১।২৪।৪)। তাঁদের সঙ্গে যতিদের কোনও সম্পর্ক আছে কি? তৃতীয় কীর্তিটি হল, দ্যুলোকে প্রহ্লাদীয়দের অন্তরিক্ষে পৌলমদের এবং পৃথিবীতে কালকঞ্জদের তর্দন (বেধন) করা। তিনটিই অসুরশক্তি, বাসা বেঁধেছে মনোময় প্রাণময় আর অন্নময় লোকে। তু. ত্রিপুরনাশন, গ্রন্থিত্রয়ভেদ, সপ্তশতীতে দেবীর তিনটি চরিত্র। ইন্দ্র এখানে আরেকটি কথা বলছেন, 'আমাকে যে জানে, কোনও কর্মের দ্বারাই সে লোকভ্রষ্ট হয় না, চুরি ভ্রূণহত্যা মাতৃবধ বা পিতৃবধ কিছুর দ্বারাই না।' এ সেই বেদান্তের 'ন পুণ্যং ন পাপম্‌।'

[৪৯] প্রাণ যদি প্রজ্ঞা হয়, তা হলে জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং বিষয় তিনটিই এই মত অনুসারে একাত্মক হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ রূপজ্ঞান, রূপগ্রাহক চক্ষুরিন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যরূপ তিনটিই তত্ত্বত এক। সাংখ্যমতে তিনটিই যথাক্রমে প্রকৃতির সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বিকার। প্রাণ বা প্রজ্ঞাই বাইরে বিষয়ের আকারে দেখা দেয়, এই মতের সঙ্গে তুলনীয় বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ।

[৫০] এখানে চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ (প্রায়) জিহ্বা বাক্‌ হস্ত পদ উপস্থ এবং মন এই নয়টী ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। ত্বক্‌ এবং পায়ু বাদ পড়েছে দেখা যায়। শরীরের আলাদা উল্লেখ থেকে মনে হয় ঐটিই ত্বকের জায়গা নিয়েছে।

তাই ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূলে যে-প্রজ্ঞা তাকেই মানুষের জানতে চেষ্টা করা উচিত। এক প্রজ্ঞাই দশটি প্রজ্ঞামাত্রাতে বিভক্ত হচ্ছে, তারা হল ইন্দ্রিয়বৃত্তি। আবার তারই অনুরূপ রয়েছে দশটি ভূতমাত্রা। প্রজ্ঞামাত্রা আর ভূতমাত্রা অন্যোন্যনির্ভর। ভূতমাত্রা অর্পিত রয়েছে প্রজ্ঞামাত্রায়, প্রজ্ঞামাত্রা অর্পিত রয়েছে প্রাণে। এই প্রাণই আবার প্রজ্ঞাত্মক, আনন্দ, অজর, অমৃত।'[৫১]

চতুর্থ অধ্যায়ে এই তত্ত্বেরই উপদেশ আছে রাজা অজাতশত্রু এবং ব্রাহ্মণ দৃপ্ত-বালাকির উপাখ্যান অবলম্বনে।[৫২] বালাকির অহঙ্কার ছিল, তিনি ব্রহ্মবিৎ। তাই তিনি অজাতশত্রুকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে গিয়েছিলেন। অজাতশত্রু দেখিয়ে দিলেন, বালাকি যা জানেন, তিনি তার চাইতে অনেক বেশী জানেন। বালাকি হার মেনে রাজার কাছেই উপদেশপ্রার্থী হলেন। বালাকির ঔপনিষদ পুরুষের জ্ঞান ছিল জাগ্রৎ-ভূমিকে আশ্রয় করে; অজাতশত্রু তাঁকে দিলেন সুষুপ্তির বিজ্ঞান। সুষুপ্তিতে জাগ্রতের চেতনা আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু তবুও চেতনা কোথাও থাকে। থাকে প্রাণে, হিতা নামে যেসব নাড়ী হৃদয় থেকে পুরীততের দিকে[৫৩] ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে।[৫৪] এইখানেই আমরা শুদ্ধপ্রাণের সন্ধান পাই। অন্তর্মুখ হয়ে এই প্রাণকে জানাই সত্যকার জ্ঞান।[৫৫]

ঋগ্‌বেদের উপনিষৎ দুখানিতে আমরা তাহলে মুখ্যত এই কয়টি তত্ত্বের বিবৃতি পাচ্ছিঃ আত্মা হতে জগৎসৃষ্টি এবং জীবজন্ম হয়েছে, দেবযানের পথ ধরে চলেছে জীবের ব্রহ্মাভিযান, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রজ্ঞা এবং প্রাণ, ব্রহ্ম সুপ্তিজ্ঞানলভ্য। চিত্র প্রতর্দন এবং অজাতশত্রু এই তিনজন ব্রহ্মবিদ্ রাজর্ষির উল্লেখও পাচ্ছি।

৩

তারপর সামবেদের উপনিষৎ **কেন** এবং **ছান্দোগ্য**। প্রথম কেনোপনিষদের কথাই বলি।

[৫১] একদিকে প্রজ্ঞা বা চিৎ, আরেকদিকে ভূত বা জড়—অস্তিত্বের এই দুটি কোটি। মাত্রাস্পর্শের জগৎটা দেখা দিয়েছে দুয়ের মাঝখানে। অবশ্য প্রজ্ঞাই মূল, কিন্তু তা নিষ্প্রাণ বা নিষ্পন্দ নয়। আদিবেদান্তের মূল সূত্রগুলি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জগন্মিথ্যাত্ববাদ বা নির্গুণব্রহ্মবাদের কোনও ছায়া এতে পড়েনি।

[৫২] উপাখ্যান এবং উপদেশ দুটিরই আরেকটি সংস্করণ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যকে (২।১)। এখানে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সাধনসঙ্কেত পাওয়া যায়।

[৫৩] পুরীতৎ নাড়ীতন্ত্রের (nervous system) প্রাচীন সংজ্ঞা। হিতা নাড়ীর কথা অন্যত্রও আছে (বৃ. ২।১।১৯, ৪।২।৩, ৩।২০)।

[৫৪] নাড়ীগুলিকে বলা হয়েছে খুব সূক্ষ্ম—একটি চুলের হাজার ভাগের এক ভাগ। তাদের মাঝে খুব সূক্ষ্ম রং খেলে। রংগুলি কালো পিঙ্গল লাল পীত এবং শুক্ল। এইখানে নাড়ীবিজ্ঞানের একটি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। রংগুলিতে তামস হতে শুদ্ধসত্ত্ব পর্যন্ত সুষুপ্তিচেতনার ক্রমবিকাশের একটা ধারার ইঙ্গিত আছে।

[৫৫] এইখানে আমরা আদিবেদান্তের আরেকটি সূত্র পেলাম—তত্ত্বজ্ঞানের সত্যকার প্রতিষ্ঠা সুপ্তিতে। প্রাকৃত সুপ্তিতে চিত্তবৃত্তি আপনি নিরুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। সজ্ঞানে যদি সুপ্তিকে প্রবর্তিত করা যায়, তাহলে তা-ই হয় যোগীর সমাধি। এখানে তারই ইঙ্গিত। বৃহদারণ্যকের বিবৃতিতে বিষয়টি আরও ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে।

সামবেদের জৈমিনীয় বা তলবকার-ব্রাহ্মণের আটটি অধ্যায়। তার মধ্যে চতুর্থ অধ্যায় হতে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত অংশটির নাম উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ। এটি আরণ্যকধর্মী। তারই মধ্যে সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ হতে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত হল **কেন** বা তলবকারোপনিষৎ। 'কেনেষিতম্' বলে তার আরম্ভ, তাই উপনিষৎটির নাম কেনোপনিষদ্। উপনিষদের প্রথম দুটি খণ্ড পদ্যে রচিত বলে অনেকে সমস্ত উপনিষদ্‌টিকেই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলতে চান। কিন্তু এটা খুব জোরালো যুক্তি নয়। বস্তুত পদ্যাংশগুলি ব্রহ্মবিদ্যাবাচক প্রাচীন শ্লোকের সংগ্রহ। এমন শ্লোকের উল্লেখ বৃহদারণ্যকেও আছে।[৫৬]

কেনোপনিষদের প্রথম দুটি খণ্ডের বক্তব্য বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং প্রাণ দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না, বরং তারাই ব্রহ্মের দ্বারা উদ্ভাসিত। বস্তুত ব্রহ্ম জানা এবং অজানার বাইরে, তিনি প্রতিবোধবিদিত। তৃতীয় আর চতুর্থ খণ্ডে আছে হৈমবতী উমার উপাখ্যান,[৫৭] ইন্দ্র যাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মরহস্য জানতে পারলেন। এখানে দিব্য-

---

[৫৬] দ্র. বৃ. ৪।৪।৬-২১। তার মধ্যে দুটি শ্লোক (১৪, ১৮) একেবারে কোনোপনিষদের শ্লোকের অনুরূপ। ব্রাহ্মণের মাঝেও এমনিতর গাথা ঋক্ বা শ্লোক অনেক পাওয়া যায়। সুতরাং কেনোপনিষদকে এই কয়েকটি শ্লোকের দরুন পদ্যবদ্ধ উপনিষদের আদিরূপ বলা উচিত হবে না।

[৫৭] 'উমা' নামটি এইখানে এবং তৈত্তিরীয়ারণ্যকের একজায়গায় (১০।১৮।১ খিল: 'উমাপতয়ে') ছাড়া বেদে আর কোথাও পাওয়া যায় না। পুরাণে উমা শিবপত্নী কুমারজননী। আধুনিক পণ্ডিতদের মাঝে কেউ-কেউ অনুমান করেন, উমা কিংবা শিব কেউই বৈদিক দেবতা নন, কোনও অনার্য পার্বত্য দেবতা। ভূমধ্যসাগরতীরের প্রাচীন Mother-Goddess-এর নামের সঙ্গে উমা-নামের সাদৃশ্যের কথাও এইসঙ্গে তোলা হয়। অবশ্য এসমস্তই অনুমান মাত্র। কেনোপনিষদের 'উমা'কে শংকরাচার্য সংজ্ঞাশব্দ বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু মূলে আছে, 'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্'; সুতরাং এখানে হৈমবতীর মত 'উমা'ও স্ত্রী-শব্দের বিশেষণ হলেই কিন্তু অন্বয়টি সুষ্ঠু হয়। অর্থ দাঁড়ায়, ইন্দ্র সেই মহাশূন্যেই চলতে-চলতে একটি স্ত্রীমূর্তির দেখা পেলেন, যিনি বহুশোভমানা, 'উমা' এবং হৈমবতী। ঋক্‌সংহিতায় 'উম' (<√অব্ 'আগলে থাকা, প্রসাদ দেওয়া') শব্দটি বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ (৪।১৯।১, ৫।৫১।১, ৫২।১২, ৭।৩৯।৪, ১০।৬।৭, ৩১।৩, ৩২।৫, ৭৭।৮, ১২০।১, ৩)। একজায়গায় আছে 'ওমাসঃ' (১।৩।৭)। প্রসাদ বোঝাতে 'ওমন্' শব্দের ব্যবহারও আছে একাধিক জায়গায় (৫।৪৩।১৩ আদ্যুদাত্ত, ১।৩৪।৬, ১১৮।৭, ৬।৫০।৭, ৭।৬৮।৫, ৬৯।৪)। আকাশবাচী 'ব্যোমন্' শব্দও আসলে 'বি-ওমন্'—বোঝাচ্ছে অনিবাধ বৈপুল্যের প্রসাদ ও পরিরক্ষণ। 'উমা' শব্দটিও স্বচ্ছন্দে এই শব্দগুলির সগোত্র হতে পারে। পুংদেবতার বিশেষণ 'উম' এবং স্ত্রীদেবতার বিশেষণ 'উমা'—এতে শব্দতত্ত্বের দিক দিয়েও বিশেষ কোনও বাধা নাই; দুটি শব্দে দীর্ঘ-হ্রস্বের ব্যত্যয় হলেও মাত্রার পরিমাণ ঠিকই আছে। তাহলে 'উমা' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দাঁড়ায়—'পালয়িত্রী, প্রসাদযুক্তা'। এক্ষেত্রে আকাশ বা 'ব্যোমে' দেবতার আবির্ভাবও লক্ষণীয়, অর্থাৎ উমা পরমব্যোমেরই শক্তি। আখ্যায়িকাটিতে 'যক্ষ' বা ব্রহ্মরহস্য (যক্ষ শব্দের প্রাচীন অর্থ রহস্য ঃ তু. 'ন যাসু চিত্রং দদৃশে ন যক্ষম্' ঋ. ৭।৬১।৫) যে শক্তিমত্তায় লভ্য নয় কিন্তু প্রসাদলভ্য এই তত্ত্বটিই প্রতিপাদিত হয়েছে (তু. যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ক. ১।২।২৩)। 'হৈমবতী' শব্দের অর্থ শংকর একবার করেছেন হেমালংকারভূষিতা, আরেকবার হিমবানের পুত্রী। মরমীয়ার দৃষ্টিতে দুটি ব্যাখ্যাই সত্য। ঐন্দ্রী চেতনার মহাকাশে যে-স্ত্রীমূর্তির আবির্ভাব হল, তিনি হিরণ্ময়ী; অথবা তিনি চেতনার শুভ্র তুঙ্গতায় আবির্ভূতা। এই ভাবটি ঋক্‌সংহিতায়ও আছে। সেখানে বিষ্ণু 'গিরিষ্ঠাঃ' (১।১৫৪।২) বা 'গিরিক্ষিৎ, (১।১৫৪।৩); ইন্দ্রও তা-ই (১০।১৮০।২); সোমও (৩।৪৮।২ দ্র., ৯।১৮।১, ৬২।৪, ৮৫।১০)। তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখি রুদ্র 'গিরিশন্ত' (৪।৫।১।১) অথবা 'গিরিশ' (৪।৫।১।২, নমো গিরিশায় শিপিবিষ্টায় চ ৪।৫।৫।১ [ঋক্‌-সংহিতায় 'শিপিবিষ্ট' বিষ্ণুর সংজ্ঞা ৭।৯৯।৭, ১০০।৫, ৬, ৭]); বাজসনেয়সংহিতায় তিনি 'গিরিশয়' (১৬।২৯)। হিমাচলের তুষারশৃঙ্গের মহিমা রুদ্রেরই শিবরূপ; তাইতে তিনি গিরিশ। এই মহিমার কথা ঋক্‌সংহিতার হিরণ্যগর্ভসূক্তেও পাই: 'যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা' (১০।১২১।৪)। এই হিমবান্ থেকেই হৈমবতী; তৈত্তিরীয়সংহিতায় তিনি রুদ্রের বোন্, নাম 'অম্বিকা' : এষ তে

চেতনার ক্রমিক উন্মেষের একটি ছবি পাওয়া যায়—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্ম। ইন্দ্র এবং ব্রহ্মে এখানে একটু তফাত করা হচ্ছে।

উপাখ্যানের শেষে উপনিষদ্‌টিতে ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছু সাধারণ বিবৃতি আছে। বিদ্যুতের ঝলক যেমন দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়, ব্রহ্মও তেমনি। সাধকের মন তাঁকে ছুঁই-ছুঁই করে, স্মৃতি দিয়ে তাঁকে ধরে রাখতে চায়, অবশেষে সংকল্প দিয়ে তাঁকে ধরে রাখে। তারপর তাঁকে পায় 'তদ্‌ বনং'-রূপে। যিনি অনির্বচনীয় তৎস্বরূপ, তিনিই আবার পরম কাম্য 'বন' বা বঁধু।[৫৮] এই ব্রহ্মকে পাবার মুখ্য সাধন হল তপ দম এবং কর্ম, বেদ বেদাঙ্গ এবং সত্যই তাঁর আয়তন।

তারপর **ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌**। এটি সামবেদের ছান্দোগ্য মন্ত্র বা উপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণের পরিশেষ। ব্রাহ্মণের দশটি প্রপাঠকের শেষ আটটি ছান্দোগ্যোপনিষদের আটটি অধ্যায়। এই উপনিষদ্‌টি সর্বপ্রাচীন উপনিষদগুলির অন্যতম।

প্রথম অধ্যায়ে নানাভাবে উদ্‌গীথোপাসনার কথা বলা হয়েছে। উপাসনা বলতে বোঝায় ব্রহ্মের কোনও প্রতীকে মনকে অবিচল একাগ্রতায় সন্তত করা।[৫৯] উদ্‌গীথ সামগানের একটি 'ভক্তি' অর্থাৎ ভাগ বা অবয়ব, সম্পূর্ণ গানটির ঠিক মাঝখানটায়, গেয়ে থাকেন উদ্‌গাতা। গানের এই অংশটিই হল আসল।

উদ্‌গীথ গান করতে হলে প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ করতে হয়। ওঙ্কার ব্রহ্মবীজ, তার সাধারণ সংজ্ঞা হল 'অক্ষর'।[৬০] প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে ওঙ্কারকেই উদ্‌গীথ জ্ঞানে উপাসনার বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সর্বভূতের রস বা সার হল পৃথিবী, পৃথিবীর রস অপ্‌, অপের রস ওষধি, ওষধির রস পুরুষ, পুরুষের রস বাক্‌, বাকের রস ঋক্‌, ঋকের রস নাম, আর নামের রস উদ্‌গীথ। সেই উদ্‌গীথ যদি

রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব (১।৮।৬।১)। কেনোপনিষদে যে-স্ত্রীমূর্তিকে আমরা পাই, তিনি শংকরের মতে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী। ঋক্‌সংহিতায় তিনি 'বাক্‌'। তিনি সবার কাছে সুলভদর্শন নন, কারও-কারও কাছে তিনি উশতী সুবাসা জায়ার মত তনুখানি মেলে ধরেন (১০।৭১।৪)। ব্রহ্ম এবং বাক্‌ ঋক্‌সংহিতায় একটি যুগনদ্ধ মিথুন (১০।১১৪।৮)। কেনোপনিষদের আখ্যায়িকাটি এই তত্ত্বেরই বিবৃতি এবং এইটি পরে পুরাণে পল্লবিত হয়েছে।

[৫৮] বন < √বন্‌ (কামনা করা)॥ 'বেন্‌ (তু. Lat. Venus সৌন্দর্যের দেবী)। যিনি 'বেন', তিনিই 'বন'। বেন হলেন সূর্য, তিনি সবার বঁধু। তু. 'যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমং পথস্ততে, ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি, আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে' (ঋ. ১।৮৩।৫; এখানে সূর্য, গো এবং যমের উল্লেখ লক্ষণীয়; ভাগবতদের যিনি 'বন্ধুরাত্মা', তিনি যমের সহোদরা যমুনার তীরে গোচারণ করতেন।) দ্র. বেনসূক্ত, ঋ, ১০।১২৩। ভাগবতের প্রেমধর্মের বীজ এইগুলিতে পাই।

[৫৯] 'উপাসীত'...পরমাত্মপ্রতীকে দৃঢ়ামৈকাগ্র্যলক্ষণাং মতিং সন্তনুয়াৎ (শংকর, ছান্দোগ্যভাষ্য ১।১।১)।

[৬০] 'অক্ষর' একদিকে যেমন বোঝায় পরমব্যোমকে (তু. অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যস্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ঋ ১।১৬৪।৩৯), তেমনি বোঝায় বাক্‌কে (তু. গৌরী...বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্‌, ঐ ৪১)। সুতরাং অক্ষর ব্রহ্ম এবং বাক্‌ দুয়েরই সংজ্ঞা। দুটিতে একটি মিথুন। ব্রহ্মসূত্রে এই মিথুন আকাশ এবং প্রাণ, দর্শনে আকাশ এবং শব্দ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যোগে ঈশ্বর এবং ওঙ্কারের মাঝে বাচ্য-বাচকসম্বন্ধ (পাত. ১।২৭)। ঐ. ব্র. বলছেন, 'ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত অকার উকারো মকার ইতি। তান্‌ একধা সমভরৎ, তদেতদ্‌ ওম্‌ ইতি, তস্মাদ, ওম্‌ ইতি প্রণৌতি (৫।৩২)। এইসব ভাবনাই মন্ত্রশাস্ত্রের মূল।

ওঙ্কারে পর্যবসিত হয়, তাহলে সর্বভূতই তার মধ্যে লীন হয়ে যায়।[৬১] আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই ওঙ্কার হল বাক্ এবং প্রাণের মিথুন। এইটি জানলেই সমস্ত কামনার পরিতর্পণ ঘটে।[৬২] তারপর, শুধু বাক্ বা মন্ত্র দিয়ে প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলেই ওঙ্কারকে পাওয়া নয়, তাকে পেতে হবে 'অনুজ্ঞা'-রূপে। এই অনুজ্ঞা আসে পরমব্যোম থেকে[৬৩] তখনই ওঙ্কারের ভাবনা মহিমায় এবং রসে উপচে ওঠে। এইসব তত্ত্ব জেনে কর্ম করতে হয়। বিদ্যা শ্রদ্ধা এবং উপনিষদ্ (দিব্যাবেশ) সহকারে যে-কর্ম করা হয়, তা-ই হয় বীর্যবত্তর।[৬৪]

দ্বিতীয় খণ্ডে দেবাসুর-দ্বন্দ্বের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে বোঝানো হয়েছে, ওঙ্কাররূপী এই উদ্গীথই হল মুখ্য প্রাণ। নাসিক্য প্রাণ (ঘ্রাণ) বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন সবই তার বৃত্তি।[৬৫] কিন্তু এই বৃত্তিগুলি দ্বৈতস্পৃষ্ট, অতএব পাপবিদ্ধ।[৬৬] একমাত্র মুখ্যপ্রাণই অদ্বৈত অতএব অপাপবিদ্ধ। ওঙ্কার আমার ঘ্রাণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মনের অতীত মুখ্যপ্রাণস্বরূপ—এই হল উদ্গীথোপাসনার অধ্যাত্মরূপ।

---

[৬১] এইধরনের ভাবনাকে বলে কর্মাঙ্গোপাসনা। তার অর্থ হল, কর্মের যে-কোনও অঙ্গকে অবলম্বন করে চেতনাকে ক্রমসূক্ষ্ম করে মূলে পৌঁছানো। যজ্ঞের সেরা হল সোমযাগ; যাজ্ঞিকেরা বলেন, তাতে অমৃতত্ব লাভ হয়। একমাত্র সোমযাগেই সামগান হয়। সেই গানের আসল পর্ব হল উদ্গীথ। উদ্গীথকে যদি ওঙ্কারে লয় করে দেওয়া হয়, তাহলে পাঁচদিনব্যাপী জটিল সোমযাগটি গুটিয়ে আসে ওঙ্কারে। সুতরাং শেষপর্যন্ত এই দাঁড়ায়, সোমযাগ করাও যা, ওঙ্কারের সাধনা করাও তা। কর্ম তাহলে জ্ঞানের বাধক নয়, সাধক—কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে। এইটিই হল কর্মের উপনিষৎ বা তত্ত্ব। এই খণ্ডের শেষে তার ইঙ্গিত আছে। বৈদিক ভাবনায় কর্মে এবং জ্ঞানে যে কোনও বিরোধ নাই, এই কর্মাঙ্গোপাসনাগুলিই তার প্রমাণ। এগুলির সর্বত্রই রয়েছে চিত্তের একটা প্রত্যাহারের ব্যাপার, স্থূল ছেড়ে মূলকে ধরা। উপনিষদে তাই বারবার দেখি, একটা অধিদৈবত তত্ত্বের পাশে তারই একটা অধ্যাত্ম প্রতিরূপ। তন্ত্রেও তেমনি বাহ্যযাগ, আবার মানসযাগ—দুটি পাশাপাশি।

[৬২] বাক্ প্রকৃতি, প্রাণ পুরুষ; একটি মন্ত্র, আরেকটি তার সুর। দুটির মিলনে ওঙ্কার। তন্ত্রে এইটিই বীজের শেষে নাদবিন্দু বা আনন্দচেতনার ক্রমসূক্ষ্মতা। একে শিব-শক্তির সামরস্যও বলা হয়। এই একটি অনুচ্ছেদে জপের রহস্যটুকু সূত্রাকারে বলে দেওয়া হল। প্রাচীন উপনিষদ্গুলিতে এমন বহু সূত্র আছে।

[৬৩] অর্থাৎ জানব, এখানে যে-ঝঙ্কার উঠেছে তা ঐ পরমব্যোমেরই 'অভিস্বরণ' বা সুরের নির্ঝরণ। এই 'অনুজ্ঞা'কে তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে 'অনুকৃতি' (১।৮; এই অনুবাকটির সঙ্গে বর্তমান খণ্ডটি তুলনীয়)। এর আরেক নাম 'অনিরাকরণ' (দ্র: ছান্দোগ্য শান্তিপাঠ)। বাক্ আর প্রাণের সামরস্যের ফলে আমাতে যে-ওঙ্কারের আবির্ভাব হল, তাদিয়ে আমি ব্রহ্মকে স্বীকার করলাম, আর সেই স্বীকৃতির সমর্থন এল পরমব্যোম হতে নিত্য ওঙ্কারের নির্ঝরণে। এ যেন এখান থেকে একজন বলল, 'ওম্, আমি তোমার', আর অমনি ওখান থেকে সাড়া এল, 'ওম্, তুমি আমার।' এই অনুজ্ঞাগ্রহণের ব্যাপারটি যজ্ঞেও আছে। সোমযাগের অধ্যক্ষ ব্রহ্মা সমস্ত অনুজ্ঞার উৎস। তিনি অনুজ্ঞা দেন 'ওম্' বলে এবং তাঁরই প্রসাদে ও পরিরক্ষণে যজ্ঞ সুনিষ্পন্ন হয়। এখানে আমরা এই অধিযজ্ঞ বিধিটিরই অধ্যাত্মরূপ পাচ্ছি।

[৬৪] আসল কথাটা তাহলে দাঁড়াল এই। সামবেদের প্রধান ঋত্বিক যে-উদ্গাতা, তিনি যদি ওঙ্কারের তত্ত্ব এবং রহস্য জানেন, তাহলেই তাঁর অনুষ্ঠিত কর্ম বীর্যশালী হবে। ঋত্বিক থেকে যজমানে শক্তিসঞ্চার তখনই সম্ভব। আবার যাঁর সোমযাগ করবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই, তিনিও যাগের ফল লাভ করেন, যদি তিনি এমনি করে ওঙ্কারের উপাসনা করেন।

[৬৫] এখানে ব্রহ্মের দ্বারপালদের পাচ্ছি। প্রাণকে দ্বিধাবিভক্ত করে আদিতে এবং অন্তে স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বৃত্তির দ্বারাই ব্রহ্মের সাধনা করা চলে। নাসিক্য প্রাণের দ্বারা সাধনা হল প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের কথা পরের খণ্ডে বলা হবে।

[৬৬] এইখানে পাপের একটি সংজ্ঞা পাওয়া গেল। অনুকূল এবং প্রতিকূল বেদনা-(feeling)-রূপ যে-দ্বন্দ্ববোধ, তা-ই পাপ। বিশ্বব্যাপ্ত চিন্ময় (দিব্য) প্রাণে এই দ্বন্দ্ববোধ নাই। সেই প্রাণই অপহতপাপ্মা অজর অমৃত ব্রহ্ম। আকাশস্থ আদিত্য তাঁর অধিদৈবতরূপ। আদিত্যই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-- যাঁহতে এখানকার সব-কিছুর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হচ্ছে। তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য। বেদের

তৃতীয় খণ্ডে তিনটি উপাসনার কথা আছে। প্রথমে উদ্‌গীথকে[৬৭] আদিত্যরূপে উপাসনা করতে বলা হয়েছে। জানতে হবে আদিত্যই প্রাণ। তারপর উদ্‌গীথকে উপাসনা করতে হবে ব্যানরূপে। ব্যান হল প্রাণ ও অপানের সন্ধি, বায়ুর ক্রিয়া সেখানে স্থির হয়ে যায়। কথা বলতে, গান গাইতে বা কোনও জোরের কাজ করতেও তা-ই হয়। এই নিবাত অবস্থাটুকু উদ্‌গীথ।[৬৮] আবার 'উদ্‌গীথ' সংজ্ঞার উৎ গী এবং থ এই তিনটি অক্ষরকে যথাক্রমে প্রাণ বাক্‌ এবং অন্ন, অথবা দ্যোঃ অন্তরিক্ষ এবং পৃথিবী, অথবা আদিত্য বায়ু এবং অগ্নি, অতএব সামবেদ যজুর্বেদ এবং ঋগ্‌বেদরূপে ভাবনাও একরকম উপাসনা।[৬৯] এইসব উপাসনায় সিদ্ধ সামগায়ক যে-কামনা নিয়ে সামগান করেন তা-ই সিদ্ধ হয়। তবে তাঁকে গান করতে হবে আত্মস্থ হয়ে।

চতুর্থ এবং পঞ্চম খণ্ডেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এইসব কথাই বলা হয়েছে।

এপর্যন্ত দেখা গেল, সামের যে-উদ্‌গীথ, তা বস্তুত ওঙ্কার; আর এই ওঙ্কার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ, আবার অধিদৈবত দৃষ্টিতে আদিত্য। ষষ্ঠ খণ্ডে বলা হচ্ছে, সামের নিগূঢ়তর রূপ হচ্ছে বাইরে আদিত্যের আলোর ঝলমলানি আর তার গভীরে পরঃকৃষ্ণের নীলিমা। তার মাঝে আছেন এক পুণ্ডরীকাক্ষ অপাপবিদ্ধ হিরণ্ময় পুরুষ। তিনি সমস্ত ভুবন ও তাদের অধিষ্ঠানজ্যোতির ওপারে। ঋক্‌ আর সাম তাঁথেকেই বেরিয়ে এসেছে। উদ্‌গাতা বস্তুত তাঁরই মহিমাগান করেন। আদিত্যমণ্ডলের ওপারে যেসব লোক আছে, তিনি তাদেরও ঈশ্বর।

সপ্তম খণ্ডে বলা হচ্ছে, এমনি করেই আবার চোখের আলোর গভীরে আছে এক পরঃকৃষ্ণের নীলিমা, তার মাঝেও এক হিরণ্ময় পুরুষ আছেন, তিনি বাক্‌ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও মনের অতীত। ঐ আদিত্যপুরুষ আর এই অক্ষিপুরুষ দুইই এক। আদিত্যমণ্ডলের এপারে যেসব লোক আছে, অক্ষিপুরুষ তাদের ঈশ্বর। যিনি সত্যকার উদ্‌গাতা, তিনি এই উভয় পুরুষের উদ্দেশেই গান করেন।[৭০]

সংহিতাও এই আদিত্যসাধনার কথাই বলেছেন। যিনি আদিত্য, তিনিই আমার প্রাণ। দুইই চিন্ময়, দুইই দেবতা। এই চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদই বৈদিক ভাবনার মর্মকথা।

[৬৭] সর্বত্রই উদ্‌গীথ বোঝাচ্ছে ওঙ্কারকে, কেননা ওঙ্কারই উদ্‌গীথের সার।

[৬৮] এর সঙ্গে তু. সংবর্গবিদ্যা ৪।৩। স্বভাবতই প্রাণ এবং অপানের দুটি সন্ধি থাকবে—একটি শ্বাস নেবার পর, আরেকটি ছাড়বার পর। দুটির পরেই একটু ফাঁক আছে। ঐ ফাঁকটুকুরই ব্যান। তখন বায়ুর চলাচল থাকে না। ঐটুকু লক্ষ্য করতে পারলে চিত্ত শান্ত হয়ে যায়। ব্যান যেন আকাশের মত, তারই মাঝে প্রাণাপানের ওঠা-নামা চলছে। এই ভাবনাই বৈদিক প্রাণায়ামের মূল। রাজযোগের এবং হঠযোগের প্রাণায়ামও এই থেকে এসেছে।

[৬৯] তু. তৈত্তিরীয়োপনিষদে অধ্যাত্ম অধিলোক অধিজ্যোতিষ এবং অধিবিদ্য দৃষ্টিতে সংহিতার ব্যাখ্যা (১।৩।১)। কথাটা হল, উদ্‌গীথ বা ওঙ্কারই সব—এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে পর সত্যকার উদ্‌গাতা হওরা যায়।

[৭০] এইখানে আমরা বেদমীমাংসার তিনটি সূত্রের সন্ধান পেলাম। প্রথম সূত্র, বৈদিক ক্রিয়া একটা গভীর চিন্ময় অনুভবেরই অভিব্যক্তি। ঋত্বিকের মাঝে সে-অনুভব সুস্পষ্ট। তিনি যজমানের মাঝে তা সঞ্চারিত করেন। দ্বিতীয় সূত্র, ঋত্বিকের যে-মন্ত্রবীর্য, তার আশ্রয় প্রণব বা ওঙ্কার। ওঙ্কার জ্ঞান আর কর্ম দুয়েরই বীজমন্ত্র। তৃতীয় সূত্র, অধিদৈবত দৃষ্টিতে তিনি আদিত্য, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি প্রাণ। ঐ পুরুষ আর এই পুরুষ এক। অথবা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। আত্মস্থ হিরণ্ময় পুরুষকে জানতে হলে অন্তরাবৃত্ত হয়ে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে দিতে হবে চোখের গভীরে (অন্তরক্ষিণি) পরঃকৃষ্ণ নীলিমার অতলে। কঠোপনিষদের ভাষায় সাধককে 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হতে হবে (২।১।১) হঠযোগের পরিভাষায় ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে জীবাত্মা আর শিরসি সহস্রারে পরমাত্মা। দুয়ের সাযুজ্য ঘটানোই পরম পুরুষার্থ। ঋত্বিক্‌ সেই সাযুজ্যে সিদ্ধ।

অষ্টম এবং নবম খণ্ডে দেখি, প্রবাহণ জৈবলি[৭১] উদ্গীথের উপনিষদ্ বলছেন শিলক এবং দাল্ভ্যের কাছে। দাল্ভ্য বলছিলেন, সামের পর্যবসান স্বরে, স্বরের প্রাণে, প্রাণের অন্নে, অন্নের অপে এবং অপের স্বর্গলোকে। শিলক আরেক ধাপ এগিয়ে বললেন, স্বর্গের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে। প্রবাহণ আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা আকাশে। আকাশই পরাৎপর অনন্ত উদ্গীথ।[৭২]

দশম এবং একাদশ খণ্ডে আছে উষস্তি চাক্রায়ণের উপাখ্যান। তিনি ছিলেন তত্ত্ববিৎ। বাধ্য হয়ে তাঁকে নীচজাতির উচ্ছিষ্ট খেতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর কোনও ক্ষতিই হয়নি। ঐ উচ্ছিষ্ট খেয়েই তিনি এক রাজার যজ্ঞে গিয়ে উদ্গাতৃগণের ঋত্বিক্দের তত্ত্বোপদেশ দিয়ে তাদের অজ্ঞান দূর করে দিয়েছিলেন। উষস্তি বললেন, 'উদ্গীথকে জানতে হবে আদিত্য বলে; তার আগে যে-প্রস্তাব, আর পরে যে-প্রতিহার, তা যথাক্রমে প্রাণ এবং অন্ন'।[৭৩]

দ্বাদশ খণ্ডটি 'শৌব উদ্গীথ' অর্থাৎ শ্বা বা কুকুরদের সামগান। বক বা গ্লাব নামে এক ঋষি[৭৪] স্বাধ্যায়ের জন্য এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়েছিলেন।[৭৫] সেখানে একটি সাদা কুকুর তাঁর সামনে আবির্ভূত হল, তাকে ঘিরে আরও কতকগুলি কুকুর। তারা সাদা কুকুরটিকে বলল, 'আমাদের ক্ষুধা পেয়েছে, আপনি অন্নের গান করুন।' সাদা কুকুরটি বলল, 'কাল সকালে তোমরা এখানে আমার কাছে এসো।' পরদিন সবাই এলে সামগায়ীদের মত হিংকার উচ্চারণ করে তারা গান ধরল, 'ওম্ আমরা ভাত খাব, জল খাব, দেবতা বরুণ প্রজাপতি সবিতা এখানে অন্ন নিয়ে আসুন, অন্নপতি এখানে অন্ন নিয়ে আসুন, অন্নপতি এখানে অন্ন নিয়ে আসুন ওম্।' তারপর কি হল, তা কিছু বলা হয় নি।[৭৬]

---

[৭১] ইনি একজন ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি এখানে যেমন উদ্গীথের উপনিষদের প্রবক্তা, অন্যত্র তেমনি দেবযানের উপনিষদের প্রবক্তা (ছা. ৫।৩-১০; বৃ. ৬।২)।

[৭২] দাল্ভ্য প্রথম অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সামকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করে আবার অধিলোকদৃষ্টিতে তার বিস্তার ঘটিয়ে উজিয়ে গেলেন দ্যুলোকে। এটি উত্তারপন্থা। শিলক তাকে আবার নামিয়ে আনলেন। এটি অবতারপন্থা। এই উত্তার-অবতারের কথা বেদে অনেকজায়গাতেই আছে। প্রবাহণ পার্থিব-চেতনাকে আকাশে ব্যাপ্ত করে দিলেন। আকাশ ভূলোক-দ্যুলোক দুয়েরই আশ্রয়। এটি সহজপন্থা। বলা বাহুল্য, এই আকাশই সংহিতার 'পরম ব্যোম' 'বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' ইত্যাদি। উদ্গীথের সার হল ওঙ্কার। সুতরাং আকাশই ওঙ্কার। অর্থাৎ মহাশূন্যে যে-প্রাণস্পন্দ, তা-ই 'ওম্'। এই উপনিষদের আদিপ্রবক্তা অতিধন্বা শৌনক (ছা. ১।৯।৩)। এখানে বারবার 'মূর্ধবিপতনের' উল্লেখ আছে। সাধারণত তার অর্থ করা হয়, 'মাথা খসে পড়া'। কিন্তু মনে হয়, ওটা একটা বাগ্ভঙ্গি, আমরা যেমন বলি, 'লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া, মাথা হেঁট হওয়া।'

[৭৩] এখানে সামভক্তিগুলির বিন্যাসের মাঝে একটা ওঠা-নামার ক্রম আরোপ করা হয়েছে। প্রাণ উঠে যাবে আদিত্যে এবং সেখান থেকে আবার নেমে আসবে অন্নে। বস্তুত অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণাপানের গতিতেও এই ছন্দ। প্রশ্বাসে প্রাণ ঊর্ধ্বগামী হয়ে আদিত্যে পেঁছিয়; আবার নিশ্বাসে অপানের আকর্ষণে সেখান থেকে অন্নে বা দেহে নেমে আসে। অবশ্য বিজ্ঞানীর প্রাণই আদিত্যে পেঁছিয়, অজ্ঞানীর নয়। তাইতে অজ্ঞানীর শ্বাস-প্রশ্বাসে আয়ুক্ষয় হয়, বিজ্ঞানীর হয় আয়ুর 'প্রতরণ'। যে-দেবতা এমনি করে প্রাণাপানকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, ঋক্সংহিতায় তিনি 'সর্পরাজ্ঞী' (দ্র. ১০।১৮৯।১; উষস্তি এখানে যে-বিদ্যার কথা বলছেন, তার মূল ঐখানে), পুরাণে 'মনসা', হঠযোগে 'কুণ্ডলিনী'।

[৭৪] এঁর উল্লেখ আছে ১।২।১৩ কণ্ডিকায়। সেখানে তিনি নৈমিষীয় ঋষিদের উদ্গাতা, উদ্গীথকে প্রাণ বলে জেনেছেন। তখন তিনি সিদ্ধ, এখানে সাধক।

[৭৫] মূলে আছে 'উদ্বব্রাজ'। 'উৎ' উপসর্গটি ঊর্ধ্বগতি বোঝায়।

[৭৬] এই উপাখ্যানটিকে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেছেন সামগায়ীদের প্রতি বিদ্রূপ। এদেশের একজন আধুনিক পণ্ডিত এর মধ্যে আদিম সমাজের টোটেমিজম্ ও কর্মসঙ্গীতের স্মৃতি আবিষ্কার

ঋকে সাম বা সুর বসাতে গিয়ে মাঝে-মাঝে স্তোভাক্ষর ঢুকিয়ে দিতে হয়, একথা আগেই বলেছি। ত্রয়োদশ খণ্ডে তেরটি স্তোভাক্ষরকে দেবতাদৃষ্টিতে উপাসনা করার কথা আছে। স্তোভগুলি নিরর্থক, অথচ ঐ নিরর্থক শব্দগুলিই বোঝাচ্ছে দেবতাকে। তন্ত্রেও আমরা দেখি, নিরর্থক কতকগুলি শব্দ দেবতার বীজ। মন্ত্রশাস্ত্রের একটি মূল সূত্রের সন্ধান তাহলে এখানে পাওয়া গেল। ত্রয়োদশ স্তোভাক্ষর 'হুং'কে বলা হচ্ছে 'অনিরুক্ত' অথচ 'সঞ্চর' অর্থাৎ তা অনির্বচনীয় হয়েও স্ফুরত্তাধর্মযুক্ত। এই 'হুং' তন্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ বীজ।[৭৭]

এইখানে প্রথম অধ্যায়ের শেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চবিবশটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে বলা হচ্ছে, সাম বলতে বোঝায় সাধুত্ব অর্থাৎ সৌষম্য এবং কল্যাণ। সামগানের সময় এই ভাবনাটি হৃদয়ে জাগরূক রাখতে হবে।[৭৮]

করেছেন। শঙ্কর বলেন, সাদা কুকুরটি মুখ্যপ্রাণ, আর অন্য কুকুরগুলি বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। শঙ্করের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। উপনিষদে ঘ্রাণ এবং প্রাণ অনেকজায়গায় সমার্থক। কুকুর তাই প্রাণের প্রতীক। এই কুকুরের ইঙ্গিত আমরা পাই ঋক্‌সংহিতায় যমের দুটি দূতরূপে (১০।১৪।১১-১২)। পৃথিবীতে ঘুরে-ঘুরে তারাই মুমূর্ষুর প্রাণকে যমের কাছে নিয়ে যায় ('অসুতৃপৌ...চরতো জনাঁ অনু')। তাদের একটি বিশেষণ 'চতুরক্ষ' চারচোখা। এই বিশেষণটি আবেস্তাতেও আছে (বেন্দিদাদ্ ৮।১৬)। 'অক্ষ' শব্দ চোখ বা ইন্দ্রিয় দুইই বোঝায়। সুতরাং চতুরক্ষ কুকুরের মাঝে আমরা মুখ্য প্রাণ আর বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মনরূপী চারটি ইন্দ্রিয়ের সন্ধান পাচ্ছি। ঋক্‌সংহিতার একজায়গায় অশ্বিদ্বয়কে বলা হচ্ছে 'শ্বানের নো অরিষণ্যা তনূনাম্'—দুটি কুকুরের মত তাঁরা আমাদের তনুকে সমস্ত রিষ্টি হতে রক্ষা করেন (২।৩৯।৪)। এখানে কুকুর নিঃসন্দেহে নাসিক্য বা মুখ্য প্রাণ। আরেকজায়গায় পাই, অগোহ্যের (সবিতার) ঘরে ঋভুরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের জাগিয়ে দিল একটি কুকুর (ঋ. ১।১৬১।১৩)। এ-কুকুর স্পষ্টতই প্রাণচেতনা। দেবশুনী সরমা পণিদের কাছ থেকে লুকানো গাভী উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন, ঋক্‌সংহিতার এই বিশ্রুত উপাখ্যানটিও লক্ষণীয় (১০।১০৮)। এখানে সরমাও প্রাণচেতনা। একটি বায়ব্য মন্ত্রে আছে, 'অশ্বেষিতং রজেষিতং শুনেষিতং প্রাজম্ (৮।৪৬।২৮); অশ্ব রজঃ এবং শ্বা তিনটিই সেখানে পেষণ-শক্তিরূপে প্রাণের বিভূতি। মন্ত্রটির দেবতা বায়ু, এটিও অর্থপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে 'মাতরি-শ্বা' সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি লক্ষণীয়; 'শ্বা' যেমন < √ শূ (ফেঁপে ওঠা, 'মাতরিশ্বা য়দমিমীত মাতরি' ঋ. ৩।২৯।১১), তেমনি আবার কুকুরের ব্যঞ্জনাও বহন করছে। অথচ মাতরিশ্বা মহাপ্রাণ (দ্র. ঋ. ৩।২।১৩ টীকা)। স্মরণীয়, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের সময় শেষপর্যন্ত তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি কুকুর। রূপক ভাঙ্‌লে ব্যাপারটা দাঁড়ায় প্রাণের উদয়ন। সুতরাং প্রতীকী অর্থে কুকুরকে বহুজায়গায় আমরা প্রাণরূপেই পাচ্ছি। অলৌকিক দর্শনের ফলেই হ'ক বা যেমন করেই হ'ক, কোনও ইতর প্রাণী আবির্ভূত হয়ে ঋষিকে তত্ত্বজ্ঞান দিচ্ছে, এ-বিবরণ আমরা এই উপনিষদেরই সত্যকামের কাহিনীতে পাচ্ছি (৪।৫, ৭, ৮)। কাজেই বিদ্রূপের বা টোটেমের থিয়োরি এখানে অবান্তর। ঋক্‌সংহিতায় মাত্র একটি সূক্তকে ব্যঙ্গানুকৃতি (parody) বলে মনে হয় (৯।১১২), তাছাড়া আর-কোথাও বিদ্রূপের কোনও নিদর্শন নাই।...এই খণ্ডে উদ্দিষ্ট দেবতারা হলেন বরুণ প্রজাপতি এবং সবিতা। এঁরা সবাই অন্নপতি। তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাই ব্রহ্ম প্রজাপতি বৃহস্পতি ইন্দ্র (২।৮)। সুতরাং বরুণ ব্রহ্মবাচী। দেবতার কাছে প্রাণের অন্নকামনা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ঋষিরা জীবনবিমুখ ছিলেন না। পূর্বখণ্ডে ছিল আদিত্য প্রাণ ও অন্নের কথা, এই খণ্ডে তারই অনুবৃত্তিরূপে প্রাণ ও অন্নের কথা।

[৭৭] 'হুং' উচ্চারণ করতে হয় প্রশ্বাসের সঙ্গে, প্রাণ যখন উর্ধ্বস্রোতা হয়ে আদিত্যগামী হয় (দ্র. ছা. ২।২৪)। হঠযোগের যোনিমুদ্রার মূলেও এই হুঙ্কার। স্মরণীয়, তিব্বতের বৌদ্ধ যোগসাধনার গায়ত্রী 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'—যা শিব-শক্তির সামরস্যের মন্ত্র।

[৭৮] আগে 'স্তোত্র বা গান, তারপর 'শস্ত্র' বা প্রশস্তিপাঠ, তারপর যাগ—এই হল সাধারণ বিধি। সাম বা সুর দিয়ে প্রথমে একটি অনুকূল পরিবেশ রচনা করে নিতে হবে, তবে উৎসর্গের সাধনা সার্থক হবে।

তার পর দশম খণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিতে সামের উপাসনার উপদেশ। সামে যে-সৌষম্যের ভাবনা, তাকে এখন ছড়িয়ে দিতে হবে বাইরে-ভিতরে সর্বত্র। সবই সামময় বা সুষম ও সুমঙ্গল, অথবা সামই সব—এই দুরকমেই ভাবনা করা যেতে পারে। ফলে সব-কিছু যেন সুরে-বাঁধা বলে অনুভব হবে—এই হল উপাসনার তাৎপর্য। উপাসনার জন্য সামকে পাঁচটি অবয়বে ভাগ করা হয়েছে, কেবল তিনটি জায়গায় তাকে করা হয়েছে সপ্তভক্তিক বা সপ্তাবয়ব।[৭৯] সামের ভাবনা করতে হবে লোকে বৃষ্টিতে জলে ঋতুতে পশুতে প্রাণে বাকে এবং আদিত্যে। সবগুলিতেই সাম পঞ্চভক্তিক, কেবল শেষের দুটিতে সপ্তভক্তিক। হিংকার থেকে নিধন পর্যন্ত সুর খেলে যায় যেন ঢেউএর মত, উদ্‌গীথ হল তার চূড়া। এই ঢেউ-খেলানোর ভাবটা রয়েছে সর্বত্র। প্রকৃতিপরিণামের এটি একটি স্বাভাবিক ছন্দ। একে মেনে নিতে পারলেই জীবনে সাম বা সৌষম্য আসে। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। উদ্‌গীথ হতে নিধন পর্যন্ত বাইরের দিক্ থেকে ঢেউ ভেঙে পড়লেও ভিতরের দিক্ থেকে কিন্তু চেতনার উত্তরায়ণই ঘটে। মধ্যাদিনের সূর্য অস্তের দিকে ঢলে পড়ে—অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে; কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই প্রতিহার আর নিধন চেতনার 'প্রত্যাহার' এবং 'সমাধান' অর্থাৎ একটা অন্তরঙ্গ যোগের ব্যাপার।[৮০]

দশম খণ্ডে আছে অতিমৃত্যু বা মৃত্যুতরণ সামের উপাসনা। একটি অক্ষর দিয়ে আমরা মৃত্যুর ওপারে চলে যেতে পারি। সামের সাতটি ভক্তির নামাক্ষরগুলি সবসুদ্ধ বাইশটি। বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে ভক্তিগুলিতে গড়পড়তা তিনটি করে অক্ষর পাওরা যায়, একটি অক্ষর অবশিষ্ট থাকে। এই দ্বাবিংশ অক্ষরটিই অতিমৃত্যু বা মৃত্যুতরণ। আদিত্যের নীচে যেসব লোক, তারা মৃত্যুস্পৃষ্ট। অমৃতলোক হল ওপারে, তার নাম 'নাক'।[৮১] একুশটি অক্ষর দিয়ে আদিত্য পর্যন্ত পৌঁছন যায়, তার ওপারে যাবার সাধন হল দ্বাবিংশ অক্ষর।[৮২]

এতক্ষণ সামের অবয়বগুলির কি তাৎপর্য, তা-ই বলা হচ্ছিল। এখন একবিংশখণ্ড

---

[৭৯] পাঁচটি অবয়ব হল হিংকার প্রস্তাব উদ্‌গীথ প্রতিহার ও নিধন। প্রস্তাবের পর 'আদি' আর প্রতিহারের পর 'উপদ্রব' যোগ করলে পাওরা যায় সাতটি 'ভক্তি' বা অবয়ব।

[৮০] উপনিষদ্ সামের 'পরোবরীয়স্ত্ব' বা ক্রমিক উৎকর্ষের কথা বলছেন প্রাণের বেলায়। কিন্তু এই উৎকর্ষ বৃষ্টিতে জলে এবং পশুতেও দেখা যাচ্ছে। কেবল ঋতু আর আদিত্যের বেলায় দেখছি, ঢেউটা যেন ভেঙেই পড়ছে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু বাইরের প্রত্যাহার দিয়ে ভিতরে আলো ফোটানো। ঋতুর বেলায় বলা চলে, বর্ষার পর যে দক্ষিণায়ন শুরু হয়, অন্তর্যোগীর পক্ষে ওটা অবক্ষয় নয়, উল্লাস। আদিত্যের বেলায় দেখছি, তার মাধ্যন্দিন মহিমায় উদ্‌গীথ, তখন দেবতা বা জ্যোতিঃশক্তির প্রকাশ; তারপরেই চেতনা গুটিয়ে গর্ভ বা প্রাণ হয়ে গেল, হয়ে গেল গুহাচারী এবং অবশেষে পিতৃগণে বা মৃত্যুতে সমাপন্ন। আবার বাকের বেলায় দেখছি, সব বাকই সাম। লোকের বেলায় একটা উজান-ভাটার সঙ্কেত আছে, তেমনি আছে জলের বেলাতেও। আদিত্যলোক হতে নামে পর্জন্যের সৌম্যধারা, জীবন হয় ঋতচ্ছন্দা, ঘটে পৌরুষের আপ্যায়ন, বাক্ হয় সামময়, আদিত্যায়নের ছন্দের সঙ্গে মিলে যায় চিন্ময় জীবনের দৈনন্দিন ছন্দ—এই পারম্পর্যও লক্ষণীয়। এই সঙ্কেত ধরে মূলের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আশা করি কঠিন হবে না।

[৮১] দ্র. ঋ. ৩।২।১২ টীকা। এখানে নাককে বলা হয়েছে 'বিশোক'। ঔপনিষদ-ভাবনায় শোক এবং মোহ পার হওরাই জীবের পুরুষার্থ। পাতঞ্জলে 'বিশোকা' জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিকে মনের স্থিতিনিবন্ধনী বলা হয়েছে (দ্র. ব্যাসভাষ্য ১।৩৬)।

[৮২] এই দ্বাবিংশ অক্ষর কোন্‌টি তা উপনিষদ স্পষ্ট করে বলছেন না। তৃতীয় কণ্ডিকায় দেখা যাচ্ছে 'উপদ্রবে'র 'ব' হল পরিশিষ্ট অক্ষর। কিন্তু তাকেও তিন অক্ষরের সমান বলে ধরা হচ্ছে। সুতরাং ওটিও দ্বাবিংশ অক্ষর নয়। দ্বাবিংশ অক্ষরটি তাহলে প্রথম অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত 'হুম্'-এর মতই অনিরুক্ত। এই অনিরুক্ত অক্ষরটি নিশ্চয়ই 'ওম্' (দ্র. খণ্ড ২৩।২-৩)।

পর্যন্ত নাম ধরে-ধরে বাছা-বাছা কয়েকটি অখণ্ড সামের তাৎপর্য বলা হবে। বলা হবে, প্রত্যেকটি সামের অধিষ্ঠানতত্ত্ব কি, অধিষ্ঠানজ্ঞানের ফল এবং সাধনাই-বা কি।

প্রথম শুরু করা হয়েছে গায়ত্রসাম দিয়ে। তার অধিষ্ঠানতত্ত্ব হল প্রাণ। এই তত্ত্বের ভাবনা সহ সাম প্রয়োগ করতে যিনি জানেন, তিনি প্রাণবান্ হন, কিন্তু তার জন্য তাঁকে মহামনা হতে হয়, এই তাঁর ব্রত।[৮০] প্রাণের আপ্যায়নে সমস্ত ইন্দ্রিয় সামময় হবে, এই হল উপাসনার তাৎপর্য। প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় যাঁর আপ্যায়িত, অগ্নিমন্থনের অধিকার জন্মায় তাঁরই। অগ্নিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে রথন্তরসাম। এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি অন্নাদ এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন। অগ্নির সম্মানন হল তাঁর ব্রত।

যিনি প্রাণবান এবং ব্রহ্মতেজস্বী, বামদেব্যসামের তত্ত্বে তাঁরই অধিকার জন্মায়। বামদেব্যসাম ওতপ্রোত রয়েছে মিথুনে। তার তত্ত্ব জেনে যিনি মৈথুন করেন, একদিকে তাঁর প্রতি মৈথুনে যেমন সন্তান উৎপন্ন হয়, তেমনি তিনি হন মিথুনীভূত অর্থাৎ শক্তির সঙ্গে নিত্যসঙ্গত। তাঁর ব্রত হচ্ছে সমাগমার্থিনী কোনও নারীকেই তিনি পরিহার করবেন না।

এইখানে আমরা তন্ত্রোক্ত বামাচারের বীজ পাচ্ছি। ফলশ্রুতি থেকে দেখা যায়, উপাসনার দুটি ভাগ—একটি স্মার্ত অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত, আরেকটি তার বাইরে। স্মার্তবিধি অনুসারে বামদেব্যব্রতের তাৎপর্য হল, শুধু প্রজননের জন্যই ধর্ম-পত্নীতে সঙ্গত হবে এবং তাও পত্নীরই ইচ্ছানুসারে। ব্রহ্মতেজস্বী প্রাণবান্ পুরুষের পক্ষে এই ব্রতই সঙ্গত এবং শোভন। কিন্তু 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' কথাটির অর্থব্যাপ্তি ঘটালে (এবং তা ভাষ্যকার শঙ্করেরও সম্মত), আমরা ধর্মশাস্ত্রের বহির্ভূত একটি ব্রতের সন্ধান পাই, যাকে নানা কারণে তান্ত্রিক বামাচারের বীজ বলে মনে করা যেতে পারে। কারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

বামদেব্যসামটির একটি বিশেষ প্রয়োগ বিবাহের অনুষ্ঠানে। এই সামটির যোনি হল ঋ. ৪।৩১।১। ঋক্‌সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা গোতম বামদেব। এই মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তটি একটি সংবাদসূক্ত। তাতে বামদেবের জন্মকথা এবং শেষ ঋকে জীবনকাহিনীর একটু আভাস আছে। বামদেবের মাতৃগর্ভ হতে জন্ম সহজভাবে হয়নি, আজকাল আমরা যাকে 'সীজারিয়ান্ অপারেশন' বলে জানি, সেইভাবে হয়েছিল। দ্বিতীয় ঋকে বামদেব বলছেন, 'আমি তেরচা হয়ে পাশ দিয়ে বের'ব—কেননা আমাকে এমন অনেক কাজ করতে হবে যা আর কেউ করেনি; আমাকে যুঝতে হবে কারও সঙ্গে, কারও সঙ্গে করতে হবে বাদানুবাদ।' সীজারিয়ান্ অপারেশন সে-যুগে থাক বা না থাক, ঋক্‌টি হতে এই বোঝা যায়, বামদেব নিজেকে বলতে চাইছেন 'অযোনিজ', সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না; তিনি এমন-একটা নতুন ধারার প্রবর্তক, যার জন্য তাঁকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল এবং লাঞ্ছনাও কিছু কম হয়নি। এই লাঞ্ছনার কথা তিনি বলছেন শেষ ঋক্‌টিতে: 'আমার কোনও বৃত্তি বা জীবিকা রইল না, তাইতে কুকুরের অন্ত্র পাক করতে হল আমায়, দেবতাদের মধ্যে কারও প্রসাদ আমি পেলাম না, চেয়ে-চেয়ে দেখলাম আমার স্ত্রীর অপমান।' এই উক্তিগুলি অনিবার্যভাবে আমাদের

[৮০] এখানে ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপালকে আবার পাওয়া যাচ্ছে। ব্রতকে এখানে সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই চর্যা বলে ধরে নিতে হবে।

শিব-সতীর কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। শিব দেবমণ্ডলীর বাইরে, তিনি বৃত্তিহীন ভিখারী, দক্ষের যজ্ঞসভায় অপমানিতা হয়ে তাঁর সতী দেহত্যাগ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে, তন্ত্র শিবপ্রোক্ত, শিবেরও এক নাম বামদেব এবং তিনি অযোনিজ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিষ্ণু বা বাসুদেবের (=জ্যোতির্ময় দেবতা অর্থাৎ ভগ বা আদিত্য) অবতার, বামদেবও তেমনি শিবের অবতার।

শিবকে আদৌ অনার্য দেবতা কল্পনা করবার দরকার পড়ে না। তিনি ব্রাত্যদের দেবতা, এ আমরা আগেই দেখেছি। বস্তুত তিনি দ্যুস্থানদেবতা, আকাশ তাঁর প্রতিরূপ। অন্তরিক্ষ যখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, তখন তিনি রুদ্র; তাঁর মেঘের জটাজুটে তখন বিদ্যুতের সাপ খেলে বেড়াচ্ছে। আবার ঝড় থেমে গেলে প্রসন্ন আকাশে দেখি সেই রুদ্রেরই 'দক্ষিণ মুখ', তাঁর শিবরূপ।[৮৪] তন্ত্রে 'হং' শিববীজ এবং আকাশবীজ দুইই। ব্রাত্যদের যিনি শিব, বৈদিকদের তিনিই বরুণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দুইই 'ব্রহ্ম' বা চেতনার অনিবাধ বিপুল প্রসার।[৮৫]

এই বরুণের সঙ্গে বামদেবের সম্পর্কের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ঋক্‌সংহিতায় যথারীতি অগ্নিসূক্ত দিয়ে বামদেব্যমণ্ডলের আরম্ভ। বামদেব সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি দিয়ে অগ্নির আবাহন করেই পরের পাঁচটি ঋকে তাঁকে বলছেন বরুণকে এখানে নামিয়ে আনতে। বোঝা যায়, বামদেবের দৃষ্টিতে অগ্নি-বরুণ এই দেবতাদ্বন্দ্বটি হল দেবমণ্ডলীর আদি এবং অন্ত, যেমন ঐতরেয়ব্রাহ্মণের গোড়ায় দেখি অগ্নি-বিষ্ণুকে অমনিতর একটি দেবতাদ্বন্দ্বরূপে। অগ্নি-বরুণের যুগলে প্রশস্তি আর্যমণ্ডলগুলির গোড়ার আর কোথাও নাই। মনে হয়, এই দৃষ্টিটি বামদেবের নিজস্ব। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ইঙ্গিত থেকে আমরা যেমন বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বররূপে পাই, তেমনি এখানেও বরুণকে বামদেবের সাধনার লক্ষ্যরূপে পাচ্ছি।

অথচ মণ্ডলের মধ্যে একটিমাত্র সূক্তে (৪।৪১) বামদেব ইন্দ্র-বরুণের প্রশস্তি উচ্চারণ করছেন, শুধু বরুণের প্রশস্তি তাঁর নাই। কিন্তু লক্ষণীয়,—ঋক্‌সংহিতায় যে-কয়টি পূর্ণসূক্তের বরুণপ্রশস্তি আছে,[৮৬] তার সবক'টিতেই দেখা যায় দেবতার প্রতি দৈন্য এবং অপরাধক্ষমাপণের ভাব। কিন্তু বরুণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলেই ঋষিদের মনে আর এই ভাব থাকে না।[৮৭] এইদিক দিয়ে বামদেবের ইন্দ্র-বরুণসূক্তে প্রকাশ পেয়েছে একটি বলিষ্ঠ মনোভাব। ঋষি তাঁর 'ধী' বা ধ্যানচেতনার উপমা দিচ্ছেন একটি সহস্র-ধারায় প্রস্রাবিণী ধেনুর সঙ্গে যা হবে ইন্দ্র-বরুণের নন্দিনী(৫); সবার হয়ে তিনি

---

[৮৪] তু. 'স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে...দিদিষ্টন,...শিবঃ স্বরান্...দিবঃ সিষক্তি স্বয়শাঃ...' ঋ. ১০।৯২।৯। এখানে রুদ্ররূপে যিনি শক্তির খেলা দেখাচ্ছেন ('শিক্বসে'), তিনিই আবার শিবরূপে আত্মস্থ (স্বরান্'), তাঁর ঈশনা তাঁতেই সমাহিত (স্বয়শাঃ)। রুদ্রই প্রশান্ত হয়ে শিব হন, তার প্রমাণ এখানে পাচ্ছি। Geldnerও মন্তব্য করেছেন, Rudra heisst schön hier der Siva, *Der Rigveda*।

[৮৫] তু. এবা বন্দস্ব বরুণং 'বৃহন্তম্' নমস্যা ধীরমমৃতস্য গোপাম্ ঋ. ৮।৪২।২; ৪।৪১।১১; দ্র. টীকা ৩।৪।২। আরও তু. ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যৎ ত্বং মিত্রো ভবসি য়ৎ সমিদ্ধঃ, ত্বমর্যমা ভবসি য়ৎ কনীনাম্ (৫।৩।১-২)। এখানে অগ্নি=বরুণ মিত্র অর্যমা বা সৎ চিৎ আনন্দ।

[৮৬] শুনঃশেপ ১।২৪, ২৫; গৃৎসমদ ২।২৮; অত্রি ৫।৮৫; বসিষ্ঠ ৭।৮৬-৮৯; নাভাক ৮।৪১, ৪২ (১-৩)।

[৮৭] দ্র. ১।১৭, ৬।৬৮, ৭।৮২-৮৫, ৮।৫৯।

তাঁদের কাছে চাইছেন 'প্রিয়সখ্য'।[৮৮] ইন্দ্র শত্রুনিপাত করে পথের বাধা দূর করেন, তারপর নেমে আসে বরুণের মহাপ্রসাদ (২)

এই সখ্যের পরিণাম হল দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য।[৮৯] সেই সাযুজ্যবোধ হতে আত্ম-মহিমার যে-উল্লাস, ঋক্‌সংহিতার কয়েকটি সূক্তে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। অনুক্রমণিকাকার এগুলিকে বলেছেন 'আত্মস্তুতি'। আত্মস্তুতিগুলি এমনভাবে রচিত, যাতে সেগুলিকে দেবতার জবানী বলেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন প্রসিদ্ধ বাক্‌সূক্ত বা দেবীসূক্ত।[৯০] অম্ভৃণকন্যা বাক্‌ এখানে বাক্‌-দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য-বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে এই সূক্তটি উচ্চারণ করেছেন। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা সব আত্মস্তুতিকেই দেবস্তুতি বলে ধরে নিয়েছেন কেন, তা বোঝা যায় না। দেবতার ভাবনায় উপাসক তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে নিজেকেই দেবতা বলে অনুভব করবেন, এটা অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছুই নয়।[৯১] এই অদ্বৈতভাবনাই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার চরম পরিণাম। ঋক্‌সংহিতার ঋষিদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বেই বলেছি, কয়েকজায়গায় দেখা যায়, ঋষির পরিচয় নিজের নামে নয়, দেবতার নামে। এগুলি ঐ অদ্বৈতভাবনারই উদাহরণ। বাজসনেয়সংহিতার ঈশোপনিষদে সাযুজ্যবোধ কি করে জাগে, তার একটি সুন্দর ছবি পাই এই উক্তিতে ঃ 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ পশ্যামি, য়োঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'।[৯২] তৈত্তিরীয়োপনিষদের ত্রিশঙ্কুর বেদানুবচনও এর একটি সুন্দর উদাহরণ।[৯৩] এইসব ভাবনারই সূত্রাকারে পরিণতি দেখি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'শিবোঽহম্‌' ইত্যাদি মহাবাক্যগুলিতে।

ঋক্‌সংহিতায় এই আত্মস্তুতিগুলি আছেঃ বিশ্বামিত্র [অগ্নি][৯৪], বামদেব [ইন্দ্র][৯৫], ত্রসদস্যু [ইন্দ্র-বরুণ][৯৬], লব [ইন্দ্র][৯৭], অম্ভৃণকন্যা [বাক্‌][৯৮], শচী[৯৯]। এর মধ্যে বামদেবের অনুভবটি উপনিষদে একটি বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। বৃহদারণ্যকে দেখি, বামদেবের উক্তিটিকেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' উপলব্ধির উদাহরণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১০০] পরবর্তী সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিকে[১০১] ঐতরেয়োপনিষদ্‌ গর্ভস্থ বামদেবের দিব্যজ্ঞানের নিদর্শনরূপে উল্লেখ করেছেন।[১০২] ঐতরেয় এবং বৃহদারণ্যক দুটিই অতিপ্রাচীন

---

[৮৮] বৃণীমহে সখ্যায় প্রিয়ায় (৭)।

[৮৯] দ্বা সুপর্ণা 'সয়ুজা সখায়া' সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ১।১৬৪।২০; এই সাযুজ্যসিদ্ধিই বৈদিক সাধনায় পরম পুরুষার্থ।

[৯০] ঋ. ১০।১২৫।

[৯১] ১০।১২০।৯। ঋক্‌সংহিতায় তার স্পষ্ট উল্লেখ পাচ্ছি : এবা মহান্‌ বৃহদ্দিবো অথর্বা বোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব—এমনি করে মহান্‌ অথর্বা বৃহদ্দিবঃ (ঋষির নাম) নিজেকেই ইন্দ্র বলে ঘোষণা করলেন। Geldner এই সোজা কথাটাকে কষ্টকল্পনার দ্বারা চাপা দিতে চেয়েছেন।

[৯২] ১৬

[৯৩] ১।১০

[৯৪] ৩।২৬।৭-৮

[৯৫] ৪।২৬।১-৩

[৯৬] ৪।৪২।১-৬

[৯৭] ১০।১১৯

[৯৮] ১০।১২৫

[৯৯] ১০।১৫৯

[১০০] ১।৪।১০

[১০১] ৪।২৭।১

[১০২] ২।৪।৫

উপনিষদ্। এঁদের নজীরকে উপেক্ষা করে এই আত্মস্তুতির মন্ত্রগুলিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার মাঝে কি যুক্তি আছে বোঝা যায় না। এই বামদেব্যমণ্ডলেই ত্রসদস্যুর একটি আত্মস্তুতি পাচ্ছি।[১০৩] বলা বাহুল্য, ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা এটিকে ইন্দ্র-বরুণের সংবাদরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, সূক্তটির শেষে রাজা ত্রসদস্যুকে ইন্দ্রের সঙ্গে উপমিত করে 'অর্ধদেব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূক্তটিতেই বলা হচ্ছে, ইন্দ্র বরুণের উপাসনা করে ত্রসদস্যুর মা তাঁকে সন্তানরূপে লাভ করেছিলেন। সেই সন্তান যে পরে ইন্দ্র-বরুণের সাযুজ্যলাভ করে অর্ধদেবরূপে পরিগণিত হবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।[১০৪]

সুতরাং বামদেব্যমণ্ডল হতেই বামদেবের সাধনা এবং সিদ্ধি সম্পর্কে যেটুকু আভাস পাচ্ছি, তাতে প্রাচীন ঋষিসঙ্ঘের মাঝে তাঁর বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর রচিত সূক্তগুলির অনেকজায়গাতেই আছে একটা দৃপ্ত পৌরুষের ভাব। তাঁর অভীপ্সার সুন্দর পরিচয় পাই এই ঋক্‌টিতে ঃ 'অধা মাতুরুষসঃ সপ্ত বিপ্রা জায়েমহি প্রথমা বেধসো নৄন্, দিবস্পুত্রা অঙ্গিরসো ভবেমাদ্রিং রুজেম ধনিনং শুচন্তঃ'—আর আমরা জননী ঊষা হতে জন্ম নেব সপ্ত বিপ্র হয়ে, হব নরলোকের প্রথম বিধাতা, দ্যুলোকের পুত্র হব অঙ্গিরাদের মত, অগ্নিতেজে ভাঙ্‌ব ধনহারী পাষাণের বাধা।[১০৫] ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে বামদেব বলছেন, 'মর্যো ন যোষামভিমন্যমানোঽচ্ছা বিবক্মি পুরুহূতমিন্দ্রম্'—তরুণ যেমন তরুণীর ভাবনায় ডুবে যায়, তেমনি করে সর্বজনাহূত ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠাই আমার আমন্ত্রণ।[১০৬] উপমাটিতে প্রকাশ পাচ্ছে শৈবের পৌরুষ। ঠিক এই উপমাটি ঋক্‌সংহিতার আর দুজায়গায় আছে,[১০৭] কিন্তু তরুণ সেখানে মানুষ নন, দেবতা। এইদিক দিয়ে বামদেবের উপমাপ্রয়োগটি তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যই সূচিত করছে।

আবার দেখি, বামদেব কয়েকটি ঋভুসূক্তেরই ঋষি।[১০৮] তাঁর এই সূক্তগুলি ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় আর ঋভুসূক্ত আছে বিশ্বামিত্রের একটি, কুৎসের দুটি, মেধাতিথির একটি, বশিষ্ঠের একটি এবং দীর্ঘতমার একটি মাত্র।[১০৯] ঋভুরা আগে মানুষ ছিলেন, আত্মশক্তিতে তাঁরা দেবতা হয়েছিলেন এবং দেবতাদের দিক্ থেকে অনেক বাধা অতিক্রম করে অবশেষে যজ্ঞে সোমপানের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁদের কীর্তি-কলাপে পাই যোগবিভূতির পরিচয়। তাঁরা বৈদিক ধারার পাশাপাশি আরেকটা অবৈদিক আর্যসাধনার যে বাহন, তা মনে করবার কারণ আছে।[১১০] এই ঋভুদের প্রতি বামদেবের পক্ষপাতও তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

---

[১০৩] ৪২

[১০৪] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, এই যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মকথা। সংহিতার ভাষায় বলতে গেলে দুজনেই অর্ধদেব।

[১০৫] ৪।২।১৫; Geldner মন্তব্য করছেন, 'শুচন্তঃ' শব্দটিতে আমরা পাচ্ছি তপঃশক্তির এবং ধ্যানতন্ময়তাজনিত তাপ ও আলোর পরিচয়।

[১০৬] ৪।২০।৫

[১০৭] ১।১১৫।৫, ৯।৯৩।২

[১০৮] ৩৩-৩৭

[১০৯] যথাক্রমে ৩।৬০, ১।১১০, ১১১, ১।২০, ৭।৪৮, ১।১৬১।

[১১০] দ্র. ঋ. ৩।৬০ ভূমিকা।

বাংলা দেশে আমরা শিবকে কৃষক দেবতারূপে দেখি। এই কৃষক শিবের আদি-কথা নিয়ে পণ্ডিতমহলে অনেক জল্পনা-কল্পনা আজও চলছে। কৃষি যে যোগসাধনার রূপক, তার প্রমাণ পাই রোহিণীপুত্র 'বল'রামকে যখন হলধররূপে দেখি। তিনি শেষনাগ বা ঐশ্বরযোগশক্তির অবতার, একথা জানা আছে। বৌদ্ধেরা এবং নাথযোগীরা আদ্যাশক্তিকে কল্পনা করেছেন অস্পৃশ্যা ডোমের বা চণ্ডালের মেয়ে বলে। চাষী শিবের কুচুনীর পিছনে ছোটার এইদিক দিয়ে একটা তাৎপর্য থাকতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয়, বামদেবেরও একটি কৃষিসূক্ত আছে,[১১১] তার দেবতা 'ক্ষেত্রপতি'। ঋক্-সংহিতায় এই একটিই কৃষিসূক্ত।[১১২] এটিও বামদেবের সাধনার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

সব মিলিয়ে পাচ্ছি, বামদেব বরুণ বা মহাকাশের উপাসক। সাধনায় তিনি আত্ম-শক্তিবাদী। দেবতার প্রতি তাঁর ভাব পুরুষের, নারীর নয়। তাঁর সিদ্ধি দেবসাযুজ্য-এবং সর্বাত্ম-ভাবনায়। তিনি ক্ষেত্রের কর্ষক বা যোগী। এবং সবচাইতে গুরুতর কথা, তিনি বামদেব্যব্রতের প্রবর্তক—যা সামাজিক রীতির বহির্ভূত। তাঁর আত্মকথা তিনি নিজেই কিছু-কিছু বলেছেন। এইসব দেখে তাঁকে শিবের অবতার এবং তন্ত্রের—বিশেষ করে 'বামাচারের'—প্রবর্তক বলে মনে করবার কোনও বাধা দেখি না।

ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত তিনটি খণ্ডে একটি সমগ্র ভাবনার সংকেত পাওয়া যায়, যার লক্ষ্য হল প্রাণ এবং অগ্নির তত্ত্ব আয়ত্ত করে মিথুনভাবে বা শিব-শক্তির সামরস্যের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[১১৩] এই সাধনাটি গার্হস্থ্যধর্মের পরিপোষক।

তার পর পাঁচটি খণ্ডে যথাক্রমে বৃহৎ বৈরূপ বৈরাজ শক্করী এবং রেবতী সামকে আদিত্যে পর্জন্যে ঋতুতে লোকে এবং পশুতে প্রতিষ্ঠিত জেনে উপাসনার বিধান। উপাসনার অঙ্গীভূত সাধারণ ব্রত হল আদিত্য প্রভৃতিকে কখনও নিন্দা করবে না। সূর্যের আলো, বৃষ্টির ধারা, ঋতুচক্রের আবর্তন, বিশ্বভুবনের বিস্তার এবং তাতে বিচিত্র জীবের মেলা—এইসবকেই দেখতে হবে যেন একটা বিরাট্ সৌষম্যের হিল্লোল। তার ফলে এদের ছন্দোবীর্য উপাসকের আয়ত্ত হবে, এই হল ভাবনার তাৎপর্য।[১১৪]

---

[১১১] ৪।৫৭

[১১২] কিন্তু 'ক্ষেত্রে'র কথা অনেক জায়গায় আছে নানাভাবে। আধার ক্ষেত্র এবং তার অন্তর্যামী ক্ষেত্রপতি বা ক্ষেত্রজ্ঞ—এসব পুরাতন কথা। ঋক্‌সংহিতায় সাধকের একটা সাধারণ সংজ্ঞা হল 'কৃষ্টি' বা কৃষক।

[১১৩] প্রাণ এবং অগ্নির সাম্যের কথা উপনিষদের অন্যত্রও আছে। শরীরের উত্তাপই জীবনের চিহ্ন, এই তত্ত্বটি তার মূলে। ঘুমালে পরে আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু 'প্রাণাগ্নিরা তখন এই দেহপুরীতে জেগে থাকে' (প্র. ৪।৩)। আহারব্যাপারটাকে মনে করতে হবে 'প্রাণাগ্নিহোত্র' (ছা. ৫।১৮-২৪)। প্রাণাগ্নির সাতটি শিখাই আমাদের শীর্ষস্থিত সাতটি ইন্দ্রিয়দ্বার বের'চ্ছে (প্র. ৩।৫)। ভূতগুণ যোগগুণে রূপান্তরিত হয়ে শরীর যে যোগাগ্নিময় হয় (শ্বে. ২।১২), তাও প্রাণেরই আপ্যায়নের ফল। প্রাণাগ্নিকে জাগ্রৎ করেই দাম্পত্যধর্ম পালন করতে হবে, এই হল এখানকার ইঙ্গিত। এই ভাবটি তন্ত্রের কুলসাধনাতেও আছে।

[১১৪] এর আগে সামাবয়বের উপাসনায় যে-ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছিল, এখানকার ক্রম অনেকাংশে তার বিপরীত। সেখানে ছিল আদিত্যে পর্যবসান, এখানে আদিত্য দিয়েই শুরু। আদিত্যের পরে পর্জন্য অথবা আদিত্য থেকেই পর্জন্য—এই ক্রমবিন্যাসের একটা রহস্য আছে। অধিভূতদৃষ্টিতে উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে বর্ষা শুরু হয়। দিনের আলো যখন সবচাইতে বেশী, তখনই আকাশ ভেঙে জল পড়ে। অধিদৈবতদৃষ্টিতে এটি হল বৃত্রবধের ফলে ইন্দ্রের বিজয়, যার কথা ঋক্‌সংহিতার বহু

তারপর ঊনবিংশ খণ্ডে অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত জেনে যজ্ঞাযজ্ঞীর সামের উপাসনা; ব্রত হল, একবছর পর্যন্ত কিংবা সারাজীবনই আমিষভক্ষণ না করা। ফলে অঙ্গের কোনও বৈকল্য হবে না।[১১৫]

বিংশ খণ্ডে বিশ্বদেবতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনসামের উপাসনা, ফল দেবতার সালোক্য সার্ষ্টিত্ব এবং সাযুজ্য লাভ।[১১৬] ব্রত হল, ব্রাহ্মণের নিন্দা করবে না, কেননা দেবরহস্য তাঁরাই জানেন।

একবিংশ খণ্ডে সামোপাসনা চরমে উঠেছে। এবার আর কোনও নির্দিষ্ট সামের উপাসনা নয়, সমস্ত বিশ্বেই যে সামের অশ্রুত ঝঙ্কার উঠছে, তারই উপাসনার কথা বলা হচ্ছে। বেদবিদ্যাই সেই সামের হিঙ্কার, পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোক তার প্রস্তাব, এই লোকত্রয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নি বায়ু আর আদিত্য তার উদ্‌গীথ। উদ্‌গীথে সাম চরমে ওঠে, নেমে আসে প্রতিহারে, মিলিয়ে যায় নিধনে। উদ্‌গীথে চেতনার সুর উঠেছিল আদিত্যে। এবার তা নক্ষত্রে ঝিকিয়ে উঠে নেমে এল আদিত্যরশ্মিতে, পাখির পক্ষবিধুননে। তারপর মিলিয়ে গেল পিতৃগণে গন্ধর্বে এবং সর্পে। সমস্ত বিশ্ব সামময় হয়ে গেল উপাসকের কাছে।[১১৭] ফলে তিনি হলেন সর্বময় ও সর্বজিৎ। তাঁর ব্রত হল 'আমিই সব' এই ভাবনা করা।[১১৮]

জায়গায় আছে। ইন্দ্র আদিত্য, ইন্দ্র অভিজিৎ (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।৫।২।৪, ৪।৪।১।২...)। অভিজিৎ নক্ষত্রচক্রের বাইরে অষ্টাবিংশ নক্ষত্র, অথর্বসংহিতায় তার স্থান পূর্বাষাঢ়ার আগে (১৯।৭।৪)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্যাপারটা হল, চেতনার চরম বিস্ফোরণে আধারে দ্যুলোকের অমৃত-ধারার নির্ঝরণ (দ্র. ঋ. পর্জন্যসূক্ত ৫।৮৩)। লোকের বেলায় নিধন হল 'সমুদ্র', আর পশুর বেলায় নিধন 'পুরুষ', এইটি লক্ষণীয়।

[১১৫] এই উপাসনাটি কায়সাধনের অন্তর্গত। নিরামিষাশী হওয়ার বিধানটি লক্ষণীয়। বৈকল্যকে মূলে বলা হয়েছে 'রিহ্বর্ন' < রি √ হ্বর্ (আঁকা-বাঁকা হয়ে চলা; তু. 'জুহুরাণমেনঃ' ঋ. ১।১৮৯।১) + ছ (বিকরণ)। অঙ্গের অবৈকল্য বস্তুত নাড়ীতন্ত্রে 'গ্রন্থি' না পড়া, যাতে প্রাণস্রোত তাদের মধ্য দিয়ে অনায়াসে গতায়াত করতে পারে। সংহিতায় একেই বলা হয়েছে 'অধ্বর'-গতি, অগ্নি তার নেতা। যজ্ঞসাধনারও তা-ই লক্ষ্য।

[১১৬] সামীপ্য এবং সারূপ্যের কথা উপনিষদে নাই, এটি লক্ষণীয়। সার্ষ্টিত্ব হল দেবতার মত শক্তিমান হওয়া।

[১১৭] আদিত্যরশ্মি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে; তু. ঋ. স. 'নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ' (১।২৪।৭)। নক্ষত্র লোকোত্তরের প্রতীক (তু. অথর্ব. 'ব্রহ্ম দেবাঁ অনু ক্ষিয়তি, ব্রহ্ম দৈবজনীর্বিশঃ, ব্রহ্মোদম্ অন্যন্নক্ষত্রং ব্রহ্ম সৎক্ষত্রমুচ্যতে' ১০।২।২৩; যে-ব্রহ্ম এই সব-কিছু হয়েছেন, যে-ব্রহ্ম দেবজনের সমষ্টি, তিনি হলেন, 'সৎ-ক্ষত্র'; তাঁর ওপারে 'নক্ষত্র'। তু. ক. ২।২।১৫; সেখানে অগ্নি যেমন আদিম ভাতি, নক্ষত্র তেমনি অন্তিম ভাতি)। পক্ষী ঊর্ধ্বাভিসারী চেতনার প্রতীক (তু. ঋ. ১।২৫।৪...)। সূর্য একটি 'সুপর্ণ' বা পাখি—(ঋ. ১।৩৫।৭, ১০৫।১, ১৬৪।৪৬, ৫।৪৭।৩...)। তিনি 'হংসঃ শুচিষৎ' (ঋ. ৪।৪০।৫)। জীবের মাঝে নামে তাঁরই কিরণ, সুতরাং জীবও হংস। তৈত্তিরীয়োপনিষদে জীবাত্মা পক্ষিরূপে কল্পিত (২।১-৫)। অগ্নিচয়নে যজ্ঞের বেদিকেও পাখির আকার দেওয়া হত। সুতরাং প্রতিহার বলতে নক্ষত্রলোক হতে অন্তরিক্ষলোক পর্যন্ত চেতনার অবনমন বুঝতে হবে। নিধনে সামচেতনা অন্তরিক্ষলোক হতে পৃথিবীর গভীরে তলিয়ে গেল। তৈত্তিরীয়োপনিষদে গন্ধর্ব-গণের ঊর্ধ্বে পিতৃগণ (৩।৮)। সর্প পৃথিবীর বিবরে থাকে। তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্পরাজ্ঞী। ঋক্‌সংহিতায় তিনি অপানশক্তি (১০।১৮৯।১), তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে তিনি পৃথিবী (১।৪।৬।৬, ২।২।৬।২, 'মনসার' মূল এইখানে; ঐ. ব্রা. ৫।২৩)। প্রতিহার আর নিধনে এমনি করে সাম-চেতনা আদিত্য হতে নেমে এসে আধারের গভীরে কুণ্ডলিত হয়ে রইল।

[১১৮] এই অদ্বৈতোপলব্ধির তিনটি বিভাবের এইটি একটি বিভাব—আত্মা = সব; আর দুটি বিভাব 'ব্রহ্ম = সব', 'আত্মা = ব্রহ্ম'। সামোপাসনার চরম ফল তাহলে অদ্বৈতোপলব্ধি। এখানে পঞ্চাবয়ব সামের প্রত্যেকটি অবয়বের আধাররূপে তিনটি করে তত্ত্বের নির্দেশ রয়েছে। তাহতে মোটের উপর

এমনি করে একাদশ হতে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত সর্বাত্মভাব-সাধনার একটা পুরা ছক আছে।

দ্বাবিংশ খণ্ডে সাতরকম স্বরের বর্ণনা এবং তাদের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার উল্লেখ করে কিভাবে সামগান করতে হবে তার উপদেশ রয়েছে। যদি উচ্চারণের কোনও ভুল হয়, তাহলেই-বা কি করতে হবে, তাও বলা হয়েছে।[১১৯]

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে বলা হচ্ছে, ধর্মের তিনটি স্কন্ধ। প্রথম স্কন্ধ যজ্ঞ অধ্যয়ন এবং দান; দ্বিতীয় স্কন্ধ তপ; তৃতীয় স্কন্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য। এইসব ধর্ম যাঁরা আচরণ করেন, তাঁরা পুণ্যলোকে যান। কিন্তু যিনি ব্রহ্মসংস্থ, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। এই ব্রহ্মের বাচক হল ওঙ্কার। ত্রয়ীবিদ্যার সার হল ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতি। ওঙ্কার তাদেরও সার। গাছের পাতাকে যেমন ছেয়ে থাকে শিরাজাল, ওঙ্কারও তেমনি সমস্ত বাক্‌কে ছেয়ে থাকে। ওঙ্কারই এই যা-কিছু সব।

চতুর্বিংশ খণ্ডে কি করে কেবল সামগানের দ্বারা যজমান নিজেই পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক জয় করতে পারেন, তার সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। আগেই বলেছি, সাম-গানের প্রয়োগ হয় সোমযাগে। যাগের শেষদিকে তিনটি 'সবন' (সোমলতা ছেঁচে রস নিংড়ে বার করা) হয় সকালে দুপুরে এবং সন্ধ্যায়। যজমান প্রাতঃসবনের আগেই গার্হপত্য অগ্নির পিছনে উত্তরমুখী হয়ে বসে 'বাসব' সাম গান করে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিয়ে বলবেন মৃত্যুর পর তাঁকে পার্থিব লোকে নিয়ে যেতে। বসুরা তখন তাঁকে প্রাতঃসবনের ফল দিয়ে দেবেন। এমনিকরে মাধ্যন্দিন সবনে রৌদ্রসাম গেয়ে এবং বায়ুর উদ্দেশে আহুতি দিয়ে তিনি জয় করবেন অন্তরিক্ষলোক, আবার তৃতীয় সবনে আদিত্য এবং বৈশ্বদেব সাম গেয়ে আদিত্য ও বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে জয় করবেন দ্যুলোক। পৃথিবীজয়ের নাম 'রাজ্য', অন্তরিক্ষজয়ের নাম 'বৈরাজ্য', দ্যুলোক জয়ের নাম 'স্বারাজ্য' এবং 'সাম্রাজ্য'।[১২০]

এইখানে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ।

তত্ত্ব দাঁড়াচ্ছে পনেরটি। পুরুষ ষোড়শকল, তাঁর শক্তির পনেরটি কলা (এই জন্য পুরুষসূক্তে পনেরটি অনুষ্টুপ্ ছন্দের ঋকের পর জগতীচ্ছন্দের আরেকটি ঋক্ আছে, মোটের উপর ষোলটি ঋক্)। তাইতে মূলে বলা হচ্ছে, এই পনেরটির পর আর-কিছুই নাই অর্থাৎ পনের কলার মাঝেই বিসৃষ্টির সব। ষোড়শকল পুরুষ তার অধিষ্ঠান।

[১১৯] স্বরের সাতজন দেবতাকে এই ভাবে সাজানো যেতে পারে : অগ্নি বায়ু ইন্দ্র সোম বৃহস্পতি প্রজাপতি এবং বরুণ (তু. তৈ. উ. ২।৮ : সেখানে ইন্দ্র বৃহস্পতি প্রজাপতি বরুণ—এই ক্রমটি পাওয়া যায়)। ঋক্‌সংহিতায় তিনটি দেবতার প্রাধান্য—অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম। যাস্ক বায়ু এবং ইন্দ্র দুজনকেই অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা বলছেন। ঋক্‌সংহিতার প্রথম অনুবাকে (যাতে বৈদিক দেব-বিদ্যার মূল ছকটি পাওয়া যায়) ইন্দ্র এবং বায়ুকে একসঙ্গে আবাহন করা হয়েছে (১।২।৪-৬)। স্বরগুলিও তাহলে যথাক্রমে বিনর্দি, মৃদু, সুক্ষ্ম, নিরুক্ত ক্রৌঞ্চ অনিরুক্ত এবং অপধ্বান্ত। দেবসংস্থানের দিকে দৃষ্টি রাখলে এটিকে আরোহক্রম বলা যেতে পারে। এই সঙ্গে তুলনীয় মার্গ-সঙ্গীতের সাতটি স্বর এবং পশু-পাখির স্বরের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যকল্পনা। এখানে শুধু ক্রৌঞ্চ পাখির নাম পাওয়া যাচ্ছে। বারুণ স্বরকে বর্জন করতে বলা হয়েছে, এটিও লক্ষণীয়।

[১২০] এইখণ্ডে বর্ণিত অনুষ্ঠানটি সমগ্র সোমযাগের সার। ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য নাই, ঋত্বিকদের সাহায্য নেবার কোনও প্রয়োজন নাই, যজমান শুধু বিদ্যার বলেই একটি সরল ও সংক্ষিপ্ত কর্মের দ্বারা সমগ্র যাগের ফল লাভ করছেন (তু. মূলে : ক তর্হি য়জমানস্য লোক ইতি, স য়স্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্য়াদ্, অথ বিদ্বান্ কুর্য়াৎ' ২)। এই সংক্ষেপকরণ বৈদিক ভাবনার একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্বেও দেখেছি, সাম কি করে শেষ পর্যন্ত ওঙ্কারে পর্যবসিত হল। সুতরাং ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বলা যেতে পারে সাধনার প্রথম পাঠ। ওটা মন্দাধিকারীর জন্য।...কেনোপনিষদে দেখেছি, অগ্নি বায়ু এবং ইন্দ্র

ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে উনিশটি খণ্ড। প্রথম এগারটি খণ্ডের বর্ণিত বিষয় মধুবিদ্যা। এটি আদিত্যোপাসনারই নামান্তর। উপাসনার পাঁচটি পর্ব, তাতে চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষের একটি বিবৃতি পাওয়া যায়।

বলা হচ্ছে, অন্তরিক্ষ যেন একটি মৌচাকের মত। আদিত্যের রশ্মিজাল তাতে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি মৌচাকের মধুকোষ। যজমান যে বেদবিহিত কর্ম করেন, তার ফল হল পুষ্পরস বা অমৃত যার দ্বারা মধুকোষগুলি পূর্ণ হয়। এই অমৃতই আবার আদিত্যের বিচিত্র রূপ বা আভা। গণদেবতারা এই রূপ হতে জাগেন, একে দর্শন করে তৃপ্ত হন, আবার এতেই মিলিয়ে যান। যে-যজমান এই রহস্য জানেন, তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে গণদেবতার সাযুজ্য লাভ করেন।

রূপক ছেড়ে সোজাসুজি বলতে গেলে কথাটা এই দাঁড়ায়ঃ আদিত্য নির্মল অদ্বয়চেতনার প্রতীক। বেদবিহিত কর্ম সাধককে এই চেতনাতেই পৌঁছে দেয়।

কিন্তু পৌঁছবার রাস্তার পর-পর পাঁচটি ধাপ আছে। তাতে সাধনফলের উৎকর্ষের তারতম্য আছে। এই তারতম্য বোঝানো হয়েছে আদিত্যরশ্মির দিগ্‌বিভাগ এবং আদিত্যের গতিবিভাগ দিয়ে। পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর এমনি করে দক্ষিণাবর্তক্রমে দিক্‌গুলিকে বসিয়ে সবার শেষে রাখা হয়েছে ঊর্ধ্বদিক্‌ প্রত্যেকটি দিক্‌কে আবার আদিত্যের উদয়বিন্দুরূপে চিহ্নিত করে গতিবিভাগের কল্পনা করা হয়েছে।

আদিত্যের দুটি গতির কথা আমরা জানি। একটি আহ্নিক গতি, আরেকটি বার্ষিক গতি। আহ্নিক গতির একটাই আমাদের চোখে পড়ে, আদিত্য যখন পূবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যান। তাঁর এই গতিপথটি পাতা রয়েছে অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বগোলার্ধে। অস্তমিত আদিত্য আবার পূবে উঠে আসেন যখন, তখন কল্পনা করতে পারি,

---

ব্রহ্মসংস্পর্শের ক্রমিক সোপান। এখানে অগ্নি বায়ু আদিত্য এবং বিশ্বদেব। আদিত্য অদ্বৈতচেতনা, বিশ্বদেব তার বিভূতি। তু. 'একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (ঋ. ১।১৬৪।৪৬)। বসুগণ এবং রুদ্রগণ যথাক্রমে অগ্নি (matter) ও প্রাণের অন্তর্যামী চিৎশক্তি, অগ্নিও বায়ুরই বিভূতি। লোকদ্বারের কথা ঋক্‌সংহিতার আপ্রীসূক্তগুলিতে আছে, সেখানে তাদের নাম 'দেবীর্দ্বারঃ' বা জ্যোতির দুয়ার। সমস্তটা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হল চেতনার উত্তরায়ণ, পার্থিবচেতনা হতে বিশ্বচেতনায় ছড়িয়ে পড়া। এই শেষেরটাই অধ্যাত্মসাধনশাস্ত্রে 'জীবন্মুক্তি'র নাম নিয়েছে। মৃত্যুর পর (মূলে 'পরস্তাদায়ুষঃ' যজমান এক চিন্ময় সর্বাত্মভাব নিয়ে যুগপৎ পার্থিব অন্তরিক্ষ এবং দিব্যলোক সমূহেই থাকবেন— এই হল লোকপ্রাপ্তির শেষ পরিণাম। গীতায় আছে স্থিতপ্রজ্ঞের জীবদ্দশায় 'ব্রাহ্মী স্থিতি' এবং অন্তকালে 'ব্রহ্মনির্বাণ'; এখানে পাচ্ছি (এবং পূর্বেও দেখেছি, দ্র. কৌষীতকী উপনিষৎপ্রসঙ্গ) অনির্বাণ আদিত্যস্থিতি। আকাশে সূর্য জ্বলছে, সেই সূর্যের সঙ্গে যজমান এক হয়ে রইলেন— যেমন জীবনে তেমনি মরণে। যদি বলি, সর্ববর্ণ আদিত্যের ভূমিকা হল অবর্ণ আকাশ, ঐখানেই যজমানের উৎক্রান্তির পর্যবসান, তাহলে কথাটা নির্বাণবাদের অনুকূল হবে। উপনিষৎ কিন্তু আদিত্যের 'শুক্লং ভাঃ' আর 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্‌' দুয়ের মাঝে কোনও বিরোধ কল্পনা করছেন না। দুটিই হিরণ্ময়-পুরুষের দিব্যবিভূতি (ছা. ১।৬-৮)। ঋক্‌সংহিতার সোমমণ্ডলের উপান্ত্যসূক্তে আমরা যে অমৃত-লোকের বিবৃতি পাই, যেখানে আছে 'অজস্র জ্যোতি আনন্দ তৃপ্তি এবং স্বধা', তা মুখ্যত আদিত্যের শুক্লভাতিকেই লক্ষ্য করছে, যদিও লোকোত্তরের ইঙ্গিতও সেখানে আছে ('অবরোধনং দিবঃ)। এখানে পাচ্ছি সিদ্ধির চারটি স্তর—রাজ্য, বৈরাজ্য, স্বারাজ্য এবং সাম্রাজ্য। তার সঙ্গে তু. পতঞ্জলির ভূতজয়, ইন্দ্রিয়জয় এবং প্রকৃতিজয় (পাত. ৩।৪৪, ৪৭, ৪৮)। ঋক্‌সংহিতায় আছে অগ্নির রাজ্য (৭।৬।২), ইন্দ্রের স্বারাজ্য (১।৮০), বরুণের সাম্রাজ্য (১।২৫।৪, ৮।২৫।৮, ১৭)। বৈরাজ্য শব্দটি নাই, কিন্তু চতুষ্পাৎ পুরুষের ব্যক্ত একপাদ হতে বিরাটের আবির্ভাবের কথা আছে (১০।৯০।৪, ৫)। একজায়গায় আছে : 'বিরাট্‌ সম্রাট্‌ বিভ্বীঃ প্রভ্বীঃ, বহ্বীশ্চ ভূয়সীশ্চ য়া, দুরো ঘৃতান্যক্ষরন্‌' (১।১৮৮।৫)। বর্তমান প্রসঙ্গের বীজ এইখানে।

খগোলের নিম্নগোলার্ধ বেয়ে তাঁর আরেকটি পথ পাতা রয়েছে। আদিত্যের বার্ষিক গতি হল একবার দক্ষিণ হতে উত্তরে, আরেকবার উত্তর হতে দক্ষিণে। আমরা বলি উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন। দুটি অয়নের পরিমাণ ছয়মাস করে। পুরাণে তাদের বলা হয়েছে দেবতাদের অহোরাত্র। এই অয়নকালব্যাপী অহোরাত্র পৃথিবীর সুমেরুবৃত্তে এখনও হয়ে থাকে।

আর্যেরা জ্যোতির উপাসক। আদিত্যের আলো আমরা দিনে পাই, সুতরাং রাতের চাইতে দিনকে মনে করতে পারি সাধনার বেশী অনুকূল। তেমনি উত্তরায়ণে দিনের আলো বেড়ে চলে, দক্ষিণায়নে কমে যায়। সুতরাং দক্ষিণায়নের চাইতে উত্তরায়ণ সাধনার বেশী অনুকূল।

সাধনার পর্যায় বিন্যাস করতে গিয়ে উপনিষদ প্রথমে অনুকূল কাল দুটির উল্লেখ করেছেন। প্রথমত যে-আদিত্য পূব হতে পশ্চিমে অস্ত যান, তাঁর উপাসনা। মানুষের তখন দিন। দিনের আলোয় চেতনাকে আপ্লুত রাখা হল বাসবী সিদ্ধি। অগ্নি বসুগণের প্রমুখ, তিনি পৃথিবীস্থান দেবতা। সুতরাং এই সিদ্ধিকে আগ্নেয়ী সিদ্ধিও বলতে পারি। এইখানে অমৃতচেতনার অভ্যুদয়, তাই তার রূপকে উদীয়মান সূর্যের মত লোহিত বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই সিদ্ধির সাধন ঋগ্‌বেদ।

তারপরের পর্যায়ে হল উত্তরায়ণের আদিত্যের উপাসনা। তাঁর গতি দক্ষিণ হতে উত্তরে। এটি দেবতাদের দিবাভাগ। আগেরটি যদি 'উজ্জ্যোতিঃ', এটি তাহলে 'উত্তর-জ্যোতিঃ'।[১২১] এই জ্যোতিকে লাভ করা হল রৌদ্রী সিদ্ধি। রুদ্রগণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা, ইন্দ্র তাঁদের প্রমুখ।[১২২] সুতরাং এই সিদ্ধিকে ঐন্দ্রী সিদ্ধিও বলা চলে। অমৃতচেতনা তখন মাধ্যন্দিন সূর্যের মত ভাস্বর। তাই তার রূপ শুক্ল। এই সিদ্ধির সাধন হল যজুর্বেদ।

কিন্তু দিনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রাত্রি, উত্তরায়ণের সঙ্গে দক্ষিণায়ন যা দেবতাদের রাত্রি। মানুষের চোখে দিনের আলো নিবে যায়, কিন্তু আদিত্যদৃষ্টিতে তো যায় না। সুতরাং দিন যদি হয় ব্যক্ত জ্যোতিঃ, রাত্রি তাহলে অব্যক্ত জ্যোতিঃ।[১২৩] দিনের চাইতে রাত্রির রহস্য আরও গভীর। এই রহস্যকে আয়ত্ত না করতে পারলে আদিত্যবিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। আদিত্যে দিবাও নাই রাত্রিও নাই; কিন্তু তা বুঝতে হলে দিনের আলো পেরিয়ে রাত্রির আঁধারে ডুব দিতে হবে।[১২৪]

সাধনার তৃতীয় পর্যায়ে আদিত্যগতিকে অনুসরণ করতে হবে রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। প্রবৃত্তি হতে চেতনার মোড় তখন ফিরবে নিবৃত্তির দিকে। তাই প্রাকৃত

---

[১২১] ঋ. স. ১।৫০।১০।

[১২২] নিরুক্তমতে বায়ু (১০।২)। ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে অগ্নি ও বায়ুর পরেই ইন্দ্র-বায়ু দেবতাদ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে (১।২।৪-৬)। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হচ্ছে, পুরুষের দশটি প্রাণ এবং আত্মাকে নিয়ে একাদশ রুদ্র (৩।৯।৪)। রৌদ্রী সিদ্ধি তাহলে বোঝাচ্ছে প্রাণের উপর আধিপত্য।

[১২৩] দ্র. ঋ. স. রাত্রিসূক্ত : রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ...জ্যোতিষা বাধতে তমঃ (১০।১২৭।১, ২)।

[১২৪] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মৃত্যুর গৃহে অতিথি হয়ে নচিকেতার তিনটি 'রাত্রি' কাটানোর কথা। মৃত্যু প্রাকৃত চেতনার সুপ্তি, সুতরাং অন্ধকার; কিন্তু বস্তুত তিনি 'বৈবস্বত' বা নিত্যভাস্বর আদিত্য-চেতনা হতে জাত।

দৃষ্টিতে আদিত্যের গতি মনে হবে বিপরীত, যেন তিনি পশ্চিমে উঠে পূবে অস্ত যাচ্ছেন। আদিত্য অস্তেই যাচ্ছেন; কিন্তু অস্তের অর্থ তখন বিলোপ নয়, বলা যেতে পারে 'অস্তিতা'।[১২৫] এই হল আদিত্যচেতনার সিদ্ধি। বরুণ আদিত্যগণের প্রমুখ, সুতরাং একে বারুণী সিদ্ধিও বলা যেতে পারে।[১২৬] অমৃতচেতনা তখন চলেছে অবিদ্যা বিনাশ অসম্ভূতি বা মৃত্যুর অন্ধকার ভেদ করে,[১২৭] তাই তার রূপ কৃষ্ণ। এই সিদ্ধির সাধন সামবেদ।[১২৮]

মানুষী রাত্রি অতিক্রম করার পর সাধনার চতুর্থ পর্যায়ে অতিক্রম করে যেতে হবে দৈবী রাত্রির অন্ধকারকে।[১২৯] এখানে দক্ষিণায়নে আদিত্যের উপাসনা। তাঁর গতি তখন বিপরীত, অন্ধকার আগের চাইতেও গাঢ়তর।[১৩০] অমৃতচেতনার রূপ তখন পরঃকৃষ্ণ। একে লাভ করা হল মারুতী অথবা সোম্যা সিদ্ধি।[১৩১] ইতিহাস-পুরাণরূপ বেদ তার সাধন, যা অথর্বাঙ্গিরসের আশ্রিত।[১৩২]

চারটি পর্যায়ের পর আদিত্যের যে-গতির কথা বলা হচ্ছে, তা উপর থেকে নীচের দিকে। স্পষ্টতই এখানে উপাস্য হচ্ছেন মাধ্যন্দিন আদিত্য। এখানেই বিষ্ণুর পরম পদ যেখানে পৌঁছনো হল বৈদিক সাধনার পরমা সিদ্ধি।[১৩৩] এইখান থেকেই চিজ্জ্যোতি নিরন্তর ধারায় সৃষ্টির উপর ঝরে পড়ছে। এখানে আর দিন-রাত্রির ভেদ নাই। অথচ

---

[১২৫] 'অস্ত' গৃহের প্রাচীন সংজ্ঞা। দ্র. ঋ. স. ৩।৫৩।৪ টীকা। মাথার উপরে উঠে আদিত্য ঢলে পড়েন—প্রাকৃত চেতনার এই রীতি। এরই নাম জরা এবং মৃত্যু। কিন্তু দিব্য চেতনা অজর এবং অমৃত। সে-চেতনা লাভ করতে হলে আদিত্যের ঐ ঢলে-পড়াটা নিবারণ করতে হবে। তা পারা যায় নিরোধের পথ ধরলে। বাইরের চেতনা যতই ক্ষীণ হয়ে আসছে অন্তরের চেতনা ততই জোর ধরছে, এটা নিরোধযোগের অনুভূত সত্য। এইটাই আদিত্যের পশ্চিমে উদয়। এ-উদয়ন যে-অস্তের দিকে চলেছে, তা হল নিত্য-প্রাচীতে বা আদিত্যচেতনার স্বধামে। তার কথা একাদশ খণ্ডে বলা হবে।

[১২৬] সংহিতায় বরুণ রাত্রি বা অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা। বিশেষ বিবরণের জন্য দ্র. ঋ. স. ৩।৫৪।১৮ টীকা।

[১২৭] দ্র. ঈ. ৯-১৪; ক. ১।১।৯।

[১২৮] তু. অথ য়দেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব ঋক্, অথ রান্নীলং পরঃকৃষ্ণং তৎ সাম (ছা. ১।৬।৫)। সামের অর্থ সুর। ভাগবতদের পরমদেবতা আদিত্যের এই 'নীলং পরঃকৃষ্ণং ভাঃ'; তাঁরও হাতে বেণু। তার সুরে তিনি যমুনার মৃত্যুস্রোতকে উজান বওয়ান।

[১২৯] এই প্রসঙ্গে তু. সপ্তশতীর কালরাত্রি এবং মহারাত্রি (১।৭৯)। রাত্রিকে যদি স্থূলদৃষ্টিতে অবিদ্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে আগেরটিকে বেদান্তের পরিভাষায় বলা যায় তুলাবিদ্যা আর পরেরটিকে মূলাবিদ্যা। অবচেতনা এবং অচেতনার গভীরে ঝাঁপ দিয়ে প্রচেতনা এবং অতিচেতনার কুণ্ডলিত শক্তিকে মুক্তি দেওয়া নিঃসন্দেহে বীরকর্ম।

[১৩০] তু. ঋ. নাসদীয় সূক্ত : তম আসীত্তমসা গূল্‌হমগ্রে ১০।১২৯।৩।

[১৩১] মরুদ্‌গণ বস্তুত অন্তরিক্ষস্থান দেবতা, বিশ্বপ্রাণ তাঁদের স্বরূপ। ঋক্‌সংহিতায় মরুদ্‌গণ 'রুদ্রিয়াঃ' বা রুদ্রপুত্র (দ্র. ১।৩৮।৭, ২।৩৪।১০, ৩।২৬।৫, ৫।৫৭।৭, ৭।৫৬।২২...)। রুদ্রও অন্তরিক্ষস্থান। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একাদশ রুদ্র একাদশ ইন্দ্রিয় বা প্রাণবৃত্তি (বৃ. ৩।৯।৪)। উত্তরায়ণের আদিত্যের উপাসনায় রৌদ্রী সিদ্ধি আর দক্ষিণায়নের আদিত্যোপাসনায় মারুতী সিদ্ধি। ব্যাপারটা ব্যষ্টিপ্রাণ হতে সমষ্টিপ্রাণে উত্তরণ। রাত্রির অধিদেবতা বরুণ; আবার এই রাত্রিতেই চাঁদের আলো। তাই এ-সিদ্ধি সোম্যা সিদ্ধি।

[১৩২] আগেই দেখেছি, অথর্বাঙ্গিরস ত্রয়ীর বাইরে, তাতে শ্রৌতকর্মের প্রাধান্য নাই। এটি গণমানসের কাছাকাছি। ইতিহাস-পুরাণও তা-ই। আবার ব্রাহ্মণের মতে মরুদ্‌গণও দেবতাদের মধ্যে বৈশ্য বা জনসাধারণের মত (ঐ. ১।৯; তা. ৬।১০।১০, ১৮।১।১৪, শ. ৪।৫।২।১৬, তৈ. ১।৮।৩।৩, কৌ. ৭।৮...)। উপনিষদের কি তাহলে এই ইঙ্গিত যে দক্ষিণায়নের পথটা মুখ্যত জনসাধারণের? লক্ষণীয়, বৈদিক অনুষ্ঠানে দিনের প্রাধান্য—যদিও অতিরাত্রযাগের কথা বৈদিক সাধনাতেও আছে। কিন্তু তন্ত্রের অনেক অনুষ্ঠানই রাত্রির। আবার তন্ত্র ভারতবর্ষের লোকাতত ধর্ম।

[১৩৩] তু. ঋ. ১।২২।২০, ২১; ১।১৫৪।৫, ৬।

গতি আছে, উপর থেকে নীচে ঝরে পড়ার গতি। তাইতে এই ভূমিতে অমৃতচেতনার রূপ হল 'ব্রহ্মক্ষোভ'—মাধ্যান্দিন সূর্যের মাঝে পারার মত আলো যে টলমল করছে তা-ই। এই সিদ্ধি সাধ্যগণের আশ্রিত।[১০৪] ব্রহ্ম সাধ্যগণের প্রমুখ, আবার তিনিই এই বিদ্যার সাধন। এই ব্রহ্মকে আহরণ করা যেতে পারে গুহ্য আদেশের দ্বারা।[১০৫]

ব্রহ্মক্ষোভের ঊর্ধ্বেও একটি ভূমি আছে যেখানে কোনও গতি নাই। আদিত্য সেখানে ওঠেনও না অস্তও যান না—'একল' হয়ে মাঝখানে স্থির থাকেন।[১০৬]

এই মধুবিদ্যা উদ্দালক পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। আরেকটি মধু-বিদ্যা আছে বৃহদারণ্যকে (২।৫)।

দ্বাদশ খণ্ডে গায়ত্রীর উপাসনা।[১০৭] গায়ত্রীর স্বরূপঃ অধিদৈবতদৃষ্টিতে তিনি

---

[১০৪] সাধ্যগণের উল্লেখ আছে ঋক্‌সংহিতায় পুরুষসূক্তের (১০।৯০) অন্তিম ঋকের অন্তিম পাদে : 'তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত য়ত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।' নাক হল দ্যুলোকের পরম ভূমি (দ্র. ৩।২।১২ টীকা)। সাধ্যেরা সেখানে আছেন পূর্বদেব বা দেবাদিদেব হয়ে। এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলছেন, সাধ্যগণ হলেন ছন্দঃ (১।১৬)। শতপথব্রাহ্মণের মতে তাঁরা প্রাণ (১০।২।২।২)। নিঘণ্টুতে তাঁদের বলা হয়েছে রশ্মি (১।৫), আবার দ্যুস্থান দেবগণের মাঝেও তাঁদের উল্লেখ আছে (নি. ৫।৬।২৮)। যাস্ক সেখানে নিরুক্তি দিচ্ছেন, 'সাধ্যা দেবাঃ সাধনাৎ।' ব্যাখ্যায় দুর্গ বলছেন, 'তে হি সর্বমিদং সাধয়ন্তি য়দন্যেন সর্বকর্মভিরসাধিতং, তৎ সাধ্যা উচ্যন্তে। তে চ পুনঃ প্রাণাঃ বিশ্বসৃজ ঋষয়ঃ (তু. ঋ. তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ১০।৯০।৭; এখানে 'দেবতাদের মধ্যে যাঁরা সাধ্য এবং ঋষি' এই অর্থও করা যেতে পারে), য়ে সহস্রসংবৎসরসত্রেণেদং বিশ্বমসৃজন্ত। ত এবৈতে অধিদৈবং রশ্ময়ঃ; বিজ্ঞায়তে হি, প্রাণা বৈ সপ্ত ঋষয়ঃ সাধ্যা বিশ্বসৃজ ইতি।' মোটের উপর বলা যেতে পারে, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে মহাপ্রাণের ছন্দোলীলা, তা-ই সাধ্যনামক দেবগণ। পরমপদ হতে আদিত্যরশ্মির নির্ঝরণের সঙ্গে এই ভাবনার সঙ্গতি আছে।

[১০৫] গুহ্য আদেশগুলি পাঁচটি বেদের সারভূত মহাবাক্য, যার মাঝে প্রচোদক শক্তি রয়েছে। শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এমনিতর একটি আদেশের উল্লেখ করেছেন 'লোকদ্বারমপাবৃণু' ইত্যাদি (ছা. ২।২৪।৪)। কেনোপনিষদে এইরকম একটি আদেশ আছে : 'য়দেতদ্‌বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্‌ আ ইতি' ইত্যাদি (৪।৪-৬); তৈত্তিরীয়ে : ১।১১ (আচার্যের অনুশাসন), ২।৩ (মনোময় পুরুষের আত্মা); ছান্দোগ্যে : আদিত্যো ব্রহ্ম (৩।১৯।১) একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান (৬।১।৪, ৬), অহঙ্কারাদেশ (৭।২৫।১), আত্মাদেশ (ঐ ২); বৃহদারণ্যকে : নেতি নেতি (২।৩৬)।

[১০৬] অধিভূতদৃষ্টিতে এটি হল সুমেরুবিন্দুর দ্বারা লক্ষিত ধ্রুবনক্ষত্র। বরুণের 'ধ্রুবং সদঃ'র কথা ঋক্‌সংহিতায় আছে (৮।৪১।৯); অন্যত্র আছে, এই 'ধ্রুবং সদঃ' উত্তম অর্থাৎ সর্বোচ্চ এবং সহস্রস্থূণ (২।৪১।৫, ৫।৬২।৬)। এই থেকেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'শিরসি সহস্রারের' কল্পনা এসেছে। বরুণ ব্রহ্মের অব্যক্ত জ্যোতিঃ। গতির সাধনায় চেতনার উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে কালের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলে, এটিও লক্ষণীয়।

[১০৭] বৈদিক সাতটি প্রধান ছন্দের আদিতে হল গায়ত্রী। আট অক্ষরের তিনটি পাদে মোটের উপর চব্বিশটি অক্ষরে ছন্দটি রচিত। ঋক্‌সংহিতায় তার প্রাচীন সংজ্ঞা 'গায়ত্র', কেবল দশম মণ্ডলে দুবার আছে 'গায়ত্রী' (১০।১৪।১৬, ১৩০।৪)। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, একথা ঋক্‌সংহিতায় আছে : অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সয়ুগ্বা (১০।১৩০।৪), পুরোগা অগ্নির্দেবানাং গায়ত্রেণ সমজ্যতে (১।১৮৮।১১)। এই অগ্নিসম্পর্ক হতেই গায়ত্রীর তিনটি সমিধের কথা আছে দীর্ঘতমার ব্রহ্মোদ্যসূক্তে (১০।১৬৪।২৫)। অন্যত্র পাই, অগ্নির তিনটি সমিধের একটিই মানুষের ভোগে লাগে, আর দুটি চলে যায় লোকোত্তরে (৩।২।৯)। গায়ত্রীর সঙ্গে গানের সম্পর্ক সংজ্ঞা হতেই বোঝা যায় (তু. ঋ. ১।১৬৪।২৪, ২১।২, ৩৮।১৪, ৮।১।৭, ২।১৪, ৯।৬০।১)। সামযোনি ঋক্‌গুলি যে অধিকাংশই গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত একথা আগেই বলেছি। ঋক্‌সংহিতায় আছে, একটি শ্যেন দ্যুলোক হতে সোম আহরণ করে আনে (দ্র. ৪।২৬, ২৭)। ব্রাহ্মণে দেখি, গায়ত্রী সুপর্ণী হয়ে দুলোক হতে সোম নিয়ে আসছেন (ঐ. ৩।২৫, শ. ৩।৯।৪।১০)। অন্যত্র গায়ত্রীর জায়গায় পাই বাক্‌কে, তিনি 'মহানগ্নী' হয়ে স্ত্রীকাম গন্ধর্বদের ভুলিয়ে সোম নিয়ে আসছেন (ঐ. ১।২৭)। সায়ণ তাঁর ভাষ্যে শাখান্তর হতে উদ্ধরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন, এই নগ্নিকা একটি একবছরের মেয়ে। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের এই সমস্ত উক্তি হতে গায়ত্রীর গুরুত্ব বোঝা যাবে। এখন আমরা গায়ত্রী বলতে এই ছন্দে রচিত বিশ্বামিত্রের একটি সাবিত্রী ঋক্‌কেই বুঝি (৩।৬২।১০)। এখানে গায়ত্রী বলতে সেই ঋক্‌টিকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট বোঝা

বাক্;[১৩৮] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ।[১৩৯] বাক্-প্রাণরূপিণী গায়ত্রী চতুষ্পাৎ। পুরুষও চতুষ্পাৎ।[১৪০] গায়ত্রী আর পুরুষ একই।[১৪১] পুরুষের একপাদ হল এই সর্বভূত, গায়ত্রীরও তা-ই। পুরুষের আর তিনটি পাদ হল পৃথিবী শরীর এবং হৃদয়। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টি এখানে ক্রমে স্থূল থেকে মূলের দিকে যাচ্ছে। হৃদয় হল গায়ত্রীর তুরীয় পাদ।[১৪২] বাইরের যে-আকাশ, সেই আকাশ নেমে এসেছে অন্তরে, আর অন্তরের আকাশ ঘনীভূত হয়েছে হৃদয়ে। এই হৃদয়রূপী আকাশেই গায়ত্রীর তথা ব্রহ্মের পরম প্রতিষ্ঠা। [১৪৩] এই প্রতিষ্ঠার স্বরূপ হল এক প্রবর্তনাহীন অচলপ্রতিষ্ঠ পূর্ণতার অনুভব।

তারপর ত্রয়োদশ খণ্ডে 'দ্বারপা'-উপাসনা। এই দ্বারপালদের কথা উপনিষদের অনেকজায়গাতেই আছে। আগের খণ্ডে দেখেছি, হৃদয়ই হল ব্রহ্মপুর। ঐখানেই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মের কাছে পেঁ‍ৗছবার জন্য এই হৃদয়ে পাঁচটি 'দেবসুষি' বা জ্যোতির দুয়ার আছে।[১৪৪] প্রত্যেক দ্বারে একজন করে ব্রহ্মপুরুষ আছেন, যিনি দ্বারের রক্ষী। তাঁর উপাসনার দ্বারা সাধক ব্রহ্মে পেঁ‍ৗছতে পারে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই ব্রহ্মপুরুষেরা প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়। এক প্রাণেরই পাঁচটি বৃত্তি—প্রাণ ব্যান অপান সমান এবং উদান। এরা সবাই প্রজ্ঞারই ক্রিয়াশক্তি।[১৪৫] প্রাণের গতি সামনের দিকে, অপানের

যাচ্ছে না। কিন্তু বৃহদারণ্যকে গায়ত্রীপ্রসঙ্গে বিশেষ করে সাবিত্রী গায়ত্রীর কথাই বলা হয়েছে (গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ ৫।১৪।৫)। তবে বিশ্বামিত্রের ঐ ঋক্‌টি ছাড়াও ঋক্‌সংহিতায় গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত আরও কয়েকটি সাবিত্রমন্ত্র আছে (১।২২।৫-৮, ১।২৪।৩-৪, ৫।৮২।২-৯)। শেষের সূক্তটির প্রথম মন্ত্রটি অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত একটি সাবিত্রমন্ত্র, আর বৃহদারণ্যকে এই মন্ত্রটিই যে উক্ত সাবিত্রীপ্রসঙ্গে উদ্দিষ্ট তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সুতরাং ছান্দোগ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দকেই যে বিশেষ করে লক্ষ্য করা হয়েছে, এটা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যেতে পারে। তবে গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত অন্যান্য সাবিত্রমন্ত্রকে ছাপিয়ে বিশ্বামিত্রের মন্ত্রটিই যে ক্রমে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাই যখন দেখি তৈত্তিরীয়ারণ্যকের খিলকাণ্ডে ঠিক এই ছাঁদেই অন্যান্য দেবতার গায়ত্রী রচিত হয়েছে (১০।১।৫-৭)। এই দেবতাদের মধ্যে অবশ্য পৌরাণিক দেবতাও আছেন। সামবেদের গ্রামগেয় গানের প্রথমেই বিশ্বামিত্রের মন্ত্রটিকে স্থান দেওয়াতে বোঝা যায়, অতি প্রাচীন কাল হতেই এটিতে একটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। একে বিশেষ করে ব্যাহৃতিযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে বাজসনেয়সংহিতাতেও (৩৬।৩; তু. বৃ. ৬।৩।৩, মন্থকর্মে বিনিয়োগ)। এটাও এর গুরুত্বের একটা প্রমাণ।

[১৩৮] বাগ্ বৈ গায়ত্রী ১।

[১৩৯] কণ্ডিকা ৩, ৪। গায়ত্রীই প্রাণ, একথার উল্লেখ মূলে নাই। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনায় প্রাণের প্রাধান্য উপনিষদে বহুসম্মত। তু. এবমেবৈষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে, প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম (বৃ. ৫।১৪।৪)। প্রাণকে ধরেই বলা যেতে পারে, গায়ত্রী ষড়্‌বিধা (কণ্ডিকা ৫)।

[১৪০] ঋ. ১০।৯০।৩।

[১৪১] ঋক্‌সংহিতার বাক্ আর ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা মিথুনীভাবের কথা আছে (১০।১১৪।৮)। ব্রহ্ম স্বরূপত চেতনার বিস্ফারণ এবং বাক্ তারই স্ফূর্তি। সুতরাং বাক্ ব্রহ্মশক্তি। শক্তিমান্ ও শক্তি অভেদ। এখানেও তা-ই।

[১৪২] বৃহদারণ্যকে গায়ত্রীর এই তুরীয় পাদ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং, পরোরজা য় এষ তপতি (৫।১৪।৩)। সুতরাং গায়ত্রীর তুরীয় পাদ হল আদিত্য। আদিত্যে যে-পুরুষ, এই হৃদয়েও সেই পুরুষ। দুটি পুরুষই এক, একথা উপনিষদের অন্যত্র আছে (দ্র. ঈ. ১৬, তৈ. ৩।১০।৪...)। হৃদয়ের আদিত্যকে যোগীরা বলেন 'হার্দজ্যোতিঃ।' গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ হয়ে সাধককে পেঁ‍ৗছে দেন আদিত্যে। বৈদিক যজ্ঞসাধনার তা-ই তাৎপর্য।

[১৪৩] দ্র. দহরবিদ্যা, ছা. ৮।১।

[১৪৪] তু. ঋক্‌সংহিতার 'দেবীর্দ্বারঃ'; দ্র. আপ্রীসূক্ত ৩।৪।৫ টীকা।

[১৪৫] দ্র. কৌ. তৃতীয় অধ্যায়।

গতি তার বিপরীতে পিছনের দিকে। সুতরাং দুটিতে মেরুসম্বন্ধ (polarity) আছে। তেমনি আছে ব্যানে এবং সমানে: ব্যানের গতি বিচ্ছুরণে, আর সমানের গতি সংহরণে। পরস্পর চারটি গতির রেখাচিত্র তাহলে হতে পারে যোগচিহ্নের (+) মত। হৃদয় আছে দেহকাণ্ডের মধ্যদেশে। তাকে একটি গোলক কল্পনা করে তার সামনের দিকে স্থাপন করা যেতে পারে প্রাণের দ্বারকে। অপানের দ্বার হবে তাহলে পিছন দিকে। ডানদিকে যদি ব্যানের দ্বার হয়, তাহলে সমানের দ্বার হবে বাঁদিকে। আর গোলকের কেন্দ্র হতে উপরের দিকে হবে উদানের দ্বার।

এই প্রাণবৃত্তিগুলির সঙ্গে যথাক্রমে পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে যুক্ত করা হয়েছে। এগারটি ইন্দ্রিয়ের মাঝে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন পাঁচটি ইন্দ্রিয় বেছে নেওয়া হয়েছে—চক্ষু শ্রোত্র বাক্ মন এবং বায়ু।[১৪৬]

অধিদৈবতদৃষ্টিতে এই পঞ্চপ্রাণ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে পাঁচজন দেবতা—আদিত্য (সূর্য) চন্দ্রমা (সোম) অগ্নি পর্জন্য এবং আকাশ (দ্যৌঃ)। আদিত্য দিব্য জ্যোতি আর অগ্নি পার্থিব জ্যোতি; চন্দ্রমা দিব্য অমৃত, আর পর্জন্য তারই ধারাসার। এইভাবে দেবতাদের মাঝেও প্রাণবৃত্তির অনুরূপ মেরুসম্বন্ধ বুঝতে হবে।

উপাসনা করতে হবে অধ্যাত্মসাধন নিয়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবৃত্তিকে অবলম্বন করে। দেবতার আনুকূল্য অবশ্য তার পিছনে থাকবে এবং তার ফলে একেক উপাসনায় ব্রহ্মেরই একেকটি দিব্যবিভূতির অনুভব স্ফুরিত হবে। এই অনুভব আবার জীবনে অভ্যুদয়ের রূপ ধরবে। আদিত্যের অনুভবে লাভ হবে তেজ এবং অন্নাদত্ব (জড়ের আত্তীকরণ assimilation), চন্দ্রমার অনুভবে শ্রী এবং যশ (ঈশনা), অগ্নির অনুভবে ব্রহ্মবর্চস (মন্ত্রবীর্য) এবং অন্নাদত্ব, পর্জন্যের অনুভবে কীর্তি এবং ব্যুষ্টি (ঊষার আলোর ঝলমলানি), আকাশের অনুভবে ওজঃ এবং মহঃ (ব্যাপ্তিচৈতন্যের শক্তি)।

ব্রহ্মজ্যোতি যেমন লোকোত্তর এবং লোকাত্মক, তেমনি আবার দেহগতও। বিশ্বে ছড়িয়ে তাকে ছাড়িয়ে আবার তিনি গুটিয়ে এসেছেন এই হৃদয়ে। তাঁকে অনুভব করতে হবে হৃদয়েই, অনুভব করতে হবে ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবৃত্তি দিয়ে। অনুভবের দুটি রীতি—একটি আহরণ, আরেকটি বিসৃষ্টি। চক্ষু দিয়ে ব্রহ্মজ্যোতি এবং শ্রোত্র দিয়ে ব্রহ্মঘোষকে আমরা আহরণ করতে পারি হৃদয়ে; আবার হৃদয় থেকেই তাঁকে বিসৃষ্ট করতে পারি বাক্ এবং মন দিয়ে।[১৪৭] চক্ষু গ্রহণ করে রূপকে, শ্রোত্র অরূপকে; তাই চক্ষুর চাইতে শ্রোত্রের অনুভব সূক্ষ্ম। তেমনি বাকের চাইতে মনের বিসৃষ্টিও সূক্ষ্মতর।

আবার প্রাণের ধর্ম ব্যাপ্তি, অপানের ধর্ম সংহরণ।[১৪৮] তেমনি ব্যান আর সমানের বেলাতেও: ব্যানে ব্যাপ্তি, সমানে সংহরণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আধারে প্রাণাপানের ক্রিয়া

---

[১৪৬] বায়ু স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্যোতক। অন্য বিবরণে বায়ুর জায়গায় আছে প্রাণ। উদানের ক্রিয়া মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে স্পর্শস্রোতের মত অনুভূত হয়। তাই বায়ুর গতির সঙ্গে তার উপমা, একটা নলের ভিতর ফুঁ দিলে যেমন হয় তেমনি।

[১৪৭] এখানে সিদ্ধ বাক্ এবং সিদ্ধ মনের কথাই হচ্ছে। বাক্ আর মনকে সাধনরূপেও গ্রহণ করা যায়।

[১৪৮] এটি প্রশ্বাস এবং নিশ্বাসের বেলায় বোঝা যায়। নিশ্বাসে সংকোচ, প্রশ্বাসে প্রসার; একটিতে দেহের মাঝে গুটিয়ে আসা, আরেকটিতে দেহের বাইরে ছড়িয়ে পড়া।

উপরে-নীচে, আর ব্যান-সমানের ক্রিয়া পাশাপাশি; কিন্তু দুটি ক্রিয়ার ক্ষেত্রই বর্তুল। ঊর্ধ্বাধঃ-ক্রিয়াকে ভাবনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সামনে আর পিছনে। অর্থাৎ যোগচিহ্নের রেখাচিত্রটি পৃথিবীর উপরে লম্বভাবে না থেকে আছে যেন সমতলভাবে।

ব্যাপ্তি আর সংহরণের ক্রিয়াকে বোঝান যেতে পারে একটি কোণের রেখাচিত্র দিয়ে (<)। দুটি কোণকে বিপরীতমুখে স্থাপন করলে একটি পূরণচিহ্ন (×) হয়। এই পূরণচিহ্নটিকে যোগচিহ্নের উপর স্থাপন করলে যে-রেখাচিত্র হবে তাকে প্রাণাপান এবং ব্যান-সমানের গতির ছবি বলে ধরা যেতে পারে পারে। চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু হল হৃদয়।

ভাবনার সময় চক্ষুর্গ্রাহ্য আদিত্যজ্যোতিকে সামনের দিক্ থেকে আকর্ষণ করে যদি হৃদয়ের কেন্দ্রে সংহৃত করা যায়, তাহলে তা ওখানে এসে চিদগ্নির কন্দে পরিণত হয় এবং তাথেকে স্ফুরিত হয় বাক্ বা মন্ত্র। বাক্‌শক্তি বিপরীতমুখে হৃদয়ের পিছনদিকে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, অগ্নি রূপান্তরিত হন বৈশ্বানরে। সংহরণের ক্রিয়া অপান দিয়েই হয়, আর ব্যাপ্তির ক্রিয়া প্রাণ দিয়ে। প্রাণাপান তখন ওতপ্রোত হয়ে কাজ করে।

এইটি প্রাথমিক ভাবনা। এটি সিদ্ধ হলে পর অনুরূপ রীতিতে দ্বিতীয় ভাবনাটি করতে হয়। বায়ুর গতি তখন ডাইনে-বাঁয়ে। আদিত্যের ঊর্ধ্বে চন্দ্রমা,[১৪৯] দিনের আলোকে ছাপিয়ে রাতের নৈঃশব্দ্য। এই নৈঃশব্দ্যকে গ্রহণ করা যায় যে-ইন্দ্রিয় দিয়ে, তা-ই দিব্য শ্রোত্র। মহাশূন্যের ব্যাপ্তিতে যে-স্পন্দ আছে, তাকে অনুরূপ রীতিতে আকর্ষণ করে আনতে হয় হৃদয়ে। চন্দ্রমার অমৃতপ্লাবন সংহত হয় পর্জন্যে এবং তাথেকে স্ফুরিত হয় শিবসঙ্কল্পময় দিব্যমন।[১৫০] এই মনের শক্তি বামপথে ধারাসারে ছড়িয়ে পড়ে মহাশূন্যে। ঋক্‌সংহিতার ভাষায় পর্জন্য হলেন রেতোধা। প্রাণাপানের মত ব্যান-সমানও এখানে ওতপ্রোত হয়ে কাজ করে।

এই ক্রিয়াগুলি অনুলোম-বিলোম দুভাবেই করা যেতে পারে। অর্থাৎ যেমন দর্শন থেকে বাকে এবং শ্রবণ থেকে মননে যাওয়া যায়, তেমনি বাক্ থেকে দর্শনে এবং মনন থেকে শ্রবণেও যাওয়া চলে।

আরেকটি পথ হল হৃদয়ের কেন্দ্র হতে মূর্ধার দিকে।[১৫১] এই পথে উদানের গতি। তখন ইন্দ্রিয়কে বলা হয়েছে বায়ু,[১৫২] আর দেবতাকে আকাশ। সাধনার পক্ষে এই পথটি ধরাই প্রশস্ত। এই ধরে অন্যান্য ভাবনাগুলিও করা যায়।

ব্রহ্মজ্যোতিকে দেখা শোনা প্রাণ দিয়ে অনুভব করা, মনে এবং বাক্যে স্ফুরিত করাই দ্বারপা-উপাসনার সিদ্ধি।

তারপর চতুর্দশ খণ্ডে বিখ্যাত শাণ্ডিল্যবিদ্যা। ঋষি শাণ্ডিল্যের অনুশাসন : 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'—এই সব-কিছুই ব্রহ্ম, তাঁতেই তারা জন্মাচ্ছে তাঁতে লয় পাচ্ছে তাঁতেই বেঁচে আছে—এই জেনে শান্ত হয়ে উপাসনা

[১৪৯] দ্র. ছা. ৪।১৫।৫
[১৫০] দ্র. ঋ. খিল ৪।১১
[১৫১] দ্র. ক. ২।৩।১৬
[১৫২] এইটিই অন্যত্র মুখ্য প্রাণ।

করবে।[১৫৩] 'ক্রতু' বা চিন্ময় সৃষ্টিসামর্থ্যের দ্বারা অন্তরে ব্রহ্মবোধকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে : 'ব্রহ্ম আত্মচৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন আমার হৃদয়ে, অণোরণীয়ান্ আবার মহতো মহীয়ান্ হয়ে; ইনি মনোময় প্রাণশরীর চিজ্জ্যোতিঃস্বরূপ, ইনি সত্যসঙ্কল্প সর্বকর্মা সর্বকাম সর্বগন্ধ সর্বরস সর্বব্যাপ্ত; আবার ইনি আকাশাত্মা অবাকী অনাদর, প্রেতিতে অর্থাৎ মর্ত্যভাবকে অতিক্রম করবার পর আমি এঁকেই পাব।'[১৫৪]

পঞ্চদশ খণ্ডে কোশবিদ্যা। সর্বগত ব্রহ্মকে এখানে কোশরূপে ভাবনা করা হচ্ছে। কোশ অর্থে যার মাঝে কিছু রাখা যায়। এখানে কল্পনাটি একটি হাঁড়ির। হাঁড়ির তলা হল পৃথিবী, পেট অন্তরিক্ষ, আর গলা দ্যুলোক। তার কোণগুলি হল দিক্।[১৫৫] পূব হতে দক্ষিণাবর্তে ঘুরে গেলে যথাক্রমে চারটি দিকের নাম জুহূ সহমানা রাজ্ঞী এবং সুভূতা।[১৫৬] এই চারিটি দিক্‌শক্তির সঙ্গমস্থলে আছেন বায়ু, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁকে বলি প্রাণ। ব্রহ্মকোশ 'বসুধান' অর্থাৎ জ্যোতিতে পূর্ণ।[১৫৭] শক্তির দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তা প্রাণে পূর্ণ। জ্যোতির্ময় প্রাণই অজর এবং অমৃত। ব্রহ্মকোশ তাই 'অরিষ্ট' অর্থাৎ জরা-মৃত্যুর দ্বারা অহিংসিত। আলোঝলমল খগোলের উত্তরার্ধে

---

[১৫৩] এখানে ব্রহ্ম বিশ্বাত্মক। কিন্তু তাবলে তিনি বিশ্বেই নিঃশেষিত নন, তাকে ছাপিয়েও তিনি আছেন। ব্রহ্মের লক্ষণ বলতে গিয়ে এর পরেই শাণ্ডিল্য বলছেন, তিনি আকাশাত্মা অবাকী অনাদর অর্থাৎ আকাশের মতই শূন্য নিস্তব্ধ নিরাগ্রহ। এটি তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপের বর্ণনা। তিনি বিশ্বাত্মক হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ—এ-ভাবটি সর্বত্র। ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্তেও দেখি তা-ই [১০।৯০।১, ৩]। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কল্পিত Pantheism বেদান্তের কোথাও নাই। শাণ্ডিল্যের সর্ব-ব্রহ্মবাদের পাশাপাশিই হল যাজ্ঞবল্ক্যের নেতিবাদ (তু. বৃ ২।৩।৬; দ্র. ২।৪)। এই দুইটি হল বেদান্তের দুটি মুখ্য ধারা যা যথাক্রমে দার্শনিক পরিণামবাদে ও বিবর্তবাদে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু নেতিবাদের উপর জোর দিলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। সাধকের কাছে একসময় তা হয়ও। কিন্তু তাথেকে জগতের ঐকান্তিক মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না। আবার ব্রহ্মের এক পাদেই জগৎ, আর তিন পাদে জগৎ নাই—একথাও সত্য। কিন্তু তাতেও জগতের ঐকান্তিক মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না, এক পাদে জগতের সত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। আসল ধাঁধা হচ্ছে মনের, বিজ্ঞানের নয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মক। এতে অন্যোন্যবিরোধের কিছুই নাই। তাঁকে বিশ্বোত্তীর্ণরূপে জানতে গেলে জগৎ ছাড়িয়ে যেতেই হয়; তখনই নেতিবাদের প্রয়োজনীয়তা। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখি, তিনিই সব হয়েছেন; তখন পাই সর্বব্রহ্মবাদ। উত্তরণের বেলায় নেতিবাদ, যার পর্যবসান বুদ্ধের সর্বশূন্যতায়; আর অবতরণের বেলায় সর্বব্রহ্মবাদ, যা তারই পরিপূরক। প্রসিদ্ধি আছে, শাণ্ডিল্য ভক্তিধর্মের প্রবর্তক। ভক্তিমার্গের বেদান্তে পরিণামবাদই স্বীকৃত।

[১৫৪] প্রেতি লৌকিক অর্থে মৃত্যু; কিন্তু রাহস্যিক অর্থে চেতনার উত্তরণ। উপনিষদে এই অর্থও গ্রহণ করতে হবে, নতুবা অধ্যাত্মবিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হবে না।

[১৫৫] আকাশের শক্তি দিক্। আকাশ সর্বব্যাপী, স্থাণু। তার শক্তিস্পন্দনের যে-গতিরেখা, তা-ই হল দিক্। অধিভূতদৃষ্টিতে দিক্ নিরূপিত হয় আদিত্যের গতির দ্বারা।

[১৫৬] নামগুলিতে সাধনজীবনের পরিচয় আছে। আর্যেরা জ্যোতিরগ্র (ঋ. ৭।৩৩।৭), তাঁরা সবসময় আলোর দিকে মুখ করে আছেন, তার উদ্দেশে আত্মাহুতি দেবেন বলে। আত্মাহুতিই যজ্ঞ। যজ্ঞে হোমদ্রব্য আহুতি দেওয়া হয় জুহূর দ্বারা। সুতরাং 'জুহূ' উৎসর্গের প্রতীক। সূর্য অস্ত যান পশ্চিমে। আগেই বলেছি, এটা তাঁর ঘরে যাওয়া। দিনের আলো মিলিয়ে যায় রাত্রির আঁধারে, মিত্রের বিশ্রাম বরুণে। কিন্তু মিত্র আর বরুণ দুজনেই আদিত্য। দুয়ের মাঝে বরুণ হলেন রাজা। আঁধার হতেই আলোর উৎসারণ, আবার আঁধারেই তার নিমজ্জন। আত্মাহুতিতে যে-আলো জ্বলেছিল, তারও নির্বাণ ঘটবে ঐ মহাশূন্যের আঁধারে। আঁধারই আলোর 'রাজা' বা প্রশাস্তা। আবার দক্ষিণগামী আদিত্য জরাগ্রস্ত। সেই জরার বাধা ঠেলে তাঁকে উত্তরে যেতে হয়। সহ্ ধাতুর প্রাচীন অর্থ ছিল বাধা ঠেলা, বিরুদ্ধ শক্তিকে অভিভূত করা। দক্ষিণ দিকে থাকলে 'সহমান' হয়ে তা-ই করতে হবে। উত্তরে যেতে পারলে তবে চেতনা 'সুভূত' বা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

[১৫৭] বসুর প্রাচীন অর্থ জ্যোতি, < √ বস্ (আলো দেওয়া)।

প্রতিদিন এই ব্রহ্মকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তাঁকে আশ্রয় করেই চেতনা লোক হতে লোকান্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে। তিনটি লোক—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অথবা পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌঃ। আবার চেতনারও ক্রমসূক্ষ্ম তিনটি পর্ব—লোকচেতনা দেবচেতনা ও বেদ-চেতনা। একেকটি লোকে একেকটি চেতনার প্রাধান্য। পৃথিবীতে চেতনা লৌকিক, অন্তরিক্ষে দেবময়, আর দ্যুলোকে প্রজ্ঞানময়। কিন্তু প্রত্যেক লোকেই অন্য লোকের অনুপ্রবেশ আছে। এই জেনে 'সর্বভাবেন' ব্রহ্মকোশের শরণ নিতে হবে।[১৫৮]

তারপর ষোড়শ আর সপ্তদশ খণ্ডে পুরুষযজ্ঞবিদ্যা। ভাবনা করতে হবে, সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ। যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সোমযাগ। পাঁচদিন ধরে যাগ হয়। আসল যাগ শেষের দিনে, আর চারদিন তার উদ্যোগপর্ব। প্রথম দিনে দীক্ষা, তার পরের তিন দিনের প্রধান যাগ হল উপসৎ।[১৫৯] পঞ্চমদিনে 'সুত্যা' বা সোমলতা ছেঁচে রস বার করবার দিন। তিনবার ছেঁচতে হয়, সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের নাম তাই প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয়সবন। এই দিনই স্তোত্রগান এবং শস্ত্র-পাঠ করতে হয়। সোমযাগের দ্বারা যজমান দিব্যজন্ম লাভ করে, অমৃত হয়।[১৬০] তারপর সোমলিপ্ত পাত্রগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, তাকে বলে 'অবভৃথ'।[১৬১] অবশেষে দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ শেষ করতে হয়।

উপনিষৎ জীবনযাত্রার সঙ্গে এই যজ্ঞাঙ্গগুলিকে মিলিয়ে দিয়ে বলছেন, সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ। জীবনের কৃচ্ছ্রতাই দীক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্যই উপসৎ, আনন্দ আর ভালবাসাই স্তোত্র-শস্ত্র, সন্তানের জন্মই নিজের নবজন্ম, আর মরণই অবভৃথ। সারা-জীবন ধরে যে তপঃ দান আর্জব অহিংসা ও সত্যের আচরণ, তা-ই দক্ষিণা। প্রাণের উপাসনাতেই অমৃতত্বলাভ হয়। সোমযাগের তিনটি সবনের মত জীবনকেও তিন ভাগ করে নিতে হবে। প্রথম ভাগ চব্বিশ বছর পর্যন্ত। তখন জীবনের ছন্দ হল গায়ত্রী, তার অধিষ্ঠাতা বসুগণ। দ্বিতীয় ভাগ আরও চুয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত—ছন্দ ত্রিষ্টুপ, অধিষ্ঠাতা রুদ্রগণ। তৃতীয় ভাগ আরও আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত—ছন্দ জগতী, অধিষ্ঠাতা আদিত্যগণ।[১৬২]

এই অভিনব যজ্ঞবিদ্যা আঙ্গিরস ঘোর দিয়েছিলেন দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে। অনুশাসন শুনে কৃষ্ণ 'অপিপাস'[১৬৩] অর্থাৎ নিঃস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন। ঋষি আরও বলেছিলেন,

---

[১৫৮] এই কোশবিদ্যা শাণ্ডিল্যবিদ্যারই প্রপঞ্চন।

[১৫৯] এর কথা আগেই বলেছি। আসলে এটি অসুরবিজয় বা অবিদ্যানাশের সাধনা। 'উপনিষৎ' সংজ্ঞার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে।

[১৬০] তু. ঋ. অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ৮।৪৮।৩। প্রথম দিনের দীক্ষণীয়েষ্টিতেই যজমানকে নবজন্মের জন্য গর্ভস্থ ভ্রূণের অভিনয় করতে হয়। (দ্র. ঐ. ব্রা. ১৩)।

[১৬১] ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'নীচের দিকে বয়ে নিয়ে যাওরা' অর্থাৎ ভাটার স্রোতে ভেসে যাওরা। এটি স্পষ্টতই রূপক। আসলে এখন থেকে অমৃতজ্যোতির স্রোতে ভেসে চলা। তু. বৌদ্ধ 'স্রোতাপত্তি'। দুর্গোৎসবও হয় পাঁচদিন ধরে। ষষ্ঠীতে সংকল্প আর বিজয়াতে বিসর্জন।

[১৬২] বসুগণ উন্মিষন্ত জ্যোতি, উষার আলোর মত। দুয়েরই এক ব্যুৎপত্তি। যাস্কের মতে বসুরা ত্রিস্থানদেবতা—অগ্নি ইন্দ্র আদিত্য সবাই বাসব (নি. ১২।৪১)। একই বিশ্বপ্রাণের আলো ফুটছে আদিত্যের উপচীয়মান দীপ্তি হয়ে। জীবনকে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তারই ছন্দে গাঁথতে হবে। এই হল উপনিষৎ। এইটিই গীতার জ্ঞানযজ্ঞ (৪।৩৩)।

[১৬৩] 'অপিপাস' বিশেষণটি এই ছান্দোগ্যেই অন্যত্র আত্মার বেলায় প্রযুক্ত হয়েছে (৮।১।৫, ৭।১, ৩)। পিপাসা বা কামনার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এই কথাটির গীতায় খুব বেশী জোর দেওরা হয়েছে।

'মৃত্যুকালে আত্মাকে সম্বোধন করে এই তিনটি মন্ত্র জপ করবেঃ তুমি অক্ষিত (অক্ষয়), তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত (বিশ্বপ্রাণের আবেশদ্বারা সম্যক্ তীক্ষ্ণীকৃত)।' বলে এই দুটি ঋকের উল্লেখ করেছিলেনঃ 'তারপর তাঁরা সর্বাদি সেই বিশ্ববীজের ঝলমল জ্যোতিকে দেখেন যা দ্যুলোকের ওপারে জ্বলছে।[১৬৪] আমরা উন্মুখ হয়ে তমিস্রার ওপারে উত্তরজ্যোতিকে দেখতে-দেখতে, তারও পরে স্বর্জ্যোতিকে দেখতে-দেখতে দেবগণের মাঝে দীপ্যমান সেই সূর্যে গেলাম, যিনি উত্তম জ্যোতিঃ'।[১৬৫]

তারপর অষ্টাদশ খণ্ডে মনোবিজ্ঞান। মনকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করতে হবে। আমার মাঝে যেমন মন, বাইরে তেমনি আকাশ—দুইই ব্রহ্ম। সুতরাং আমার মনশ্চেতনা আকাশবৎ। এই ভাবনায় ব্রহ্মবিজ্ঞান হবে।[১৬৬]

মন চতুষ্পাৎ। তার চারটি পাদ হল বাক্ প্রাণ চক্ষু এবং শ্রোত্র।[১৬৭] এদের প্রত্যেককে দিব্য জ্যোতিতে ভাস্বর এবং তপস্বান্ বলে ভাবনা করতে হবে। ভাবতে হবে : আমার বাক্ অগ্নিময়, আমার প্রাণ বায়ুময়, আমার চক্ষু আদিত্যপ্রভাময়, আমার শ্রোত্র দিঙ্ময়। এতেই মনশ্চেতনা আকাশের মত ব্রহ্মময় হবে।[১৬৮]

তারপর ঊনবিংশ খণ্ডে আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই একটি আদেশ। আদিত্যের আবির্ভাব হয়েছে এইভাবে : প্রথম সবই ছিল 'অসৎ'; তারপর

---

[১৬৪] ঋ. ৮।৬।৩০।

[১৬৫] ঋ. ১।৫০।১০। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর *Early History of the Vaishnava Sect*এ (Calcutta, 1936) দেখিয়েছেন, ছান্দোগ্যের এই যজ্ঞবিদ্যার সঙ্গে গীতোক্ত দর্শনের এইসব বিষয়ে সাদৃশ্য আছে ঃ গীতায় দ্রব্যযজ্ঞের চাইতে জ্ঞানযজ্ঞকে বড় বলা হয়েছে (৪।৩৩); উপনিষদে যেগুলিকে দক্ষিণা বলা হয়েছে, গীতায় সেগুলিকে দৈবসম্পদের অন্তর্গত করা হয়েছে, দুই ক্ষেত্রেই সংজ্ঞাগুলির আক্ষরিক মিল পর্যন্ত আছে (১৬।৩); উপনিষদের মৃত্যুবিজ্ঞান আর গীতার মৃত্যুবিজ্ঞানেও এইধরনের মিল দেখা যাচ্ছে (৮।৫-১০)। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করছেন, ছান্দোগ্যের এই দেবকীনন্দন কৃষ্ণ আর ভাগবতের বাসুদেব কৃষ্ণ এক (78-83)। রায়চৌধুরীর সিদ্ধান্ত খুবই সমীচীন বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় ঃ গোঁড়া বেদবাদীদের প্রতি কৃষ্ণের ঘোর অবজ্ঞা (২।৪১-৪৪); বিজ্ঞান তাঁর কাছে প্লাবনের মত বিশাল, আর বেদ তার কাছে একটা ডোবা মাত্র (২।৪৬); অথচ বেদের রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন, তিনিই বেদান্তকৃৎ (১৫।১৫); যজ্ঞকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন (১৮।৫), কিন্তু তাকে একেবারে নতুনভাবে এক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন (৪।২৩-৩২)। ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যেই যজ্ঞের সার্থকতা নয়, একথা তিনি জোরের সঙ্গেই বলছেন। এর উলটা পিঠের কথা হল, সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ, যা ঘোর আঙ্গিরস তাঁকে শিখিয়েছিলেন। এইটাই নতুন উপনিষৎ বা নতুন বেদান্ত। তাই কৃষ্ণ নিজেকেই বেদবিদ্ এবং বেদান্তকৃৎ বলে ঘোষণা করেছেন। আরও লক্ষণীয়, শতপথব্রাহ্মণে 'নারায়ণে'র উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যে 'পাঞ্চরাত্র' যজ্ঞের বিবরণ আছে, তার নাম পুরুষমেধ। ভাগবতধর্মের যাজ্ঞিক রূপ তারই মাঝে পাই। আঙ্গিরসও কৃষ্ণকে যে-বিদ্যা দিচ্ছেন, তার নাম পুরুষযজ্ঞবিদ্যা।

[১৬৬] এখানে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দুটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যাত্ম তা-ই যা আমার মাঝে আছে; আর অধিদৈবত তা-ই যা আমার বাইরে অথচ চিন্ময়। বাইরের বিষয়কে যদি চিন্ময় বলে ভাবনা না করি, তাহলে তা অধিভূত (phenomenal) মাত্র। এটা হল প্রাকৃতদৃষ্টি। বাইরটা এক দিব্যচেতনারই প্রকাশ, এই হল বিজ্ঞানদৃষ্টি বা অধিদৈবতদৃষ্টি। বাইরে-ভিতরে একই দিব্যচেতনার প্রকাশ—এই বোধে অধ্যাত্ম আর অধিদৈবত দৃষ্টি মিলে গিয়ে বোধ পূর্ণাঙ্গ হয়। তাই অধ্যাত্মের পাশেই অধিদৈবতের উপদেশ উপনিষদের বহু জায়গায় পাওয়া যায়।

[১৬৭] ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপালকে আবার পাচ্ছি।

[১৬৮] চিন্ময় বিশ্বপ্রাণই বায়ু। দিব্য শ্রোত্র ব্রহ্মঘোষকে গ্রহণ করে। তন্ত্রে তাকে বলা হয়েছে নাদ। এই ঘোষ আকাশের স্পন্দ। স্পন্দ যেন একটি কেন্দ্র হতে কদম্বকেশরের মত বিচ্ছুরিত হয়। বিচ্ছুরণের রেখাগুলিই দিক্। এই প্রসঙ্গে তু. ঋ. ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ, স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ (১।৮৯।৮) এখানে 'স্তুতি' বাক্ এবং 'আয়ু' প্রাণ। এটি দিব্য জীবনায়নের ছবি। আরও তু. ঋ. দিশঃ শ্রোত্রাৎ ১০।৯০।১৪।

তা হল 'সৎ'; তাথেকে 'অণ্ডের সম্ভূতি'; সেই অণ্ডকে নির্ভিন্ন করে আদিত্যের আবির্ভাব।[১৬৯]

তৃতীয় অধ্যায়ের এইখানে শেষ।

চতুর্থ অধ্যায়ে সতেরটি খণ্ড। প্রথম তিন খণ্ডে আছে রৈক্ক ও জানশ্রুতির উপাখ্যান। রৈক্ক জানশ্রুতিকে যে-উপদেশ দেন, তার নাম সংবর্গবিদ্যা।[১৭০] সংবর্গ মানে লয়স্থান। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ সংবর্গ, আর অধিদৈবতদৃষ্টিতে বায়ু। সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয় হয় প্রাণে—যেমন সুপ্তিতে; তেমনি সব আলো মিলিয়ে যায় বায়ুতে, জলও শুকিয়ে বায়ুতে মিশে যায়। তেমনি করে আত্মপ্রাণকে বিশ্বপ্রাণে মিশিয়ে দিতে পারলেই অমৃত হওৱা যায়।[১৭১] রৈক্ক এক ব্রহ্মচারীর কাহিনী দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, যিনি এই মহাপ্রাণের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন, তিনি অন্নাদ, তিনি সর্বভুক্, কারও দ্বারা সম্ভুক্ত নন।[১৭২]

তারপর চতুর্থ হতে নবম খণ্ড পর্যন্ত সত্যকাম জাবালের ব্রহ্মবিদ্যালাভের কাহিনী। তাঁর আচার্য হলেন হারিদ্রুমত গৌতম। সত্যকামের মা ছেলে কোন্ গোত্রের তা জানতেন না, তাই তাঁর নিজের নামেই ছেলেকে আচার্যের কাছে পরিচয় দিতে বললেন। এটা লজ্জার কথা। কিন্তু সত্যকাম অসঙ্কোচে আচার্যের কাছে সত্য কথাই বললেন। আচার্য বললেন, 'ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারত না। তুমি সমিধ নিয়ে এস, তোমাকে আমি উপনয়ন দিচ্ছি। তুমি সত্য হতে বিচ্যুত হওনি।'[১৭৩]

সত্যকাম গরু চরাবার সময় অলৌকিক উপায়ে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের একেকটি পাদের জ্ঞান তিনি পান ষাঁড় আগুন হাঁস আর পানকৌড়ির কাছ থেকে। পূর্বে পশ্চিমে দক্ষিণে উত্তরে দিকে-দিকে ব্রহ্ম 'প্রকাশ'রূপে আবির্ভূত। এই হল ব্রহ্মের প্রথম পাদ। পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোক এবং সমুদ্রের 'অনন্ত' বিস্তারে ব্রহ্মের আবির্ভাব, এই তাঁর দ্বিতীয় পাদ। অগ্নি সূর্য চন্দ্র এবং বিদ্যুতের 'জ্যোতি'তে তিনি স্ফুরিত, এই তাঁর তৃতীয় পাদ। প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন তাঁরই 'আয়তন', এই হল ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ।[১৭৪]

---

[১৬৯] তু. ঋ. অঘমর্ষণ সূক্ত (১০।১৯০); অসৎ হতে সতের আবির্ভাব ঋ. ১০।৭২।২, ৩; ১২৯।৪) অণ্ড এখানে অব্যক্ত মহাপ্রকৃতি বা ব্রহ্মযোনি; ঋক্‌সংহিতায় তিনিই অদিতি, আদিত্য তাঁর পুত্র (তু. ঋ. ১০।৭২।৫, ৮, ৯)। অসৎ > সৎ > সম্ভূতি > আদিত্য; সুতরাং বিলোমক্রমে আদিত্যব্রহ্মও চতুষ্পাৎ। তাঁর একপাদ ব্যক্ত, আর ত্রিপাদ অব্যক্ত (তু. ঋ. পুরুষসূক্ত ১০।৯০।৩, ৪) আদিত্যোপাসনাই বৈদিক সাধনার সার।

[১৭০] রৈক্ক জানশ্রুতিকে দুবার শূদ্র বলে সম্বোধন করেন। ব্রহ্মসূত্রকারের মতে শূদ্র এখানে একটা গালি, জানশ্রুতি জাতিশূদ্র নন (১।৩।৩৪-৩৫)।

[১৭১] এই ভাবটি কৌষীতক্যুপনিষদে অনেক বিস্তৃত করে বোঝানো হয়েছে।

[১৭২] ঈশোপনিষদে দেখি, আদিত্যের সঙ্গে সাযুজ্যে সিদ্ধ পুরুষের কাছে বায়ু 'অনিল অমৃত' (১৭)। ঋক্‌সংহিতায় বায়ুর উত্তম স্বরূপ হল 'মাতরিশ্বা' বা অদিতিতে ফেঁপে-ওঠা বিশ্বপ্রাণের উচ্ছ্বাস (দ্র. 'মাতরিশ্বা' ৩।২।১৩ টীকা)।

[১৭৩] সত্যকামকে ব্রহ্মবাদিরূপে যজ্ঞাঙ্গবিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে দেখা যায় ঐতরেয় (৮।৭) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে ১৩।৫।৩।১)। এই উপনিষদেই তাঁকে অক্ষিপুরুষ এবং উত্তরায়ণগতির প্রবক্তারূপে পাচ্ছি পরের খণ্ডগুলিতে এবং প্রাণবিদ্যার প্রবক্তারূপে পরের অধ্যায়ে (৫।২।৩)।

[১৭৪] জীবনের নানা জটিলতায় উদ্‌ভ্রান্ত না করে নিজেকে নির্জনে প্রকৃতির কোলে ছড়িয়ে দিতে পারলে ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ অনায়াসে স্ফুরিত হতে পারে, এই হল সত্যকামের সহজসাধনের রহস্য।

ব্রহ্মজিৎ সত্যকামের মুখে-চোখে এক দিব্যবিভা দেখে আচার্য আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে তোমাকে উপদেশ দিল?' সত্যকাম বললেন, 'মানুষে নয়। তবুও আপনি বলুন। শুনেছি, আচার্যের কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করলেই সবচাইতে ভাল।' আচার্য যখন তাঁকে উপদেশ দিলেন, সত্যকাম দেখলেন, তিনি একই কথা বলছেন।

এই সত্যকামের শিষ্য হলেন উপকোসল কামলায়ন। তাঁর আত্মবিদ্যা আর অগ্নিবিদ্যা লাভের কাহিনী বলা হয়েছে পঞ্চদশ খণ্ড পর্যন্ত পরের ছয়টি খণ্ডে।

উপকোসল বার বছর ধরে গুরুর অগ্নির পরিচর্যা করলেন, তবুও আচার্য তাঁকে কিছু বললেন না। সত্যকামের স্ত্রী বললেন, 'আহা, বেচারীকে কিছু বল না গো।' সত্যকাম তবুও কিছু না বলেই বিদেশে চলে গেলেন। উপকোসল মনের দুঃখে উপবাস দিতে শুরু করলেন, আচার্যপত্নীর অনুরোধেও কিছু খেলেন না। অগ্নিরা তখন সদয় হয়ে তাঁকে বললেন, 'দেখ, প্রাণই ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম।' উপকোসল বললেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম তা বুঝলাম, কিন্তু কং আর খং কি তা তো জানি না।' অগ্নিরা বললেন, 'যা কং, তা-ই খং। যা খং, তা-ই কং।' বলে প্রাণ আর তাকে জড়িয়ে যে-আকাশ তার কথাও বললেন।[১৭৫]

এখানে আমরা দুটি মিথুনের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। একটি প্রাণ এবং আকাশ, আরেকটি কং এবং খং। তাহতে ভাবনার দুটি সূত্র পাওয়া যাবে। প্রাণকে প্রাণবায়ু-রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। অথবা প্রাণক্রিয়ার অনুভবরূপেও তাকে গ্রহণ করা চলে। প্রতিটি নিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণের অনুভূতি মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, ভাবনার এই হল একটি ধারা। আবার কং মানে সুখ, খং মানে শূন্য। সুখে চিত্ত বিশ্রান্ত হয়। সেও তো শূন্যতা। যে-কোনও সুখের অনুভূতি চেতনাকে শূন্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এই হল ভাবনার আরেকটি ধারা। দুটি মিথুনের মধ্যে প্রাণ এবং কং হল অধ্যাত্ম, আর আকাশ এবং খং হল অধিদৈবত। অধ্যাত্মকে অধি-দৈবতে মিলিয়ে দেওয়া, আবার অধিদৈবতকে দিয়ে অধ্যাত্মকে আবিষ্ট জারিত এবং সন্দীপ্ত করা—এই হল সাধনার মূলসূত্র। একে নানা জায়গায় প্রাণাপানের ছন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর অগ্নিরা উপকোসলকে পৃথক্-পৃথক্ উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। তিনটি অগ্নি—গার্হপত্য অগ্নি মানুষের, অন্বাহার্যপচন বা দক্ষিণ পিতৃগণের, আর

প্রথমে চেতনায় বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রকাশ (মুণ্ডকে একেই বলা হয়েছে 'আবিঃ' ২।২।১), তারপর তার সম্প্রসারণ, তারপর ভোরের আকাশ যেমন ক্রমে আলোতে পুরে ওঠে তেমনি করে জ্যোতির সন্দীপন—এই পর্যন্ত সাধনার আশ্রয় হল অধিদৈবত। তারপর এই অস্তি ব্যাপ্তি আর ভাতি ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনে নিরূঢ় হয়ে আধারকেও দিব্য করে তোলে, এই হল অধ্যাত্মসিদ্ধি।

[১৭৫] প্রাণ ব্রহ্ম, একথা আমরা বারবার পাচ্ছি। জরা এবং মৃত্যুতে ব্যষ্টিপ্রাণের অবক্ষয় আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাই। অথচ আত্মা এ-অবক্ষয়কে স্বীকার করতে চায় না। অজর ও অমৃত হওয়ার পিপাসা তার শাশ্বত। কোথায় সেই অজর এবং অমৃত প্রাণের উৎস? আদিত্যে। আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? আকাশে। মহাশূন্যে আদিত্যের নিত্যদীপ্তি, এই ভাবনায় আমরা অজর এবং অমৃত হতে পারি। দেহস্থ প্রাণের অবক্ষয় তবুও অনিবার্য, মরতে আমাদের হবেই। কিন্তু বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে আত্মা এক চরম প্রদ্যোতনায় ঐ আদিত্যে এবং সেখান হতে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। অমৃতত্বের আশ্বাস এইখানেই। এই ভাবনাকে জীবনের প্রতিমুহূর্তে বহন করে চলাই আমাদের পুরুষার্থ। উপকোসলের উপাখ্যানে এই তত্ত্বটিই বিবৃত হয়েছে।

আহবনীয় দেবগণের। মানুষের আশ্রয় অন্ন বা জড়, পিতৃগণের প্রাণ, আর দেবগণের বিজ্ঞান বা চিৎ। সুতরাং গার্হপত্য অগ্নি হলেন জড়ের অধিষ্ঠাত্রী চিৎশক্তি, দক্ষিণ প্রাণের, আর আহবনীয় বিজ্ঞানের। অধিদৈবতদৃষ্টিতে এঁদের একেকটি স্বধাম আছে, সেখানে তাঁরা 'পুরুষ' বা চিদ্‌ঘনবিগ্রহ। গার্হপত্য অগ্নি হলেন আদিত্য-পুরুষ, দক্ষিণ চন্দ্র-পুরুষ আর আহবনীয় বিদ্যুৎ-পুরুষ।[১৭৬]

এই ধামগুলিতে পৌঁছতে হবে ধাপে-ধাপে। আদিত্যে পৌঁছবার প্রথম ধাপ হল পৃথিবী। দ্বিতীয় ধাপ অগ্নি, যিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠানচৈতন্য। তৃতীয় ধাপ হল অন্ন বা বিশ্বজড়শক্তি (universal matter)।[১৭৭] তেমনি চন্দ্রে পৌঁছবার ধাপ হল অপ্ দিক্ এবং নক্ষত্র।[১৭৮] আর বিদ্যুতে পৌঁছবার ধাপ হল প্রাণ আকাশ এবং দ্যৌঃ।[১৭৯]

উপদেশের শেষে অগ্নিরা বললেন, 'আমরা তোমাকে অগ্নিবিদ্যা আর আত্মবিদ্যার কথা বললাম, এখন আচার্য তোমাকে গতির কথা বলবেন।'[১৮০] সত্যকাম প্রবাস থেকে ফিরে উপকোসলকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত ঝলমল করছে! কে তোমায় উপদেশ দিলেন?' উপকোসল একটু ইতস্তত করে সব খুলে বললেন। শুনে সত্যকাম বললেন, 'অগ্নিরা তোমায় লোক বা চেতনার বিভিন্ন ভূমির কথাই বলেছেন। আমি তোমায় সাধনার সঙ্কেত বলে দিচ্ছি।'

'এই যে অক্ষিতে পুরুষ দেখা যায়, তিনিই আত্মা।[১৮১] তিনি অমৃত, তিনি অভয়, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অপরামৃষ্ট। তিনি সংযদ্‌বাম—সমস্ত বাম বা কল্যাণ তাঁতেই কেন্দ্রীভূত; তিনি বাম-নী—সমস্ত কল্যাণের নায়ক; তিনি ভাম-নী—সমস্ত জ্যোতির নায়ক।'[১৮২]

---

[১৭৬] আদিত্যের ওপারে চন্দ্র, চন্দ্রের ওপারে বিদ্যুৎ—এইভাবে এখানে চিদ্‌ভূমির স্তরবিন্যাস করা হয়েছে। সাধারণত এই বিন্যাস একটু অন্যরকমের—অগ্নি বিদ্যুৎ আদিত্য চন্দ্রমা এবং নক্ষত্র। মেঘলোকের বিদ্যুৎ সেখানে লক্ষ্য। সে-বিদ্যুৎ প্রাণচেতনার। আর এখানকার বিদ্যুৎ বিজ্ঞানচেতনার। এই বিদ্যুতের কথায় অথর্বসংহিতায় ভৃগ্বঙ্গিরাঃ বলছেন, 'রিস্ম তে ধাম পরমং গুহায়ৎ সমুদ্রে অন্তর্নিহিতাসি নাভিঃ (১।১৩।৩)। আন্তরিক্ষ বিদ্যুতের প্রসঙ্গও সেখানে আছে। তিনটি পুরুষকে তৈত্তিরীয়োপনিষদের পরিভাষানুসারে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানচৈতন্য আনন্দচৈতন্য এবং আত্ম-চৈতন্য (২।৪-৬)।

[১৭৭] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পৃথিবী হল দেহ। এটিকে আমরা স্থূলবোধেই পাই। দেহকে ধরে আছে তাপ। এইটিই সূক্ষ্মবোধগম্য অগ্নি। এই অগ্নি আবার এসেছে এক অব্যক্ত কারণ হতে, তা-ই জড়শক্তি। এই শক্তি আদিত্যচেতনার শক্তি। এমনি করে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং চৈতন্য এই ক্রমানুসারে তত্ত্বগুলিকে এখানে সাজানো হয়েছে।

[১৭৮] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অপ্ হল নাড়ীসঞ্চারী প্রাণস্রোত। তার মূলে আছে দিক্‌শক্তির প্রেরণা বা নিগূঢ় চৈতন্যের দেশনা। তারও গভীরে বহু হওবার কামনায় চিৎশক্তির পরিকীর্ণতা। যখন চাঁদ থাকে না তখনও নক্ষত্র থাকে, এই দৃষ্টিতে চন্দ্রের পর নক্ষত্র। নক্ষত্রেরা চন্দ্র বা আনন্দচেতনারই স্ফুলিঙ্গ, এই দৃষ্টিতে এখানে তারা চন্দ্রের আগে।

[১৭৯] এই প্রাণ চিন্ময়, আকাশেরই স্ফূর্তি। ব্যাপ্তির ভাবনা এখানে মুখ্য। নাড়ীস্রোতের সঙ্গে এইখানে তার তফাত। আর দ্যৌঃ যেন অব্যক্ত জ্যোতিঃশক্তির পারাবার।

[১৮০] এই গতি হল মৃত্যুর পর উত্তরায়ণের গতি। কিন্তু জীবনে তার ভাবনা না করলে মৃত্যুকালে তা আয়ত্ত হয় না।

[১৮১] দ্র. ১।৭।৫। এই অক্ষিপুরুষ বা চাক্ষুষপুরুষের কথা অন্যত্রও আছে : ছা. ৮।৭।৪; বৃ. ২।৫।৫, ৩।৭।১৮, ৪।৪।১; মৈত্রি. ৬।৬, ৭, ৭।১১। আদিত্যপুরুষ আর অক্ষিপুরুষ এক। অক্ষিপুরুষ বস্তুত দৃষ্টির দ্রষ্টা।

[১৮২] দর্শনের ভাষায় বাম আনন্দ, আর ভাম চিৎ। এখানে নাড়ীবিজ্ঞানের আভাস আছে। অক্ষি-পুরুষের তিনটি বিশেষণ দিয়ে সূচিত হচ্ছে ভ্রূমধ্যস্থ একটি ত্রিবেণী। তার বাঁয়ে বামধারা আর

'ব্রহ্মকে এইভাবে যিনি জানেন, মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হ'ক বা না হ'ক, তিনি অর্চিতে রূপান্তরিত হন।[১৮৩] অর্চিঃ থেকে তিনি হন অহঃ বা দিনের আলো, তা থেকে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না, তা থেকে উত্তরায়ণের সৌরদীপ্তি, তা থেকে সংবৎসরের দীপ্তি, তা থেকে আদিত্য, তা থেকে চন্দ্রমা, তা থেকে বিদ্যুৎ।[১৮৪] বিদ্যুৎরূপে সম্ভূত হওয়ার পর এক অমানব পুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ব্রহ্মে নিয়ে যান। এই হল দেবপথ বা ব্রহ্মপথ। এ-পথে যাঁরা চলেন, তাঁরা আর মানব-আবর্তে আবর্তিত হন না।'[১৮৫]

এর পরের দুটি খণ্ডে সোমযাগের অধ্যক্ষ-ঋত্বিক্ ব্রহ্মার মৌনবিধানের এবং যজ্ঞের অঙ্গহানি হলে ব্যাহৃতিমন্ত্রে আহুতি দিয়ে তার প্রতীকারের প্রসঙ্গ আছে।

এইখানেই চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ।

ডাইনে ভামধারা, দুয়ের 'সংযমে' বা সঙ্গমে মধ্যধারার উৎপত্তি। নাড়ীবিজ্ঞানে বামে ইড়া বা চন্দ্র, দক্ষিণে পিঙ্গলা বা সূর্য, আর দুয়ের মাঝখানে সুষুম্ণা বা অগ্নি। এই অগ্নিশিখাই অক্ষিপুরুষ এবং আদিত্যপুরুষের মাঝে সেতু। দ্র. মৈত্রি. ৬।৩০, ৭।১১।

[১৮৩] অর্চি. অগ্নিশিখা, অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম দুই দৃষ্টিতেই। বাইরের যজ্ঞ আন্তর সাধনারই প্রতিরূপ। যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে তদাত্মভাবনায় চেতনার উত্তরায়ণ এবং বিস্ফারণ ঘটে। অগ্নিদের কাছ থেকে উপকোসল তাঁদের যে-রহস্য জানতে পেরেছিলেন, তাতে এই কথাই বলা হয়েছে। আত্মস্থ অগ্নি নাড়ীসঞ্চারী। একটি নাড়ী হৃদয় থেকে মূর্ধার দিকে গিয়েছে, সেইটি ধরে উঠে গেলে অমৃতত্ব লাভ করা যায় (ছা. ৮।৬।৬; সমস্ত খণ্ডটিই দ্র.)। এই নাড়ীই অগ্নিনাড়ী হিতানাড়ী বা সুষুম্ণ-নাড়ী। সত্যকাম যে অক্ষিপুরুষের কথা বলেছেন, তার সার্থকতা এই অগিনাড়ীকে ধরায়। অগ্নি-বিদ্যারও এই হল মর্মরহস্য। মৃত্যুকালে দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে সংহত করতে হবে এবং হৃদয় থেকে প্রাণকে একাগ্র করে টেনে তুলতে হবে ঐ ভ্রূমধ্যবিন্দুতে। তারপর ভ্রূমধ্যের উজানে মূর্ধন্যচেতনায় তার বিস্ফারণ ঘটবে (দ্র. গী. ৮।১০-১৩)। অবশ্য জীবদ্দশায় এই অভ্যাস না করলে মৃত্যুকালে অগ্নিনাড়ী আশ্রয় করা সম্ভব হয় না। তাই উপনিষদ বলছেন, 'এই লোকদ্বার বিদ্বানের পক্ষে খোলা, কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে নিরুদ্ধ' (ছা. ৮।৬।৫)।

[১৮৪] উপকোসলকে অগ্নিরা এই শেষের তিনটি সম্ভূতির কথাই বলেছিলেন। সংবৎসর পর্যন্ত চেতনার ক্রমিক বিস্ফারণ ঘটে। তখন পর্যন্ত আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব থাকে, তাই আঁধারের পথ ছেড়ে আলোর পথ ধরতে হয়। সংবৎসরের অধিষ্ঠাতা হলেন আদিত্য। তাঁতে পেঁছলে পর চেতনা দ্বন্দ্বের বাইরে চলে যায়। এই অবস্থার বর্ণনা অন্যত্র আছে (দ্র. তৈ. ব্রা. ৩।১১।৭)।

[১৮৫] তু. কৌ. প্রথম অধ্যায়ে পর্যঙ্কবিদ্যা। অন্যত্র দেবযানের বর্ণনা : ছা. ৫।১০।২, বৃ. ৬।২।১৫, গী. ৮।২৪। তু. ঋ. স. 'দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্, তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ'—দুটি বয়ে-চলার কথা শুনেছি আমি পিতৃগণের—তাঁদের কেউ দেবতা, কেউ-বা মর্ত্য; পিতা আর মাতা অর্থাৎ দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে যা-কিছু আছে, সবই ঐ দুটি প্রবাহ ধরে চলতে-চলতে একজায়গায় এসে মেশে (১০।৮৮।১৫)। পিতৃগণের মধ্যে যাঁরা মানব-আবর্তে আর আবর্তিত হন না তাঁরা দেব, যাঁরা হন তাঁরা মর্ত্য। মিলনস্থানটিকে ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে 'ব্যবর্তনা' অর্থাৎ ছাড়াছাড়ির জায়গা (৫।১০।২)। কৌষীতকীতে এইটি চন্দ্রলোক, এখানে সবাইকে আসতে হয় (১।২)। তারপর বিদ্বানেরা আরও উজিয়ে যান, ঋক্‌সংহিতায় তাঁরাই দেব-পিতৃগণ; আর অবিদ্বানেরা ফিরে আসেন, তাঁরা মর্ত্য-পিতৃগণ। দেবযান ধরে চলবার অধিকার পেতে হলে জীবদ্দশায় প্রথম উপচীয়মান আলোর ভাবনা করতে হবে—যেমন ভোর হতে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দৈনন্দিন আলো, শুক্লপক্ষের আলো, উত্তরায়ণের আলো। আলোর ভাবনায় আঁধারের ভাবনা ক্রমে তলিয়ে যাবে, কালোর মাঝেও আলোকে তখন অনুভব করতে পারব। এই হল সংবৎসরকে পাওয়া। তারপর তিনটি পুরুষের বোধ জাগবে চেতনায়। এগুলি যে তাদাত্ম্যবোধ, সেকথা অগ্নিরাই উপকোসলকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন (দ্র. ৪।১১।১, ১২।১, ১৩।১)। এমনি করে জ্যোতিরুপাসনায় যে-সুখের অনুভব হবে, তাকে মিলিয়ে দিতে হবে শূন্যে—প্রতিটি কং হবে খং। শৈবদর্শনে একেই বলা হয়েছে 'আনন্দো বিশ্রান্তিঃ।'

তারপর পঞ্চম অধ্যায়ে চব্বিশটি খণ্ড। প্রথম দুটি খণ্ডে আছে প্রাণোপাসনা। প্রবক্তা সত্যকাম জাবাল।

প্রাণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন—ব্রহ্মের এই পাঁচটি দ্বারপাল।[১৮৬] এদের মধ্যে বাক্ 'বসিষ্ঠ' কিনা উজ্জ্বলতম[১৮৭] চক্ষু প্রতিষ্ঠা, শ্রোত্র সম্পৎ,[১৮৮] আর মন আয়তন বা সব বৃত্তির আশ্রয়। কিন্তু প্রাণ সবার জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। একথা প্রমাণিত হল যখন দেখা গেল, আর-সবাইকে বাদ দিয়েও শরীর চলে, কিন্তু প্রাণকে বাদ দিয়ে নয়।[১৮৯] সুতরাং মানতে হয়, বাক্ চক্ষু ইত্যাদি প্রাণেরই বৃত্তি।

বিশ্বের সব-কিছুই প্রাণের অন্ন,[১৯০] আর জল তার বাস বা আচ্ছাদন।

এই প্রাণই মহত্তত্ত্ব।[১৯১] এঁকে পেতে হলে অমাবস্যায় দীক্ষা নিয়ে পূর্ণিমার রাত্রে সমস্ত ওষধির মন্থ তৈরি করে দই আর মধুর সঙ্গে ছেনে প্রাণ আর তাঁর বৃত্তিদের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে।[১৯২]

তারপর হুতশেষ মন্থটুকু অঞ্জলিতে নিয়ে জপ করতে হবে, 'তুমি অম, তোমার সঙ্গে সবাই আছে, তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজা এবং অধিপতি, আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব রাজ্য এবং আধিপত্য দাও, আমি যেন এই যা-কিছু সব হতে পারি।'[১৯৩] তারপর 'তৎ

---

[১৮৬] দ্র. ৩।১৩।৬

[১৮৭] 'বসিষ্ঠ' < বস্ (দীপ্তি দেওয়া)। বাকের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক আছে একথা আগেই বলা হয়েছে (৩।১৩।৩; তু. ঋ. মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ ১০।৯০।১৪)। আধার যোগাগ্নিময় হলে যে-বাকের স্ফূর্তি হয়, তা-ই 'ঋক্' যা অগ্নিশিখা সুর ও মন্ত্র তিনটিকেই বোঝায় (তু. 'অর্ক', 'অর্চিঃ')। এইখানেই অগ্নির সঙ্গে বাকের সম্পর্ক। আবার তু. 'বসুরগ্নিঃ' ঋ. ৫।২৪।২, ১।৩১।৩, ২।৭।১, ৩।১৫।৩...; 'বসিষ্ঠঃ' ২।৯।১, ৭।১।৮।

[১৮৮] অর্থাৎ সিদ্ধি। ইন্দ্রিয়দের মাঝে শ্রোত্রের স্থান সবার উপরে, যেমন প্রমাণের মধ্যে 'শ্রুতি'।

[১৮৯] এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে কৌষীতকীর তৃতীয় অধ্যায়ে। সেখানে দেখানো হয়েছে, প্রাণই সর্বমূল, কিন্তু এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা। বৃহদারণ্যকেও এই প্রসঙ্গটি আছে একটু অন্য আকারে (৬।১)। তু. প্র. ২, কৌ. ২।১৪।

[১৯০] সুতরাং প্রাণ অন্নাদ (দ্র. প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যা. ছা. ৫।১৮)। বিশ্বকে যেমন প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দৃক্ এবং দৃশ্যে ভাগ করা যায়, তেমনি প্রাণের দিক দিয়ে ভাগ করা যায় অন্নাদ এবং অন্নে। অন্ন আবার জড়েরও সংজ্ঞা। উপনিষদের মতে জড় তা-ই, যা তার অন্তর্নিহিত উত্তরশক্তির স্ফুরণের উপাদান (দ্র. ছা. ৬।৬)। প্রাণবাদীর মতে জড় অন্ন, আর প্রজ্ঞাবাদীর মতে দৃশ্য। এই কথাটি মনে রাখলে এদেশের জড়বাদ সম্বন্ধে দৃষ্টি শুদ্ধ হয়।

[১৯১] মূলে আছে, 'অথ যদি মহজ্জিগমিষেৎ'—যদি কেউ মহৎকে পেতে ইচ্ছা করে। এই মহৎ বিশ্বপ্রাণ। সাংখ্যের তত্ত্বসংখ্যান স্মরণীয় : বিশ্বের মূলে পুরুষ ও প্রকৃতি যুগনদ্ধ হয়ে আছেন। এইটি আকাশ বা মহাশূন্য। অসঙ্গ পুরুষের শূন্যতা ফোটে বিজ্ঞানীর বোধে, আর অব্যক্ত প্রকৃতির শূন্যতা অজ্ঞানীর সুষুপ্তিতে। প্রকৃতির প্রথম বিকার হল 'মহৎ', যার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জ্যোতিঃশক্তির বিচ্ছুরণ। একেই ঋক্‌সংহিতায় বলা হয়েছে 'মাতরিশ্বা'—যিনি মায়ের মাঝে ফেঁপে উঠেছেন (দ্র. ৩।২৯।১১)। এমনি করে বিসৃষ্টির গোড়াতে আমরা উপনিষদের ভাষায় পাই আকাশ এবং প্রাণের একটি মিথুন। মহৎ বা প্রাণই তারপর সব-কিছু হয়েছে।

[১৯২] প্রাণকে এখানে সোমদৃষ্টিতে উপাসনা করতে বলা হয়েছে। আবার প্রাণ সূর্য বা আদিত্য (দ্র. ১।৫), প্রাণ অগ্নি (দ্র. ৫।১৮-২৪)। প্রাণ অগ্নি-সূর্য-সোমাত্মক। তন্ত্রের মহাশক্তিও তা-ই। অমাবস্যা হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত সোমকলার উপচয় প্রাণেরই উপচয়। এই ভাবটিই তন্ত্রে ষোড়শী- বা শ্রী-বিদ্যায় প্রপঞ্চিত হয়েছে। ওষধিরা সোমরসে পুষ্ট হয় (দ্র. ঋ. 'ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীঃ' ১০।৯৭।১৮, ১৯; ওষধয়ঃ সং বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা ২২; সোমবতীম্ ৭)। পঞ্চামৃতের দুটি অমৃত হল দধি এবং মধু। পয়ঃ-তে চেতনার আপ্যায়ন, দধিতে সংহনন, ঘৃতে প্রজ্বলন, মধুতে আনন্দন আর পুরানো মধু দানা বেঁধে শর্করা হলে প্রতিষ্ঠা।

[১৯৩] 'অম' শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট। ঋক্‌সংহিতায় অম অর্থে বল; আবার 'অমা' অর্থ সহচার। এখানে দুটি অর্থই ধরতে হবে। আত্মপ্রাণকে বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে এক করার কথা পাচ্ছি।

সবিতুর্বৃণীমহে' এই ঋক্‌টির একেকটি পাদ উচ্চারণ করে সব মন্থটুকু খেয়ে ফেলতে হবে।[১১৪] তারপর রাত্রে অগ্নির কাছে শুয়ে স্বপ্নে স্ত্রীমূর্তি দেখলে পর জানতে হবে ক্রিয়াটি সিদ্ধ হয়েছে। সমস্ত কাম্যকর্মের বেলাতেই স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন সিদ্ধির সূচক।[১১৫]

এরপর তৃতীয় হতে দশম কান্ড পর্যন্ত শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ। আলোচ্য বিষয় পঞ্চাগ্নিবিদ্যা।[১১৬]

শ্বেতকেতু আরুণেয় রাজা প্রবাহণ জৈবলির সভায় গেলে পর রাজা তাঁকে পাঁচটি প্রশ্ন করেন, 'জান, এই লোক হতে জীব কোথায় যায়? কেমন করে ফিরে আসে? দেবযান আর পিতৃযাণ কোথায় আলাদা হয়েছে? দ্যুলোক কেন ভরে ওঠে না? পঞ্চম আহুতিতে অপ্‌ কি করে পুরুষ হয়?' শ্বেতকেতু একটারও জবাব দিতে পারলেন না। রাজা কটাক্ষ করে বললেন, 'তোমার বাবা তাহলে তোমাকে কি শিখিয়েছেন?' শ্বেতকেতু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাবাকে এসে সব বললেন। বাবা গৌতম বললেন, 'এসব তো আমিও জানি না, জানলে নিশ্চয় তোমায় বলতাম।' পরদিন গৌতম রাজার কাছে গিয়ে হাজির।[১১৭] বললেন, 'আমার ছেলেকে যা বলেছিলেন, তা আমায় বলুন।' রাজা বললেন, 'তাহলে দীর্ঘকাল এখানে থাকুন।' গৌতম তা-ই থাকলেন। অবশেষে রাজা বললেন, 'দেখুন, আপনার আগে ব্রাহ্মণদের কেউ এ-বিদ্যা পাননি। তাই না ক্ষত্রিয়ের প্রশাসন সর্বত্র।'[১১৮] এই বলে প্রবাহণ উদ্দালককে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

---

[১১৪] ঋ. ৫।৮২।১। এটি একটি সাবিত্রী ঋক্‌, কিন্তু গায়ত্রীছন্দে নয়। বৃহদারণ্যকে এটির ইঙ্গিত আছে (৫।১৪।৫)।

[১১৫] এই মন্থকর্মটি আরেকটু বিস্তৃত আকারে আবার বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায় (৬।৩)। সেখানে দেখা যায়, সত্যকাম এটি আচার্য-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে পেয়েছিলেন। পরম্পরাটি এই: আদি-প্রবক্তা উদ্দালক আরুণি > বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য > পৈঙ্গ মধুক > ভাগবিত্তি চূল > আয়স্থূণ জানকি > সত্যকাম জাবাল। সত্যকামের মন্থবিদ্যার আচার্য কিন্তু হারিদ্রুমত গৌতম নন। বিদ্যা-গ্রহণের জন্য বিভিন্ন আচার্যের অন্তেবাসী হওয়া তখন সাধারণ রীতি ছিল। এইজন্য ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না (তু. বৃ. ৬।২।৭)।

[১১৬] এই প্রসঙ্গটি প্রায় একই আকারে আবার বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায় (৬।২)। দেবযান-পিতৃযাণের কথা কৌষীতকীতেও আছে (১)। কিন্তু রাজার নাম সেখানে চিত্র গাঙ্গ্যায়নি। প্রবাহণকে উদ্‌গীথবিদ্যার প্রবক্তারূপে পাচ্ছি ছা. ১।৮-৯এ।

[১১৭] বৃহদারণ্যকে আছে, ঋষি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্বেতকেতু বললেন, 'আপনিই যান।'

[১১৮] ছান্দোগ্যে রাজাকে গর্বিত করে আঁকা হয়েছে। বৃহদারণ্যকে কিন্তু তিনি বেশ বিনীতভাবেই কথাবার্তা বলছেন। কৌষীতকীর বিবরণে বলেছি, দেবযান-পিতৃযাণের কথা ব্রাহ্মণেরাও জানতেন। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছি, সত্যকাম উপকোসলকে দেবযানের কথা বলছেন। তবে সত্যকাম উদ্দালক-আরুণির অনেক পরের (বৃ. ৬।৩)। এখানে উদ্দালক আরুণিকে (গৌতম তাঁর গোত্রনাম, তাঁর পিতা অরুণের উল্লেখ আছে বংশব্রাহ্মণে, বৃ. ৬।৫।৩) প্রবাহণের কাছে বিদ্যার্থীরূপে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বৃহদারণ্যকে প্রবাহণ নিজেই শ্বেতকেতুকে বলছেন, 'আমরা ঋষির বচন শুনেছি,' বলে ঋক্‌সংহিতার 'দ্বে স্রুতী' মন্ত্রটির (১০।৮৮।১৫) উল্লেখ করছেন। Keith তাঁর *RPVU*তে এই উল্লেখটি অপ্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করলেন কি যুক্তিতে তা বোঝা যায় না। সংহিতার 'স্রুতী' উপনিষদে হয়েছে 'সৃতী', গীতায়ও তা-ই (৮।২৭)। ঋকের 'সমেতি' কথাটি দেবযান-পিতৃযাণের সঙ্গমস্থানটিকে বোঝাচ্ছে। এইটিই আবার বিচ্ছেদের স্থানও। অর্থাৎ জীবের উৎক্রান্তির পথটা যেন ⅄ এই চিহ্নের মত। বাঁদিকের হেলানো রেখাটি শেষ পর্যন্ত গেছে—এইটি অর্চিঃপথ; আর ডাইনেরটি সংযোগবিন্দু পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে—এইটি ধূমপথ। সুতরাং মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায়, ফিরে আসে কিনা, দেবযান আর পিতৃযাণ কোথায় গিয়ে মিলেছে—এগুলি পুরানো কথা। প্রবাহণের নতুন কথা হল, জীবজন্ম হয় কি করে, আর দেবযান ও পিতৃযাণ ছাড়াও তৃতীয় একটা গতিপথ আছে কিনা। এই শেষের কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, তার কথা পরে বলব। এই উপনিষদেরই ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে যেসব বিজ্ঞান দিয়েছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ

প্রবাহণ শেষের প্রশ্নটির উত্তর দিলেন সবার প্রথমে : পঞ্চম আহুতিতে অপ্ কি করে পুরুষ হয়। অপ্ জনয়িত্রী শক্তি।[১৯৯] তাকেই এখানে হব্যরূপে ধরা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারটাই একটা যজ্ঞ।[২০০] সুতরাং জীবসৃষ্টির মূলেও এই যজ্ঞ। একটি যজ্ঞ নয়, পর-পর পাঁচটি যজ্ঞ। একেকটি যজ্ঞে একেকটি অগ্নি। প্রত্যেকটি যজ্ঞেই আহুতিকর্তারা হলেন দেবগণ অর্থাৎ চিৎশক্তির কর্তৃত্বেই এই জীবসৃষ্টিরূপ যজ্ঞ নিষ্পন্ন হচ্ছে। যজ্ঞের পরম্পরাকে বিলোমক্রমে নিলে পর বুঝতে সুবিধা হবে, কেননা তাতে আমরা দৃষ্ট ব্যাপার হতে ক্রমে অদৃষ্টের দিকে যেতে পারব।

প্রাকৃত জগতে দেখি, স্ত্রীতে বীজ নিক্ষিপ্ত হলে জীবসৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা যজ্ঞের অনুরূপ। স্ত্রী এখানে অগ্নি, হব্য রেতঃ; কিন্তু আহুতিকর্তা হলেন দেবতারা। রেতঃ আসে কোথা থেকে? অন্নের পরিপাক থেকে। পুরুষরূপ অগ্নিতে দেবতারা অন্ন আহুতি দেন। তাইতে রেতের উৎপত্তি হয়। অন্ন আসে কোথা থেকে? বৃষ্টি থেকে। পৃথিবী তখন অগ্নি, বৃষ্টি হব্য। বৃষ্টি আসে কোথা থেকে? সোম থেকে। পর্জন্য তখন অগ্নি, সোম হব্য। সোম আসে কোথা থেকে? শ্রদ্ধা থেকে। দ্যুলোক তখন অগ্নি, শ্রদ্ধা হব্য। এখন অনুলোমক্রমে বলতে গেলে শ্রদ্ধা থেকে সোম, সোম থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে রেতঃ আর রেতঃ থেকে পুরুষের উৎপত্তি হয়। উৎপত্তির আধার হল যথাক্রমে পাঁচটি অগ্নি—দ্যুলোক পর্জন্য পৃথিবী পুরুষ এবং স্ত্রী। দেবতারা নিমিত্ত। এই হল প্রবাহণের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা।[২০১]

আছে। সেখানে তিনি মৃত্যুবিজ্ঞানসম্পর্কে বলছেন, 'মুমূর্ষুর বাক্ মনে যায়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতায়।' সেখানে খুঁটিয়ে আর কিছু বলা হয়নি। এটি একটি প্রাচীন বিজ্ঞান (দ্র. ঋ. ১০।১৪-১৯)। দুটি সৃতির খুঁটিয়ে বর্ণনা প্রবাহণই করছেন, এমন-কি চিত্রও কৌষীতকীতে তা করেননি। দ্র. টীকা ১৮৩, ২০৩।

[১৯৯] তু. ঋ. আপো জনয়থা চ নঃ ১০।৯।৩; তস্যাঃ (গৌর্যাঃ) সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি...ততঃ ক্ষরত্যক্ষরম ১।১৬৪।৪২; আপো...মাতরঃ ১০।১৭।১০; সৃষ্টির আদিতে 'অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্' ১২৯।৩; অব্যক্ত রাত্রি হতে 'সমুদ্রো অর্ণবঃ,' তাহতে সৃষ্টি ১৯০।১।

[২০০] দ্র. ঋ. পুরুষসূক্ত ১০।৯০।

[২০১] কৌষীতকীতে রাজা চিত্র একবার বলছেন, চন্দ্রমা থেকে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে জীবের জন্ম হয়। আবার একটি ঋক্ উদ্ধার করে বলছেন, চন্দ্রমা থেকে (পঞ্চদশাৎ পিত্র্যারতঃ) রেতঃ আহরণ করা হয়, পুরুষ তাকে স্ত্রীতে নিষিক্ত করে (১।২)। চিত্রের বিবৃতিতে শ্রদ্ধা এবং অন্নের কথা বাদ পড়েছে। তাছাড়া চিত্র প্রবাহণের মত কথাটাকে গুছিয়ে বলছেন না। ঐতরেয়ে আছে, রেতের উৎপত্তি দিব্য অপ্ হতে (১।২।৪)। অন্যত্র আছে, রেতঃ পুরুষের সর্বাঙ্গ হতে সংভৃত তেজ (১।৪।১; তু. কৌ. ২।১১; অ. স. ৫।২৫।১)। ঋক্‌সংহিতায় যে গর্ভাধানমন্ত্র আছে, তাতে দেবতাদের আবাহনই করা হয়েছে; কিন্তু কি করে জীবসৃষ্টি হয় তার কোনও ইঙ্গিত সেখানে পাওয়া যায় না (ঋ. ১০।১৮৪; তু. অ. স. ৫।২৫)। এইদিক দিয়ে প্রবাহণ তাঁর বিদ্যাকে নিজস্ব বলে দাবী করতে পারেন। বৃষ্টি অন্ন রেতঃ এবং গর্ভ—এদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুমান করা কঠিন নয়। ওষধির (=অন্ন) সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ঋক্‌সংহিতাতেও পাচ্ছি (১০।৯৭।৭, ১৮, ১৯, ২২)। আবার বৃষ্টিতে ওষধির পুষ্টি, এও জানা কথা। তা-ই থেকে সোম অম্ময় বা জলময়—এ-ধারণা হতে পারে, বিশেষত যাজ্ঞিকদের সোম যখন লতার রস, তা পান করলে মানুষ অমৃত হয় (ঋ. ৮।৪৮।৩), পার্থিব সোমই আকাশে চন্দ্র, দেবতারা তাকে পান করেন। এইসব ভাবানুষঙ্গ থেকে মনে হতে পারে, সোম 'পিত্র্যাবান্' বা পিতৃশক্তির আধার। সব জীবই চন্দ্র থেকে আসছে, আবার চন্দ্রেই যাচ্ছে (কৌ. ১।২)। তবে চন্দ্র দুটি—একটি আদিত্যের ওপারে, আরেকটি এপারে (ছা. ৫।১০।২, ৪; তু. তৈ ব্রা. ৩।১১।৭।৪)। দুটিই অমৃত প্রাণের আধার, কিন্তু একটি থেকে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, আরেকটি থেকে হয়। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ বলছেন, আদিত্যের নীচে যে-লোক, তা অন্তবান্ এবং ক্ষয়িষ্ণু; আদিত্যের ওপারের লোক অনন্ত অপার এবং অক্ষয় (৩।১১।৭।৪)। লোকের নাম সেখানে নাই, কিন্তু ছান্দোগ্যের ভাবনার সঙ্গে ভাবনার বেশ মিল আছে। এই লোকবিদ্যা

তারপর প্রবাহণ বলতে লাগলেন, 'যাঁরা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যাঁরা অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যাদির উপাসনা করেন, মৃত্যুর পর তাঁরা অর্চিতে রূপান্তরিত হন।' বলে অর্চিঃপথের একটা বর্ণনা দিলেন। সত্যকামের কাছে এই পথের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি, যদিও মনে রাখতে হবে সত্যকাম প্রবাহণের অনেক পরের।

তারপর প্রবাহণ এই দেবযান পথেরই পাশাপাশি আরেকটি পথের কথা বললেন। যাঁরা গ্রামে ইষ্ট (যজ্ঞ), পূর্ত (জনহিতকর নানা কর্ম) এবং দানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা মৃত্যুর পর ধূমে রূপান্তরিত হন। ধূম থেকে হন রাত্রি, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষিণায়ন। তাঁরা আর সংবৎসরকে পান না অর্থাৎ আদিত্যজ্যোতিতে তাঁরা আর রূপান্তরিত হন না। যে-আলোর অনুভব তাঁদের হয় তা ক্ষয়িষ্ণু, যদিও একটা সামান্যত ব্যাপ্তিবোধ তাঁদেরও থাকে। সেটা বিদেহ হওয়ার স্বাভাবিক পরিণাম। দক্ষিণায়ন থেকে তাঁরা যান পিতৃলোকে। সেখানে তাঁরা আকাশ হন, আকাশ থেকে চন্দ্রমা। এই চন্দ্রমা দেবতাদের অন্ন, তার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।[২০২] সেখানে কিছুদিন থেকে আবার তাঁরা আকাশ হন। আকাশ থেকে হন বায়ু, বায়ু থেকে ধূম, ধূম থেকে অভ্র (জলীয় বাষ্প), অভ্র থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে উদ্ভিদ্ (অন্ন), তা থেকে অন্নাদের রেতঃ, তা থেকে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ। শুভকর্মের জোর থাকলে তাঁদের উত্তমযোনিতে জন্ম হয়, নইলে হয় হীনযোনিতে—এমনকি পশুজন্ম হওয়াও অসম্ভব নয়।[২০৩]

ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে পাওয়া তার কোনও প্রমাণ নাই, কেননা এ-ভাবনাটি ঋক্‌সংহিতার 'দ্বে স্রুতী' থেকেই আসতে পারে। জীবজন্মের আদি খুঁজতে গিয়ে এমনি করে আমরা সোম পর্যন্ত পৌঁছলাম। প্রবাহণ বলছেন, তারও আদিতে আছে 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধাকে শঙ্কর বলেছেন আস্তিক্যবুদ্ধি, যা নচিকেতাতে আবিষ্ট হয়েছিল (কঠ. ১।১।২ তু. শ্রদস্মৈ ধত্ত, স জনাস ইন্দ্রঃ ২।১২।৫) ঋক্‌সংহিতার শ্রদ্ধাসূক্তে বলা হচ্ছে, শ্রদ্ধাকে পাওয়া যায় হৃদয়ের আকূতি দিয়ে (১০।১৫১।৪)। হৃদয় যখন দেবতার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, শ্রদ্ধা আবিষ্ট হয়ে জানিয়ে দেয়, তিনি আছেন। শ্রদ্ধা তাহলে দেবতার আবেশ। কিন্তু আবেশ যে এখনই হল, তা তো নয়। জীবজন্মের গোড়াতেই ছিল যে তাঁরই আবেশ (দ্র. ছা. ৬।৩।২, ৩; তৈ. ২।৬; ঐ. ১।৩।১২)। এই আবেশই কালে শ্রদ্ধারূপে হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। সুতরাং শ্রদ্ধাকে চিদ্‌বীজও বলা যেতে পারে। জীবজন্মের মূলে শ্রদ্ধা, প্রবাহণের এই ভাবনার সঙ্গে উপরি-উক্ত ভাবনার মিল আছে। আবার প্রশ্নোপনিষদে দেখতে পাই, সুকেশা ভারদ্বাজকে রাজপুত্র কৌসল্য হিরণ্যনাভ ষোড়শকল পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার জবাব দিতে পারেননি। রাজপুত্র আর ফিরে তাঁকে কিছু বললেন না। সুকেশা প্রশ্নটি ঋষি পিপ্পলাদের কাছে তুললে পর তিনি পুরুষের ষোল কলার নাম করতে গিয়ে প্রথমেই প্রাণ এবং তারপর শ্রদ্ধার কথা বললেন। এখানেও পাচ্ছি, শ্রদ্ধা জীবজন্মের মূলে। হিরণ্যনাভ একথা জানতেন কিনা, বোঝা যায় না। কিন্তু পিপ্পলাদ জানতেন। এসমস্ত থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়, জীবজন্মের রহস্য সম্বন্ধে নানা ভাবনা নানা জায়গায় ছড়ানো ছিল, তাকে একটা সুসম্বদ্ধ রূপ দিলেন প্রবাহণ—এইটুকু তাঁর কৃতিত্ব। এথেকে উপনিষদের উপর ক্ষত্রিয় প্রভাবের কথাটা বাড়িয়ে বলবার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই অভিজাত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম মূলত অভিজাতদের ধর্ম। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মণরাই অগ্রণী ছিলেন, তবে ক্ষত্রিয়েরাও যে খুব পিছিয়ে ছিলেন তা নয়। তত্ত্বমীমাংসা যেমন যজ্ঞসভায় হত, তেমনি রাজসভাতেও হত। চিরকালই তা-ই হয়ে এসেছে। তবে মীমাংসাকে গুছিয়ে সূত্ররূপ দেবার এবং সম্প্রদায় প্রবর্তন করবার কাজটা বরাবর ব্রাহ্মণরাই করে এসেছেন। ক্ষত্রিয়েরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দুয়ের মাঝে একটা বিরোধ কল্পনা করা কিংবা একপক্ষকে বাড়িয়ে তোলাটা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয় না।

[২০২] তন্ত্রে পাই, চন্দ্রের ক্ষয়িষ্ণু পঞ্চদশকলার ঊর্ধ্বে ষোড়শী নিত্যকলা। বেদের পুরুষও ষোড়শকল। লক্ষণীয়, সোমযাগের ঋত্বিকও ষোলজন।

[২০৩] সত্যকাম উপকোসলকে এই ধূমমার্গের কথা বলেছিলেন কিনা জানা যায় না। বৃহদারণ্যকের বর্ণনায় (৬।২।১৫-১৬) দেবযানপ্রসঙ্গে আছে ঃ 'অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে', 'মাসেভ্যো 'দেব-

তারপর প্রবাহণ বলতে লাগলেন, 'এই দুটি পথের কোনও পথেই যায় না, এমন পুরুষও আছে। তারা ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে কেবল বারবার আবর্তিত হয়। জন্মানো আর মরে যাওয়াই তাদের কাজ। তাদের জন্য একটি তৃতীয় স্থান আছে। তাইতে দ্যুলোক আর ভরে ওঠে না। এই তৃতীয় গতিকে এড়িয়ে চলবে। চোর মাতাল গুরুপত্নীগামী ব্রহ্মঘাতী, এরা পতিত; এদের সঙ্গ যে করে সেও পতিত।'[২০৪]

এই তৃতীয় স্থানটি কোথায় বা চেতনার কোন্ ভূমি? প্রবাহণকথিত মৃত্যুবিজ্ঞান হতে তার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। মৃত্যু হল চেতনার সংহরণ—মূর্ছা বা সুপ্তির মত। সুপ্তিতে বাহ্যচেতনার লোপ হয়, কিন্তু কোনও চেতনাই কি থাকে না?

লোকম্', 'আদিত্যাদ্ বৈদ্যুতম্' (চন্দ্রমার কথা নাই), 'পুরুষো মানসঃ' ('অমানবঃ' নয়)। পিতৃযাণ পথে যাঁরা যান, তাঁরা 'যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি' (তু. গী. ঃ 'যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমের তৎ, রজ্ঞো দানং তপশ্চৈর পাবনানি মনীষিণাম্; এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ কর্তব্যানি ১৮।৫-৬)। ছান্দোগ্যে তপস্বীরা অর্চিঃপথে যান, আর এখানে ধূমপথে!। দেবযান-পিতৃযাণের খুব সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা পিপ্পলাদ দিচ্ছেন প্রশ্নোপনিষদে (১।৯-১৩)। সেখানে উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন অবলম্বনে আদিত্যে ও চন্দ্রে যাওয়ার কথা আছে। এটিকে ঋক্‌সংহিতার 'দ্বে স্রুতী'র ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ এবং অহোরাত্রের তফাতের কথাও উঠেছে, কিন্তু উৎক্রান্তির প্রসঙ্গে নয়। তাইতে এই বিবরণটি প্রবাহণির বিবরণের চাইতে প্রাচীন বলে ধরা যেতে পারে। ঋক্‌সংহিতায় 'দেবযান' শব্দটির উল্লেখ কয়েকবার করা হয়েছে, 'পিতৃযাণ' শব্দটি একবার (১০।২।৭)। কিন্তু দেবযান বলতে সেখানে সর্বত্রই বোঝানো হয়েছে দেবতারা যে-পথে এখানে আসেন, মানুষ যে-পথে তাঁদের কাছে যায় তার কথা বলা হয়নি। তবে অগ্নি দূতরূপে নিশ্চয়ই হব্য নিয়ে ঐ দেবযানের পথ ধরেই দেবতাদের কাছে যান (১।৭২।৭, ১০।৫১।৫, ৯৮। ১১)। সব আহুতিই আত্মাহুতি; মৃত্যুর পর চিতায় দেহটি তুলে দেওরা হল চরম আহুতি বা অন্ত্যা ইষ্টি (তু. ছা. ৫।৯।২)। যাঁরা দেবতাকে চেয়েছেন, তাঁরা তখন চিতাগ্নির শিখা ধরে (তু. ঋ. ১০।১৬।৪) এই পথেই দেবতার কাছে যাবেন। এই হল প্রেতের দেবযানপথ। এই পথেই আমাদের পিতৃপুরুষেরা দেবতাদের কাছে গেছেন (১০।১৪।২; ৭ যম আর বরুণের সহাবস্থানের কথা আছে এখানে, অর্থাৎ মৃত্যু আর শূন্যতা যেন এক; ৯ এখানে অহঃ অপ্ এবং রাত্রির দ্বারা শোভিত বিশ্রামস্থানের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ প্রেতের গতি হবে দিনের আলো এবং কারণসমুদ্রের ভিতর দিয়ে মহাশূন্যে)। পিতৃপুরুষেরা এই পথে গেছেন বলে ঋক্‌সংহিতায় এই পথেরই আরেক নাম 'পিতৃযাণ' (পন্থামনু প্রবিদ্বান্ পিতৃযাণং দ্যুমদগ্নে সমিধানো বি ভাহি ১০।২।৭)। অর্থাৎ 'অগ্নিষবাত্ত' পিতৃগণ দেবযানপথেই যাতায়াত করেন (১০।১৫।১১)। তবে দেবযানপথ ছাড়া মৃত্যুর আরেকটি নিজস্ব পথের কথাও একটি ঋকে আছে (পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং রস্তে স্ব ইতরো দেবয়ানাৎ ১০।১৮।১)। এইটি পূর্বোক্ত 'দ্বে স্রুতী'র একটি নিশ্চয়। মোটের উপর ঋক্‌-সংহিতায় দেখছি প্রবাহণকথিত অর্চিঃপথেরই প্রাধান্য, ধূমপথ আভাসিত। প্রবাহণ বলছেন, ইষ্টা-পূর্তের দ্বারা ধূমপথই লাভ হয়; ঋক্‌সংহিতায় কিন্তু বলা হচ্ছে, ইষ্টাপূর্তের ফল পরম ব্যোম পর্যন্ত যায় (সংগচ্ছস্ব...ইষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ১০।১৪।৮)। মৃত্যুর পর প্রেতের অধ্যাত্ম-সত্তা অধিদৈবতসত্তায় মিলিয়ে যায়, শুধু তার 'অজো ভাগঃ' বা আত্মাকে অগ্নি তাঁর 'অর্চিঃ' দিয়ে তপ্ত করে নিয়ে যান 'উরুলোকে', সেখানে তার দিব্যশরীর হয়—এই হল ঋক্‌সংহিতার মরণোত্তর অবস্থার বিবরণ (১০।১৬।৩-৫)। অধ্যাত্মসত্তার অধিদৈবত রূপান্তরের কথা উপনিষদেও পাচ্ছি (তু. কৌ. ২।১৩; ছা. ৬।১৫।২ এখানে উদ্দালক সাধারণভাবেই পুরুষের কথা বলছেন, এই তত্ত্বই তাঁর জানা ছিল; বৃ. ৩।২।১৩ এখানে আর্তভাগ যা বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য যেন তার চাইতে আরও বেশী-কিছু কথা তাঁকে বললেন—কিন্তু গোপনে; এটাই কি প্রবাহণকথিত বিদ্যা? বৃ. ৪।৪।১-২...)। মোটের উপর দেখতে পাচ্ছি, দেবযান-পিতৃযাণের কথাটা নতুন নয়। তবে দুটি গতিপথের পুঙ্খানু-পুঙ্খ বর্ণনাকে প্রবাহণ ক্ষাত্রবিদ্যা বলে দাবি করতে পারেন বটে। সংহিতায় এবং উপনিষদের অন্যত্র মৃত্যুর পর অধ্যাত্মসত্তার অধিদৈবতসত্তায় লীন হওয়ার দিকেই জোর দেওরা হয়েছে বেশী। এ-যেন রামপ্রসাদের সেই উক্তির মত ঃ 'জানিস কি ভাই কি হয় মলে? যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে' (তু. কঠ. ২।১।১৫)। কিন্তু প্রবাহণ পরের প্রসঙ্গে এসম্বন্ধে একটা নতুন কথা শুনিয়েছেন।

[২০৪] অর্থাৎ এরা মহাপাতকী, এরা ঐ তৃতীয় স্থান হতেই ফিরে আসে, তার উপরে আর উঠতে পারে না। বৃহদারণ্যক ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিচ্ছেন, কীট পতঙ্গ ডাঁশ ইত্যাদি।

উপনিষৎ বলেন, থাকে; প্রাণের আগুন তখনও দেহকে আশ্রয় করে জেগে থাকে (প্র. ৪।৩, কৌ. ৪।১৯, কঠ. ২।২।৮, বৃ. ৮।১১।১...। এই প্রাণচৈতন্যের বোধ হল একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। সুষুপ্তিতে মনের অগোচরে নিশ্চয় তার অনুভব হয়। ঘুম থেকে জাগলে পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার রেশ থাকে। জাগ্রতের চেতনা বিবিক্ত অর্থাৎ আত্মচৈতন্য সেখানে বিষয় আর বিষয়ীতে বিভক্ত হতে পারে। কিন্তু সুপ্তিচৈতন্য অবিবিক্ত—সেখানে সব একাকার। এই একাকার ভাবকে বলতে পারি অন্ধকার।

প্রাকৃত চেতনায় ঘুম অন্ধকার, মৃত্যুও তা-ই। উভয়ত্রই চেতনার সংহরণ। চেতনা সংহৃত হবে, অথচ বিলুপ্ত হবে না, এটা সম্ভব হয় ধ্যানে। ধ্যানে সমস্ত বিষয় গুটিয়ে আসে বিষয়ীতে। শুধু বিষয়ীই তখন জেগে থাকে। এই জেগে থাকাটাকে বলতে পারি আলো। অন্ধকার আসছে, তবুও তার মাঝে আলো জাগিয়ে রাখবার চেষ্টাই হল সাধনা। কে কতখানি বা কতক্ষণ আলো জাগিয়ে রাখতে পারে, তা নির্ভর করে তার সাধন-বীর্যের উপর।

যেমন ঘুমিয়ে পড়লাম, তেমনি মরলাম। মরলেই সব অন্ধকার। উপনিষদে এইটাকেই বলা হয়েছে রাত্রি। কিন্তু রাত্রি নামবার আগে আবছা আলোর সময় আসে, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে ধূম।

প্রবাহণ বলছেন, পিতৃযাণের পথে যাঁদের যেতে হয়, তাঁরা প্রথম হন ধূম, তারপর রাত্রি। তারপর এই রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র ওঠে, কিন্তু তার জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে আবার অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসে। তারপর আবার উত্তরায়ণের চরমদিনের একটি ঝলক আসে। কিন্তু সে-আলোও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যায়। আলোর সঙ্গে অন্ধকার জড়িয়েই থাকে, একেবারে উপক্ষয়হীন সৌরদীপ্তি কখনই ফোটে না।[২০৫] এই অবস্থায় যেখানে তাঁদের কাটে, তাকে বলে 'পিতৃলোক'। তারপর আবার নামে আকাশের শূন্যতা, তারমাঝে আবার জ্যোৎস্না ফোটে, দিব্যধামের খানিকটা আভাস পাওয়া যায় সম্ভুক্তের আনন্দ থেকে। কিন্তু তাও স্থায়ী হয় না। আবার আকাশের শূন্যতায় সব মিলিয়ে যায়। সেই শূন্যতায় মহাপ্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুরু করে বায়ুভাব পর্যন্ত মাঝে-মাঝে সব শূন্য হয়ে গেলেও এই অবস্থাগুলি সচেতনতার মধ্যেই কাটে।

কিন্তু তারপর আবার সব ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়, শুরু হয় প্রকৃতির শাসনে অবশ হয়ে অবসর্পিণী ধারায় নেমে আসা।

বলা যেতে পারে, পিতৃযাণ-পথের যে-রাত্রি, এটিই হল তৃতীয় স্থান। এর উপরে যারা উঠতে পারে না, তারা ঐখান থেকেই আবার ধূমের ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে। এই ধূম পিতৃযাণীরাও পান।[২০৬] এখান হতে জীবজন্মের ধাপগুলি সবার পক্ষেই সমান।

কিন্তু এর মাঝে একটা কথা আছে। প্রবাহণের পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সেইখানে সার্থকতা। অভ্র>মেঘ>বৃষ্টি>অন্ন>রেতঃ>গর্ভ—এই ধারা হল অবিদ্বানের প্রাকৃত জন্মের ধারা। কেউ যদি ভাবনা করে, 'অভ্র শ্রদ্ধাগর্ভ দ্যুলোকের আলো, আর মেঘ সোমগর্ভ

[২০৫] প্রবাহণের ভাষায়, 'তাঁরা সংবৎসরকে কখনই পান না।'
[২০৬] ৫।১০।৫।

পর্জন্য, এরা সবাই অগ্নিস্বরূপ, আমি সেই অগ্নি হতেই জাত হয়েছি',[২০৭] তাহলে তাকেও আর ফিরে আসতে হয় না।

অর্চিঃপথে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব খানিকদূর থাকলেও শেষে সবটাই আলো। এই পথে যাঁরা যান, তাঁদের মৃত্যু অন্ধকার নয়, একটা জ্যোতির্ময় বিস্ফারণ, উপনিষদে যার নাম দেওয়া 'প্রদ্যোত'।[২০৮] এ-পথের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, যেটুকু বললাম তা-ই থেকে মূল বিষয়টি অনুধাবন করা আশা করি কঠিন হবে না।

প্রবাহণ উৎক্রান্তি সম্বন্ধে যেসব কথা বললেন, সবগুলিই ধ্যানের দ্বারা এই জীবনেই অনুভব করা যায়; কেননা মৃত্যু যেমন চেতনার সংহরণ, ধ্যানও তা-ই। সুপ্তি সমাধি মৃত্যু এক পর্যায়ের বস্তু। বিজ্ঞানী তিনটিতেই জেগে থাকেন।

তারপর একাদশ হতে চতুর্বিংশ খণ্ড পর্যন্ত বৈশ্বানর এবং প্রাণাগ্নিহোত্র-বিদ্যা। উপদেষ্টা রাজা অশ্বপতি কৈকেয়, বিদ্যার্থী উদ্দালক আরুণি প্রমুখ ছয়জন ব্রহ্মবাদী। তাঁদের মীমাংসার বিষয় ছিল, আমাদের আত্মা কে, ব্রহ্মই-বা কি। এ'রা সবাই ছিলেন বৈশ্বানরের উপাসক। ব্রহ্মবাদীরা প্রথমে উদ্দালকের কাছেই প্রশ্নটি নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু উদ্দালক বললেন, 'আমি সব জানি না। চল আমরা অশ্বপতির কাছে যাই।'[২০৯]

অশ্বপতির কাছে গেলে পর তিনি তাঁদের আগে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন, তাঁরা আত্মজ্ঞানে কার উপাসনা করেন। দেখা গেল, ব্রহ্মবাদীরা প্রত্যেকে দ্যুলোক আদিত্য বায়ু আকাশ অপ্ এবং পৃথিবীকে আত্মজ্ঞানে পৃথক্-পৃথক্ উপাসনা করে আসছেন।[২১০] অশ্বপতি বললেন, 'আপনার পৃথক্‌ভাবে এক আত্মরূপী বৈশ্বানকেরই উপাসনা করে আসছেন—কিন্তু খণ্ড-খণ্ড করে।[২১১] বস্তুত দ্যুলোক তাঁর মূর্ধা, তিনি তখন সুতেজাঃ; আদিত্য তাঁর চক্ষু, তিনি তখন বিশ্বরূপ; বায়ু তাঁর প্রাণ, তিনি তখন

---

[২০৭] তু. কৌ. বিচক্ষণাদৃতবো রেত আভৃতং ইত্যাদি ১।২। এইটি হল 'জন্মকথন্তাসংবোধ' নিজের দিব্যজন্মের খবর পাওয়া। তু. গী. ৪।৯।

[২০৮] বৃ. ৪।৪।২।

[২০৯] অশ্বপতি ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রের বিশেষণ ৮।২১।৩। কাহিনীটি শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (১০।৬।১)। ছান্দোগ্যের নামগুলির সেখানে সামান্য ইতর-বিশেষ দেখা যায়। উদ্দালক আরুণির জায়গায় সেখানে আছেন অরুণ ঔপবেশি। বৃহদারণ্যকের বংশব্রাহ্মণে দেখা যাচ্ছে, উপবেশী থেকে বিদ্যাগ্রহণ করছেন অরুণ, অরুণ থেকে উদ্দালক (৬।৫।৩)। উদ্দালকের ছেলে শ্বেতকেতু বাবার কাছ থেকেই বিদ্যাগ্রহণ করেছিলেন, এ আমরা জানি। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, তাঁদের বংশের সবাই বেদবিৎ (ছা. ৬।১।১)। এথেকে মনে হয়, উদ্দালকও বিদ্যাগ্রহণ করেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে, তাঁর বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে ইত্যাদি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশ এক। তাহলে শতপথের বিবরণ অনুসারে অশ্বপতির কাছে বিদ্যার্থী হয়ে গিয়েছিলেন উদ্দালক নয়, তাঁর বাবা অরুণ। শতপথের বিবরণটিই প্রাচীনতর বলে মনে হয়। তবে রাজার কাছে বাবা গিয়েছিলেন না ছেলে গিয়েছিলেন এ নিয়ে বিতর্কে বিশেষ-কিছু লাভ নাই। উদ্দালক স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্, অথচ তাঁর জানবার তৃষ্ণা কিছুতেই মিটছে না, যেখানেই নতুন-কিছুর সন্ধান পাচ্ছেন সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন মানাভিমান না রেখে, তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য একান্তই শ্রদ্ধেয়।

[২১০] এ-উপাসনা আত্মোপাসনা, অর্থাৎ অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এখানে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, প্রাচীনশাল দ্যুলোককে আত্মা বলে উপাসনা করেন; তাঁর ভাবনার রূপ তাহলে হবে 'আমিই দ্যুলোক'। এমনি করে প্রত্যেকটি উপাসনায় আত্মচৈতন্যের উদ্দীপন এবং বিস্ফারণ ঘটানো হচ্ছে। শতপথের বিবরণে দেখি, অশ্বপতি একেক-জনকে প্রশ্ন করছেন, 'আপনি কাকে বৈশ্বানর বলে জানেন?' অর্থাৎ সেখানে দেবতাকে বিশ্বে দেখার কথাটাই আগে উঠেছে। তারপর অশ্বপতি বিদ্যার্থীদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনছেন অধ্যাত্মে (১১)।

[২১১] বৈশ্বানরের বিশেষ বিবরণের জন্য দ্র. ঋ. স. ৩।২ ভূমিকা।

পৃথগ্‌বর্ত্মা (নানা দিকে ধাবমান); আকাশ তাঁর সন্দেহ (দেহকাণ্ড), তিনি তখন বহুল (বিরাট্‌); অপ্‌ তাঁর বস্তি (মূত্রাশয়), তিনি তখন রয়ি;[২১২] পৃথিবী তাঁর পাদ, তিনি তখন প্রতিষ্ঠা। তিনিই আপনাদের আত্মা। তাঁকে প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান আত্মা-রূপে উপাসনা করলে সর্বভূতে সর্বলোকে এবং সর্বাত্মায় অন্নাদ হওয়া যায়।'[২১৩]

তারপর বৈশ্বানরের অখণ্ড রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে অশ্বপতি বললেন, 'এই-যে বৈশ্বানর, তিনিই আপনাদের আত্মা। তাঁর মূর্ধাই সুতেজা, চক্ষু বিশ্বরূপ, প্রাণ পৃথগ্‌বর্ত্মা, দেহকাণ্ড বহুল, মূত্রাশয় রয়ি, পৃথিবী চরণ, বুক বেদি, লোম বর্হি, হৃদয় গার্হপত্য, মন অন্বাহার্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) এবং মুখ আহবনীয়।'[২১৪]

বৈশ্বানর যেমন গার্হপত্যাদিরূপে যজ্ঞাগ্নি, তেমনি আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি প্রাণাগ্নিও। অগ্নিহোত্র শ্রৌতযজ্ঞগুলির মধ্যে সবচাইতে সরল, আহিতাগ্নিকে প্রতিদিন

---

[২১২] এই কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমরা অপ্‌এর সঙ্গে রয়ির সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি (তু. শ. ব্রা. ১০।৬।১।১১)। রয়ি শব্দটি ঋক্‌সংহিতায় বহুব্যবহৃত। নিঘণ্টুতে তার অর্থ দেওয়া আছে 'উদক' (১।১২) এবং 'ধন' (২।১০)। মন্ত্রব্যাখ্যাতারা, বিশেষত ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা, আগের অর্থটিকে উপেক্ষা করে পরেরটির উপর জোর দিয়েছেন। এতে অধিকাংশক্ষেত্রেই ব্যাখ্যাবিভ্রাট ঘটেছে। (দ্র. ঋ. স. ৩।১।১৯ টীকা)। এখানে অপ্‌ রয়ি এবং বস্তির সমীকরণকে রয়ির প্রকৃত অর্থের বিনিগমক বলা যেতে পারে।

[২১৩] অর্থাৎ সর্বময় হওয়া যায়। বৈশ্বানর অন্নাদ (তু. গী. ১৫।১৪), বিশ্ব তাঁর অন্ন। এই ভাবনারই প্রতিরূপ পাই সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদে। কিন্তু সাংখ্যে পুরুষ উপদ্রষ্টা, প্রকৃতি পরিণামিনী, যদিও প্রকৃতির পরিণাম ঘটছে পুরুষের জন্যই। আর অন্নাদ অন্নকে রূপান্তরিত করে চলেছেন তাঁর চিৎসত্তায়, জড় প্রতিনিয়তই চিন্ময় হয়ে উঠছে তাঁর আবেশে (তু. ছা. ৬।৫-৭)। ব্রহ্মসূত্রে বৈশ্বানরকে ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করা হয়েছে (দ্র. ১।২।২৪-৩২ শাঙ্করভাষ্য)। এখানে বলা হচ্ছে, বৈশ্বানর প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একবিঘতপরিমাণ (তু. অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি, ঈশানো ভূতভব্যস্য...'জ্যোতিরিবাধূমকঃ' কঠ ২।১।১২-১৩)। মধ্য-আত্মা হল হৃদয়। তিনি বিশ্বময় হলেও আবার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয় হতে উপরের দিকে এক বিঘত হল মুখ। ছান্দোগ্য বলছেন, তাঁর হৃদয় গার্হপত্য, মুখ আহবনীয় (৫।১৮।২)। আশ্মরথ্য বলেন, এইটুকুতে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তা-ই তিনি প্রাদেশমাত্র; বাদরি বলেন, তাঁর অনুস্মৃতিও চলে এইটুকুতে; জৈমিনি বলেন, প্রাদেশমাত্রেই অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মদৃষ্টির সাম্য (ব্র. সূ. ১।২।২৯-৩১)। জৈমিনি লক্ষ্য করছেন শতপথব্রাহ্মণের বিবরণকে (১০।৬।১।৯-১১)। সেখানে অশ্বপতি অধিদৈবত-ভাবনাকে অধ্যাত্মভাবনায় ফিরিয়ে আনছেন এই বলে, 'যে-দেবতাদের আপনারা পৃথক্‌-পৃথক্‌ উপাসনা করে আসছেন বাইরে, তাঁদের যদি প্রাদেশমাত্ররূপে অনুভব করতে পারেন, তাহলেই তাঁদের ভাল করে জানা হয় এবং ওখানে-এখানে তাঁরা এক হয়ে যান (অভিসম্পন্নাঃ)। আমি তাঁদের ওখানে-এখানে এক করে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।' তারপর মাথাটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছেন অতিষ্ঠা বৈশ্বানর।' চোখ দুটি দেখিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছেন সুততেজা বৈশ্বানর।' নাকের ছিদ্র দুটি দেখিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছেন পৃথগ্‌বর্ত্মা বৈশ্বানর।' মুখের হাঁ (আকাশ) দেখিয়ে বললেন, 'এই হলেন বহুল বৈশ্বানর।' মুখের জল দেখিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছেন প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর।' অর্থাৎ শতপথে প্রাদেশমাত্র হল চিবুক থেকে মাথার উপর পর্যন্ত। তারপর অশ্বপতি বলতে লাগলেন, 'পুরুষও যা, এই অগ্নি বৈশ্বানরও তা। যিনি এই অগ্নি বৈশ্বানরকে পুরুষের মত করে পুরুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত জানেন (অর্থাৎ যিনি নিজেকে বৈশ্বানর পুরুষে রূপান্তরিত বলে অনুভব করেন তু. ঋ. ৩।২৬।৭), তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করে সর্বায়ু লাভ করেন।' এখানে অধিভূত অধিদৈবত অধ্যাত্ম তিনটি দৃষ্টিই মিলে গেল—যিনি বিশ্বভুবনরূপে প্রকাশিত, তিনি আমিরূপেও প্রকাশিত। এই হল বৈদিক অদ্বৈতবাদের মর্মকথা। তাঁকে বিশ্বের সর্বত্র দেখছি—এই ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে সংহিতায়। আর ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, তাঁকে আমার মাঝে দেখছি—এই ভাবেরই প্রাধান্য। ছান্দোগ্যে একেই বলা হয়েছে 'অভিবিমান'।

[২১৪] এখানে 'বৈশ্বানর আত্মা' বলায় অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু 'তাঁর বুক বেদি' ইত্যাদি বলাতে অধিযজ্ঞদৃষ্টিকেও এই দৃষ্টির অন্তর্গত করা হয়েছে। যাজ্ঞিককে এই ভাবনা করতে হবে, 'এই বেদি যেমন বৈশ্বানরের বুক, তেমনি আমারও বুক, কেননা বৈশ্বানরই আমার আত্মা' ইত্যাদি। অধিযজ্ঞ ভাবনাটুকু শতপথে নাই।

তার অনুষ্ঠান করতে হয়। এক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানেই সব যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় বলা হয়। অগ্নিহোত্রের আহুতি দিতে হয় বাইরে জ্বালানো শ্রৌতাগ্নিতে। কিন্তু এই দেহেও তো আগুন জ্বলছে, তাতে প্রতিদিন আমরা অন্নাহুতিও দিচ্ছি। যজ্ঞভাবনায় এইটি করলেই তা হয় 'প্রাণাগ্নিহোত্র।'[২১৫]

যেমন গার্হপত্য দক্ষিণ আহবনীয় সভ্য ও আবসথ্য এই পাঁচটি যজ্ঞাগ্নি, তেমনি প্রাণ ব্যান অপান সমান ও উদান এই পাঁচটি প্রাণাগ্নি। খাওয়ার সময় এই পাঁচটি অগ্নিতে প্রথম পাঁচ গ্রাস অন্ন স্বাহামন্ত্রে আহুতি দিতে হবে। 'প্রাণায় স্বাহা" বলে প্রথম গ্রাস প্রাণে আহুতি দিলে চক্ষু তৃপ্ত হবে; চক্ষু তৃপ্ত হলে আদিত্য তৃপ্ত হবে; আদিত্য তৃপ্ত হলে দ্যুলোক তৃপ্ত হবে; দ্যুলোক তৃপ্ত হলে আদিত্য এবং দ্যুলোকের অধিষ্ঠিত সব-কিছু তৃপ্ত হবে। সবার তৃপ্তিতে আত্মার তৃপ্তি এবং অভ্যুদয়। এমনি করে প্রত্যেক আহুতির বেলায় বুঝতে হবে।[২১৬] এই প্রাণাগ্নিহোত্রের কঙ্কালটি এখনও দ্বিজাতিদের মধ্যে টিকে আছে।

অশ্বপতির বৈশ্বানরবিদ্যার সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চতম অধ্যায়েরও এইখানে শেষ।

তারপর ষোলটি খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়।[২১৭] অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হল একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান। এই এককে বলা হয়েছে 'একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ'।[২১৮] এটি একটি আদেশ।[২১৯] প্রসিদ্ধ 'তত্ত্বমসি' মহাকাব্যটি এই অধ্যায়েই পাওয়া যায়।[২২০] অধ্যায়ের প্রবক্তা উদ্দালক, শ্রোতা তাঁর ছেলে শ্বেতকেতু।[২২১]

---

[২১৫] অনুরূপ একটি আন্তরাগ্নিহোত্রের কথা রাজা প্রতর্দন বলছেন কৌষীতক্যুপনিষদে (১।৫)। সেটি হল শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে বাক্ ও প্রাণের হোম। দুটিতেই ক্রিয়াবিশেষবহুল দ্রব্যযজ্ঞকে সরল জ্ঞানযজ্ঞে রূপান্তরিত করবার ইশারা পাওয়া যায়।

[২১৬] এই হল ভাবনার ধারা। পাঁচটি প্রাণকে যুক্ত করা হয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি দেবতা এবং পাঁচটি লোকের সঙ্গে। তু. দ্বারপালোপাসনা (৩।১৩)। সেখানে উদানের সম্পর্ক বায়ু আর আকাশের সঙ্গে, এখানে ত্বক্ আর বায়ুর সঙ্গে—এই মাত্র তফাত। উদানই চেতনাকে ঊর্ধ্বগামী করে (দ্র. ছা. ৩।১৩।৫, প্র. ৪।৪)। দ্বারপালোপাসনা আর প্রাণাগ্নিহোত্রের আপাতলক্ষ্য আলাদা, তাই দুটিতে উদানের ক্রিয়াও আলাদা। একটি উদান বায়ু বা প্রাণকে আকাশে মিলিয়ে দেয়, আরেকটিতে সর্বশরীরব্যাপী স্পর্শবোধকে (ত্বক্‌কে) দিব্যস্পর্শে (বায়ুতে) রূপান্তরিত ক'রে অবশেষে তাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয়। আহারকে যজ্ঞভাবনায় ভাবিত করবার এই হল চরম ফল। তার তৃপ্তি শুধু জৈবতৃপ্তি নয়, একটা দিব্যতৃপ্তি, শূন্যতার একটা আনন্দ। প্রাণাগ্নিহোত্রের ফলে যে-লোকচেতনার স্ফুরণ হবে, যথাক্রমে তারা হল দ্যৌঃ দিক্ পৃথিবী বিদ্যুৎ এবং আকাশ। অর্থাৎ চেতনা বিদ্যুতের মত দ্যুলোকে-ভূলোকে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে মিলিয়ে যাবে। যে-কোনও ইন্দ্রিয়ভোগের পর্যবসান যদি এইভাবে হয়, তাহলেই মানুষ 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'—এইখানেই ব্রহ্মকে বা বৃহৎকে সম্ভোগ করতে পারে (ক. ২।৩।১৪)।

[২১৭] এই অধ্যায়টিকে ষোল খণ্ডে বিভক্ত করার তাৎপর্য ষোড়শকল পুরুষের (৬।৭।১) ইঙ্গিত করা—ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্তের মত। পুরুষের ষোড়শী কলাই 'সন্মূল' (৬।৮।৪)। তার ওপারে 'অসৎ' (৬।২।১), তন্ত্রে যাকে সপ্তদশী নির্বাণকলা বলা হয়েছে।

[২১৮] ৬।২।১

[২১৯] ৬।১।২, ৩

[২২০] ৬।৮।৭, ৯।৪, ১০।৩, ১১।৩, ১২।৩, ১৩।৩, ১৪।৩, ১৫।৩, ১৬।৩

[২২১] উদ্দালককে আমরা এখানে ব্রহ্মবিদ্‌রূপে পাচ্ছি। প্রবাহণের সঙ্গে তাঁর সংবাদটা পরের ঘটনা। উদ্দালককে আরেকবার আমরা দেখতে পাব জনকের সভায়। সেখানেও তিনি নিজেকে রহস্যবিৎ বলে পরিচয় দিচ্ছেন (বৃ. ৩।৭।১)। শ্বেতকেতু ছাড়া উদ্দালকের আরও দুটি ছেলের সন্ধান পাওয়া যায়—কুসুরুবিন্দ (তৈ. স. ৭।২।২।১), আর বাজশ্রবস (ক. ১।১।১, ১১; আসল নামটি জানা যায় না, কেননা বাজশ্রবার ছেলে হলেন কুশ্রি বাজশ্রবস, যিনি উদ্দালকের প্রপিতামহ, দ্র. শ. ব্রা.

শ্বেতকেতু বার বছরের হলে উদ্দালক বললেন, 'বাবা, আমাদের কুলে কেউ বেদাধ্যয়ন না করে ব্রহ্মবন্ধু[২২২] হয়ে থাকেনি। তুমি আচার্যগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন কর।' ছেলে বার বছর পরে ফিরে এলেন পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নিয়ে, দেমাকে কারও সঙ্গে কথাই বলেন না। বাবা তাকে বললেন, 'কথাই বল না যে বড়! আচ্ছা, যাকে জানলে সব জানা হয়, সে-আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে? যেমন একটা মাটির ঢেলাকে জানলে মাটির সব-কিছুকেই জানা যায় বিকার বলে কথার কথা বলে, জানা যায় মাটিই সত্য?' শ্বেতকেতু বললেন, 'আচার্যেরা এ-আদেশ নিশ্চয় জানেন না, জানলে বলতেন। আচ্ছা, আপনিই বলুন।'

উদ্দালক বলে চললেন, 'দেখ, এই যা-কিছু তা আদিতে এক এবং অদ্বিতীয় সৎই ছিল। কেউ বলেন,—না, আদিতে অসৎই ছিল, তাহতে সৎ হয়েছে। কিন্তু কি করে তা হয়? তাই বলি আদিতে সৎই ছিলেন।[২২৩] সেই সৎ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রজাত হব। তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। সেই তেজ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রজাত হব। তিনি অপ্ সৃষ্টি করলেন। অপ্ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রজাত হব। তিনি অন্ন সৃষ্টি করলেন।[২২৪]

১০।৫।৫।১)। উদ্দালক গোতমবংশীয়। বংশটি অতিপ্রাচীন। এই বংশের বামদেব ঋক্‌সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা, নোধা একটি প্রকীর্ণমণ্ডলের (১।৫৮-৬৪)। স্বয়ং গোতম রাহূগণও আরেকটি প্রকীর্ণমণ্ডলের দ্রষ্টা (১।৭৪-৯৩)। বিখ্যাত 'মধু বাতা ঋতায়তে' তৃচটি এঁরই। ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তকও একজন গোতম। বুদ্ধদেবও তা-ই। বামদেবের কথা আগেই বলেছি। গোতমেরা ভারতবর্ষের অধ্যাত্মদর্শনের ইতিহাসে একটা ছাপ রেখে গেছেন বলা চলে।

[২২২] ব্রাহ্মণের সঙ্গে যার মাত্র 'বন্ধন' বা রক্তের সম্পর্কই আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের শীল বা বিদ্যা নাই। এরা সমাজে হেয়।

[২২৩] তু. ছা. ৩।১৯।১। উদ্দালকের 'একং সৎ'এর মূল ঋক্‌সংহিতায় : 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (১।১৬৪।৪৬)। একত্বের স্পষ্ট উল্লেখ শুধু এইটিই নয়, আরও অনেক আছে, তার আলোচনা অন্যত্র করেছি। সদ্‌বাদের পাশাপাশি অসদ্‌বাদও পাওয়া যায় ঋক্‌সংহিতাতেই : 'দেবানাং পূর্বে যুগে অসতঃ সদজায়ত, দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদজায়ত (১০।৭২।২, ৩); সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা (১০।১২৯।৪; তু. অস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি ১।১৬৪।৪)। অসতের পরিকল্পনা এসেছে ভোরের আগেকার অন্ধকার হতে : 'বি নূনমুচ্ছাদ্ "অসতি" প্র কেতুঃ' (১।১২৪।১১)। নাসদীয়সূক্তে একে বলা হয়েছে 'তমঃ', অথচ 'অপ্রকেতং সলিলম্'—প্রচেতনাশূন্য প্রাণ টলমল করছে যেখানে (১০।১২৯।৩)। দেববাদের ভাষায় অসৎকে বলা হয়েছে অদিতি, আর সৎকে দক্ষ। তখন 'অদিতের্দক্ষো অজায়ত' (১০।৭২।৪), অদিতির কোলেই দক্ষের জন্ম (১০।৫।৯)। আবার অদিতিকে অসতেরও মাতা বলা হয়েছে : অসৎ তখন 'মার্তাণ্ড' বা মড়া ডিম, উপনিষদের ভাষায় 'অসম্ভূতি', যা মৃত্যুরই আরেক রূপ (১০।৭২।৮, ৯)। সূর্যাস্তের সময় বরুণ তাঁর 'অপ্য যোনি'তে (জলময় উৎসে, কারণসলিলে) যান, বিশ্ব তখন হয় 'মার্তাণ্ড' (২।২৮।৮; 'বিশ্ব' এখানে সর্বনাম, অর্থ 'সবাই'; তু. ৫।৫০।১, ৭।১৮।৪, 'বিশ্বকঃ' ৮।৮৬।১-৩)। বরুণ রাত্রির দেবতা, রাত্রি অসতের প্রতিরূপ। বরুণের শূন্যতাই হল 'শূন', যাকে ঋষি চান না ('মাহং...বরুণ...আ বিদং শূনমাপেঃ' ২।২৭।১৭, ২৮।১১, ২৯।৭)। সৎ আর অসৎ দুইই আছে পরমব্যোমে (১০।৫।৯); অথবা এমন-এক সময় ছিল, যখন অসৎ বা সৎ কিছুই ছিল না (১০।১২৯।১)। উদ্দালক যে-বিকল্পের কথা বলছেন, তার সমন্বয় আছে তৈত্তিরীয়োপনিষদে : 'অসৎই সে হয়ে যায়, যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলে জানে; অস্তি ব্রহ্ম এই জানলে তাকে সৎ বলেই জানে (২।৬; তু. ২।৭)।'

[২২৪] সৎ > তেজ > অপ্ > অন্ন—সৃষ্টির এই ধারা। সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে ঈক্ষণ। ঈক্ষণ হতে সৃষ্টি (তু. ব্র. সূ. ১।১।৫)। তারই নাম দিতে পারি দৃষ্টি-সৃষ্টি। ভাবই রূপ হল, কিন্তু চিন্ময় রূপ। তেজ হতে অন্ন পর্যন্ত একটা ক্রমিক ঘনীভাব আছে। তৈত্তিরীয়ের পঞ্চ মহাভূতকে (২।১।৩) পাচ্ছি না, পাচ্ছি তিনটিকে। ঈক্ষণ অন্যত্র 'কাম' (তৈ. ২।৬।১; তু. ঋ. কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ১০।১২৯।৪; অ. স. কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ...৯।২।১৯-২৫, তু. ১৯।৫২)। তেজ 'তপঃ' (প্র. ১।৪; তৈ. ২।৬।১;

'এই তেজ অপ্ এবং অন্নই সর্বভূতের তিনটি বীজ। যথাক্রমে তাদের সংজ্ঞা আণ্ডজ জীবজ উদ্ভিজ্জ।[২২৫] তারাও দেবতা অর্থাৎ চিন্ময়। কিন্তু পরমদেবতার অনুপ্রবেশ ছাড়া তারা সক্রিয় হয় না। আবার তারা সক্রিয় হলেই যা অব্যাকৃত তা নাম এবং রূপে ব্যাকৃত হতে পারে। তাই পরমদেবতা তাদের মাঝে চিন্ময় প্রাণ রূপে (জীবেন আত্মনা) অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ করলেন অর্থাৎ প্রত্যেকের মাঝে অন্য দুটির আংশিক মিশ্রণ ঘটালেন।

'তাই প্রত্যেক বস্তুতে আমরা লোহিত শুক্ল এবং কৃষ্ণরূপে এই তিনটি চিৎশক্তির মিশ্রণের আভাস পাই, যেমন অগ্নিতে আদিত্যে চন্দ্রমায় বিদ্যুতে। বস্তুর বীজশক্তিরূপে এই তিনটি রূপই সত্য, আর-সব হচ্ছে বিকার এবং কথার কথা মাত্র। বস্তুর তত্ত্বকে এইভাবে জানলে আর-কিছুই জানবার থাকে না, প্রাচীনেরা এটি জানতেন।[২২৬]

'এই তিনটি চিদ্‌বিভূতি যখন সর্বত্র সক্রিয়, তখন তোমার মাঝেও তারা সক্রিয়। তুমি অন্ন খাও ; তার স্থূল অংশ মলরূপে বেরিয়ে যায়, মধ্যম অংশ হয় মাংস আর

মু. 'জ্ঞানময়ং তপঃ' অর্থাৎ ঈক্ষণ ও তপের সমাহার ১।১।৯; তু. ঋ. স. ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ১০।১৯০।১)। তেজ অপ্ এবং অন্ন তিনটিকেই এখানে 'দেবতা' বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এরা সৎএর চিদ্‌বিভূতি।

[২২৫] সাধারণত ভূতদের বলা হয় উদ্‌ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। এখানে স্বেদজ সংজ্ঞাটি নাই। তাছাড়া ভূতদের কথাও হচ্ছে না, হচ্ছে ভূতবীজদের কথা। তিনটি দেবতাই যে বীজ, একথা পরের কণ্ডিকাগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে। এদের উৎপত্তি সৎ থেকে। সুতরাং সৎই আণ্ড জীব এবং উদ্‌ভিদ্। তিনি প্রথমে সম্ভূত হলেন তেজোময় অণ্ডের আকারে (তু. ছা. ৩।১৯।১)। এই অণ্ডের মাঝেই রয়েছে জীবশক্তি—সূক্ষ্ম ভ্রূণরূপে। সেই ভ্রূণের মাঝে নিহিত রয়েছে উদ্‌ভিৎ-শক্তি অর্থাৎ সংহত রূপ নিয়ে ফুটে বের'বার শক্তি ('নিরভিদ্যত' শব্দটি লক্ষণীয় ৩।১৯।১)। এই তিনটি শক্তির দেবরূপ হল তেজ অপ্ এবং অন্ন। কিন্তু তারা এক সৎ হতেই উৎপন্ন, তাই তারা আণ্ডজ জীবজ এবং উদ্‌ভিজ্জ।

[২২৬] এখানে সাংখ্যের ত্রিগুণা প্রকৃতির একটি প্রতিচ্ছবি পাচ্ছি। তবে সাংখ্য দেখছেন বিশ্লেষণ দৃষ্টিতে—প্রকৃতিকে পুরুষ থেকে আলাদা করে; আর উপনিষৎ দেখছেন সংশ্লেষণদৃষ্টিতে—প্রকৃতিকে পুরুষেরই আত্মসম্ভূতিরূপে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সাংখ্যভাবনার বীজটি আছে এই মন্ত্রে : 'অজামেকাং "লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ, অজো হ্যেকঃ জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তাভোগামজোঽন্যঃ' (৪।৫)। মন্ত্রের প্রথমার্ধটি উদ্দালকের ভাবনারই সংক্ষিপ্ত রূপ। রজঃ সত্ত্ব তমঃ তিনটি গুণকে যথাক্রমে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণরূপে দেখার তাৎপর্য হল, প্রকৃতির গুণক্রিয়াতে বাস্তবিক স্ফুরিত হচ্ছে চিজ্জ্যোতি। সমস্ত সৃষ্টির তা-ই লক্ষ্য। এই চিৎস্ফুরণের অধিভূত রূপ হল সূর্যোদয়। অন্ধকার লাল হয়ে ওঠে আগে, তারপর আলোর আবির্ভাব হয়। আকাশ যতক্ষণ লাল না হয়, ততক্ষণ বুঝতে পারি না যে আলো ফুটবে। তাই লাল রংকে বা রজঃশক্তিকে আদিতে স্থান দেওরা হয়েছে। এই রজঃ হল পুরুষের ঈক্ষা বা কামনার তাপ। সূর্যের উদয় হয় রক্তপিণ্ডের মত, তারপর ক্রমে তা ভাস্বর হয়ে ওঠে। মাধ্যন্দিন সূর্যের ভাস্বরতাই হল তার সত্য রূপ। কিন্তু ভাস্বরতা টেকে না, আলো ক্রমে অন্ধকারে তলিয়ে যায়। জীবনে অথবা সৃষ্টিতে এই হল জরা এবং মৃত্যুর অভিশাপ। আলো কালো হয়ে যায়, শুক্ল হয় কৃষ্ণ। কিন্তু আবার সেই কৃষ্ণকে প্রতপ্ত এবং সুলোহিত করে শুক্লের আবির্ভাব হয়। লোহিতের আদিতে কৃষ্ণ, অন্তে, শুক্ল, কৃষ্ণের মাঝে শুক্লের আভাস, আবার শুক্লের মাঝে কৃষ্ণের ছায়া—লোহিত দুয়ের মাঝেই সক্রিয়। এই ত্রিবৃৎ ক্রিয়া জগতের সর্বত্র। এর প্রতিরূপ যেমন দেখতে পাই সূর্যোদয়ে, তেমনি অগ্নিসমিন্ধনেও। অগ্নিশিখারাও 'কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা য়া চ সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী' (মু. ১।২।৪)। ঋক্‌সংহিতায় অগ্নির সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কৃষ্ণঃ শ্বেতোঽরুষো য়ামো অস্য' (১০।২০।৯)—এখানেও ঐ একই ভাবনা। ত্রিগুণের আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত : 'অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে য়ে ভূতানি সমকৃন্বন্নিমানি' (১০।৮২।৪; সূর্ত < স্বর্ 'আলো')। বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্দালক অধিদৈবত রূপের লীলাই প্রথম দেখালেন, তাঁর উদাহরণগুলি হল অগ্নি আদিত্য চন্দ্রমা এবং বিদ্যুৎ। এগুলি স্পষ্টতই ধ্যানের আলম্বন এবং এদের মাঝে একটা পরম্পরাও আছে। রূপলীলা বা গুণলীলা যে চিৎশক্তিরই খেলা, এখানে তারই ইঙ্গিত।

সূক্ষ্মতম অংশ হয় মন। তেমনি যে-অপ্ পান কর, তাও যথাক্রমে হয় মূত্র রক্ত এবং প্রাণ। যে-তেজ খাও, তা হয় অস্থি মজ্জা এবং বাক্। তোমার মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়। এরা ঐ তিনটি চিদ্‌বিভূতিরই ঊর্ধ্বপরিণাম।'

শ্বেতকেতু বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' উদ্দালক বললেন, 'আচ্ছা পনের দিন কিছু খেও না। তবে জল খেতে পার। তারপর আমার কাছে এসো।'

ষোল দিনের দিন শ্বেতকেতু এলে পর উদ্দালক বললেন, 'এবার বেদপাঠ করে শোনাও তো।' শ্বেতকেতু বললেন, 'আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না।' উদ্দালক বললেন, 'এবার খেয়ে এস, তাহলেই মনে পড়বে।'

সত্যি তা-ই হল। তখন উদ্দালক বললেন, 'এবার বুঝতে পারছ, কেন বলে-ছিলাম মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় আর বাক্ তেজোময়?[২২৭]

প্রথম সাতটি খণ্ডে শ্বেতকেতুর শিক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হল। তারপর বাকী নয়টি খণ্ডে দ্বিতীয় পর্বের বিবরণ। সৎই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই প্রসঙ্গই চলছে, কিন্তু উপদেশ হয়েছে আরও গভীর। প্রত্যেক খণ্ডের শেষে একটি ধুরা আছেঃ 'স য় এষ অণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'— এই যে অণুভাব, তা-ই এসব-কিছুর আত্মা, তা-ই সত্য, তা-ই আত্মা; হে শ্বেতকেতু, তা-ই হচ্ছ তুমি।' এইটি বিশেষ লক্ষণীয়।

একদিন উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, 'শোন, তোমাকে সুপ্তির রহস্য বলছি। মানুষ যখন ঘুমায়, তখন সে সৎ-এর সঙ্গে এক হয়ে যায়। মন এতক্ষণ এদিক-ওদিক করছিল, ঘুমের সময় আর-কোথাও আশ্রয় না পেয়ে সে প্রাণের মাঝে তলিয়ে গেল, কেননা মনের বোঁটাটি রয়েছে ঐ প্রাণে।[২২৮]

'ক্ষুধা-তৃষ্ণার রহস্যও তোমাকে বলছি। মানুষ যা খায়, তাকে পরিপাক করে জল, অন্ন রসে রূপান্তরিত হয়। এই রসকে শোষণ করে তেজ, রস রূপান্তরিত হয় তেজে। তাহলে দেহের মূল অন্ন, অন্নের মূল অপ্, আর অপের মূল তেজ। তেজের মূল সেই সৎ। মানুষ যখন মরে, তখন তার বাক্ লয় হয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে আর তেজ সেই সদ্‌রূপী পরমদেবতায়।

'এই সৎ হলেন অণিমা বা সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। তিনিই সব-কিছুর আত্মা, তিনিই আত্মা, তিনিই হচ্ছ তুমি।'

---

[২২৭] উদ্দালকের মতে তাহলে বাক্ রাজস, প্রাণ সাত্ত্বিক আর মন তামস। এটি প্রাকৃত ধারণার সঙ্গে কিন্তু মেলে না। আমরা মনকে সবার উপরে স্থান দিই। বহির্জীবনে কথাটা সত্য হতে পারে, কিন্তু অন্তর্জীবনে অন্তরাবৃত্তির পথে মনের যান্ত্রিক আবর্তন যে কত বড় বাধা তা সবাই জানি। মনকে তখন তামস না বলে উপায় থাকে না। বাক্‌কে বৈদিক দর্শনে আদ্যাশক্তি বলে ভাবনা করা হয়, তিনিই সৃষ্টির প্রবর্তিকা (ঋ. ১।১৬৪।৪১, ৪২)। মন শুদ্ধ হলে আমাদের মাঝে বাকের সত্য স্ফুরণ হয় মন্ত্ররূপে (তু. ঋ. ধীরা মনসা বাচমক্রত ১০।৭১।২, যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্ ৩, উতো স্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়ের পত্য উশতী সুবাসাঃ ৫)। আর সেই বাক্‌ই আমাদের নিয়ে যান আদিত্যরূপী চিন্ময় মহাপ্রাণে বা জ্যোতিঃসমুদ্রে। উদ্দালকের ভাবনা এই দর্শনের অনুযায়ী।

[২২৮] সচেতন থেকে এমনি করে মনকে প্রাণে লয় করে দিতে পারলে তা-ই হয় যোগীর সমাধি 'নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।'

শ্বেতকেতু বললেন, 'আবার বুঝিয়ে বলুন।' উদ্দালক বললেন, 'আচ্ছা, বলছি।[২২৯]

'দেখ, মৌমাছিরা নানা ফুলের রস এনে মধু তৈরি করে। মধুটা কিন্তু একরস, তাতে এ-ফুলের মধু না ও-ফুলের মধু তার কোনও নিশানা থাকে না। তেমনি মানুষ যখন সতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়,[২০০] তখন সে যে একাকার হয়ে আছে, এ-বোধ তার থাকে না। যখন সেখান থেকে ফিরে আসে, তখনই সে বাঘ বা সিংহ বা পোকামাকড় যা হবার তা হয়।[২০১] এমনি করে নানা নদী এসে একই সমুদ্রে মিশে যায়। এই হল সতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, তা-ই আত্মা, তা-ই হচ্ছ তুমি।

'একটা গাছের মূলে মধ্যে বা আগায় যেখানেই আঘাত কর না কেন, গাছটা যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে রস ঝরাবে। আত্মা জীব বা প্রাণশক্তিরূপে তার সবখানি ব্যাপে আছেন বলেই সে আনন্দে আছে। প্রাণশক্তি তার একটি ডাল ছেড়ে গেলে ডালটা শুকিয়ে যায়, সব ছেড়ে গেলে সবটাই শুকিয়ে যায়। প্রাণশক্তি ছেড়ে গেলে দেহটাই মরে, কিন্তু প্রাণশক্তি তো মরে না।

'আচ্ছা, একটা বটফল নিয়ে এস। ভেঙে দেখ, কি দেখতে পাচ্ছ? ছোট-ছোট বীজ? একটা বীজ ভেঙে দেখ তো। কিছুই দেখছ না? অথচ ঐ কিছুই-নার মাঝেই অত বড় বটগাছটা কিন্তু সূক্ষ্ম হয়ে রয়ে গেছে।

'আচ্ছা, সৈন্ধবের একটা ডেলা আজ জলে ফেলে রেখে কাল সকালে আমার কাছে নিয়ে এসো।...

'এসেছ? ডেলাটা কোথায় গেল? নাই? উপর থেকে একটু জল মুখে দিয়ে দেখ তো কেমন লাগছে। নোনা? এপাশ থেকে দেখ। তাও নোনা? ওপাশ থেকেও নোনা? নুন তাহলে সবজায়গাতেই আছে, কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তেমনি সেই সৎও এখানেই আছেন, কিন্তু তাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না।

'তাঁকে কি তাহলে জানা যায় না? যায় বই কি। ধর, কাউকে গান্ধার হতে চোখ বেঁধে এনে কেউ বনে ফেলে গেল। সে তখন আর গান্ধারে ফিরে যেতে পারবে না। একবার পূবে যাবে একবার পশ্চিমে, কিন্তু পথের দিশা কিছুতেই পাবে না। কেউ যদি তার চোখ খুলে দিয়ে বলে, "গান্ধার এইদিকে। সোজা চলে যাও," সে

---

[২২৯] ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাগ্রতের ব্যাপার। আহারদ্বারা আমরা প্রাণকে পুষ্ট করছি। প্রাকৃত জীবনে এই প্রাণকে আশ্রয় করেই মন এবং বাকের স্ফুরণ হচ্ছে। মন ও বাকের ক্রিয়া চঞ্চল—এটা আমাদের জীবনের প্রবৃত্তির দিক। কিন্তু এই প্রবৃত্তির গভীরে আছে নিবৃত্তির প্রতিষ্ঠা, প্রাণ সেখানে শুদ্ধ হয়ে আছে (তু. প্র. ৪।৩; ২।১৩; ক. ২।৩।২)। এই স্তব্ধতার মাঝে ডুবতে না পারলে প্রবৃত্তিরও স্ফূর্তি হয় না। তাই মানুষকে প্রাণের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়তে হয়। স্তব্ধ প্রাণই 'সর্বাধার', তা-ই সতের স্বরূপ। যেমন নিদ্রাতে, তেমনি মৃত্যুতে আমরা সদ্রূপী মহাপ্রাণেই লীন হয়ে যাই। জাগ্রতের আহারক্রিয়াকেও এমনি করে সৎস্বরূপের স্তব্ধতায় লীন করে দিতে পারলে জীবন অমৃতে অনুষিক্ত হয়। দেহের আহার বা মনের আহার—দুয়েরই পরিণাম তৃপ্তি। তৃপ্তি একটা একরস প্রত্যয়। তাকে সচেতনভাবে ধরে রাখতে পারলে জাগ্রতেও সতের সঙ্গে এক হয়ে থাকা যায়। প্রাণাগ্নিহোত্রের শেষ আহুতিটিতে তার ইঙ্গিত আছে, একথা আগেও বলেছি। আহার-ব্যাপারটার তত্ত্ব উদ্দালক জানতেন একরকম, প্রবাহণের কাছে শুনলেন একটু ভিন্নরকম। মৃত্যু-বিজ্ঞানের বেলাতেও উদ্দালক জানতেন একরকম, প্রবাহণ একটু ভিন্ন কথা শোনালেন। সবাই মৃত্যুর পর সৎএ সম্পন্ন হয়, প্রবাহণ একথা মানেন না।

[২০০] যেমন সুপ্তিতে, মৃত্যুতে বা সমাধিতে।

[২০১] তু. যাজ্ঞবল্ক্যের 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' (বৃ. ২।৫।১২); য়থোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তম্ ইত্যাদি (ক. ২।১।১৫)।

তখন গ্রাম থেকে গ্রামে জিজ্ঞাসা করতে-করতে শেষে গান্ধারে ফিরে আসে। তেমনি আচার্যবান্ পুরুষ সৎকে জানতে পারেন। জানা যায় দেহ থাকতেই। তারপর দেহটা ঝরে পড়লেই তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

'মানুষ মরলে সে সেই সতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, একথা আগেও বলেছি।[২০২] জ্ঞানীর মরণও ঠিক এইভাবেই হয়। তাঁর বাক্ মনে লয় হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরমদেবতায়। তখন তিনিও কিছুই জানেন না। অথচ একটা বোধ তখনও থাকে। কিন্তু সে-বোধ একটা অণুভাব। তা-ই সবার আত্মা। তা-ই সত্য, তা-ই আত্মা। তা-ই হচ্ছ তুমি।[২০৩]

'কেউ চুরি করেছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয় তার হাতে একটা তপ্ত কুঠার তুলে দিয়ে। সে যদি চুরি করেও বলে "আমি্ করিনি," তাহলে তার হাত পুড়ে যায়। কিন্তু যে চুরি করেনি, তার হাত পোড়ে না, কেননা সে সত্যাভিসন্ধ, সত্যদ্বারাই সে আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। তাই রাজপুরুষদের বন্ধন হতে সে মুক্ত হয়। তেমনি যিনি সৎকে জানেন, সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি কখনও দগ্ধ হন না। সদ্‌রূপ বস্তুই এই সব-কিছুর আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। তিনিই হচ্ছ তুমি।'

এমনি করে শ্বেতকেতু পিতার কাছ থেকে সদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করলেন, যা জানলে পর সব জানা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের এইখানে শেষ।[২০৪]

---

[২০২] দ্র. ৬।৮।৬

[২০৩] এইখানটাতেই নচিকেতার প্রশ্ন, 'প্রেত্য' অর্থাৎ মৃত্যু সুপ্তি বা সমাধির পর ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না? এ নিয়ে আলোচনা আগেই করেছি, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের বিবরণ দেবার সময়। প্রশ্নটা চিরন্তন। তার উত্তরে কেউ বলেছেন থাকে, কেউ বলেছেন থাকে না। দুটা উত্তরই সত্য এবং একসঙ্গেই সত্য। অস্তি একটা ভাবপ্রত্যয়; কিন্তু তাকে ঘিরে নাস্তির পরিমণ্ডল—এ-জ্ঞান না হলে অস্তির জ্ঞান বিজ্ঞান হয়ে ওঠে না। আবার নাস্তি একটা অভাবপ্রত্যয়; কিন্তু সেও তো নিঃশক্তিক নয়, অস্তির উৎসারণে এবং সংহরণেই তার শক্তির সার্থকতা। উদ্দালকও একথা স্বীকার করছেন, যখন বলছেন, 'বটের বীজটা ভেঙে কিছুই দেখতে পাচ্ছ না যে, তারই মাঝে ঐ অত বড় বটগাছটা রয়ে গেছে।' অস্তি আর নাস্তির প্রত্যয়কে যদি পর-পর স্থাপনা করা যায়, তাহলে অস্তিবাদী একসময় দেখবেন, তাঁর সব-কিছুকে নাস্তি এসে গ্রাস করছে; আবার নাস্তিবাদীও দেখবেন, একসময় নাস্তিত্বের বুক ফুঁড়ে অস্তিত্বের আবির্ভাব হচ্ছে। এই পর্যায়বোধটাই হল দ্বৈতবীজ। ঋষিরা উপমা দিচ্ছেন অহোরাত্রের—দিন মিলিয়ে যায় রাতের মাঝে, আবার রাতের বুক ফুঁড়ে ফোটে দিনের আলো। অথচ এমন-একটা জায়গা আছে, যেখানে দিনও নাই রাতও নাই, যদিও সেইটাই দিন-রাতের প্রসূতি। তাকে বলতে পারি আদিত্য (দ্র. তৈ. ব্রা. ৩।১১।১০)। চেতনার আদিত্যে স্থিতিই হল অমৃতত্ব। আদিত্যের দ্যুতি হল বিজ্ঞান। কিন্তু তারও গভীরে হচ্ছে আকাশের বোধ। এই আকাশই সন্মাত্র। সুষুপ্তিতে বা মৃত্যুতে মানুষ সেখানেই যায়। প্রাকৃত জীবের জাগ্রতে আকাশের বোধ উজ্জ্বল নয়। তাকে উজ্জ্বল করে তোলাই হল মরমীয়ারা যাকে বলেছেন 'জ্যান্তে-মরা' হয়ে থাকা। উদ্দালকের 'সৎ' এই শুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ। এই ব্রহ্মসদ্‌ভাব একরস নির্বর্ণ অথচ ব্যাপক একটা অনুভব। উদ্দালকের ঝোঁক নিরুপাধিক প্রত্যয়ের দিকে, এইটি লক্ষণীয়। উদ্দালকের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁর হাতে এই সদ্‌বাদ নেতিবাদে পরিণত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

[২০৪] সমস্তটি অধ্যায়েই উদ্দালকের নিজস্ব দর্শনের বিবৃতি। সে-দর্শনের সার এই : জগতের মূলে অসৎ নয়, আছেন 'একং সৎ'। চিন্ময় সংকল্পশক্তির দ্বারা এই এক এবং অদ্বিতীয় সৎই বহুরূপে প্রজাত হয়েছেন। প্রজাতির মূলে তাঁর চিৎশক্তির যে-প্রবেগ রয়েছে, তার তিনটি পর্ব—তেজ (তপঃ), অপ্ (প্রাণ) এবং অন্ন (জড়)। এই তিনটির অন্যোন্যসংমিশ্রণে ভূতের সৃষ্টি হয়েছে। এদের সঙ্গে যথাক্রমে সাংখ্যের রজঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণের মিল আছে। এদেরই সারভাগ হতে মানুষের মাঝে ফুটেছে বাক্ প্রাণ এবং মন। মন অন্নেরই বিকার। সৎকে জানলেই সব জানা হয়। তাঁর স্বরূপকে ধরতে পারা যায় সুষুপ্তিতে। তখন মনোলয় হয়, কিন্তু প্রাণ জেগে থাকে।

তারপর ছাব্বিশটি খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়। এই অধ্যায়টি নারদ-সনৎ-কুমার-সংবাদ, প্রতিপাদ্য ভূমার বিজ্ঞান।[২০৫]

নারদ বিদ্যার্থী হয়ে সনৎকুমারের কাছে গেলে তিনি বললেন, 'তুমি কি জান তা বল, তারও পরে যদি কিছু থাকে আমি বলব।' নারদ যা জানেন, তার একটা দীর্ঘ তালিকা[২০৬] দিয়ে বললেন, 'এত জেনেও আমি মন্ত্রবিৎই মাত্র, আত্মবিৎ নই।' সনৎকুমার বললেন, 'তুমি যেগুলির কথা বললে, সেসবই হল নাম। নামও ব্রহ্ম।[২০৭] তুমি নামের উপাসনাই কর না কেন?

'কিন্তু নামের চাইতে বড় কিছু কি নাই?' 'আছে—বাক্। বাইরে যা নামরূপে ফুটেছে, অন্তরে তা-ই আছে বাক্ হয়ে।[২০৮] বাকের রহস্য জানলেই নামের বিজ্ঞান বা বোধিজ জ্ঞান সম্ভব। এই বোধি দিয়ে দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝে জড় বা চেতন যা-কিছু আছে সবারই তত্ত্ব জানা যায়।[২০৯] তাছাড়া তখন দেখা দেয় বিবেক, যার ফলে ইষ্টার্থের চেতনা জাগে, ধর্ম সত্য এবং সাধুত্বের বোধ স্পষ্ট হয়, কে যে হৃদয়জ্ঞ আর কে নয় তা বোঝা যায়।[২১০] এই বাক্ই ব্রহ্ম।'

'কিন্তু বাকের চাইতে বড় কিছু কি নাই?' 'আছে—মন। নাম আর বাক্ এই মনেরই অন্তর্গত। মানুষ যা-কিছু করে, মনের প্রেরণাতেই করে।[২১১] এই মনই ব্রহ্ম।'

এই প্রাণ সূক্ষ্মবোধময়, একরস, সর্বব্যাপী, অব্যক্তরূপে সবার কারণ। এই হল সৎএর স্বরূপ। ইনিই সবার আত্মা। ইনিই সত্য, ইনিই আত্মা, জীবের স্বরূপও ইনিই। মানুষ মৃত্যুতে এঁরই সঙ্গে এক হয়ে যায়।

[২০৫] নারদ একজন ব্রহ্মবাদী ঋষিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন : অ. স. ৫।১৯।৯, ১২।৪। ১৬, ৪১, ৪২, ৪৩; মৈ. স. ১।৫।৮, ৮।২; ঐ. ব্রা. ৭।১৩।

[২০৬] তু. শ. ব্রা. ১১।৫।৬, ১৩।৪।৩; বৃ. ২।৪।১০, ৪।১।২, ৫।১১। নারদের তালিকায় ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে (তু. ৩।৪।১, ২)। বিদ্যাগুলির অর্থ এই হতে পারে : বেদের বেদ = শিক্ষাদি ছয়টি বেদাঙ্গ; পিত্র্য = পরলোক শ্রাদ্ধ ইত্যাদির তত্ত্ব; রাশি = অঙ্কশাস্ত্র; দৈব = শকুন এবং ফলিত জ্যোতিষের জ্ঞান; নিধি = গুপ্তধনের জ্ঞান (গুপ্তধন অর্থে ঋক্‌সংহিতায় নিধির প্রয়োগ আছে, তু. এষ রেদ নিধীনাম্ ৮।২৯।৩...); বাকোবাক্য = ব্রহ্মোদ্য, বাদানুবাদ; একায়ন = পরমার্থতত্ত্ব, metaphysics ('চরম আশ্রয়' অর্থে শব্দটির অনেক প্রয়োগ আছে উপনিষদে); বেদবিদ্যা = দেবতাবিজ্ঞান (তু. বামদেবের উক্তি : 'গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং জনিমানি বিশ্বা' ঋ. ৪।২৭।১; ভূতবিদ্যা = জড়বিজ্ঞান বা প্রাণিবিজ্ঞান অথবা দুইই; সর্পবিদ্যা ও দেবজন-বিদ্যার জন্য দ্র. শ. ব্রা. ১৩।৪।৩।৯, ১০ (দেবজন = রক্ষঃ পিশাচ ইত্যাদি; ঋক্‌সংহিতায় অর্থ কিন্তু 'দেবমণ্ডলী' ৯।৬৭।২৭; তু. অ. স. ৬।৫৬।১, ২, ১১।১, ৯৩।১...)।

[২০৭] মুণ্ডকোপনিষদে এগুলিকে বলা হয়েছে অপরা বিদ্যা (১।১।৫)।

[২০৮] ঋক্‌সংহিতায় আছে, 'বাকের চারটি পদ, মনীষী ব্রাহ্মণেরাই তার খবর জানেন। তার তিনটি পদ গুহাহিত, তাদের প্রকাশ নাই। মানুষ যা বলে, তা হল বাকের চতুর্থ পদ (১।১৬৪।৪৫)। তন্ত্রে একেই বলা হয়েছে বৈখরী বাক্। সনৎকুমার নাম বলতে তাকেই বুঝিয়েছেন।

[২০৯] এখানে দ্যুলোক ও দেবগণ ছাড়া পঞ্চভূত ও মানুষ হতে গাছপালা পর্যন্ত ভূতগ্রামের উল্লেখ আছে। এগুলিকে পূর্বোক্ত ভূতবিদ্যার বিষয় বলে ধরা যেতে পারে (তু. খণ্ড ৭, ৮, ১০)।

[২১০] সংহিতায় 'হৃদয়জ্ঞে'র অনুরূপ শব্দ 'বিপশ্চিৎ', যা অধিকাংশস্থলেই দেবতার বিশেষণ। তার অর্থ, 'বিপ্' বা ভাবকম্প্রতাকে যিনি জানেন। অর্থাৎ দেবতার জন্য সাধকের হৃদয় যখন উতলা হয়ে ওঠে, দেবতা তখন সাড়া দেন। সংহিতাতেই এই সংজ্ঞাটি সাধকে উপচরিত হয়েছে। এখানে বুঝতে হবে, মানুষ যতক্ষণ বহির্মুখ ততক্ষণই সে অহৃদয়জ্ঞ, তার নিজের হৃদয় কি চায়, তা-ই সে জানে না। যখন জানে, তখন সে হৃদয়জ্ঞ।

[২১১] এ-মন ইন্দ্রিয়নির্ভর বহির্মুখ মন নয়, কিন্তু মনোময়পুরুষাধিষ্ঠিত শুদ্ধ মন যার লক্ষ্য জ্ঞান-আত্মার দিকে (তু. যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি ক. ১।৩।১৩)। অপরোক্ষ অনুভব তার বৃত্তি। বিষয় তখন বাইরে নয়, অন্তরে। বাহ্যপ্রত্যক্ষের চাইতে অন্তর-

'মনের চাইতে বড় কিছু নাই?' 'আছে—সংকল্প। সংকল্প হতেই মনন, মনন হতে বাক্, বাক্ হতে নাম। সব মন্ত্র এক হয় নামে, আর কর্ম এক হয়ে মন্ত্রে।[২৪২] সংকল্পই সব-কিছুর একায়ন আত্মা এবং প্রতিষ্ঠা। দ্যুলোককে আধার করে আকাশ বায়ু তেজ অপ্ এবং পৃথিবীরূপ মহাভূতের যে-পরিণাম, তারও মূলে আছে সংকল্প। ভূতসৃষ্টির অনুকূলে পঞ্চমহাভূতের সার্থক ক্রিয়াপরিণাম হল বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন্ত্র, মন্ত্র থেকে কর্ম (যজ্ঞ), কর্ম থেকে লোক বা চেতনার মহাভূমি এবং তাথেকে সর্বাত্মভাব—এই ঊর্ধ্বপরিণামের প্রতিপর্বে রয়েছে সংকল্পের প্রবেগ। এই সংকল্পই ব্রহ্ম। এর উপাসনাতে মানুষ ধ্রুব এবং অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে সিদ্ধ হয়।'[২৪৩]

'সংকল্পের চাইতে বড় কিছু নাই?' 'আছে—চিত্ত। চেতনা হতেই তো সংকল্প। চিত্তই সব-কিছুর অয়ন আত্মা এবং প্রতিষ্ঠা। কেউ বহুবিৎ হয়েও যদি অচিত্ত হয়, তার থাকা না-থাকা সমান। আবার অল্পবিৎ হয়েও যদি কেউ চিত্তবান্ হয়, তার কথা সবাই শুনতে চায়। চিত্তই ব্রহ্ম। চিত্তের উপাসনাতে মানুষ ধ্রুব এবং অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে সিদ্ধ হয়।'[২৪৪]

'চিত্তের চাইতে বড় কিছু নাই?' 'আছে—ধ্যান। দেখ, পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোক জল পর্বত সবাই যেন ধ্যান করছে। দেবমানবেরাও ধ্যানই করছেন যেন সবসময়। মানুষের মাঝে তাঁরাই মহান্, তাঁরাই প্রভু, তাঁরা যেন মূর্তিমান ধ্যানফল। যারা ক্ষুদ্র, তারা কলহী পিশুন পরনিন্দক। ধ্যানই ব্রহ্ম।'[২৪৫]

প্রত্যক্ষ তখন স্পষ্টতর। বাইরকে তখন অনুভব হয় যেন ভিতরেরই ছায়া। ভাবময় কায়া ভিতরে, বস্তুময় ছায়া বাইরে। অন্তরের-বাইরের সব-কিছু তখন অনুভব হয় যেন হাতের মুঠায়।

[২৪২] এইখানে মন্ত্রশাস্ত্রের একটি মূলরহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সংকল্পই সিদ্ধ হয় কর্মে, এই হল গোড়ার কথা। মন্ত্র হল সে-সিদ্ধির সাধন। মন্ত্রবীর্য নিহিত রয়েছে নামে। মন্ত্র বিস্তৃত যেমন সূক্তাদিতে। নাম সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তবুও তা বৈখরী বাক্। নামের বীর্য নিহিত আছে সূক্ষ্মতর বাকে, যা স্পন্দমাত্র—যেমন তন্ত্রের বীজ। তার গভীরে বিশুদ্ধ মনঃস্পন্দ। তারও গভীরে সংকল্প, যার সঙ্গে 'ঈক্ষা'র নিবিড় সম্পর্ক আছে। মন্ত্রের সাহায্যে কোনও সংকল্পকে সিদ্ধ করতে হলে এই স্তরগুলির ভিতর দিয়ে যেতে হবে। আবার সে-সংকল্পও বিজ্ঞানীর সংকল্প হওয়া চাই।

[২৪৩] অন্তর্মুখ অবাধিত মনে জাগে সংকল্প। সংকল্প রূপকৃৎ শক্তি (<√ কৢপ্ সামর্থ্যে; তু. সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ঋ. ১০।১৯০।৩), সমস্ত বিসৃষ্টির মূলে অমোঘ প্রেরণা। ভাবনির্ভর মনেই সত্যসংকল্পের স্ফুরণ সম্ভব। উপরে দ্যুলোক নীচে পৃথিবী, দুয়ের মাঝে রয়েছে ভূতশক্তির পরম্পরা। ব্রহ্মের সংকল্পশক্তি তাদের মাঝে অনুস্যূত। তারই প্রবেগে শক্তির ধারা নেমে আসে, জড়ের মাঝে জাগায় প্রাণস্পন্দ। প্রাণের সংকল্প হতে জাগে মননের ছন্দ, তাহতে চেতনার উত্তরভূমিসমূহ এবং তাহতে সর্বাত্মভাব।

[২৪৪] সংকল্প শক্তি, কিন্তু তা অন্ধ নয়। তার মূলে আছে লক্ষ্যের চেতনা। তারই আধার হল চিত্ত। অপরোক্ষ অনুভব যেমন মনের বৃত্তি, তেমনি অপরোক্ষ দর্শন হল চিত্তের বৃত্তি। প্রাকৃত জ্ঞানের ধারার এখানে বিপর্যাস ঘটে—দর্শনের পর অনুভব নয়, অনুভবের পর দর্শন। বস্তু ভাব হয়ে ছিল মনে, সেই ভাব আবার বস্তু হল চিত্তে। প্রাকৃত বস্তু নয়, চিদ্‌বস্তু। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টিতে অব্যক্তের পরদার উপর বিদ্যুতের রেখায় চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে। ঋক্‌সংহিতায় তাকে বলা হয়েছে 'চিত্তি' (দ্র. ৩।২।৩ টীকা)। এই অপরোক্ষ দর্শন ছাড়া বিদ্যা অসার্থক।

[২৪৫] ধ্যান যেন প্রশান্ত আকাশের স্তব্ধতা, চিত্ত তার বুকে বিদ্যুতের দীপনী। এই ধ্যান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুকে আবিষ্ট করে আছে। অচিত্তের চোখে তা পড়ে না, পড়ে চিত্তবানের চোখে। অচিত্ত দেখে, সংসার জুড়ে কেবল ছোট মন ছোট কথা আর ছোট কাজ, কেবল ঝগড়া পরচর্চা আর পরনিন্দা। কিন্তু চিত্তবান্ দেখেন, তাকেও ছাপিয়ে আছে দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে পৃথিবীতে বৃহতের এক ধ্যানতন্ময়তার প্রশান্তি। পর্বতের উত্তুঙ্গ স্তব্ধতায়, নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের উদার বক্ষে এই ধ্যান অবিচল হয়ে আছে। যাঁরা ধ্যানী, তাঁরাই মহান্, তাঁরাই জগতের নিয়ন্তা।

'ধ্যানের চাইতে বড় কিছুই নাই?' 'আছে—বিজ্ঞান। আগে বাক্ দিয়ে যা জেনেছ,[২৪৬] সেসমস্তই যদি বিজ্ঞান দিয়ে জানতে পার, তবেই জানা সার্থক হবে। তখন এই অন্নের (অর্থাৎ জড়ের) মাঝেই পাবে রসের সন্ধান, ইহলোকের মাঝেই লোকোত্তরের আনন্দ। এই বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।'[২৪৭]

নারদ আবার প্রশ্ন করলেন, 'বিজ্ঞানের চাইতে বড় কিছুই নাই?' সনৎকুমার বললেন, 'আছে—বল।[২৪৮] একজন বলী একশ'জন বিজ্ঞানীকে কাঁপিয়ে তুলতে পারেন। যে দুর্বল, সে কখনও বিজ্ঞানী হতে পারে না। বল থাকলেই সাধকের মাঝে দেখা দেয় উদ্যম।[২৪৯] সে তখন আচার্যের পরিচর্যা করে এবং অভ্যাসদ্বারা তত্ত্বের সমীপস্থ হয়।[২৫০] তারপর সে তত্ত্বের দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা এবং বোদ্ধা হয়।[২৫১] তারপর সে হয় কর্তা অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ তত্ত্বকে কর্মে প্রতিফলিত করে। তবে সে যথার্থ বিজ্ঞাতা

---

[২৪৬] দ্র. ৭।২।১।

[২৪৭] বিজ্ঞান থেকে যদি অবরোহক্রমে যোগভূমির পরম্পরাগুলি দেখে যাই, তাহলে তার স্বরূপটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানের মুখ্য বৃত্তি সত্তার গভীরে এক ধ্যানতন্ময়তার নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি, ইষ্টের সম্প্রয়োগে বা সাযুজ্যে যার অনুভব হয়। এই ধ্যানচিত্ততায় একটা প্রভাস্বরতা আছে, তাতে অজানা আর অজানা থাকে না, বিদ্যুতের ছটায় চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যা ফোটে, তা নিষ্প্রাণ নয়। তার মধ্যে থাকে একটা রূপায়ণী শক্তি, অন্তর্গূঢ় প্রাণসংবেগ তাকে ছোটায় রূপাভিব্যক্তির দিকে। শুদ্ধ মনে তারই প্রতিবিম্ব পড়ে, জাগে অনুভব—যা বস্তুর দিক থেকে দেখলে অস্পষ্ট, কিন্তু ভাবের দিক থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই অনুভব অন্তর্জগতে ধরে বাঙ্ময় রূপ। অবশ্য বাক্ এখানে বৈখরী বাক্ নয়, ঋষির ভাষায় তা অন্তরিক্ষচারিণী মাধ্যমিকা বাক্ বা 'গৌরী'। ভাব যখন রূপের মাঝে অঙ্গ পেতে চায়, এ তখনকার 'দিব্য'-স্পন্দ, প্রাকৃত কবিও হৃদয়ের আকৃতিতে ও প্রকাশ-বেদনায় যার আভাস পান। সাধকের মাঝে তখন অজানার ছন্দে আপনা হতে মন্ত্রের স্ফুরণ হয়, অথবা অকল্পিত সত্যের দ্যোতনাবাহী মন্ত্রবর্ণের আবির্ভাব হয়। এই হল বাকের কামনার চরিতার্থতা। আর্ষ দর্শন ও বাণীর মূল এইখানে। তারপর বাক্‌কে যখন আটপৌরে ভাষায় রূপ দেওয়া হয়, তখন তা হয় নাম। ভাষা যে একেবারে আটপৌরে হয় তা নয়; ঋষিরা বলেন, তারও মাঝে 'নবীয়ো ব্রহ্ম'র ছোঁয়াচ লাগে মাঝে-মাঝে। তবুও কাঠামটা আটপৌরেই হয়, কেবল বিদ্যুদ্-গর্ভ মেঘের মত মন্ত্রবীর্য তাতে আহিত থাকে। এরপর শুরু হয়ে যায় প্রাকৃত মনের ক্রিয়া। বোধিগ্রাহ্য তত্ত্বকে প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে সে ফেনিয়ে তোলে। কিন্তু নামের জগতে যা অপরা বিদ্যা, বিজ্ঞানভূমিতে তা বিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। এই জন্যই উপনিষদ্ বলছেন, বস্তুত বিজ্ঞানই সর্ববিদ্যার প্রসূতি। ব্রহ্মবিদ্যা হতে ভূতবিদ্যা পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যাকেই তাই দেখা হয়েছে তিনটি ভূমি থেকে। একটি নামের ভূমি যেখানে কথার মারপ্যাঁচ আর তর্কের কচকচি, আরেকটি বাকের ভূমি যেখানে বিদ্যার ভিতর থেকে মন্ত্রবীর্যের স্ফুরণ হয় আর বিজ্ঞানের আভাস জাগে, আর সবার শেষে বিজ্ঞানের ভূমি যেখানে এই অপরা বিদ্যাই রূপান্তরিত হয় পরা বিদ্যার বিভূতিতে।

[২৪৮] এতক্ষণ সনৎকুমার নাম হতে ক্রমে উজিয়ে চলেছিলেন। এখন বিজ্ঞান হতে আবার ভাটিয়ে চলতে শুরু করলেন। উজানপথটি ছিল চেতনার। কিন্তু চেতনা তো নিঃশক্তিক নয়। কৌষীতকীতেও আমরা দেখেছি, প্রজ্ঞা আর প্রাণ অবিনাভূত। শিব-শক্তির নিত্যযুক্ত-তার কথা তন্ত্রেও আছে। বস্তুত শক্তি ছাড়া শিবত্বে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব। মুণ্ডকোপনিষদেও পাই, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (৩।২।৪)। সনৎকুমার এখন এইদিকেই নারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

[২৪৯] মূলে আছে, 'উত্থাতা ভবতি।' তু. উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত (ক. ১।৩।১৪)।

[২৫০] মূলে আছে, 'উপসত্তা ভবতি।' আগেই বলেছি, এটি গুরুর কাছে যাওয়া বোঝাচ্ছেনা, কেননা তার আগেই আছে পরিচর্যার কথা। এখানে সাধকের উপসত্তির অর্থ হল 'উপাসনা'। আর দেবতার উপসত্তি হল 'আবেশ'। দ্র. 'উপনিষৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি।

[২৫১] তু. আত্মনো বারে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ (বৃ. ২।৪।৫, ৪।৫।৬)।

হতে পারে।[২৫২] ত্রিলোকের যা-কিছু, সমস্তেরই প্রতিষ্ঠা এই বলে। সুতরাং বলই ব্রহ্ম।'

'বলের চাইতে বড় কিছুই নাই?' 'আছে—অন্ন। দশদিন না খেয়ে কেউ যদি বেঁচেও থাকে, তার দর্শন শ্রবণ মনন বোধ বা বিজ্ঞান কিছুই আর স্ফুরিত হয় না। তাই বলি, অন্নই ব্রহ্ম।'[২৫৩]

'অন্নের চাইতে বড় কিছু নাই?' 'আছে—অপ্। বৃষ্টিরূপ অপ্ থেকেই তো অন্ন হয়। এই ত্রিলোকে যা-কিছু আছে, সব অপরেই মূর্তি।[২৫৪] সুতরাং অপ্‌ই ব্রহ্ম।'

'অপের চাইতে বড়?' 'তেজ। দেখ না, তেজই আগে অশনি-বিদ্যুৎরূপে দেখা দেয়, তারপর বৃষ্টি হয়। সুতরাং তেজই ব্রহ্ম।'[২৫৫]

'তেজের চাইতে বড়?' 'আকাশ।[২৫৬] চেয়ে দেখ, অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রেরা আকাশেই আছে।[২৫৭] মানুষ আকাশ দিয়েই ডাকে, আকাশ দিয়েই শোনে, আবার আকাশ দিয়েই ডাকের সাড়া পায়।[২৫৮] আনন্দও আকাশে, তার অভাবও

---

[২৫২] এটি বলা হল সাধকের দিক থেকে। কিন্তু বল সিদ্ধেরও হতে পারে। সাধকের বেলায় বল কারণ, বিজ্ঞান কার্য; আর সিদ্ধের বেলায় বিজ্ঞান কারণ, বল কার্য। বল তখন বিজ্ঞানীর যোগবল, আত্মশক্তির স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। তা প্রযুক্ত হয় অপরের মাঝে প্রকাশের যে-বাধা আছে তা ভাঙতে। সে-বলপ্রয়োগ হল অনায়াস আত্মবিকিরণ, সবিতার জ্যোতির্ময় প্রচোদনার মত।

[২৫৩] অর্থাৎ চৈতন্য জড়নির্ভর। কৌষীতকীতেও বলা হয়েছে, প্রজ্ঞামাত্রা এবং ভূতমাত্রা অন্যোন্যনির্ভর (৩।৮)। অন্নের অণিষ্ঠ ভাগ মন, একথা উদ্দালকও শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন (ছা. ৬।৭)। ভূতকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান হয় না; আবার ভূতকে শুদ্ধ না করলেও বিজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। এই ভূতশুদ্ধি এবং তার ফলের কথা আছে শ্বেতাশ্বতরে (২।১২)। এই অধ্যায়েই শেষ খণ্ডে ভূতশুদ্ধিকে বলা হয়েছে 'আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি'। এখন থেকে পঞ্চভূতের যে ক্রমিক উৎকর্ষের কথা বলা হবে, তা এই ভূতশুদ্ধির দিক থেকে। সবচাইতে স্থূল ভূত হল পৃথিবী অন্ন বা জড়—যা এই স্থূলদেহের উপাদান। তার চাইতে সূক্ষ্ম অপ্, তার চাইতে তেজ ইত্যাদি। দেহবোধের ক্রমিক সূক্ষ্মতার দ্বারা ভূতের যোগগুণকে আবিষ্কার করতে হবে। তবে বলের স্ফুরণ হবে। এইটি হল আধ্যাত্মিক বলবিদ্যা, যা আয়ত্ত না হলে বিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকরী হতে পারে না।

[২৫৪] মূর্ত হওয়া মানে সংহত হওয়া। প্রশ্নোপনিষদে আছে, 'মূর্তিরেব রয়িঃ', 'রয়িরেব চন্দ্রমাঃ' (১।৫)। তাহলে চন্দ্রমা অপ্ এবং রয়ি এক পর্যায়ের। দেহবোধের স্থৈর্য যেমন পৃথিবী বা অন্নের যোগগুণ, তেমনি গ্রন্থিহীন দ্রবভাব হল অপের যোগগুণ। বল ও বিজ্ঞানের প্রকাশ তাতে আরও সাবলীল হয়।

[২৫৫] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই তেজ হল তপঃশক্তি। এইটি তার যোগগুণ। অপের গভীরে তেজকে আবিষ্কার করা হল জলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। সংহিতার ভাষায় অপ্ তখন 'দেবীরাপঃ'। দেহ-বোধ তখন অগ্নিস্রোতের মত।

[২৫৬] এখানে বায়ুকে বাদ দেওয়া হল। তেজের রূপ আছে, কিন্তু বায়ু আর আকাশ দুইই অরূপ একটি মিথুন। মৃত্যুকালে তেজ পরমদেবতায় মিলিয়ে যায়, একথা উদ্দালকও বলেছিলেন (৬।৮।৬, ১৫); অধিদৈবত বায়ু এবং অধ্যাত্ম প্রাণকে সংবর্গ বা লয়স্থান বলেছিলেন রৈক্ব (৪।৩।৪)। দুটি ভাবনাতেই পাচ্ছি রূপের অরূপে লয়। সনৎকুমারের ভাবনাও তারই অনুরূপ। ভূতশুদ্ধির ক্রম বজায় রাখতে হলে এখানে বায়ুর অধ্যাহার করে নিতে হবে। পরে অবশ্য প্রাণব্রহ্মের কথা আছে (৭।১৫।১)। বায়ুর যোগগুণ হল স্পর্শবতী প্রবৃত্তি, আর আকাশের নির্বিষয় প্রবৃত্তি (দ্র. শ্বে. ২।১২ ভাষ্য।)

[২৫৭] অর্থাৎ তারা আকাশে ফুটে আকাশেই মিলিয়ে যায়। এটি অধিদৈবত দৃষ্টি। ঠিক এই পাঁচটি জ্যোতির উল্লেখ আছে ক. ২।২।১৫, মু. ২।২।১০, শ্বে. ৬।১৪ তে। অধ্যাত্মভাবনার আলম্বনরূপেও এদের গ্রহণ করা যেতে পারে।

[২৫৮] এখন থেকে অধ্যাত্মদৃষ্টি। ডাকা দেবতাকে, সাড়া পাওয়াও দেবতারই। শোনা হল 'শ্রুতি' —মহাশূন্যে চিন্ময় স্পন্দের বোধ। তাহলে আকাশ বাকের আশ্রয়। আকাশ ব্রহ্ম, বাক্ তাঁর শক্তি। ঋক্‌সংহিতায় পরম ব্যোম এবং সহস্রাক্ষরা গৌরী (১।১৬৪।৪১)।

আকাশে।[২৫৯] সব-কিছু আকাশেই জন্মায় এবং আকাশের দিকেই বাড়তে থাকে।[২৬০] সুতরাং আকাশই ব্রহ্ম।'[২৬১]

'আকাশের চাইতে বড় কিছু আছে?' 'আছে—স্মর বা স্মৃতি। দেখছ না, স্মৃতির সাহায্যেই লোকব্যবহার চলছে। সুতরাং স্মৃতিই ব্রহ্ম।'[২৬২]

'স্মরেরও বাড়া?' 'আছে—আশা। আশার আগুন জ্বলে উঠলেই স্মৃতি জাগে। তাহতেই মন্ত্রমূল কর্ম, কর্ম হতেই সিদ্ধি—ইহলোকে বা পরলোকে। সুতরাং আশা ব্রহ্ম।'[২৬৩]

'তারও পরে?' 'তার পরে প্রাণ। চাকার শলাগুলি যেমন নাভিতে এসে জোটে, তেমনি সব এসে সমবেত হয় প্রাণে। জগতে কর্তা কর্ম করণ সবই প্রাণ, বাবা-মা ভাই-বোন আচার্য-ব্রাহ্মণ সবই প্রাণ। প্রাণকে কটু কথা দিয়েও আঘাত করতে নাই। প্রাণই সব-কিছু হয়েছে—এই দর্শন মনন এবং বিজ্ঞান যাঁর, তিনিই অতিবাদী অর্থাৎ

---

[২৫৯] তু. রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ য়দেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ (তৈ. ২।৭)। তার পরেই আছে তাঁর অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত অনিলয়ন বিভাবের কথা। এইটিই অনুবাকের প্রথমে উল্লিখিত 'অসৎ ব্রহ্ম'। এইখানে 'ন রমতে' (তু. 'আনন্দময়োহ ভ্যাসাৎ' ব্র. সূ. ১।১।১২ শাঙ্করভাষ্য; আনন্দবাদকে সেখানে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরও তু. 'স বৈ আত্মা নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী নৈব রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ' বৃ. ১।৪।৩)।

[২৬০] এবং অবশেষে আকাশেই লয় হয়। তু. আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা, তে য়দন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা (ছা. ৮।১৪।১)।

[২৬১] আকাশ জ্যোতি বাক্ আনন্দ এবং নাম-রূপের আধার—এই লক্ষণটি পাওয়া গেল। ভূতশুদ্ধির সাধনার সঙ্কেত এইখানে শেষ হল। ভূতশুদ্ধির উপায় হল পঞ্চভূতের ক্রমিক সূক্ষ্মতার জ্ঞান। প্রত্যেকটি ভূতের মৌল আন্তরগুণ আছে, সেই গুণের ভাবনা করতে হয়। প্রথম শুরু করতে হয় অন্ন বা জড় দিয়ে, যাহতে এই স্থূলদেহের সৃষ্টি। তার যোগগুণ হল স্থৈর্য। স্থৈর্যের ভাবনা হতে সাবলীলতার বোধ হয়, তা-ই হল অপের যোগগুণ। আমাদের দেহবোধের মাঝে যেসব আড় থাকে, তা তখন ভেঙে যায়, নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রাণস্রোত অবাধে সঞ্চারিত হয়। ক্রমে জলের স্রোত রূপান্তরিত হয় আগুনের স্রোতে। শরীর হয় যোগাগ্নিময়। সেই অগ্নির তাপ অলৌকিক স্পর্শবোধ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দিকে-দিকে। সনৎকুমার এই পর্বটি বাদ দিয়েছেন। অবশেষে মহাশূন্যের বোধে সব-কিছু মিলিয়ে যায়। এমনি করে ভূতশুদ্ধির ফলে সত্ত্বশুদ্ধি বা আধারের রূপান্তর ঘটে।

[২৬২] আকাশে সব মিলিয়ে যায়, এইখানে উত্তারপন্থার শেষ। কিন্তু উত্তারের পর আছে অবতার, ঐ আকাশকে নিয়েই এখানে নেমে আসা। এখন সনৎকুমার তারই কথা বলছেন। অবরোহ-ক্রমের কথা অধ্যায়ের শেষে আরও স্পষ্ট করে বলবেন। আকাশচেতনায় যে-স্মৃতি ফোটে, তা হল ধ্রুবা স্মৃতি (৭।২৬।২), শৈবদর্শনে যাকে বলা হয়েছে প্রত্যভিজ্ঞা। এটি স্বরূপের বিজ্ঞান বা প্রমা, লৌকিক স্মৃতির মত অনুভূত বিষয়ের আবছা ছবি অতএব অপ্রমা নয়। অথচ লৌকিক স্মৃতির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে—দুটি কারণে। প্রথমত, ব্রহ্মবিদ্ আকাশ নিয়ে ফিরে এসে লৌকিক জীবনই যাপন করেন, যদিও সে-জীবন জীবন্মুক্তের দিব্যজীবন। দ্বিতীয়ত, তাঁর অন্তঃকরণ তখন অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানে প্রভাস্বর। বিজ্ঞান, সত্ত্ব, স্বপ্ন, স্মৃতি, বুদ্ধি—এগুলি চেতনার একই ভূমির বস্তু (তু. ক. ১।৩।৩, ৯, ১০, ২।৩।৭; মাণ্ডূ. ১০)। লৌকিক জীবনে স্মৃতির প্রাধান্য বলতে এখানে বিজ্ঞানের প্রাধান্যই বলা হচ্ছে (মূলে 'বিজানীরন্' ক্রিয়াপদটি লক্ষণীয়; পুত্র ও পশুতেও ব্রহ্ম-বিদের আত্মবিজ্ঞানই হয়)। ঈশোপনিষদের 'ক্রতো স্মর কৃতং স্মর' এই অনুশাসনও এই তাৎপর্যই বহন করছে (১৭)।

[২৬৩] আশা হল কামনা বা ঈক্ষা, ব্রহ্মবিদের সত্যসংকল্প। সত্যসংকল্পে জাগে ভব্যার্থের ছবি। তাও স্মৃতি অথবা দিব্যস্বপ্ন, হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন। স্বপ্নের সৃষ্টিক্ষমতা আছে (তু. বৃ. ৪।৩।১০)। ব্রহ্মবিদের সংকল্প অব্যর্থ, কেননা তাঁর মাঝে প্রজ্ঞা আর সংকল্পের সাযুজ্য আছে বলে যা ঘটবে তারই সংকল্প তাঁর মাঝে জাগে। ফলশ্রুতিতে তাই বলা হচ্ছে, 'আশয়া অস্য সর্বে কামাঃ সমৃধ্যন্তি, অমোঘা হি অস্য আশিষো ভবন্তি।' ব্রহ্মবিদের জীবন রিক্ত বা ঊষর নয়, পরন্তু সমৃদ্ধ এবং অমোঘসিদ্ধি।

পরমার্থের প্রবক্তা। কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি অতিবাদী? তিনি আত্মগোপন করবেন না, বলবেন, হাঁ আমি অতিবাদী।'

সনৎকুমারের ব্রহ্মবিচার এমনি করে পর্যবসিত হল সর্বাত্মক প্রাণে।

সাধ্যের কথা বলে সনৎকুমার বলতে আরম্ভ করলেন সাধনের কথা: 'দেখ, সত্যের অতিবাদই হল সত্যকার অতিবাদ।' নারদ সাগ্রহে বললেন, 'আমি সত্যেরই অতিবাদী হতে চাই।' 'তাহলে তোমার সত্যের বিজ্ঞান থাকা চাই তো।' 'আমি যে সত্যের বিজ্ঞানই চাই।' 'কিন্তু বিজ্ঞানবৃত্তিকে অধিগত না করতে পারলে তুমি সত্যকে জানবে কি করে?'[২৬৪]

এই বলে সনৎকুমার বিজ্ঞানলাভের ধাপগুলি দেখাতে গিয়ে বললেন, 'দেখ, বিজ্ঞানের জন্য মনন দরকার, মননের জন্য দরকার শ্রদ্ধার। আবার নিষ্ঠা না থাকলে শ্রদ্ধা হয় না, কিছু না করলে নিষ্ঠাও আসে না। আবার সুখ না পেলে মানুষ কিছু করতেও যায় না। কিন্তু সুখ কোথায়? না, ভূমাতে। অল্পে সুখ নাই। যদি সত্য লাভ করতে চাও, তাহলে এই ভূমার বিজ্ঞানের জন্যই সাধনা কর।' 'আমি ভূমার বিজ্ঞানই চাই।'

সনৎকুমার তখন বলতে লাগলেন, 'ভূমা কি জান? যেখানে অন্য-কিছুর দর্শন শ্রবণ বা বিজ্ঞান হয় না, তা-ই ভূমা। আর যার দর্শন শ্রবণ বা বিজ্ঞান সম্ভব, তা হল অল্প। ভূমাই অমৃত, আর অল্প হল মর্ত্য।' 'আচ্ছা, ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত?' 'কিসে আবার? আপন মহিমাতে। হাতিঘোড়া টাকাপয়সা জমিজমা থাকাকে আমি মহিমা বলি না। ভূমার বিজ্ঞান হলে দেখবে, ভূমা উপরে-নীচে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র—ভূমাই সব। তখন নিজেকেই জানবে ভূমা বলে। অনুভব হবে, আমিই উপরে-নীচে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র—আমিই সব। এটি হল অহংকারাদেশ। আবার এটিই পর্যবসিত হয় আত্মাদেশে, তখন আর অহং থাকে না, শুধু বোধ থাকে। অনুভব হয়, আত্মাই উপরে-নীচে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র—আত্মাই সব। তখন দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান হয় আত্মারই অথবা ভূমারই। পুরুষ তখন আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দ। তিনি স্বরাট্। চেতনার যে-কোনও ভূমিতে তখন তাঁর অবাধ গতি হয়। আর ভূমাকে যে জানে না, সে হয় অপরের প্রজা, সব ভূমিতে সে যেতে পারে না, যেখানে যায় সেখান থেকেও তাকে নেমে আসতে হয়।'[২৬৫]

---

[২৬৪] জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষের জ্ঞান, যেমন চোখ দিয়ে একটা গাছ দেখলাম। আবার বস্তুশূন্য শব্দজ্ঞানও জ্ঞান, পতঞ্জলি যাকে বলেছেন শ্রুতপ্রজ্ঞা বা অনুমানপ্রজ্ঞা (পাত. ১।৪৯), যেমন কারও কাছে শুনে বা তর্কবুদ্ধির সহায়ে ব্রহ্মের জ্ঞান হল। কিন্তু বিজ্ঞান হল সামান্যের অপরোক্ষ অনুভব, যাকে পতঞ্জলি বলবেন ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা (১।৪৮)। ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে জানা হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বোধিজ প্রত্যয়।

[২৬৫] সনৎকুমার নারদকে ভূমানন্দে পৌঁছে দিলেন ভাবনার কয়েকটি স্তর পার করে। এই স্তরগুলি লক্ষণীয়। নারদ তাঁর কাছে এসেছিলেন মন্ত্রবিৎ হয়ে। তিনি ছিলেন তথাকথিত জ্ঞানী। সনৎকুমার প্রথম শেখালেন, কি করে ধ্যানচিত্ততার দ্বারা জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হয়। এই হল প্রথম স্তর। তারপর দেখালেন, ভূতশুদ্ধির দ্বারা কি করে বিজ্ঞানে বলাধান করতে হয়। এই হল দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তর হল, ভূতশুদ্ধির চরম যে ব্যোমতনুর বোধ তাকে প্রাণময় করে তোলা—বিজ্ঞানে বলাধান করার মত। একটি স্তরের শেষে বিজ্ঞান, আরেকটির শেষে আকাশ, আরেকটির শেষে প্রাণ। আকাশ আর প্রাণ সিদ্ধচেতনায় একটি মিথুন, বিজ্ঞান তার বৃত্তি। তিনটি মিলিয়ে ভূমা। এটি হল অনন্ত সত্তার নিরপেক্ষ বোধ। এইটি উদ্দালকেরও সৎ-সম্পত্তি বা সদ্ভাব। আকাশভাবনায় এটি

এতক্ষণ পর্যন্ত সনৎকুমার উত্তরপন্থার কথাই বলছিলেন, যদিও তার মাঝে পাহাড় ডিঙানোর মত কিছুটা ওঠা-নামাও ছিল। এইবার বিজ্ঞানীর আত্মভাব কি করে দিব্য বিসৃষ্টির নিমিত্ত হয়, তা-ই বলছেন। এখানে আগের ধাপগুলিকেই তিনি অবরোহ-ক্রমে বলে গেলেন বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, অবরোহণের সময় উত্তরভূমির শক্তি সংক্রামিত হয় অবরভূমিতে, তাইতে অবরতত্ত্বটি হয় উত্তরতত্ত্বের প্রকাশের আধার। সুতরাং উত্তরশক্তির আবেশে তার রূপান্তর ঘটে। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত থেকে কথাটা স্পষ্ট হতে পারে। যখন আত্মার দিকে উজিয়ে যাচ্ছি, তখন দেহ-প্রাণ-মন বাধা। কিন্তু আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে যখন নেমে আসছি, তখন মন-প্রাণ-দেহ আত্মজ্যোতির বিচ্ছুরণের আধার। সুতরাং তারা আর তখন প্রাকৃত নয়, চিন্ময়। এইটিই সনৎকুমার-কথিত স্বারাজ্যসিদ্ধির ফল।

নেমে আসবার সময় আত্মভাব প্রাণস্পন্দিত হয়। সে-স্পন্দন রূপান্তরিত হয় আশায় বা দিব্যকামনায়। এই কামনায় নিত্যসিদ্ধ বস্তুর যে-ছবি ভেসে ওঠে সম্ভূতির বীর্য নিয়ে, তা-ই স্মর। এই পর্যন্ত একটি পর্ব। এরপর রূপায়ণের আয়োজন। তার ভূমিকা হল আকাশ, ভাবকে রূপ দেবার জন্য যা অপরিহার্য। আকাশে স্মর ঘনভূত হয় তেজে, যা রূপকৃৎ শক্তি। তেজ বিগলিত এবং সাবলীল হয় অপে। এই পর্যন্ত আরেকটি পর্ব। এরপর আরেকটি শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়, যার কথা সনৎকুমার আগে বলেননি। এটি হল 'আবির্ভাব-তিরোভাব'। স্মর পর্যন্ত সম্ভূতির ব্যাপ্রিয়া কারণ-রূপে, অপ্ পর্যন্ত সূক্ষ্মরূপে। তারপর স্থূলের আবির্ভাব-তিরোভাব বা ভাঙা-গড়ার খেলা। তার একদিকে দেহতত্ত্ব বা সংহতত্ত্ব (integration), আরেকদিকে শরীরতত্ত্ব (disintegration)। তারপর অপ্ সংহত হয় অন্নে। যা সম্ভাবিত, তা হয় মূর্ত। এই মূর্তিতে শক্তি প্রকাশ পেল বলরূপে, আর তাকে আশ্রয় ক'রে চৈতন্য বিজ্ঞান-রূপে। অন্ন হতে বিজ্ঞান পর্যন্ত ঊর্ধ্বপরিণাম। তারপর আবার বিজ্ঞানকে নিয়ামক-

---

সহজে সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু আকাশ নিঃশক্তিক নয়, তাকে জড়িয়ে আছে প্রাণ। আকাশ নিথর, আবার মহাপ্রাণে স্পন্দিত। এই নিস্পন্দ-স্পন্দনের বোধ থেকে যে-চিদ্‌বৃত্তির উন্মেষ হয়, তা-ই বিজ্ঞান। একমাত্র বিজ্ঞান দ্বারাই পরম সত্যকে জানা যায়। বিজ্ঞানবৃত্তি জাগে শ্রদ্ধাপূত মননের ফলে। আবার নিষ্ঠাসহকারে কাজ করে গেলেই চিদাবেশরূপে হৃদয়ে শ্রদ্ধার স্ফুরণ হয়। মানুষ কাজ করে সুখের আশায়। কিন্তু ভূমার বোধ ছাড়া সুখ কোথাও নাই। সুতরাং ভূমার প্রেরণাতেই মানুষের সাধনজীবনের শুরু। ভূমার ভাবনা প্রথম করতে হয় নির্বিশেষ নির্বিষয়রূপে। দর্শন শ্রবণ আর বিজ্ঞান তিনটি হল অধ্যাত্মবোধের মুখ্য বৃত্তি। এই তিনটিকেই তলিয়ে দিতে হবে শূন্যতায়। তখন সংবর্তুল ব্যাপ্তিচৈতন্যরূপে ভূমার আবির্ভাব হবে। এ-অনুভবটি পরাক্-বৃত্ত (objective), চেতনার ক্ষেত্রের অনুভব। এটি গাঢ় হলে প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective) ক্ষেত্রজ্ঞের অনুভব হবে। সনৎকুমার তাকে বলেছেন অহঙ্কারাদেশ। এ-অহং প্রাকৃত অহং নয়, অনুভবের কেন্দ্রে একটা বৈন্দবসত্তার বোধ। তারপর বিন্দুর ঘনভাব সমাব্যাপ্ত হয় পরিধির আনন্ত্যে, অহংএর রূপান্তর ঘটে আত্মায়। এই আত্মভাবটি মহান্-রূপে সর্বাবগাহী সর্বাত্মকতারূপে প্রতিভাত হয়। আত্মাই ভূমা, নারদ এই আত্মাকেই জানতে চেয়েছিলেন। ভূমা আর সুখ, আত্মা আর আনন্দ—একই কথা। আত্মা পুরুষ, আনন্দ তাঁর শক্তি। আত্মানন্দ একটি মিথুন। এই মিথুন যখন নিত্যসংসক্ত এবং সমরস, তখন আত্মরতি; যখন চণকবৎ দ্বিদলে বিলসিত, তখন আত্মমিথুন; যখন বিসৃষ্টিরূপে উল্লসিত, তখন আত্মক্রীড় (তু. বৃ. ১।৪।৩-৪; মু. ৩।১।৪)। বিজ্ঞানী তখন স্বরাট্ এবং কামচারী। লক্ষণীয়, উঠা-নামা দুটিকে মিলিয়ে সনৎকুমার এক অখণ্ড তত্ত্বেরই উপদেশ করছেন। তার অনুভব হয় মরমীয়ার বোধিতে। বৌদ্ধিক অনুভবে ওঠার উপরই জোর থাকে বলে অখণ্ড অনুভব খণ্ডিত হয়ে যায়।

শক্তিরূপে ধরে মন্ত্র পর্যন্ত চিৎশক্তির নিম্নপরিণাম। মন্ত্রের ক্রিয়াতে সিদ্ধি বা আশার সার্থকতা।[২৬৬]

তারপর সনৎকুমার বললেন, 'আত্মাই এই সব—এই যিনি দেখছেন, তিনি "পশ্যঃ"।[২৬৭] পশ্য সব দেখেন, দেখেন না দুঃখ রোগ এবং মৃত্যু।[২৬৮] তিনি এক হয়ে থাকেন। আবার তিনিই হন ত্রিধা পঞ্চধা সপ্তধা নবধা।[২৬৯] আবার তিনি হন এগার, একশ' এগার, বিশ হাজার।[২৭০] পশ্য হওরা যায় সমস্ত গ্রন্থি বিকীর্ণ হলে। গ্রন্থি-মোচন হয় ধ্রুবা স্মৃতি থেকে। ধ্রুবা স্মৃতি জাগে সত্ত্বশুদ্ধি থেকে। সত্ত্বশুদ্ধি হয় আহারশুদ্ধি থেকে।'

এইখানে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ এবং সঙ্গে-সঙ্গে সপ্তম অধ্যায়ের শেষ।[২৭১]

তারপর পনের খণ্ডে অষ্টম অধ্যায়। প্রথম ছয়টি খণ্ডের প্রতিপাদ্য হল 'দহরবিদ্যা'।[২৭২] এই দেহই ব্রহ্মপুর।[২৭৩] তার মধ্যে 'দহর' বা ছোট্ট একটি কমলের ঘর[২৭৪] আছে—হৃদয়ে। তার মাঝে[২৭৫] যে-আকাশ বা শূন্যতা, তাতেই সমাহিত রয়েছে

---

[২৬৬] এই অবরোহক্রমটি বিজ্ঞানীর। সমস্ত ক্রমটি দ্বিধাবিভক্ত। সন্ধিতে আছে আবির্ভাব-তিরোভাব। প্রথম ভাগের আদিতে আত্মা, দ্বিতীয় ভাগের আদিতে অন্ন। অন্ন থেকেই 'ইদং সর্বম্'। 'ইদং' উপনিষদের একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা, বোঝায় চিদাবিষ্ট জড়। নিরেট জড় ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে চলে গেছে চৈতন্যের দিকে। শুদ্ধ চৈতন্য হল আত্মা। জড় তাঁরই বিভূতি এবং বিগ্রহ। সুতরাং আত্মা আর ইদং দুয়ে মিলে একটি যুগনদ্ধ সত্তা (দ্র. ঐ. ১।১।১)। বিজ্ঞানীর আশা ক্রমে বিবর্তিত হয় অপে। তারপর অন্নকে সে সিদ্ধসত্তারূপেই পায় এবং তা-ই হয় সম্ভাবিত মূর্তির উপাদান। এতে সে বলাধান করে, প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মত। মূর্তি তখন চিন্ময়ী হয়। তাতে যথাক্রমে স্ফুরিত হয় ধ্যান চিত্ত সংকল্প এবং মন। এগুলির কথা আগেই বলেছি। তারপর মন যথাক্রমে বাক্ নাম এবং মন্ত্রের সহায়ে সিদ্ধকর্মের প্রবর্তক হয়। মন্ত্র তখন সিদ্ধমন্ত্র, তার বীর্য অমোঘ। এই বীর্য বস্তুত আত্মবীর্য। নারদ আত্মবিৎ না হয়ে মন্ত্রবিৎ হয়েছিলেন, তাই তাঁকে অনীশ্বর হয়ে শোক করতে হয়েছিল। আশা থেকে যে-মূর্তির সৃষ্টি হয়, তা অন্তশ্চিন্তিতস্বাভীষ্ট মূর্তি। তার আবির্ভাব-তিরোভাব আছে। এই আবির্ভাব-তিরোভাবের পৌরাণিক উদাহরণ আমরা পাই সপ্তশতীতে। এদেশের সাধনার ইতিহাসে একটা মূর্তিসৃষ্টির যুগ গেছে। বৌদ্ধ 'সাধনমালায়' তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওরা যায়।

[২৬৭] এই দেখাটি বীর্যশালী এবং চিদ্‌ঘন হয়, যদি উল্লিখিত উপায়ে ভাবকে মূর্তিতে রূপান্তরিত করবার সামর্থ্য জন্মে। পতঞ্জলি একেই বলেছেন স্বাধ্যায় হতে ইষ্টদেবতাসম্প্রয়োগ (পাত. ২।৪৪), যা মন্ত্রসাধনার বিশিষ্ট লক্ষ্য।

[২৬৮] তু. শ্বে. ২।১২।

[২৬৯] ত্রিধা প্রাণ আশা স্মর, অথবা তেজ অপ্ অন্ন, অথবা বিজ্ঞান ধ্যান চিত্ত, অথবা সংকল্প মন বাক্, অথবা বাক্ নাম মন্ত্র ইত্যাদি। পঞ্চধা পঞ্চবৃত্তিক প্রাণরূপে। সপ্তধা সপ্তব্যাহৃতি সপ্তধাম ইত্যাদিরূপে। নবধা, যখন তিনের মাঝে তিন ওতপ্রোত হয়ে আছে : যেমন পৃথিবীতে অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের আবেশে একটি ত্রিলোকী এবং এমনি করে আর-দুটি লোকেও দুটি ত্রিলোকী।

[২৭০] এই সংখ্যাগুলির তাৎপর্য সুনিশ্চিত নয়। শঙ্কর বলেন, 'স বিদ্বান্ প্রাক্‌সৃষ্টিপ্রভেদাদ্ একধৈব ভবতি, একধৈব চ সন্ ত্রিধাদিভেদৈঃ অনন্তভেদপ্রকারো ভবতি সৃষ্টিকালে।'

[২৭১] মূলে সনৎকুমারকে বলা হয়েছে 'স্কন্দ'। এই স্কন্দ ঋক্‌সংহিতায় 'দ্রপ্‌স' বা আদি সোমবিন্দু, যা অচ্যুত থেকেই চ্যুতির প্রবর্তক। যখন তিনি অচ্যুত, তখন 'সনৎকুমার', যার অর্থ চিরকুমার; আবার যখন তিনি চ্যুত, তখন 'স্কন্দ'। তাঁতে দুটি বিভাবই যুগপৎ রয়েছে, তিনি অটল থেকেই টলছেন (দ্র. ঋ. ১০।১৭।১১-১৩)।

[২৭২] দভ্র (কে. ২।১) > দহ্র (তৈ. স. ৭।৫।৩।১) > দহর। 'দভ্র' হ্রস্ব, অল্প (নিঘ. ৩।২)।

[২৭৩] তু. অ. স. দেবানাং পূরয়োধ্যা, তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ১০।২।৩১; পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্মা বিবেশাপরাজিতাম্ ঐ ৩৩। দ্র. ছা. ৮।৫।৪, ২।২।৭।

[২৭৪] মূলে আছে 'পুণ্ডরীকং বেশ্ম'। অথর্বসংহিতায় এই দেহকেই বলা হয়েছে 'পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্, তস্মিন্ যদ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ১০।৮।৪৩। ঋক্‌সংহিতায় আছে 'পুষ্কর' : তু. ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত, মূর্ধ্নঃ ৬।১৬।১৩ (এখানে

সব-কিছু।[২৭৫] এই আকাশকে খুঁজে বার করাই আমাদের পরম পুরুষার্থ। এই হার্দাকাশের বোধই আত্মবোধ। এই আত্মা অপহতপাপ্মা বিজর বিমৃত্যু বিশোক। তাঁর পিপাসা নাই, অথচ তিনি সত্যকাম এবং সত্যসংকল্প। এই আত্মাকে পেলেই সব পাওয়া হয়। আত্মবোধেই যথার্থ সংকল্পসিদ্ধি, কেননা আমাদের যা কাম্য তা বস্তু নয়, বোধ। বোধরূপে সমস্তই আমাদের হৃদয়াকাশেই আছে। বস্তুরূপে তা বাইরে আছে মনে করাটাই মিথ্যা।

কামনার পরিতর্পণে যে-সুখ, তার স্বরূপ হল চিত্তবিশ্রান্তি। চিত্তবিশ্রান্তির প্রাকৃত পরিচয় পাই সুষুপ্তিতে। সুষুপ্তির যে আনন্দঘন একরস প্রত্যয়, তা-ই ব্রহ্ম-বোধ। এইখানে আত্মচৈতন্য আর ব্রহ্মচৈতন্য এক। প্রত্যেক জীব প্রতিদিন এই দেহের ক্ষেত্রেই সুষুপ্তির সময় ব্রহ্মলোকে সংবিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ[২৭৬] নয় বলেই তারা ব্রহ্মকে জানতে পারছে না।

তাহলে আত্মানুভব বা ব্রহ্মানুভব হল এই হৃদয়ের গভীরেই অহরহ সুবিশ্রান্ত সুষুপ্তির অনুভব। এই অনুভব যিনি পান, তাঁর সংজ্ঞা হল 'সম্প্রসাদ'।[২৭৭] কি জীবনে কি মরণে সম্প্রসাদ যখন বিদেহ, তখন তিনি পরমজ্যোতিতে উপসম্পন্ন। এই তাঁর স্ব-রূপ। এই আমাদের আত্মচৈতন্যের পরিচয়। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই অনুভবে না আছে ভয়, না আছে মৃত্যু।

আত্মা বা ব্রহ্ম হৃদয়ে আছেন বলে তিনিই 'হৃদয়'। অমৃত এবং মৃত্যু দুয়েরই তিনি সংযন্তা বলে তিনি 'সত্য'।

এই আত্মচৈতন্য সেতু হয়ে সব-কিছুকে জুড়ে রয়েছে। তার মাঝে না আছে আলো না আছে আঁধার, না আছে জরা মৃত্যু বা শোক, না আছে সুকৃত দুষ্কৃত। এই অনুভবে দ্বন্দ্ববোধ নাই বলে পাপও নাই। এখানে পেঁছিলে সব ন্যূনতার আপূরণে রাত হয়ে ওঠে দিন।

এই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় ব্রহ্মচর্যের দ্বারা। ব্রহ্মচর্যের সাধনাও বিচিত্র। যজ্ঞ ইষ্ট বা সংত্রায়ণ—এও যেমন ব্রহ্মচর্য, তেমনি মৌন অনশন বা অরণ্যায়ন—এও ব্রহ্মচর্য।[২৭৮] সব উপায়েই চেতনাকে বৃহৎ করা যায়, আত্মচৈতন্যকে রূপান্তরিত করা যায় ব্রহ্ম-চৈতন্যে। তা-ই ব্রহ্মচর্য।

হৃদয়ের গভীরে ডুবতে হলে নাড়ীর তত্ত্ব[২৭৯] জানা দরকার। আদিত্যরশ্মি নাড়ীর

মূর্ধন্যকমলের উল্লেখ পাচ্ছি); আরও তু. রিশ্বে দেরাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত ৭।৩৩।১১; নিষিক্তিং পুষ্করে মধু ৮।৭২।১১। সুতরাং আধারে কমলের কল্পনা অতি প্রাচীন।

[২৭৫] এইখানে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডযোগের মূল।

[২৭৬] তু. ঋ. ক্ষেত্ররিদ্ধি দিশ আহ রিপৃচ্ছতে ৯।৭০।৯; অক্ষেত্ররিৎ ক্ষেত্ররিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্ররিদানুশিষ্টঃ ১০।৩২।৭; গীতা ১৩।২-৩।

[২৭৭] দ্র. বৃ. ৪।৩।৯-১৮, ২।১।১৮-১৯। 'প্রসাদ' চেতনার স্বচ্ছতা। দ্র. গী. ২।৬৪।

[২৭৮] সাধনার দুটি ধারার কথা বলা হচ্ছে। আগেরটি দেববাদীদের, পরেরটি আত্মবাদীদের। দুটিই ব্রহ্মচর্য।

[২৭৯] নাড়ীবিজ্ঞানের জন্য দ্র. ক. ২।৩।১৬; মু. ২।২।৬; কৌ. ৪।১৯ (এখানে বর্ণের কথা আছে); বৃ. ২।১।১৯, ৪।২।৩, ৩।২০ (বর্ণের উল্লেখ)। ঋক্‌সংহিতায় নাড়ীরা নদী : তু. এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ ৪।৫৮।৫; অপামনীকে সমিথে ১১। সুষুম্ণা সেখানে 'সুষোমা' নদী, অথবা 'সুষোম' ধাম।

পথ ধরে প্রসারিত রয়েছে হৃদয় পর্যন্ত। নাড়ীতে যে-চেতনা, তা হল আমাদের প্রাকৃত চেতনার অন্তঃপুর। সুষুপ্তিতে স্বভাবতই সমস্ত চেতনা গুটিয়ে আসে নাড়ীতে। সুষুপ্তিতে যিনি জেগে থাকতে পারেন, তিনি সম্প্রসন্ন হয়ে অপহতপাপ্‌মা আত্মার মহিমাকে হৃদয়ে অনুভব করেন। এ-অনুভব আবেশের, হৃদয়ে আদিত্যতেজের সমূহনের অনুভব।[২৪০]

তারপর যখন মৃত্যু বা মহাসুপ্তির লগ্ন আসে, তখন বিদ্বান্ পুরুষ হৃদয় হতেই আদিত্যরশ্মি অবলম্বনে ওঙ্কারের উচ্চারণদ্বারা মনকে তুলে নেন আদিত্যমণ্ডলে[২৪১] এবং লোকদ্বারের[২৪২] ভিতর দিয়ে ব্রহ্মে প্রপন্ন হন। হৃদয়ে একশ' একটি নাড়ী এসে মিলেছে, তার মাঝে একটি নাড়ীই চলে গেছে মূর্ধার দিকে। এইটি ধরে বিদ্বান্ উজিয়ে যান অমৃতের পানে।[২৪৩]

দহরবিদ্যার পর দ্বাদশ খণ্ড পর্যন্ত ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি-সংবাদ।[২৪৪] প্রজাপতি বলেছিলেন, 'আত্মবিজ্ঞান হয়েছে যাঁর, তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, তিনি সব লোক লাভ করেন।' কথাটা শুনতে পেয়ে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আর অসুরদের মধ্যে বিরোচন সব ছেড়ে সমিৎপাণি হয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রজাপতির কাছে হাজির হলেন। বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্যের পর প্রজাপতি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেন এখানে আছ?' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার কাছে আত্মবিজ্ঞান চাই।' প্রজাপতি বললেন, 'চক্ষুতে যে-পুরুষ,[২৪৫] তিনিই আত্মা, তিনিই অভয় অমৃত আত্মা'। 'জলে বা আয়নায় যাঁর ছায়া দেখি, তিনিও কি আত্মা?' 'হাঁ, সবার মাঝেই আত্মা। জলপাত্রে কি দেখছ?' 'নখলোমসুদ্ধ আত্মারই তো প্রতিরূপ দেখছি।' 'এবার পরিষ্কার হয়ে সেজে-গুজে আবার দেখ দেখি, কি দেখছ?' 'নিজেদেরই পরিষ্কৃত এবং সুসজ্জিত ছায়া।' 'এই তো আত্মা।'

শুনে ইন্দ্র আর বিরোচন শান্তহৃদয়ে চলে গেলেন। বিরোচন অসুরদের মধ্যে গিয়ে প্রচার করলেন, 'এই দেহই আত্মা। এর সেবা-পূজাই পুরুষার্থ।' একেই বলে

---

[২৪০] সমূহনে বা গুটিয়ে আনাতে 'তেজ', আর ব্যূহনে বা ছড়িয়ে দেওয়াতে 'রশ্মি'। দ্র. ঈ. ১৬।

[২৪১] দ্র. গী. মৃত্যুবিজ্ঞান ৮।১০-১৩।

[২৪২] দ্র. ছা. ২।২৪।

[২৪৩] ক. ২।৩।১৬।

[২৪৪] বিরোচন অসুরদের রাজা। নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, 'যে ঝলমল করছে'। তু. সপ্তশতীতে 'শুম্ভ' 'নিশুম্ভ', যা শুভ্রেরই নামান্তর। ব্রাহ্মণে আছে, অসুরেরা দ্যুলোকেও থাকে হিরণ্ময়ী পুরী রচনা ক'রে (ঐ. ১।২৩)। রূপক ভাঙ্‌লে কথাটার অর্থ দাঁড়ায়, দিব্যচেতনাতেও আলোর আড়াল থাকতে পারে। ঈশোপনিষদে তাকেই বলা হয়েছে বিদ্যার অন্ধতমঃ (৯)। অথর্বসংহিতায় বিরোচন 'প্রাহ্লাদি' বা প্রহ্লাদের পুত্র (৮।১০।২২; তু. তৈ. ব্রা. ১।৫।৯।১)। কৌষীতকীতে ইন্দ্র বলছেন, 'দ্যুলোকে আমি প্রহ্লাদীয়দের বিদ্ধ করেছিলাম (৩।১)।' এও সেই হিরণ্ময় আবরণকে বিদীর্ণ করার বর্ণনা। পুরাণে আছে, হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ; হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুদ্বেষী আর প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদের হয়ে হিরণ্যকশিপুর অন্ত্রোৎপাটন করে তাকে বধ করেন। এখানে প্রহ্লাদ স্পষ্টতই আনন্দতত্ত্ব। আর হিরণ্যকশিপু বুদ্ধিতত্ত্ব। বুদ্ধির আঁতে ঘা না পড়লে আনন্দচেতনা নিরঙ্কুশ হয় না। প্রহ্লাদের সঙ্গে কঠোপনিষদের নচিকেতার সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্র প্রহ্লাদকে বিনাশ করেন না, কিন্তু তার উপসর্গ আসুরভাবের বিরোচনতার সঙ্গে তাঁর বিরোধ। আনন্দের এই উপসর্গের দার্শনিক সংজ্ঞা 'রসাস্বাদ'। অনেকে তাকে নির্বিশেষ সত্যোপলব্ধির পরিপন্থী বলে মনে করেন।

[২৪৫] দ্র. ছা. ১।৭।৫, ৪।১৫।১; বৃ. ২।৩।৫, ৫।৫।৪; কৌ. ৪।১৬, ১৭।

আসুরী উপনিষৎ। অসুরেরা তাই বসন-ভূষণ আর ভোগ্যবস্তু দিয়ে মৃতদেহের সংস্কার করে। মনে করে, এতেই পরলোক জয় করা যাবে।[২৮৬]

মাঝপথে ইন্দ্রের মনে কিন্তু খটকা জাগল, 'দেহই যদি আত্মা হয়, তাহলে শেষ-পর্যন্ত দেহের সঙ্গে আত্মারও তো নাশ হবে। এ কেমন হল?' ইন্দ্র আবার প্রজাপতির কাছে ফিরে গেলেন।

প্রজাপতি বললেন, 'ফিরে এলে যে!' ইন্দ্র তাঁর সংশয়ের কথা বললেন। প্রজাপতি বললেন, 'ঠিক ধরেছ। আচ্ছা, আরও বত্রিশ বছর এখানে থাক।'

বত্রিশ বছর পর প্রজাপতি বললেন, 'স্বপ্নে যিনি মহিমময় হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা।'[২৮৭] ইন্দ্র খুশী হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু আবার তাঁর মনে সংশয় এল, 'জাগ্রতের দুঃখ স্বপ্নে সংক্রামিত না হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নপুরুষেরও তো নিজস্ব দুঃখ আছে।' ইন্দ্র আবারও প্রজাপতির কাছে ফিরে গেলেন।

আরও বত্রিশ বছর পরে প্রজাপতি বললেন, 'সুষুপ্তিতে সব গুটিয়ে নিয়ে সম্প্রসন্ন হয়ে যিনি স্বপ্নও দেখেন না, তিনিই আত্মা।' ইন্দ্র এবার শান্ত হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু আবার তাঁর মনে হল, 'সুষুপ্তি তো বিনাশের বোধ, তখন আমাকেও জানি না, কিছুকেই জানি না। এই কি আত্মবোধ?'[২৮৮]

আবার তাঁকে প্রজাপতির কাছে ফিরতে হল। এবার প্রজাপতি তাঁকে ব্রহ্মচর্য করালেন পাঁচ বছর মাত্র। মোটের উপর তাঁর ব্রহ্মচর্যের সাধন হল একশ' এক বছর।[২৮৯]

তখন প্রজাপতি বললেন, 'দেখ, শরীর মৃত্যুবশ। অশরীর এবং অমৃত আত্মার তা অধিষ্ঠানমাত্র।[২৯০] শরীরকে ছাড়িয়ে গেছেন যিনি, সুখ-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে না। অভ্র বিদ্যুৎ বায়ু মেঘগর্জন—এরাও অশরীরী।[২৯১] আকাশ থেকে উঠে এরা পরমজ্যোতিতে উপসম্পন্ন হয়ে আবার স্বরূপে ফিরে যায়। সম্প্রসাদরূপ আত্মাও তেমনি শরীর থেকে উঠে পরমজ্যোতিতে উপসম্পন্ন হয়ে আবার স্বরূপে ফিরে যান।

---

[২৮৬] মৃতসংকারের এইধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল ঈজিপ্ট, প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া, সিরিয়া, ব্যাবিলোনীয়া ও এসীরিয়াতে (দ্র. HERE, *Babylonians & Assyrians, Death & Disposal of the Dead* ইত্যাদি)। এই হতে আসুরী সংস্কৃতির একটা অভিজ্ঞান পাওয়া গেল। প্রথাটা বিশেষ করে চালু ছিল ঈজিপ্টে।

[২৮৭] দ্র. বৃ. ৪।৩।৭, ৯, ১০, ১৬, ১৮...। তু. মা. 'স্বপ্নস্থান পুরুষ' ৪।

[২৮৮] যোগের ভাষায় এর নাম 'প্রকৃতিলয়'। এর মাঝে জেগে থাকাই হল পরমপুরুষার্থ। আবার এই বিনাশই মৃত্যুতরণের পথ (ঈ. ১৪)। কঠোপনিষদে এটি নচিকেতার তৃতীয় রাত্রি।

[২৮৯] মূলে আছে 'একশ' বছর।' পুরুষ শতায়ু; সুতরাং তাৎপর্য হল, সমস্তটা জীবনই ব্রহ্মচর্যে কাটলে তবে আত্মবোধকে পাওয়া যায়। তু. মহিদাস ঐতরেয়ের পুরুষযজ্ঞবিদ্যা (ছা. ৩।১৬)। সেখানে আছে ১১৬ বছরের কথা। শেষের ষোল বছর ষোড়শকল পুরুষের দিব্যজীবন।

[২৯০] জরা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করাই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য—কি সংহিতায়, কি ব্রাহ্মণে বা উপনিষদে। তার উপায় হল যা অজর এবং অমৃত, তাতে অবগাহন করা। তার প্রতিরূপ আকাশ। কেউ তাকে বলছেন সৎস্বরূপ, কেউ-বা অসৎস্বরূপ। 'সম্পত্তির' দিক দিয়ে তা সৎ, 'নির্বাণে'র দিক দিয়ে অসৎ।

[২৯১] এগুলি আত্মভাবনার সাধন। তু. শ্বে. ২।১১। অভ্র পাতলা মেঘ। ভাবনার উৎকর্ষ অনুসারে এদের মাঝে একটা পর্যায় দেখা দেয়। রূপবোধ থেকে আত্মচেতনার অভিযান চলে অরূপের দিকে। অবশেষে তা হয়ে যায় আকাশবৎ। তু. 'আকাশশরীরং ব্রহ্ম' তৈ. ১।৬।২।

তিনিই উত্তম পুরুষ।[২২২] তিনি ভোজন ক'রে ক্রীড়া ক'রে স্ত্রী যান বা জ্ঞাতির সঙ্গে রমণ ক'রে বিচরণ করেন। পৃথিবীতে উপজাত এই শরীরের স্মৃতি তখন তাঁর থাকে না। যানে যুক্ত বাহনের মত এই প্রাণও শরীরে যুক্ত মাত্র। বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ এবং মন[২২৩] যাঁর সংবেদনের সাধন, তিনিই আত্মা। মন তাঁর দৈবচক্ষু।[২২৪] এই দৈবচক্ষু দিয়েই তিনি ব্রহ্মলোকে সমস্ত কাম্যবস্তু দর্শন করে রমমাণ হন। এই আত্মার বিজ্ঞান হয়েছে যাঁর, সব লোক সব কামনা তাঁর বশ।' ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি-সংবাদের এই-খানেই শেষ।

ত্রয়োদশ খণ্ডে ব্রহ্মাত্মভাবনার একটি মন্ত্র: 'আমি শ্যাম হতে আশ্রয় করি শবলকে, শবল হতে আশ্রয় করি শ্যামকে।[২২৫] শরীরকে বিধূত করে অভিসম্ভূত হই ব্রহ্মলোকে।'

চতুর্দশ খণ্ডে ব্রহ্মচৈতন্যকে বলা হচ্ছে আকাশ। এই আকাশ হতেই নাম আর রূপের নির্বাহ।[২২৬] এই আকাশই প্রজাপতির সভা ও সদন।[২২৭] তারপর এই প্রজাপতি-ধাম পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে বলা হচ্ছে, 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যে-যশ, আমি যেন তা লাভ করি। লাভ করি সেই যশের যশ, অদন্ত সেই শুভ্রতা।[২২৮] যোনিতে বাস যেন আর না করতে হয়।'

---

[২২২] এই 'উত্তমপুরুষই' অবতারবাদের প্রভাবে ভাগবতদের ভাবনায় হয়েছেন 'পুরুষোত্তম'। গীতায় আছে, 'অস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (১৫।১৮)।' কিন্তু 'পুরুষোত্তম' সংজ্ঞাটি সংহিতায় ব্রাহ্মণে বা প্রাচীন উপনিষদে নাই। এইখানে তার বীজ পাওয়া যাচ্ছে। 'স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্' উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে বেশ খাটে। এইসঙ্গে স্মরণীয়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আমরা ছান্দোগ্যেই পাই (৩।১৭।৬)।

[২২৩] প্রাণের জায়গায় পাচ্ছি ঘ্রাণ। কৌঃতে দুটি পাঠই পাওয়া যায় (১।৭, ৩।৫)।

[২২৪] মন এখানে ইন্দ্রিয় নয়, পরন্তু মনশ্চেতনা। দ্র. ছা. ৩।১৯। সেখানে মন বলতে বোঝাচ্ছে আকাশবৎ চেতনা। সংহিতাতেও মন এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুষের মন হতে চন্দ্রমার উৎপত্তি (ঋ. ১০।৯০।১৩; মনের ষোড়শী নিত্যকলাই তাহলে ব্রহ্ম বা দৈবচক্ষু, কাম মনের প্রথম রেতঃ (ঐ ১২৯।৪) প্রভৃতি উক্তি বিবেচ্য।

[২২৫] শ্যাম বোঝাচ্ছে পরঃকৃষ্ণকে (ছা. ১।৬।৫) বা লোকোত্তরকে, শবল চিত্রবর্ণ এই জগৎ (তু. শ্বে. য়ো একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি ৪।১; সংহিতায় 'পুরুরূপ', 'বিশ্বরূপ')। অসীম থেকে সীমায় আসা আবার সীমা থেকে অসীমে যাওয়াতেই অনুভবের পূর্ণতা।

[২২৬] তু. ঋ. অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্ ১০।৫।৭; দেবানাং পূর্ব্যে যুগে অসতঃ সদজায়ত ৭২।২; সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ ১২৯।৪।

[২২৭] এখানে প্রজাপতি এবং ব্রহ্ম এক, যদিও অন্যত্র প্রজাপতির পরে পাই ব্রহ্মকে (কৌ. ১।৩; তৈ. ২।৮...)। এই সভাকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্' (ছা. ৮।৫।৩), 'বিভু-প্রমিতম্' (কৌ. ১।৩)। এইটিই সংহিতায় 'পরম ব্যোম', বিষ্ণুর 'পরমপদ', মিত্রাবরুণের 'ধ্রুবং সদঃ সহস্রস্থূণম্' (ঋ. ২।৪১।৫)।

[২২৮] মূলে আছে 'শ্বেতমদৎকম্'। শঙ্কর অর্থ করছেন, 'শ্বেতং বর্ণতঃ পক্কবদরসমং রোহিতম্, তথা অদৎকং দন্তরহিতমপি অদৎকং ভক্ষয়িতৃ স্ত্রীব্যঞ্জনম্, তৎসেবিনাং তেজোবলবীর্যবিজ্ঞানধর্মাণাম্ অপহন্তৃ বিনাশয়িতৃ ইত্যেতৎ।' শব্দটি উপনিষদে আর কোথাও নাই। ঋক্‌সংহিতায় আছে অগ্নির বিশেষণরূপে (১।৭১।৪, ৭।৪।৩)। শতপথব্রাহ্মণে পাই, উদয় এবং অস্তের সময় সবিতা শ্বেত (৫।৩।১।৭)। এই থেকে শ্বেত অরুণবর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু অথর্বসংহিতায় পাচ্ছি, 'এন্যেকা শ্বেন্যেকা কৃষ্ণৈকা রোহিণী দ্বে' (৬।৮৮।২); সেখানে 'শ্বেনী' আর 'রোহিণী' নিশ্চয় আলাদা বর্ণের। বাজসনেয়সংহিতায় আছে, 'শ্যেতঃ শ্যেতাক্ষোঽরুণঃ' (২৪।৩); মহীধর এবং উব্বট দুজনেই বলছেন শ্যেত = শ্বেত। মনে হয় শব্দটির দুটি অর্থই হত। অগ্নি সবিতা বা পূষা অরুণ থেকে শ্বেত হন, এই ব্যঞ্জনা দিতে 'শ্যেত' শব্দের ব্যবহার অযৌক্তিক মনে হয় না। প্রাশিত্রভক্ষণের ফলে পূষা অদন্ত হয়েছিলেন একথা ব্রাহ্মণে পাই (শ. ১।৭।৪।৭)। পূষাই হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ সরিয়ে আদিত্যের সঙ্গে সাযুজ্য এনে দেন (ঈ. ১৫, ১৬)।

তারপর পঞ্চদশ খণ্ডে বিদ্যা-সম্প্রদায়। এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা দিয়েছিলেন প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে, মনু প্রজাগণকে। আচার্যকুল হতে গুরুসেবার দ্বারা এই বিদ্যা গ্রহণ করতে হয়। তারপর সংসারে তার অনুশীলন চলে। জীবনের সমস্ত কর্তব্য শেষ করে তারপর আত্মায় সর্বেন্দ্রিয়কে সংহৃত করে অহিংসাব্রতী হয়ে জীবনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দিতে হবে। এমনি করে মানুষের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মলোক থেকে তিনি আর ফিরে আসেন না।

ছান্দোগ্যোপনিষদের এইখানেই শেষ। কর্মাঙ্গোপাসনার সঙ্গে-সঙ্গে এই উপনিষদে অনেকগুলি বিদ্যার উপদেশ পেলাম। কর্মাঙ্গোপাসনারও পর্যবসান ঘটেছে প্রণবোপাসনায়। কর্মের পরিসমাপ্তি যে জ্ঞানে, এই তত্ত্বটি তাতে পরিস্ফুট হয়েছে। উপদিষ্ট বিদ্যাগুলির মধ্যে প্রধান হল মধুবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, কোশবিদ্যা, পুরুষযজ্ঞবিদ্যা, সংবর্গবিদ্যা, চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, সৎসম্পত্তি-বিদ্যা, ভূমবিদ্যা, দহরবিদ্যা এবং পুরুষোত্তমবিদ্যা। আরুণি এই উপনিষদে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন, বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের মত।

৪

তারপর কৃষ্ণযজুর্বেদের **তৈত্তিরীয়, কঠ** এবং **শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।**

তৈত্তিরীয়ারণ্যকের সপ্তম হতে নবম পর্যন্ত তিনটি প্রপাঠক নিয়ে **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।** তারও পরে দশম প্রপাঠকটি নারায়ণোপনিষৎ। আচার্যেরা এটিকে খিল বলে গণ্য করেন। আরণ্যকের তিনটি প্রপাঠক উপনিষদে হয়েছে বল্লী—শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মবল্লী আর ভৃগুবল্লী।

শীক্ষাবল্লীতে বারটি অনুবাক। শিক্ষা একটি বেদাঙ্গ, তার প্রতিপাদ্য হল মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান।[২৯৯] গুরুগৃহে শিক্ষার্থীর জীবন আরম্ভ হয় বেদাভ্যাস দিয়ে, তারপর বেদের রহস্য এবং উপনিষৎ আয়ত্ত করে তার সংসারে ফিরে আসা। শিক্ষাবল্লীতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত এবং বলিষ্ঠ রেখায় গুরুগৃহের একটি উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে।

প্রথম অনুবাকে শান্তিপাঠ। তাতে বায়ুকে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম।[৩০০] বায়ু অন্তরিক্ষস্থানদেবতা। যজুর্বেদ অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোক জয়ের সাধন।[৩০১] বায়ু তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

দ্বিতীয় অনুবাকে বলা হচ্ছে শিক্ষার অধ্যেতব্য বিষয় কি-কি। সন্তান বা সংহিতাই

---

[২৯৯] বিশেষ বিবরণ বেদাঙ্গ-পরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

[৩০০] বৈদিক চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয় দিয়েও উপলব্ধি করা যায়। এইথেকেই উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা. ৩।১৪।১)। অধিভূত দৃষ্টি তখন রূপান্তরিত হয় অধিদৈবত দৃষ্টিতে। বৃহদারণ্যকে বায়ু অমূর্ত (২।৩।৩),—এটি অধিভূত দৃষ্টি। অথচ ঋক্‌সংহিতায় তিনি 'দর্শত' (১।২।১)—এটি অধিদৈবত দৃষ্টি।

[৩০১] তু. প্র. ৫।৭।

তার মধ্যে প্রধান।[৩০২] তৃতীয় অনুবাকে তাই সংহিতার উপনিষৎ বা নিগূঢ় তত্ত্ব বলা হয়েছে। সংহিতার পাঁচটি অধিকরণ—লোকে জ্যোতিতে বিদ্যায় প্রজাতে এবং আত্মায় বা শরীরে।[৩০৩] এইগুলিই মহাসংহিতার আধার। আর মহাসংহিতার বিজ্ঞানই মানুষের সমস্ত পুরুষার্থের সাধক।[৩০৪]

চতুর্থ অনুবাকে আচার্যের প্রস্তুতি। বিদ্যা যিনি দেবেন, তাঁর দেবার অধিকার থাকা চাই। তিনি হবেন অমৃতের আধার। বিদ্যা তাঁতে আবিষ্ট হয়ে দেহকেও করবে 'বিচর্ষণ' কি না শক্তির বৈদ্যুতে টলমল।[৩০৫]

বিদ্যার সঙ্গে চাই শ্রীও, নইলে অন্তেবাসীদের ভরণপোষণ চলবে কি করে? আচার্যকে ভিতরে-বাইরে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রস্তুতির পর ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে আচার্য উদাত্ত আহ্বান পাঠিয়ে দিলেন দিকে-দিকে—'তোমরা এস।' এ-আহ্বান সহস্ররশ্মি আদিত্যদ্যুতিতে আবিষ্ট চেতনার আহ্বান কিশোর প্রাণের কাছে।[৩০৬] সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এ-ছবির তুলনা নাই।

তারপর কয়েকটি অনুবাকে গুরুগৃহে অনুশীলিত বিদ্যার বিবৃতি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুবাকে ব্যাহৃতিবিদ্যা। প্রবক্তা ঋষি মাহাচমস্য। ব্যাহৃতি সৃষ্টির মন্ত্র।[৩০৭] ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটি ব্যাহৃতিতে অপরার্ধের আবির্ভাব হয়। চতুর্থী ব্যাহৃতি মহঃ পরার্ধের দ্যোতক। মহঃ ব্রহ্ম, মহঃ আত্মা। আত্মচৈতন্যের মহিমাই ব্রহ্মচৈতন্য।[৩০৮] দেবতারা এই চৈতন্যের অঙ্গ বা বিভূতি। চারটি ব্যাহৃতিকে লোক জ্যোতি বিদ্যা এবং আত্মা বা আধার—এই চারদিক থেকে দেখা যেতে পারে।[৩০৯] তাহলে পাই ব্রহ্মপুরুষের ষোলটি অবয়ব। বেদের পুরুষ ষোড়শকল।

---

[৩০২] অধ্যেতব্য বিষয়ের প্রথম তিনটির সম্পর্ক বাকের সঙ্গে, পরের তিনটির সম্পর্ক বক্তার সঙ্গে। সন্তান বা সংহিতার লক্ষ্য ঐকপদ্যপ্রত্যয়ের উৎপাদন। মন্ত্রের ব্যঞ্জনা তাইতে পর্যবসিত হয় ব্যাহৃতিতে, ব্যাহৃতির ব্যঞ্জনা ওঙ্কারে। তারপর তুরীয়া বা বৈখরী বাক্‌কে গুহাহিত আর-তিনটি পদে ক্রমে উঠিয়ে নেওয়াই হল 'উচ্চারণ' বা শিক্ষাবিজ্ঞানের রহস্য (দ্র. ঋ. স. ১।১৬৪।৪৫; মা. ৮-১২)।

[৩০৩] প্রত্যেক লোকেরই অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য হল জ্যোতি। বিদ্যার সহায়ে এই জ্যোতিকে নামিয়ে আনতে হবে নিজের আধারে—বাকে। তারপর সম্প্রদায়কে অবিচ্ছেদ রাখবার জন্য তাকে সঞ্চারিত করতে হবে শিষ্যে বা প্রজায়। এমনি করে বেদাধ্যয়ন হবে অনন্ত-দেশকালব্যাপী একটি অখণ্ড প্রত্যয়ের সাধক। এই হল সংহিতার উপনিষৎ।

[৩০৪] ফলশ্রুতিতে পাঁচটি পুরুষার্থের উল্লেখ আছে। অন্ন পশু এবং প্রজা অর্থাৎ দেহ-প্রাণের পুষ্টি সবাই চায়। যাঁরা ধীর, তাঁরা অধিকন্তু চান ব্রহ্মবর্চস এবং সুবর্গ্য লোক বা পরমপদ।

[৩০৫] তু. শরীরং মে বিচক্ষণম্ ঋ. (খিল) ৪।৮।৫। ঋক্‌সংহিতায় আছে 'বিচর্ষণি' (দ্র. ৩।২।৮ টীকা)। নিঘ. পশ্যতিকর্মা (৩।১১)। কিন্তু শব্দটি √চর্ হইতে উৎপন্ন, অর্থ 'বিচরণশীল'; এখানে বোঝাচ্ছে অন্নময় আধারে প্রাণস্পন্দকে। তু. সাত্ত্বিকবিকার।

[৩০৬] গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণকুমারকে আট বছর বয়সে উপনয়ন দেবার কথা আছে। ষোল বছর পর্যন্তও দেওয়া চলে (আশ্ব. ১।১৯।১-৬; তু. মনু. ২।৩৬, ৩৮)। এইসঙ্গে তু. ঔপনিষদ পুরুষ ষোড়শকল। ষোল বছর পর্যন্ত কৈশোর। মর্ত্যতনুতে দিব্যচেতনার আবেশ এইসময়েই হতে পারে, অধ্যাত্ম-সাধনার এটি একটি নিগূঢ় রহস্য। উপনিষদে দুটি সত্যার্থী কিশোরের অপরূপ কাহিনী আছে—কঠে নচিকেতার আর ছান্দোগ্যে সত্যকামের।

[৩০৭] ব্রাহ্মণে ব্যাহৃতির অনেক প্রসঙ্গ আছে: দ্র. ঐ. ৫।৩২, ৮।৭; তৈ. ২।৩।৪।৩; শ. ২।১।৪।১০...। তিনটি ব্যাহৃতির সার হল প্রণব (ঐ. ব্রা. ৫।৩২)। তু. তৈ. স. ৫।৫।৫।৩।

[৩০৮] তু. 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃ. ২।৫।১৯, ৪।৪।৫)।

[৩০৯] আগের দুটিতে দৃষ্টি অধিদৈবত (objective), পরের দুটিতে অধ্যাত্ম (subjective)। বাইরে-ভিতরে মহিমার অনুভবই তুরীয়সম্পত্তি বা ব্রহ্মানুভব।

সেই পুরুষ আছেন হৃদয়ের মাঝে যে-আকাশ,[৩১০] তাতে মনোময় হিরণ্ময় অমৃত হয়ে।[৩১১] এই দেহেই অন্তরাবৃত্ত হয়ে তাঁকে অনুভব করা যায়। তালুর ভিতর দিয়ে সুষুম্ণা নাড়ী চলে গেছে মূর্ধার দিকে। তার আরেক নাম ইন্দ্রযোনি।[৩১২] এই পথ ধরে ঊর্ধ্বস্রোতা চেতনা শিরঃকপাল বিদীর্ণ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। ঊর্ধ্বগতির সময় একেকটি ব্যাহৃতির প্রতিপাদ্য একেকটি দিব্যজ্যোতির আবির্ভাব হয়। অগ্নি বায়ু এবং আদিত্য পার হয়ে পাই ব্রহ্মকে।[৩১৩] এই পাওরাই স্বারাজ্য। পুরুষ তখন বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং বিজ্ঞানের পতি।[৩১৪] তিনি তখন আকাশশরীর সত্যাত্ম প্রাণারাম মনআনন্দ শান্তিসমৃদ্ধ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ।

তার পর সপ্তম অনুবাকে পাঙ্ক্তব্রহ্মবিদ্যা। পঙ্ক্তি একটি পঞ্চাক্ষর ছন্দ। সব-কিছু সেই ছন্দে গাঁথা, সব পাঁচের খেলা।[৩১৫] অধিভূতদৃষ্টিতে যেমন দেখছি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চলোক, অগ্নিপ্রভৃতি পঞ্চদেবতা বা পঞ্চজ্যোতি,[৩১৬] অপ্‌প্রভৃতি পঞ্চভূত; তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখছি প্রাণপ্রভৃতি পঞ্চবায়ু, চক্ষুঃপ্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়[৩১৭] এবং চর্মপ্রভৃতি পঞ্চধাতু। মোটের উপর যেমন অধিভূত বিষয় পনেরটি, তেমনি অধ্যাত্ম বিষয়ও পনেরটি। পনেরর অধিষ্ঠাতৃরূপে ষোড়শকল পুরুষ। পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই বিভূতি, তাঁরই পাঁচের খেলা। তিনিই সব—এই হল উপনিষৎ।

তার পর অষ্টম অনুবাকে প্রণববিদ্যা। ওম্‌ই ব্রহ্ম, ওম্‌ই সব-কিছু।[৩১৮]

তার পর নবম অনুবাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনাদর্শের বিবৃতি। স্বাধ্যায় এবং

---

[৩১০] হৃদয়ই অধ্যাত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট স্থান, এই কথাটি উপনিষদের নানা জায়গায়। হৃদয় হতেই নাড়ীপথ ধরে প্রাণ ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে চলে যায় আদিত্যের দিকে। এই ভাবটির মূল রয়েছে ঋক্-সংহিতায় : এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ (৪।৫৮।৫), অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি, অপামনীকে সমিথে (১১)। উপনিষদে যেমন হৃদয়াকাশ, সংহিতায় তেমনি হৃদ্যসমুদ্র। তু. ঋ. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা (১।৬১।২)।

[৩১১] তু. মু. ২।২।৭। পুরুষ মনোময়—এটা তাঁর সঙ্কোচের পরিচয় নয়। উত্তারপন্থায় মনকে ছাপিয়ে যেতে হয়, তার কথা পরে আছে (২।৩-৪)। কিন্তু আকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার অনুভব করি, তিনিই দেহে প্রাণে মনে সর্বত্র (তু. ১।৬।২; শাণ্ডিল্যবিদ্যা ছা. ৩।১৪।১-২; বৃ. ৪।৪।৫, ৫।৬।১)। এ-অনুভব অবতরণের।

[৩১২] 'ইন্দ্রযোনি' ইন্দ্রকে বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার মার্গ। ঐতরেয়োপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'বিদৃতির্নাম দ্বাঃ' বা 'নান্দন' (১।৩।১২)। ঋক্‌সংহিতার আপ্রীসূক্তগুলিতে এই দুয়ারের নাম 'দেবীর্দ্বারঃ' (দ্র. ৩।৪।৫ টীকা), উপনিষদে তা-ই 'লোকদ্বার' (ছা. ২।২৪, ৮।৬।২-৬)। নান্দন আর সুষুম্ণ সমার্থক। ইন্দ্রযোনিই যোগশাস্ত্রের ব্রহ্মরন্ধ্র।

[৩১৩] তু. কে. ৩, ৪। আদিত্যের জায়গায় সেখানে পাই ইন্দ্র। কিন্তু ইন্দ্রও আদিত্য। বৃত্রবধের দ্বারা বর্ষা নামানো এবং আলো ফোটানো দুইই তাঁর কাজ।

[৩১৪] প্রাণের জায়গায় পাচ্ছি বিজ্ঞানকে। কৌষীতকীতে দেখেছি, প্রাণ আর প্রজ্ঞায় কোনও ভেদ নাই (২।১৪, ৩।৯)।

[৩১৫] তু. তৈ. ব্রা. ১।১।১০।৪ (পঞ্চাগ্নিপ্রসঙ্গে); বৃ. ১।৪।১৭।

[৩১৬] পরম্পরাটি লক্ষণীয়। তার ভিতর দিয়ে সূচিত হচ্ছে চেতনার উত্তরায়ণ। কঠোপনিষদে বায়ুর জায়গায় আছে বিদ্যুৎ (২।২।১৫)।

[৩১৭] প্রাণের জায়গায় পাচ্ছি ত্বক্। ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। অধ্যাত্ম প্রাণ অথবা অধিদৈবত বায়ুর গুণও স্পর্শ। এই স্পর্শ ঋক্‌সংহিতায় 'পৃশ্নি', মরুদ্‌গণ সেখানে 'পৃশ্নিমাতরঃ' (১।২৩।১০, ৩৮।৪, ৮৫।২, ৫।৫৭।২...)।

[৩১৮] প্রণববিদ্যা সর্ববিদ্যার সার, প্রায় সমস্ত উপনিষদেই তার প্রসঙ্গ আছে। এখানে ব্রহ্ম বলতে শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুইই বোঝাচ্ছে। সংহিতায় 'ব্রহ্ম' বিশেষ করে বোঝায় শব্দব্রহ্মকেই। যে-শব্দরাশি বেদ বা জ্ঞানের বাহন, তা 'ব্রহ্ম'। ঐ শব্দরাশির সার ব্যাহৃতি, তার সার প্রণব (ঐ. ব্রা. ৫।৩২)। ব্যাহৃতি লোকসৃষ্টির মন্ত্র, সুতরাং প্রণব আকাশে সৃষ্টির আদিস্পন্দ। ঋক্‌সংহিতার ভাষায় গৌরীরূপিণী একপদী বাক্, যাঁর হাম্বারবে কারণসলিল ব্যাকৃত হল (১।১৬৪।৪১)।

প্রবচনের দ্বারা বিদ্যার অনুশীলন এবং সম্প্রদানের ধারা তাঁকে অব্যাহত রাখতে হবে। ঋত সত্য তপঃ দম এবং শম হবে তাঁর আশ্রয়। তাঁকে অগ্ন্যাধান করে অগ্নিহোত্রী হতে হবে। অতিথিসৎকার এবং মানুষের প্রতি যথাকর্তব্য করতে হবে। সন্তানোৎপাদন করে গৃহকে সুব্যবস্থিত করতে হবে।[৩১৯]

এইসব সাধনাঙ্গের মধ্যে রাথীতরের মতে সত্যই শ্রেষ্ঠ, পৌরুশিষ্টির মতে তপ, এবং মৌদ্‌গল্যের মতে স্বাধ্যায় ও প্রবচন।

তার পর দশম অনুবাকে ঋষি ত্রিশঙ্কুর বেদানুবচনে ব্রহ্মাত্মভাবের গম্ভীর প্রকাশ।

একাদশ অনুবাকে গুরুকুল হতে সমাবর্তনের সময় অন্তেবাসীর প্রতি আচার্যের অনুশাসন। আচার্য বলছেন, 'অপ্রমত্ত থেকো: সত্য হতে ধর্ম হতে কুশল[৩২০] হতে ভূতি হতে স্বাধ্যায়-প্রবচন হতে কখনও বিচ্যুত হয়ো না। মাতৃদেব পিতৃদেব আচার্য-দেব অতিথিদেব হয়ো। তোমার কর্ম অনবদ্য হ'ক। সুচরিতের অনুশীলন করো। ব্রহ্মবিদ্‌দের সম্মান করো। দান করো—শ্রদ্ধা শ্রী হ্রী ভয় আর সংবিৎ নিয়ে। ব্রহ্ম-বিদ্‌দের আচরণে জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজো।'

ভারতবর্ষের সমাজ এই অনুশাসনকে যথাসাধ্য পালন করবার চেষ্টা করে এসেছে।

দ্বাদশ অনুবাকে শান্তিপাঠের অনুবৃত্তিতে শীক্ষাবল্লীর শেষ।

তার পর নয়টি অনুবাকে ব্রহ্মবল্লী। তার প্রথম অনুবাকেই ব্রহ্মের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তং ব্রহ্ম।'[৩২১] এই ব্রহ্ম পরমব্যোমে গুহাহিত হয়ে আছেন।[৩২২] তাঁকে জানাই আমাদের পুরুষার্থ এবং তাইতে সমস্ত কামনার পরিতৃপ্তি। আবার এই ব্রহ্মই আমাদের আত্মা।

তার পর ষষ্ঠ অনুবাক পর্যন্ত আত্মচৈতন্য কি করে ব্রহ্মচৈতন্যে বিস্ফারিত হতে পারে, তার বিবৃতি।

চৈতন্যের বিস্ফারণ ঘটে অন্তরাবৃত্তির দ্বারা। পুরুষকে এখানে কল্পনা করা হয়েছে যেন একটি পাখি—উড়ে চলেছে অনন্তের পানে।[৩২৩]

প্রাকৃত দৃষ্টিতে পুরুষকে প্রথম দেখতে পাচ্ছি অন্নরসময় বা জড়ময়। তখন দেহই

---

[৩১৯] ব্রাহ্মণের জীবন ব্রহ্মলাভেরই প্রস্তুতি। গৃহস্থ ব্রহ্মবিদ্‌ হতে পারেন না, প্রাচীন উপনিষদ্‌-গুলিতে এমন কথা পাওয়া যায় না। এই ভাবটি এসেছে পরে। মনে হয়, তা অবৈদিক মুনি-সম্প্রদায়ের প্রভাবের ফল।

[৩২০] 'অপ্রমত্ত থেকো' এটি বুদ্ধদেবেরও অন্তিম উপদেশ। 'কুশল' বৌদ্ধধর্মে একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। বলা হয়েছে, কুশলের করণ, অকুশলের অকরণ এবং চিত্তশুদ্ধি—এই তিনটিই বুদ্ধানু-শাসনের সার।

[৩২১] বেদান্তে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল সৎ-চিৎ-আনন্দ। উপনিষদে কোথাও এ-তিনটিকে এক জায়গায় পাওয়া যায় না। তাই কেউ-কেউ প্রস্তাব করেন, 'সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তং ব্রহ্ম'র জায়গায় পড়া হ'ক 'সত্যং জ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম।' কিন্তু এক্ষেত্রে পাঠান্তরকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। আনন্দের প্রসঙ্গ এই বল্লীর শেষে বিস্তৃতভাবেই আছে। সুতরাং সমস্ত বল্লীটিকেই বৈদান্তিক সচ্চিদানন্দ-ভাবনার বীজ বলা যেতে পারে, তার জন্য আনন্ত্যের ভাবনাকে ছেঁটে ফেলবার কোনও দরকার হয় না। মনে রাখতে হবে, ব্রহ্ম বা বৃহতের চেতনার প্রতিষ্ঠাই আনন্ত্যে।

[৩২২] 'পরমব্যোম' ঋক্‌সংহিতায় পরিভাষিত চেতনার উত্তম ভূমি। অন্য নাম,—নাক, উরুলোক, পরমপদ, অনিবাধ ইত্যাদি। উপনিষদে তা-ই 'আকাশ'। গুহা হার্দাকাশ। পরমব্যোমকে হৃদয়ে অনুভব করার ফলেই বলা চলে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

[৩২৩] এই কল্পনাটি সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে সুপরিচিত। আদিত্য হংস সুপর্ণ (ঋ. ৪।৪০।৫; ১।৩৫।৭...)। আদিত্যে যে-পুরুষ, তিনিই আবার গুহাহিত পুরুষ (তৈ. ২।৮।৫)। এই

তার আত্মা বা আমিত্ববোধের আধার। দেহ অন্নের বিকার। অন্ন জড়। কিন্তু জানতে হবে, এই অন্নও ব্রহ্ম।[৩২৪]

তবে কি না অন্নময় দেহই পুরুষের সব নয়। এই অন্নময় আমির অন্তরে আছে প্রাণময় আমি। সেই প্রাণ দেহকে পূর্ণ করে রেখেছে, সে-ই বস্তুত দেহের আত্মা। তার নিজের আত্মা হল আকাশ।[৩২৫] এই প্রাণও ব্রহ্ম।

এমনি করে প্রাণময় পুরুষের অন্তরে আছে মনোময় পুরুষ, আদেশ তার আত্মা।[৩২৬] মনোময় পুরুষের অন্তরে বিজ্ঞানময় পুরুষ, যোগ তার আত্মা।[৩২৭] তার অন্তরে আনন্দময় পুরুষ, আনন্দই তার আত্মা।

এই আনন্দকে জানাই পুরুষের পরমার্থ। তা-ই ব্রহ্মকে জানা।

সে-জানার দুটি রূপ—অসদ্ব্রহ্মরূপে, আবার অস্তিব্রহ্মরূপে।[৩২৮] দুইই আনন্দ।

ব্রহ্মকে যে জানে না অথবা যে জানে, চেতনার সংহরণে বা মৃত্যুতে[৩২৯] দুজনেই তারা ব্রহ্মেই যায়, [৩৩০] কিন্তু আনন্দের সম্ভোগ হয় বিদ্বানেরই।[৩৩১]

এই আনন্দব্রহ্মকে পেলেই সৃষ্টির রহস্য বোঝা যায়। সৃষ্টির কামনা তাঁর আনন্দের একটি রূপ। সৃষ্টি বস্তুত তাঁর প্রজনন। তার মূলে আছে

পুরুষও একটি পাখি। দুটি পাখি সযুক্ সখার মত জড়িয়ে আছেন একই গাছকে (ঋ. ১।১৬৪।২০)।

[৩২৪] অন্ন জড় বা matter। কিন্তু matter-এর চাইতে সংজ্ঞাটি বেশী ব্যঞ্জনাবহ। উপনিষৎ সত্তাকে দুভাগ করছেন—এক ভাগ অন্ন, আরেক ভাগ অন্নাদ। অন্নাদ অন্নকে আত্মসাৎ করে, অন্নই রূপান্তরিত হয় অন্নাদে। এই আত্তীকরণের (assimilation) পরম্পরাই হল সৃষ্টির মাঝে ঊর্ধ্ব-পরিণামের ধারা। সুতরাং অন্ন নিছক জড় নয়, চৈতন্যে রূপান্তরিত হবার সামর্থ্যযুক্ত জড়। তাকে আশ্রয় করে চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষণ সৃষ্টির রহস্য। অন্ন হতে আত্মা পর্যন্ত এই ক্রমটিই এখানে বিবৃত হচ্ছে। জীব অন্নাদ, কিন্তু পরম অন্নাদ হলেন সেই পরম চৈতন্য (তু. দেবীসূক্ত 'ময়া সো অন্নমত্তি' ঋ. ১০।১২৫।৪)।

[৩২৫] অন্নরসময় আত্মচৈতন্যের অনুভবকে নিয়ে যেতে হবে প্রাণময় আত্মচৈতন্যের গভীরে। এই ধারা সর্বত্র। প্রাণের আত্মা বা অধিষ্ঠান আকাশ অর্থাৎ প্রাণ আকাশেরই স্পন্দমাত্র। আকাশ-প্রাণ শিব-শক্তির মত একটি মিথুন। এই প্রাণের অনুভব পাওরা যেতে পারে সুষুপ্তিতে, যখন চেতনা নির্বিষয় অতএব আকাশবৎ (তু. প্র. ৪)।

[৩২৬] 'আদেশ' প্রচোদিকা বাক্ (দ্র. পাদটীকা ১৩৫)। মনের মাঝে ঊর্ধ্বচেতনার আবেশের ফলে এটি স্ফুরিত হয়। এটি 'মনোজবা' অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনীয় (মু. ১।২।৪; তু. হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু ঋ. ১০।৭১।৮)।

[৩২৭] পাতঞ্জলদর্শনেও পাই, বিজ্ঞানভূমিই যোগের প্রবর্তক। চিত্ত তখন একাগ্র। সংহিতায় এইটি 'ধীযোগ'। তার সূচক কতকগুলি মন্ত্র শ্বে.তে পাই (২।১-৫)। বিশেষ আলোচনা দ্র. ঋ. ৩।৩।৮ টীকা 'ধীনাম্'।

[৩২৮] সদ্ব্রহ্মের প্রতীক আদিত্য, অসদ্ব্রহ্মের প্রতীক আকাশ। এই ধরে সাধনায় ঋষিধারা আর মুনিধারার প্রবর্তন। সংহিতায় তাঁরা মিত্রাবরুণ। দর্শনে বেদান্ত- এবং সাংখ্য-প্রস্থান। উপনিষদের বহু জায়গায় দুয়ের সমন্বয়ের কথাই আছে, বিরোধের নয়। দ্র. 'ব্রাহ্মণ'-প্রসঙ্গে নচিকেতার উপাখ্যান।

[৩২৯] সুষুপ্তি যেমন চেতনার সংহরণ, মৃত্যুও তেমনি। সমাধিও তা-ই। সমাধিযোগে ইচ্ছাসুপ্তি বা ইচ্ছামৃত্যু সম্ভব।

[৩৩০] ব্রহ্ম এখানে নির্বিশেষ চৈতন্য। প্রাকৃতচেতনার কাছে তা তমোময় অব্যক্ত, কিন্তু যোগচেতনায় জ্যোতির্ময় অব্যক্ত।

[৩৩১] চেতনার সংহরণকে মূলে বলা হয়েছে 'প্রেত্য'। এই শব্দটি উপনিষদে বহুপ্রযুক্ত। অবিদ্বানের বেলায় তার অর্থ মৃত্যু, আর বিদ্বানের বেলায় চেতনার উত্তরণ—তা জীবনেই হ'ক বা মৃত্যুতেই হ'ক। 'প্রেত্য' আনন্দের সম্ভোগ হয়। সে-সম্ভোগ অনির্বচনীয়। তাই মুনিপন্থীরা বললেন, ওর লক্ষণ হচ্ছে দুঃখাভাব, ওটা সংজ্ঞাও নয় অসংজ্ঞাও নয়।

তপঃ।[৩৩২] সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট[৩৩৩] হয়ে তিনি হলেন সৎ এবং ত্যৎ অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। তা-ই সত্য।[৩৩৪] যিনি অসৎ, তিনিই সদ্‌রূপে নিজেকে ব্যাকৃত করলেন। এই তাঁর সুকৃতি। তিনি তাই 'সুকৃত'।

তিনি রস। রসস্বরূপকে পেলেই আনন্দ। তিনিই আনন্দ, আকাশরূপে আনন্দ, যা নিখিল প্রাণনের মূলাধার। এই অব্যক্ত আকাশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আনন্দ। আনন্দ অভয়, আনন্দ পরমসাম্যে। তাহতে এতটুকু বিচ্যুতিতেই ভয়। ভয় অবিদ্যা-গ্রস্তের, ভয় দেবতার। দেবতার ভয় প্রশাসনের।

তার পর অষ্টম অনুবাকে আনন্দমীমাংসা। মানুষের সর্বকামতর্পণের আনন্দ হতে অকামহত শ্রোত্রিয়ের ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত আনন্দের স্তরভেদ আছে। মানুষের আনন্দকে ছাপিয়ে মনুষ্যগন্ধর্বের আনন্দ, তাকে ছাপিয়ে দেবগন্ধর্বের। গন্ধর্বের আনন্দ প্রাণের তর্পণে। তাকে ছাপিয়ে মনের তর্পণে পিতৃগণের আনন্দ। তারও পরে বিজ্ঞানের দিব্য আনন্দ। তার ছয়টি স্তর, শেষ স্তরে প্রজাপতির আনন্দ। তাকেও ছাপিয়ে আনন্দের আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ।

এই আনন্দে অনুভব হয়, যিনি এই হৃদয়ে আর যিনি ঐ আদিত্যে, দুইই এক।[৩৩৫] অনুভবিতার চৈতন্য তখন সংক্রামিত হয় অন্নময় হতে শুরু করে আনন্দময় পর্যন্ত আত্মচৈতন্যের সকল ভূমিতে। এমনি করে ব্রহ্মের আনন্দকে জেনে কোথাও আর ভয় থাকে না। 'পুণ্য করলাম না, পাপ করলাম' এই তাপও তখন থাকে না।[৩৩৬]

এইখানে ব্রহ্মবল্লীর শেষ। তারপর দশটি অনুবাকে ভৃগুবল্লী।

প্রথম ছয়টি অনুবাকে ভার্গবী বারুণী বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ। বরুণ[৩৩৭] ভৃগুকে বলছেন, 'অন্ন অর্থাৎ অন্নরসময় শরীর প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং বাক্—এই-

---

[৩৩২] এই কামসম্পর্কে ঋক্‌সংহিতায় বলা হয়েছে, 'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ' (১০।১২৯।৪)। এইটিই ছান্দোগ্যে আদিত্যের অন্তর্গত 'ক্ষোভ' (৩।৫।৩)। আদিত্যের তাপই 'তপঃ' (radiation)। তা-ই সৃষ্টির মূলে (তু. ঋ. ঋতং চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত ১০।১৯০।১)। সৃষ্টি তাহলে পরমপুরুষের আত্মবিকিরণ (তু. ঋ. পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ, ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ ১০।৯০।৪)।

[৩৩৩] সৃষ্টিতে তাঁর যে-অনুপ্রবেশ, তা-ই তাঁর 'মায়া' (তু. ঋ. রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব... ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৬।৪৭।১৮)। এই মায়াতেই তিনি 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্' (ঋ. ৮।৫৮।২), তিনি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' (১০।৯০।১) অর্থাৎ সব শীর্ষই তাঁর শীর্ষ, সব চোখই তাঁর চোখ, সব চরণই তাঁর চরণ।

[৩৩৪] সব নিয়েই এক অখণ্ড সত্য, কিছু বাদসাদ দিয়ে নয় (তু. ছা. ৮।৩।৫, বৃ. ৫।৫।১; দ্র. ঋ. ৩।৬।১০ টীকা 'সত্যে')।

[৩৩৫] তু. ঈ. ১৫-১৬। এই হল সাযুজ্য। সংহিতায়ও তার উদাত্ত প্রকাশ আছে (দ্র. ছান্দোগ্য-বিবৃতি ৩।১৩)।

[৩৩৬] তু. বৃ. ৪।৪।২২, কৌ. ৩।১। অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য পাপপুণ্যবোধের ঊর্ধ্বে। সাধনার প্রথম পর্বে এই বোধ থাকে, থাকাও উচিত। তখন অধর্মকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ধর্মের সাধনা করি। তারপর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেখি, সত্য ধর্মাধর্মের অতীত (তু. ক. ১।২।১৪)। এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা খুলে তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দেওয়া। আগেও দেখেছি, আপেক্ষিক সত্য ও অনৃত দুই নিয়েই পরম সত্য। আর্যভাবনায় সদসৎ দুইই তাঁর বিভূতি। সেমেটিক ভাবনা কিন্তু দুয়ের মাঝে বিরোধটাকে শেষপর্যন্ত জিইয়ে রাখতে চায়। অখণ্ডাদ্বৈতের দৃষ্টিতে পাপসমস্যার সমাধান একমাত্র ভারতীয় ভাবনারই বৈশিষ্ট্য।

[৩৩৭] ব্রহ্মবিদ্যাকে বলা হচ্ছে বারুণী বিদ্যা। বরুণ ব্রহ্ম। সংহিতায় তাঁর প্রতীক আকাশ, বিশেষ করে অব্যক্তজ্যোতির্ময় রাতের আকাশ। এই আকাশ উপনিষদে ব্রহ্মের সাধারণ সংজ্ঞা। 'বরুণ' সম্পর্কে দ্র. তৃতীয় অধ্যায় 'বরুণ'।

গুলি ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার।[৩৩৮] ব্রহ্মের লক্ষণ, তিনি সর্বভূতের উৎপত্তি স্থিতি এবং লয়ের কারণ।[৩৩৯] ব্রহ্মকে জানা যায় তপের দ্বারা।[৩৪০] এই বিজ্ঞানের ক্রম আছে। ক্রমটি ব্রহ্মবল্লীতে উল্লিখিত ক্রমের অনুরূপ—অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান এবং আনন্দরূপে ব্রহ্মকে জানতে হবে।

তারপর তিনটি অনুবাকে অন্নের প্রশস্তি। অন্ন জড়, অন্নাদ বা 'অন্নকে যা আত্মসাৎ করে' তা চৈতন্য। তারা ওতপ্রোত এবং অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠিত। প্রাণ এবং শরীর, অপ্ এবং তেজ, পৃথিবী এবং আকাশ—এই তিনটি মিথুনের মাঝে এই সম্পর্ক। ভৌতিক শরীরও অন্নাদ বা চেতনাযুক্ত। তপস্যার ফলে প্রাণের উদানগতিতে তা হয় আকাশ-শরীর। এমনি করে অন্নও ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হয়। অতএব অন্নকে নিন্দা করবে না, তাকে উপেক্ষা করবে না, তাকে সংবর্ধিত করবে।

তারপর দশম অনুবাকের প্রথমে বলা হচ্ছে, কেউ আশ্রয় চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে না। অন্ন সবার সঙ্গে ভাগ করে খাবে।[৩৪১] এইটি জেনো, যেমন দেবে, তেমনি পাবে।

তারপর সর্বত্র ব্রহ্মানুভবের উপদেশ। ব্রহ্মকে অনুভব করতে হবে ভিতরে-বাইরে সর্বত্র। নিজের মাঝে তাঁকে অনুভব করা হল 'মানুষী সমাজ্ঞা' বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। তিনি তোমার বাক্যে আছেন ক্ষেমরূপে, প্রাণাপান বা উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসে আছেন যোগ-ক্ষেমরূপে, হাতে আছেন কর্মরূপে, চরণে গতিরূপে, পায়ুতে বিমুক্তিরূপে।[৩৪২]

তেমনি তাঁকে আবার বাইরে অনুভব করা হল 'দৈবী সমাজ্ঞা' বা অধিদৈবতবিজ্ঞান। তিনি আছেন বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, পশুতে যশ বা ঈশনারূপে, নক্ষত্রে জ্যোতীরূপে, উপস্থে প্রজনন অমৃত এবং আনন্দরূপে।[৩৪৩] আকাশরূপে তিনি সব হয়ে আছেন। তিনিই প্রতিষ্ঠা, তিনিই মহঃ বা মহিমা,[৩৪৪] তিনিই মন বা মান, আবার তিনিই প্রণতি।

---

[৩৩৮] প্রসিদ্ধ পাঁচটি সাধনের অতিরিক্ত অন্নকেও এখানে ব্রহ্মের সাধন বলা হচ্ছে, যেমন বৃহ-দারণ্যকে বলা হয়েছে হৃদয়কেও (৪।১।৭)।

[৩৩৯] বেদান্তে এইটি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ (ব্র. সূ. ১।১।২)। পরাক্ (objective) দৃষ্টিতে তটস্থ লক্ষণ, প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টিতে স্বরূপলক্ষণ সৎ-চিৎ-আনন্দ। এখানে তটস্থ লক্ষণ ধরে অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা স্বরূপলক্ষণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংকেত।

[৩৪০] 'তপঃ' ব্রহ্মোপলব্ধির মুখ্য সাধন। আরেকটি সাধন হল শ্রদ্ধা (তু. ছা. ৫।১০।১)। পতঞ্জলিও এদের বলেছেন যোগের উপায় (যো. সূ. ১।২০)। তু. ঋ. ত্বং তপঃ পরিতপ্যাজয়ঃ স্বঃ (তুর্যজ্যোতিঃ) ১০।১৬৭।১; তপসা য়ে স্বর্য়য়ুঃ ১৫৪।২।

[৩৪১] তু. ঋ. মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য, নার্য়মণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী (১০।১১৭।৬)। এই হতেই পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত নৃযজ্ঞের অনুশাসন।

[৩৪২] পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের চারটি এখানে আছে। উপস্থকে দৈবী সমাজ্ঞার অন্তর্গত করা হয়েছে তার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে।

[৩৪৩] সুপ্রজননকে বেদে অতি পবিত্র দৃষ্টিতে দেখা হত। বৃহদারণ্যকে গর্ভাধানের বিস্তৃত বিবরণ আছে (৬।৪।১৩-২২)। গর্ভাধানকে বলা হয় পুত্রমন্থ। আরও দুটি মন্থকর্ম আছে, একটি শ্রীমন্থ (ছা. ৫।২, বৃ. ৬।৩), আরেকটি ঊর্ধ্বমন্থ (তু. 'বাতরশনাঃ...শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ' তৈ. আ. ২।৭।১; দ্র. মুনিসূক্ত ঋ. ১০।১৩৬)। তিনটি মন্থনকর্মের লক্ষ্য যথাক্রমে প্রজা শ্রী এবং আত্মাকে লাভ করা। বৃহদারণ্যকের কয়েকটি গর্ভাধানমন্ত্র ঋক্‌সংহিতা হতে নেওয়া (১০।১৮৪; তু. ১০।১৮৩); কয়েকটি যজুর্মন্ত্র দিব্যভাবে পূর্ণ, দম্পতীকে সেখানে আদিমিথুন দ্যাবাপৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাই এই মন্ত্রাংশটিতে : 'জায়েদস্তং মঘবন্ সেদু য়োনিঃ' (ঋ. ৩।৫৩।৪; তু. ১০।৮৫।৪৬)।

[৩৪৪] মহঃ বোঝায় বিস্তার জ্যোতিঃ এবং শক্তি এই তিনের সমন্বয়কে। সংহিতায় তা-ই 'মঘ'।

যাকে বলি অনির্বচনীয় 'তৎ',[৩৪৫] তিনিই ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মবান্, ব্রহ্মদ্বেষীরা তাঁর আশেপাশে থাকতে পারে না। তখন এই পুরুষে আর ঐ আদিত্যে অনুভূত হন সেই এক।

এইভাবে ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তাঁর চৈতন্য অন্ন হতে আনন্দ পর্যন্ত সকল ভূমিতে সংক্রামিত হয়। তিনি কামান্নী কামরূপী কামচারী হয়ে আনন্দে গেয়ে বেড়ান, 'আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ, আমিই শ্লোককৃৎ।[৩৪৬] আমি ঋত এবং দেবগণেরও পূর্বজ।[৩৪৭] আমি অমৃতের নাভি।[৩৪৮] আমাকে যে দেয়, সে-ই আমাকে পায়। আমি অন্নাদেরও অত্তা।[৩৪৯] আমিই বিশ্বভুবনের প্রশাস্তা। আমি জ্যোতি—সূর্যের জ্যোতির মত।'

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ এইখানে শেষ হল। এই উপনিষদে আমরা শিক্ষা এবং জীবনাদর্শের একটি সুন্দর ছবি পেলাম। তাছাড়া পেলাম ব্যাহৃতিবিদ্যা এবং পাংক্তবিদ্যাকে অবলম্বন করে ষোড়শকল পুরুষের উদ্দেশ, অন্ন হতে আনন্দপর্যন্ত ব্রহ্মচৈতন্যের ক্রমবিকাশ এবং আনন্দমীমাংসা। অন্নকেও ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে গ্রহণ করা এই উপনিষদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

তারপর **কঠোপনিষৎ**। উপনিষৎটির দুটি অধ্যায়। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনটি করে বল্লী। অধ্যায় দুটির উপসংহার আলোচনা করলে বোঝা যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়ের বিস্তার এবং পরবর্তী সংযোজন। প্রথম অধ্যায়ের গোড়ায় আখ্যায়িকার কয়েকটি গদ্যবাক্য ছাড়া সমগ্র উপনিষৎখানিই পদ্যে রচিত।

নচিকেতার উপাখ্যানটি যে অতিপ্রাচীন, এমন-কি ঋক্‌সংহিতাতেই যে তার বীজ পাওয়া যায়, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের আলোচনাপ্রসঙ্গে তা দেখিয়েছি। সেখানে উপাখ্যানটির আরেকটি রূপ দেখতে পাই।[৩৫০] উপনিষৎখানি নিশ্চয়ই কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠকশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শাখার একসময় বহুল প্রচার ছিল।[৩৫১] এখন শুধু কাঠকসংহিতাই পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। উপনিষদের প্রাচীনতর রূপটিও সম্ভবত এইসঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেছে।

সাংখ্যসাধনায় জ্ঞানাত্মার মহাত্মাতে নিয়মনের মূলেও এই ভাব (কঠ. ১।৩।১৩)। তু. চতুর্থী ব্যাহৃতি (তৈ. ১।৫)।

[৩৪৫] 'তৎ' বা 'ত্যৎ' বোঝায় অনিরুক্তকে (তৈ. ২।৬), যার আরেকটি সংজ্ঞা হল 'অতিষ্ঠাঃ' (বৃ. ২।১।২; তু. ঋ. স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্‌দশাঙ্গুলম্ ১০।৯০।১)। তাকেই সংহিতায় বলা হয়েছে : তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষাম্ ঋ. ৫।৬২।১, কিমপি স্বিদেকম্ ১।১৬৪।৬।

[৩৪৬] শ্লোক॥ শ্রোক = শ্রুতি বা বাকের গুহাহিত পদ (ঋ. ১।১৪৬।৪৫)।

[৩৪৭] দেবগণেরও পূর্বে ছিলেন অদিতি বা অসৎ (ঋ. ১০।৭২।২, ৩, ৫)। দেবগণের প্রতীক হলেন সূর্য (তু. ঋ. ১।১১৫।১), আর তার পিছনে যে-আকাশ, তা-ই অদিতি বা অসৎ বা 'অসুর' বরুণ।

[৩৪৮] 'নাভি' কেন্দ্রবিন্দু, গ্রন্থি। তু. ঋ. ৯।৭৪।৬, সেখানে দ্যুলোকের নীচে চারটি অমৃতভৃৎ নাভির কথা আছে।

[৩৪৯] অর্থাৎ চেতনেরও চেতন (ক. ২।২।১৩) বা পরমচৈতন্য। সমস্ত মন্ত্রটি সামসংহিতা থেকে নেওয়া (৬।১।৯)।

[৩৫০] দ্র. তৈ. ব্রা. ৩।১১।৮।

[৩৫১] তু. গ্রামে গ্রামে কাঠকং কালাপকং চ প্রোচ্যতে (পা. ম. ৪।৩।১০১)।

উপনিষৎটি যম ও নচিকেতার কথোপকথন।[৩৩২] নচিকেতার পিতা বাজশ্রবস, আসল নাম কি জানা যায় না। এঁরা গোতমবংশীয়। এই বংশের পুরুষদের বুদ্ধিবাদী বলে খ্যাতি ছিল। নচিকেতার মূল প্রশ্নটিও বুদ্ধিবাদের। এই উপলক্ষ্যে উপনিষদে ব্যাখ্যাত হয়েছে আত্মবিদ্যা বা মৃত্যুবিদ্যা এবং যোগবিধি।[৩৩৩] এগুলি যজ্ঞবিদ্যাকে ছাপিয়ে তারও পরের কথা।

নচিকেতা নামটির অর্থ 'যে জানেনি'।[৩৩৪] জানেনি, অথচ বিদ্যার অভীপ্সা তার মাঝে আছে।[৩৩৫] তাকে বর্ণনা করা হয়েছে কুমার বা কিশোর বলে।[৩৩৬] পিতার বিত্ত-শাঠ্য দেখে তার কিশোরচেতনা পীড়িত হল, তার মাঝে ঘটল শ্রদ্ধার আবেশ।[৩৩৭] সেই আবেশে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল পুনর্মৃত্যুর ছবি বা ব্রহ্মচক্রের আবর্তন।[৩৩৮] শুরু হল তার মৃত্যুতরণ অভিযান।[৩৩৯]

এই অভিযানে তাকে পার হতে হল তিনটি রাত্রির[৩৪০] অন্ধকার। তারপর সে দেখল বৈবস্বত যমকে।[৩৪১]

---

[৩৩২] নচিকেতা মানুষ, যম দেবতা—যেমন সংহিতায় পাই কুৎস আর ইন্দ্র, বসিষ্ঠ আর বরুণ। পৌরাণিক কল্পনা হল নর-নারায়ণ, ঐতিহাসিক উদাহরণ বাসুদেবার্জুন।

[৩৩৩] দ্র. ২।৩।১৮। যোগ সর্বসাধারণ সাধনা হলেও তার বিশেষজ্ঞ হলেন মুনিরা। পতঞ্জলি যোগের লক্ষণ বলছেন চিত্তবৃত্তির নিরোধ। তার অনুভব হবে শূন্যতা বা বিনাশ, অথবা অসদ্‌ব্রহ্ম। স্বভাবতই মৃত্যু হবেন তার প্রবক্তা।

[৩৩৪] সংজ্ঞাটির আরেকটি ব্যঞ্জনা থাকতে পারে, 'জানতে গিয়ে যে জানার বাইরে চলে গেল।' সংহিতায় এমনিতর একটি সংজ্ঞা আছে 'নরেদাঃ' (১।৩৪।১, ৭৯।১, ১৬৫।১৩, ৪।২৩।৪, নরেদসো অমৃতানামভূম ১০।৩১।৩), নিঃসংশয়ে যার অর্থ 'পূর্ণপ্রজ্ঞ'। নিঃশেষে জানা যায় না, এইটি হল জানার শেষ কথা (তু. কে. ২।১-৩)। নাসদীয়সূক্তের শেষে এইটিই ধ্বনিত হয়েছে, 'সো অঙ্গ বেদ য়দি বা ন বেদ' (ঋ. ১০।১২৯।৭)। নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের জবাবটাও এই ধরনের।

[৩৩৫] দ্র. ১।২।৪।

[৩৩৬] অধ্যাত্মচেতনার পরিপূর্ণ স্ফুরণ হতে পারে কৈশোরেই, একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলে। সত্যকাম, ধ্রুব, প্রহ্লাদ এরা সবাই কিশোর। ঔপনিষদ পুরুষও ষোড়শকল বা কিশোর। ভাগবতরা তাই বলেন, 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্'। কৈশোর অতিক্রান্ত হলেও তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হয়, নাহলে সাযুজ্য সিদ্ধ হয় না, অধ্যাত্মসাধনার এই এক রহস্য। প্রাজ্ঞম্মন্য পিতৃচৈতন্যের সঙ্গে এই কৈশোরের বিরোধ আছে, উপনিষদের গোড়াতেই তা কৌশলে দেখানো হয়েছে।

[৩৩৭] শ্রদ্ধা যোগের প্রথম উপায় (যো. সূ. ১।২০)। এই শ্রদ্ধা জাগে হৃদয়ের আকূতিতে, তবে মানুষ আলো পায় (ঋ. ১০।১৫১।৪)। 'আবেশ' প্রসাদ বা শক্তিপাতের বৈদিক সংজ্ঞা (তু. ঋ. স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ১।১৬৪।২১; ২।২৭।১১ এইটি নচিকেতার ভাব)।

[৩৩৮] তু. শ্বে. ১।৬। ব্রাহ্মণে পুনর্জন্মের জায়গায় আছে পুনর্মৃত্যুর কথা। একবার মরে যদি বিবস্বান্ পুরুষকে না পাই, তাহলে আবার মরতে এবং জন্মাতে হবে। তু. বশিষ্ঠের কাতর প্রার্থনা : মো যু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমম্, মৃল.। সুক্ষত্র মৃল.য় (ঋ. ৭।৮৯।১; 'মৃন্ময় গৃহ' দেহ, তু. 'গহকারক' ধম্ম. ১৫৩-৫৪, ইওরোপীয়েরা অবশ্য বলেন কবর বা মৃতাস্থিপাত্র)।

[৩৩৯] এইটিই ঈশোপনিষদের 'বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা' (১৪)।

[৩৪০] যেতে হবে 'মহঃ' বা আদিত্যের লোকে (তৈ. ১।৫)। তার আগে তিনটি লোক পার হতে হবে। তাদের সন্ধিস্থানে একটি করে রাত্রি বা অব্যক্তের অনুভব। স্মৃতিতে তাই চতুর্থী তিথিতে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা। তু. ঋ. তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ, একা য়মস্য ভুবনে বিরাষাট্ ১।৩৫।৬; এই শেষেরটির এক পিঠে আতপ, আরেক পিঠে ছায়া।

[৩৪১] যমের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংহরণ এবং ব্যাপ্তি দুইই। অবিদ্বানের মৃত্যুতে চেতনা গুটিয়ে যায়, তাই পুনর্মৃত্যু সম্ভব হয়, কেননা আবর্তন প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম। জড়ে এই আবর্তন চাক্রিক, প্রাণে কম্বুরেখ (spiral)। পুনর্মৃত্যুর সম্ভাবনা এই প্রাকৃত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্বানের মৃত্যুতে চেতনা আদিত্যপ্রভায় বিস্ফারিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে মৃত্যু তাই 'বৈবস্বত' (তু. 'মৃত্যু' ॥ 'মৃৎ' জড়ত্ব ॥ 'মরুৎ' জ্যোতির্ময় দিব্য প্রাণ। √ যম্-এর মত √ মৃ-রও দুটি অর্থ—মরে যাওয়া, আবার ঝলমলিয়ে ওঠা)।

মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া কখনও বৃথা হতে পারে না। তা-ই তো জীবনের পরম পুরুষার্থ। যম নচিকেতাকে তাই তিনটি বর দিতে চাইলেন।

প্রথম বরে নচিকেতা চাইল, মর্ত্যলোকের কাছে মৃত্যুমুখ হতে প্রমুক্ত চেতনার প্রতীতি।[৩৬২] দ্বিতীয় বরে চাইল অগ্নিরহস্যের বিজ্ঞান।[৩৬৩] যম খুশী হয়েই দুটি বর তাকে দিলেন, বললেন, 'এখন থেকে এই অগ্নির নাম হবে তোমারই নামে—নাচিকেত অগ্নি।[৩৬৪]

নচিকেতা তখন তৃতীয় বরে চাইল প্রেত্যসংজ্ঞার বিজ্ঞান।[৩৬৫] মর্ত্যলোককে ছাপিয়ে গেলে চেতনার অস্তিত্ব[৩৬৬] থাকে কি না, এই হল তার প্রশ্ন। মৃত্যুর অনুভব কি, তা মৃত্যুতে অবগাহন করেই জানা যেতে পারে—যদি সে-মৃত্যু বিদ্বানের বৈবস্বত মৃত্যু হয়।[৩৬৭]

মৃত্যুর কাছ থেকে মৃত্যুর রহস্য আদায় করা সহজ কথা নয়। জীবনের ঐশ্বর্য দিয়ে মৃত্যু নচিকেতাকে ভোলাতে চাইলেন।[৩৬৮] কিন্তু নচিকেতা ভোলবার ছেলে নয়।

---

[৩৬২] মৃত্যুই অমৃতের দ্বার। পরম মৃত্যু বা অসম্প্রজ্ঞানের পর সাধক যখন ব্যুত্থিত হন, তখন তাঁর চেতনার রূপান্তর ঘটে—যে যায় ঠিক সে আর ফিরে আসে না। কিন্তু প্রাকৃত চেতনার জগৎ যেমন চলবার তেমনি চলতে থাকে। রূপান্তরিত চেতনাকে সে চিনবে কি করে? অথচ যোগীর আকূতি, জগৎ এই চেতনার পরিচয় পাক। নচিকেতার প্রথম বরে এই আকূতিই ধ্বনিত হয়েছে।

[৩৬৩] অগ্নিরহস্যই যজ্ঞবিদ্যার সার। এখানে যে-অগ্নিচয়নের কথা বলা হয়েছে, তার একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় শতপথব্রাহ্মণের সপ্তম হতে দশমকাণ্ড জুড়ে। শেষ কাণ্ডটিতে অগ্নিরহস্যের বিবৃতি আছে। বিবৃতির গাম্ভীর্যে এটি উপনিষৎতুল্য। যজ্ঞবাদপ্রসঙ্গে তার আলোচনা করব। নাচিকেত অগ্নিচয়নের বিবরণের জন্য দ্র. তৈ. ব্রা. ৩।১১। এখানে তার উপনিষৎটি বলা হয়েছে দুটি শ্লোকে (১৭, ১৮)। পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক—চেতনার এই তিনটি ভূমিতে অগ্নিচয়ন করতে হবে অর্থাৎ চেতনাকে গুটিয়ে এনে সংহত করতে হবে। এক ভূমি থেকে আরেক ভূমিতে উজিয়ে গেলেও তিনটির মাঝে সন্ধি বা যোগসূত্র অব্যাহত থাকবে। ফলে সেই পুরুষকে জানা যাবে যিনি 'ব্রহ্মজ-জ্ঞ' বা ব্রহ্মজ এবং জ্ঞ (তু. প্র. ৫।৬, শ্বে. ৬।২, ১৭) অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ওঙ্কার হতে জাত (তু. ১।২।১৫, ১৭) এবং সাক্ষী চেতা (শ্বে. ৬।১১)। অধিদৈবত দৃষ্টিতে এই পুরুষ আদিত্য (তু. শ. ব্রা. ১০।৫।২)। এখন নচিকেতার প্রশ্ন হবে, তারও পরে কিছু আছে কি না।

[৩৬৪] তৈ. ব্রা.তে মোটের উপর চারটি অগ্নিচয়নের বিবৃতি আছে—সাবিত্রী, নাচিকেত, চাতুর্হোত্র এবং বৈশ্বসৃজ (৩।১০-১২)।

[৩৬৫] 'প্রেত্য' উপনিষদে একটি বহুপ্রযুক্ত শব্দ, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'এগিয়ে গিয়ে'। প্রাণের ধর্মই হল অগ্রগতি—যেমন সূর্যের উদয়ন। আপাতদৃষ্টিতে এই অগ্রগতি ব্যাহত হয় মৃত্যুতে। মাধ্যন্দিন সূর্য অস্তের দিকে ঢলে পড়ে শেষে নিবে যায়। কিন্তু বিদ্বানের অন্তর্জ্যোতি মৃত্যুতেও অনির্বাণ থাকতে পারে। তাহলে অবিদ্বানের বেলায় 'প্রেত্য'র তাৎপর্য হল 'মরে গিয়ে', আর বিদ্বানের বেলায় 'লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হয়ে' (তু. কে. শাঙ্করভাষ্য 'প্রেত্য ব্যাবৃত্য মমাহংলক্ষণাদ্ অবিদ্যা-রূপাদস্মাৎ লোকাদ্ উপরম্য সর্বাত্মকমাত্মভাবম্ অদ্বৈতমাপন্নাঃ সন্তঃ' ২।৫)। চেতনার এই উত্তরণকে ঋক্‌সংহিতায় বলা হয়েছে 'প্রেতি'। অগ্নি তার প্রবর্তক বা নেতা, তাই সেখানে তাঁর একটি সংজ্ঞা 'প্রেতীষণি' (৬।১।৮)। দ্র. টীকা ২৩৩, তৈ. ব্রা. বিবরণ।

[৩৬৬] আস্তিক্য-নাস্তিক্যের ভেদ এই থেকে। আপাতদৃষ্টিতে, যে বলে পরলোক নাই অর্থাৎ চেতনার উত্তরণ সম্ভব নয়, সে নাস্তিক (ক. ১।২।৬)। আবার যিনি বলেন, লোকোত্তরে সংজ্ঞা থাকে না, তিনিও নাস্তিবাদী বা নাস্তিক (দ্র. তৈ. ব্রা. বিবরণ)। বেদপন্থীরা সাধারণত তা বলতেন না, কিন্তু মুনিরা বলতেন (তু. 'বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইল নাস্তিক')। যে ঈশ্বর মানে না, সে নাস্তিক—এটা লোকোক্তি মাত্র।

[৩৬৭] দ্র. ছা. ৮।৬।৫-৬

[৩৬৮] তু. কৌ. ১।৪; যোগের মধুমতী ভূমি যো. সূ. ভাষ্য ৩।৫১। নিরোধাভিমুখ চিত্তে বিভূতির আবির্ভাব যোগসাধনার একটা স্বাভাবিক ফল। কিন্তু যোগীকে সাবধানে এই প্রেয়ের প্রলোভন ত্যাগ করে যেতে হবে শ্রেয়ের দিকে (তু. ক. ১।২।১-৪)।

সে বলল, 'কাম ইন্দ্রিয়ের তেজকে জীর্ণই করে, আমি তা চাই না। বিত্ত দিয়ে মানুষকে তুমি তৃপ্ত করতে পারবে না। মহান্ সাম্পরায়ের রহস্যই আমি জানতে চাই তোমার কাছে। অন্য বর আমি চাই না।'

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লীর এইখানে শেষ। দ্বিতীয় বল্লী থেকে অধ্যায়সমাপ্তি পর্যন্ত যমের অনুশাসন।

নচিকেতার মাঝে অভীপ্সার দৃঢ়তা দেখে যম খুশী হয়ে বলতে লাগলেন, 'প্রেয় আর শ্রেয়ের মাঝে যে বিবেক[৩৬৯] করতে পারে, সেই ধীমান্। কাম তোমাকে লুব্ধ করতে পারল না, তাইতে বুঝলাম, সত্যি তোমার মাঝে বিদ্যার অভীপ্সা জেগেছে। যারা অবিদ্যাগ্রস্ত, বিত্তমোহে মূঢ় হয়ে তারাই প্রেয়কে আঁকড়ে থাকে। সাম্পরায়[৩৭০] তাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। তারা মনে করে, শুধু ইহলোকই আছে, তার পরে আর-কিছুই নাই। তাইতে তারা বারবার আমার কবলিত হয়।

'কিন্তু ইহলোককে ছাপিয়েও যা থাকে, তা হল আত্মচৈতন্য। আত্মবিজ্ঞানের ধারণা সহজ নয়। তার বক্তা এবং শ্রোতা দুইই আশ্চর্য এবং কুশল। এ-বিজ্ঞান তর্কের[৩৭১] দ্বারা পাওয়া যায় না। আর-কেউ জানিয়ে দিলেই তবে এ-রহস্য জানা যায়।

'বিত্ত যে অনিত্য, তা আমি জানি। এও জানি, অধ্রুব দিয়ে সেই ধ্রুবকে পাওয়া যায় না। তাইতো আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করলাম। আর তাইতে অনিত্য দ্রব্য দিয়েই পেলাম নিত্যকে।[৩৭২]

'কিন্তু তার জন্য লোকৈষণাও ছাড়তে হয়, ছাড়তে হয় হর্ষ-শোকের দ্বন্দ্ব।[৩৭৩] গুহাহিত সেই দুর্দর্শ দেবতাকে[৩৭৪] জানবার জন্য আশ্রয় করতে হয় অধ্যাত্মযোগ।[৩৭৫]

---

[৩৬৯] সংহিতায় বিবেকের সংজ্ঞা হল 'বিচয়': 'চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্ বি বিদ্বান্' (৪।২।১১)। চিত্তি এবং অচিত্তি সেখানে যথাক্রমে বিদ্যা- ও অবিদ্যা-স্থানীয়। √চিৎ বোঝায় 'সংজ্ঞান' (perception)।

[৩৭০] < সম্পরায়; তু. তৈ. ব্রা. নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং সর্বানুভূমাত্মানং সম্পরায়ে ৩।১২।৯।৭; প্রেতির সমার্থক (তু. পরা √ ই ঋ. ১০।১৪।১, ২, ৭)।

[৩৭১] শব্দটি সংহিতায় ব্রাহ্মণে বা প্রাচীন উপনিষদ্গুলিতে নাই। আছে পারস্করগৃহ্যসূত্রে (২।৬।৫) আর গৌতমধর্মসূত্রে (১১।২৫)। নিরুক্তপরিশিষ্টে পাই : 'অয়ং মন্ত্রার্থচিন্তাভ্যূহঃ, অভ্যূল্.হোঽপি শ্রুতিতো অপি তর্কতঃ...মনুষ্যা বা ঋষিষূৎক্রামৎসু দেবানব্রুবন্ কোন ন ঋষিৰ্ভবিষ্যতীতি, তেভ্য এতং তর্কম্ ঋষিং প্রায়চ্ছন্' (১৩।১২)। এখানে শ্রুতি (মীমাংসা) এবং তর্ক দুটি প্রস্থানের স্পষ্ট উল্লেখ পাচ্ছি। আরও দেখা যাচ্ছে, তর্কের প্রাচীন সংজ্ঞা 'ওহ' বা 'উহ' (< √ উহ বিতর্কে)। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বিচারপ্রবণ, তাঁদের সংজ্ঞা 'ওহব্রহ্মা' (ঋ. ১০।৭১।৮)। তবে উহ এবং তর্কে একটু সূক্ষ্ম তফাত আছে। উহ বা ওহ বস্তুত মনন, তার মূলে শ্রদ্ধা; তারই পরিণাম 'মীমাংসা'। আর তর্কের মূলে সংশয়। এই থেকে মীমাংসা আর তর্ক—মননের এই দুটি ধারা, যার কথা আগেও বলেছি। উহ বা ওহ সম্পর্কে দ্র. Geldner, *Der Rgveda* 1.61.10। তু. Gk. *enchomai,* I pray, *encho,* a prayer। তর্ক ॥ তর্কু 'টাকু' (cp. Gk. *atraktos,* Lat. *torquere* 'to twist, bend'; নি. ২।১)।

[৩৭২] অনিত্য দিয়ে নিত্যকে পান, যিনি রহস্যবেত্তা (তু. ঋ. ১০।৮৫।৩-৪; ঐ. আ. পুরুষে ত্বেবাবিস্তরমাত্মা, স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমঃ......মর্ত্যেনামৃতমীপ্সতি এবং সম্পন্নঃ ২।৩।২; মু. তদেতৎ সত্যম্ ১।২।১, আবার ২।১।১; দ্র. তৈ. ব্রা. বিবৃতি।

[৩৭৩] বৈদিক দর্শনের মোড় ফিরল এইখান থেকে, আধিদৈবতদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হল অধ্যাত্মদৃষ্টি। যিনি ঐখানে, তিনি এইখানেও। এই দৃষ্টি ঋক্সংহিতাতেও পাই : 'ন তং বিদাথ য় ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব' ১০।৮২।৭; তু. অ. স. ১০।৮।৩২ (ঋ. 'অন্তিদেব' ১।১৮০।৭)।

[৩৭৪] দেবতা গুহাহিত, এটি ঋক্সংহিতারও ভাব (তু. ২।১১।৫ [৩।৩৯।৬, ১০।১৪৮।২], গুল্.হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ত্ সত্যমন্ত্রাঃ ৭।৭৬।৪...)।

[৩৭৫] এই অধ্যাত্মযোগই সংহিতায় ধীযোগ (দ্র. ঋ. ৩।৩।৮ টীকা)।

'এই ধর্ম্য অণুপ্রমাণ বোধকে প্রাকৃত বোধ হতে যে নিষ্কাসিত করে নিতে পারে, আনন্দের সন্ধান সে-ই পায়। নচিকেতা, মনে হচ্ছে, ঘরের দুয়ার খুলে গেছে!'[৩৭৬]

অসীম আগ্রহে নচিকেতা বলল, 'কী দেখছ সেখানে আমায় বল। ধর্মাধর্ম কৃতাকৃত ভূতভব্যের অতীত সে কোন্ রহস্য?'

যম বললেন, 'সংক্ষেপে তোমায় বলছি। সে হল ওম্।[৩৭৭] এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই অবলম্বন। একে জেনেই ব্রহ্মলোকের মহিমা[৩৭৮] অধিগত হয়।

'এই ওঙ্কারকে জানাই হল আত্মাকে জানা, যিনি প্রতি জীবে গুহাহিত হয়ে আছেন "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" হয়ে, অজ নিত্য শাশ্বত এবং পুরাণরূপে। যে অশোক, যে অক্রতু, ধাতুপ্রসাদের ফলে[৩৭৯] আত্মার মহিমাকে সে-ই উপলব্ধি করতে পারে।

'আবার বলি, আমি ছাড়া মদামদ এই দেবতাকে কে জানতে পারে?[৩৮০] অথবা বলতে পারি, প্রবচন মেধা বা শ্রুতির দ্বারা এই আত্মাকে জানা যায় না, তিনি যাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁকে পায়, তারই কাছে তিনি তাঁর তনুখানি মেলে ধরেন।[৩৮১]

'তবে তারও জন্যে প্রস্তুত হতে হয় দুশ্চরিত হতে বিরত হয়ে, শান্ত সমাহিত ও শান্তমানস হয়ে তাহলে প্রজ্ঞানদ্বারা এই আত্মাকে পাওয়া যায়।[৩৮২]

'অথবা কে তাঁর রহস্য জানে?[৩৮৩] ব্রহ্ম আর ক্ষত্র দুইই যে তাঁর ওদন, আর মৃত্যুই তাঁর উপসেচন!'[৩৮৪]

---

[৩৭৬] এই জ্যোতির দুয়ার খুলে যাওয়ার কথা ঋক্‌সংহিতার প্রতিটি আপ্রীসূক্তেই আছে (দ্র. ৩।৪।৫ টীকা)। তু. ছা. ২।২৪, ৮।৬।৫; ঈ. ১৫।

[৩৭৭] এইটি নচিকেতার দীক্ষা, গুরু যম।

[৩৭৮] ব্রহ্মলোক সংহিতায় 'পরম ব্যোম', 'উরু লোক', 'উরু অনিবাধ', যেখানে 'অংহ' বা ক্লিষ্টতা থেকে চেতনার মুক্তি।

[৩৭৯] 'ধাতু' উপাদান (তু. ঋ. ৫।৪৪।৩), 'প্রসাদ' স্বচ্ছতা। বৌদ্ধদর্শনের দুটি সুপরিচিত সংজ্ঞা। উপনিষদে ধাতুপ্রসাদ = সত্ত্বশুদ্ধি (তু. ছা. ৭।২৬।২); শ্বেতাশ্বতরে তার বর্ণনা আছে (২।১২)। ধাতুপ্রসাদের ফলে শরীর যোগাগ্নিময় হয়। ঋক্‌সংহিতায় আছে, ইন্দ্র অপালাকে 'সূর্যত্বচ্' করেছিলেন তিনবার তাঁকে পূত ক'রে (৮।৯১।৭)। ধাতুপ্রসাদ তন্ত্রে হয়েছে ভূতশুদ্ধি।

[৩৮০] 'মদামদ' মদ + আমদ (ভৃশার্থে), অথবা মদ + অমদ ('সহর্ষঃ অহর্ষশ্চ' শঙ্কর)। শঙ্করের অর্থই সঙ্গত মনে হয়। নচিকেতা দ্বিতীয় বরে যা পেয়েছে, তা হল 'মদ' (তু. ১।১।১২-১৩; সংহিতায় 'মদ' হল সোমপানজনিত মত্ততা, তার একটি উজ্জ্বল বিবরণ আছে ঋ. ২।১৫ তে)। তৃতীয় বরের ঈপ্সিত তত্ত্ব হল তারও ওপারে, তা 'অমদ'। লক্ষণীয়, মুনিপন্থীদের অনেকেই পরমার্থকে 'সুখ' বলতে রাজী নন, বলেন সুখেরও অতীত দুঃখাভাবমাত্র। উপনিষদে এইটি অসদ্‌ব্রহ্ম। মৃত্যুতে অবগাহন না করে তা পাওয়া যায় না। অমৃতসম্ভোগ তার অযত্নসিদ্ধ পরিণাম (তু. ক. লপ্‌স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা ১।১।২৭; ঈ. ১৪)।

[৩৮১] সংহিতায় দেখি, বাক্‌ও এমনি করে সিদ্ধের কাছে তাঁর তনুখানি মেলে ধরেন ঋ. ১০।৭১।৪); তিনি যাকে চান, সে-ই তাঁকে পায় (১০।১২৫।৫)।

[৩৮২] দুশ্চরিত সংহিতার বহুপ্রযুক্ত 'দুরিত'। তু. জ্যোতির্বৃণীত তমসো বিজানন্নারে স্যাম দুরিতাদভীকে ঋ. ৩।৩৯।৭। বৌদ্ধসাধনাতেও দেখি, শীল হতে সমাধি, তাহতে প্রজ্ঞা।

[৩৮৩] তু. ঋ. ১০।১২৯।৬-৭; কে. ১।৩, ২।১-৩; বৃ. ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ২।৪।১২।

[৩৮৪] ব্রহ্ম এবং ক্ষত্রের সহচার বৈদিক ভাবনার সর্বত্র। বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় নিবিৎ-মন্ত্রগুলিতে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম বোধি বা প্রজ্ঞা, আর ক্ষত্র সাধনবীর্য। অনুরূপ : উপনিষদের শ্রদ্ধা-তপঃ, পতঞ্জলির শ্রদ্ধা-বীর্য। দর্শনে এইটিই বিবর্তিত হয়েছে ঋষিধারায় এবং মুনিধারায়। পরমতত্ত্ব কিন্তু মৃত্যু বা শূন্যতা। সে এক রহস্যময় অনুভব (তু. ঋ. ১০।১২৯।৭)।

দ্বিতীয় বল্লীর এইখানে শেষ। তৃতীয় বল্লীতে এই তত্ত্বেরই সাধনার বিবৃতি। যম বলে চলছেন:

'যাঁরা পঞ্চাগ্নি এবং ত্রিণাচিকেত, সেই ব্রহ্মবিদেরা বলেন ছায়াতপের কথা, যা লোকে ঋতপায়ী অথচ লোকোত্তর পরমপরার্ধে গুহাহিত।[৩৮৫]

'নাচিকেত অগ্নিই এই পরব্রহ্ম। এই অগ্নিরহস্য জানতে হবে, অধ্যাত্মযোগের দ্বারা সে-অগ্নিকে চয়ন করতে হবে।[৩৮৬]

'অধ্যাত্মযোগের ভিত্তি হল অধ্যাত্মজ্ঞান। তার স্বরূপ এই: এই দেহ যেন একটি রথ, ইন্দ্রিয়গুলি তার অশ্ব, মন লাগাম, বুদ্ধি সারথি এবং আত্মা রথী। ইন্দ্রিয়েরা দুষ্ট অশ্বের মত যদৃচ্ছায় বিষয়ে বিচরণ করছে। মনের লাগাম টেনে তাদের শাসনে আনতে হবে। তাতে আসবে সমনতা এবং শুচিতা।[৩৮৭] বিজ্ঞান তখন সারথি হয়ে[৩৮৮] মানুষকে নিয়ে যাবে পথের শেষে, বিষ্ণুর পরম পদে।[৩৮৯]

'বিষয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে বলে ইন্দ্রিয়ের চাইতে বড়। কিন্তু তারও চাইতে মন বড়। মনের চাইতে বুদ্ধি বড়। বুদ্ধির চাইতে বড় মহান্ আত্মা। তারও চাইতে বড় অব্যক্ত। অব্যক্তের চাইতে পুরুষ বড়। পুরুষের চাইতে বড় আর-কিছু নাই।[৩৯০]

'সর্বভূতে এই পুরুষ রয়েছেন গূঢ়াত্মা[৩৯১] হয়ে। একমাত্র অগ্র্যা বুদ্ধিতেই তাঁকে দেখা যায়। তার জন্য বাক্‌কে নিয়ত করতে হয় মনে, মনকে জ্ঞান আত্মায়, তাকে আবার মহান্ আত্মায় এবং তাকেও শান্ত আত্মায়।[৩৯২]

---

[৩৮৫] অধ্যাত্মসাধনায় পঞ্চাগ্নি যথাক্রমে অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য চন্দ্র এবং তারকা—চেতনার উত্তরায়ণের পাঁচটি ভূমি (ক. ২।২।১৫)। তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করতে হয় তিনটি সন্ধিতে (১।১।১৭-১৮)। আতপ লোক, ছায়া লোকোত্তর, সংহিতায় যথাক্রমে মিত্র এবং বরুণ; পুরাণে সূর্যের দুই পত্নী—সংজ্ঞা আর ছায়া। ঋতপায়ী = মধুদ (২।১।৫; তু. পিপ্পলাদ ঋ. ১।১৬৪।২০)। পরমপরার্ধ সংহিতার পরমব্যোম।

[৩৮৬] তু. ১।২।১২; এই অধ্যাত্মযোগকে লক্ষ্য করেই ব্রাহ্মণের ফলশ্রুতিতে পাই 'য় এবং বেদ'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নিচয়ন হল ইন্দ্রিয়ের সংহরণ। সাংখ্যে যা ইন্দ্রিয়, বেদে তা প্রাণ। তৈ. স.তে সাতটি শীর্ষন্য প্রাণের কথা আছে (৫।১।৮।১)—দুটি চক্ষু, দুটি শ্রোত্র, দুটি ঘ্রাণ বা প্রাণ এবং বাক্। এদের সঙ্গে মনকে যোগ করলেই উপনিষদের 'দ্বারপা'দের পাই (ছা. ৩।১৩।৬)। এই 'খ'গুলি পরাক্, 'আবৃত্তচক্ষু ধীর' তাদের গুটিয়ে নিয়ে আত্মাকে প্রত্যক্ দর্শন করেন (ক. ২।১।১)। সাতটি ইন্দ্রিয় প্রাণাগ্নির সাতটি শিখা (প্র. ৩।৫, মু. ২।১।৮, বৃ. ২।২।৩)। এই শিখাগুলিকে 'সঞ্চিত' করতে হবে মূর্ধন্যচেতনায়। এই হল বৈদিক ধীযোগের মুখ্য সাধনা।

[৩৮৭] শুচিতা অগ্নির বিশেষ গুণ। তিনি দাহক এবং পাবক, তাই 'শুচি'। তু. ঋ. ১।৯৭এর ধুবা : 'অপ নঃ শোশুচদঘম্'। আত্মা শুচিষদ্' (ক. ২।২।২ = ঋ. ৪।৪০।৫)। 'সমনস্কতা' সংহিতায় 'মনু্য' (দ্র. ঋ. ১০।৮৩, ৮৪), যা তপঃশক্তি, যার সহায়ে আমরা 'বিশ্ব তমুৎসং য়ত আবভূথ' (১০।৮৪।৫)। যোগে এইটি সংবেগ ও ধ্যানচিত্ততা।

[৩৮৮] 'বিজ্ঞান' সংহিতায় ধী অথবা মনীষা।

[৩৮৯] তু. ঋ. ১।২২।১৬-২১, ১।১৫৪।৪-৬।

[৩৯০] এখানকার বুদ্ধি—মহান্ আত্মা—অব্যক্ত = জ্ঞানাত্মা—মহাত্মা—শান্তাত্মা (১৩)। সংহিতার ভাষায় অগ্নি—মিত্র—বরুণ। সব মিলে আদিত্যপুরুষ বা সূর্য (ঋ. ১।১১৫।১)। এই পুরুষের একপিঠ 'শুক্লং ভাঃ', আরেকপিঠ 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্' (ছা. ১।৬।৫, ৭।৪), একপিঠ আতপ, আরেক-পিঠ ছায়া। দুয়ে মিলে তিনি পুরুষোত্তম।

[৩৯১] বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী বলেন গূঢ়োত্মা = গূঢ়ঃ + অত্মা। সুতরাং আত্মা = আ + অত্মা অর্থাৎ আধারে যিনি আ-গত বা আবিষ্ট। দ্র. 'বৈদিকপদানুক্রমকোশঃ'। সংহিতায় অগ্নি 'বিশাম্ অতিথিঃ' (দ্র. ঋ. ৩।২।২ টীকা) অথবা 'আত্মা'। দুটি সংজ্ঞা একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন।

[৩৯২] 'জ্ঞানাত্মা' আমাদের মধ্যে ধী বা ব্যক্তিচৈতন্য। তাই বিস্ফারিত হয় মহান্ আত্মায় আদিত্যের মত। তা শান্ত হয়ে মিলিয়ে যায় 'অস্তে' বা শূন্যে।

'তোমরা ওঠ, জাগ![৩২৩] বরেণ্য [৩২৪] পুরুষদের পেয়ে প্রবুদ্ধ হও। ক্ষুরের নিশিত ধারার মত সে-পথের দুর্গমতার কথা কবিরা বলে গেছেন।

'আর সে-তত্ত্ব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন, অনাদি অনন্ত নিত্য ধ্রুব এবং মহতেরও ওপারে। মৃত্যুমুখ হতে প্রমুক্তি হয় তাকে জানলেই।'

তারপর ফলশ্রুতি দিয়ে অধ্যায়ের সমাপ্তি।[৩২৫]

তারপর তিনটি বল্লীতে দ্বিতীয় অধ্যায়। আগেই বলেছি, এটি প্রথম অধ্যায়েরই মূল প্রতিপাদ্যের বিস্তার। অধ্যায়টিতে মৃত্যুবিজ্ঞানের নানা সাধনার বর্ণনা আছে। সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে একটি মহাবাক্য—'এতদ্ বৈ তৎ।' তার অর্থ : এই হচ্ছে সেই। এই কথাটিকেই একটু ভেঙে বলা হয়েছে একটি শ্লোকে : 'যা এখানে তা-ই ওখানে, যা ওখানে তা-ই অনুবৃত্ত হয়ে আছে এখানে।'[৩২৬] সর্বত্র এক অস্তিত্বের উপলব্ধিই অমৃতত্ব। এই অস্তিত্ব আলো-আঁধারের ওপারে। তাতে নিমজ্জনই জীবনের পরমার্থ। প্রত্যেকটি বল্লীর শেষে ঘুরে-ফিরে এই কথাটিই এসেছে।

প্রথম বল্লীতে বলা হয়েছে, মানুষ বাইরটাই দেখে, ভিতরপানে কেউ তাকায় না। কদাচ কেউ অমৃতের পিপাসায় আবৃত্তচক্ষু হয়ে নিজের দিকে তাকায়। যে তাকায়, সে মুখামুখি হয়ে আত্মাকে দেখে।

এই আত্মা বোধের বোধ। বোধ জাগ্রতে—বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের মৈথুনে। তেমনি বোধ স্বপ্নে সুষুপ্তিতে। কিন্তু সব বোধের পিছনে আত্মমহিমার বোধ। এই বোধেই তুমি মধ্বদ,[৩২৭] তুমি ভূত-ভব্যের ঈশান, তুমি অজুগুপ্স বা অসঙ্কুচিত।

এই বোধই আনে সেই প্রথমজা পরমপুরুষের বোধ, যিনি ভূতে-ভূতে গুহাহিত হয়ে তাকিয়ে আছেন; আনে সেই প্রাণরূপিণী পরমা প্রকৃতি অদিতির বোধ, ভূতে-ভূতে যিনি গুহাহিত হয়ে-হয়ে চলেছেন; আনে আঁধারে নিগূঢ় সেই চিদগ্নির বোধ, যাঁকে জ্বালিয়ে তোলাই মানুষের সাধনা।[৩২৮]

সূর্যের উদয়াস্ত যে-পরমব্যোমে, তা-ই সবার শেষ।[৩২৯] এই তো সেই। যা এখানে

---

[৩২৩] তু. ঋ. উদীধ্বং জীব অসুর্ন আগাৎ ১।১১৩।১৬।

[৩২৪] সংহিতায় 'ক্ষেত্রবিৎ' : তু. ঋ. ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে ৯।৭০।৯; অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ ১০।৩২।৭; ১।১৬৪।৭; ক. ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ঃ ১।২।৮।

[৩২৫] মৃত্যুমুখ হতে প্রমুক্তি হল ব্রাহ্মণের মতে 'পনুর্মৃত্যু'কে জয় করা। মরার মত মরা একবারই হয় যাতে, জীবনভোর তারই সাধনা। এই মৃত্যুর বর্ণনা দ্র. ঋ. ১০।১৪।৭-৯, ১৬।৩-৫। এখানে লক্ষ্য বরুণ-দর্শন (ঋ. ১০।১৪।৭), উপনিষদের ভাষায় যার বিবৃতি পাচ্ছি ১৫শ শ্লোকে। বরুণ মহাশূন্যের অব্যক্তজ্যোতি। 'প্রেত্য অস্তি বা নাস্তি'র মীমাংসা হয় তাঁকে পেলে। অধ্যায়ের শেষে আছে 'প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে'। 'প্রয়তঃ' এখানে ষষ্ঠীর একবচন—যমপথ ধরে যে চলে যাচ্ছে (তু. ঋ. ১০।১৪।২) তার শ্রাদ্ধকালে এই উপনিষৎ শোনাতে হবে, যাতে লোকান্তরে তার পথের দিশা মেলে। তু. তিব্বতীদের Bardo Thodol (Evans-Wentz, *The Tibetan book of the Dead*)।

[৩২৬] তু. 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্' ঈ. শান্তিপাঠ।

[৩২৭] তু. ঋ. য়স্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণাঃ ১।১৬৪।২২; তার আগেই আছে 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' (২০)। যিনি মধ্বদ, তিনিই পিপ্পলাদ।

[৩২৮] এখানে বরুণ ('স্বঃ' ৬), অদিতি এবং অগ্নি—এই তিনটি দেবতাকে নিয়ে একটি ত্রয়ী। তু. ঋ. ৭।৮৮।৭, সেখানে বরুণ এবং অদিতির সহচার দেখতে পাই। এই ত্রয়ীই পুরাণে শিব-শক্তি-কুমার। তু. ঋ. অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ ১।৮৯।১০।

[৩২৯] তু. জৈ. ব্রা. ২।২৮। ব্রাহ্মণে এইটিই বারুণী রাত্রির শূন্যতা (তু. তৈ. ব্রা. ১।৭।১০।১)।

তা ওখানে, যা ওখানে তা-ই এখানে। এই মন দিয়েই এটি বুঝতে হবে, এখানে আলাদা-আলাদা বলে কিছুই নাই। আলাদা-আলাদা যে দেখে, সে-ই মরে।[৪০০]

সেই অখণ্ড অদ্বয় অস্তিত্বই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হয়ে আছেন এই দেহের মাঝখানটিতে, ভূত-ভব্যের ঈশান হয়ে জ্বলছেন অধূমক জ্যোতির মত। তিনি আজও আছেন, কালও থাকবেন। এই তো সেই।

এককেই দেখ। বহুকে দেখতে গিয়ে মনকে ছড়িয়ে দিও না। যিনি মুনি,[৪০১] যিনি বিজ্ঞানী, তাঁর আত্মা শুদ্ধ জলের সঙ্গে শুদ্ধ জলের মত মিশে যায়।[৪০২]

তারপর দ্বিতীয় বল্লীতে:

এগার দুয়ারের এই পুরীতে[৪০৩] আছেন সেই অজ অবক্রচেতা[৪০৪] পুরুষ। এখানে অনুস্যূত থেকেও তাঁর শোক নাই; আবার যখন তিনি মুক্ত, তখন মুক্তই।[৪০৫] তিনিই হংস—আদিত্যরূপে, আবার জীবরূপে তিনিই 'ঋতং বৃহৎ'।[৪০৬] প্রাণের বিকর্ষণ আর অপানের আকর্ষণের মাঝে তিনি আছেন বামনরূপে।[৪০৭] আকর্ষণ-বিকর্ষণ যখন থেমে যায়, শরীরের বিস্রস্তির সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও মুক্তিতে ছড়িয়ে পড়েন। তখন কি আর বাকী থাকে?[৪০৮]

মৃত্যুর পর কি হয়, জান? কেউ নতুন শরীরের জন্য যোনিকে আশ্রয় করে, কেউ-বা স্থাণু হয়ে যায়।[৪০৯]

অগ্নির মত বায়ুর মত সূর্যের মত[৪১০] সর্বভূতান্তরাত্মা রূপে-রূপে হয়েছেন প্রতিরূপ, আবার ছাপিয়েও গেছেন সব-কিছু।[৪১১] ঘুমন্তের মাঝে তিনিই জেগে আছেন কামনার নির্মাতা হয়ে। একরূপকে তিনি করছেন বিশ্বরূপ। নিত্যের নিত্য তিনি,

---

[৪০০] 'নানা' বা পৃথক্-ভাব নাই এখানে, কেননা সবই সেই একেরই বিভূতি। পরাক্-দৃষ্টিতে শুধু বিভূতিকে দেখা, সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যক্-দৃষ্টিতে সর্বানুস্যূত এককে না দেখাই মরণ থেকে মরণে যাওয়া। বিভূতি মিথ্যা নয়, মিথ্যা হল নানাত্বের বোধ।

[৪০১] 'মুনি' তু. Gk. *monos* একা, নিঃসঙ্গ। দ্র. ঋ. ১০।১৩৬।

[৪০২] এটি একটি নিত্যাবস্থা—কি জীবনে, কি মরণে। রামপ্রসাদ বলেছিলেন, মৃত্যুতে 'জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মেশে জলে।' সুতরাং ব্যক্তির অমৃতত্ব নয়, অমৃত অধিষ্ঠানেরই অমৃতত্ব। এইটি জানাই মৃত্যুবিজ্ঞান। উদ্দালক একে বলেছেন সৎসম্পত্তি (ছা. ৬।৮।১, ১৫।২); তু. যাজ্ঞবল্ক্যের 'প্রেত্য' সংজ্ঞাভাব (বৃ. ২।৪।১২)।

[৪০৩] অ. স.-তে আছে নবদ্বার পুরের কথা : অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরয়োধ্যা, তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ১০।২।৩১; পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্, তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ ৮।৪৩। শঙ্কর বলছেন নাভি এবং ব্রহ্মরন্ধ্রকে নিয়ে একাদশ দ্বার।

[৪০৪] চেতনার অবক্রতাই হল সংহিতায় অধবর (=অকুটিল) গতি। তু. যুয়োধ্যস্মাজ্ 'জুহুরাণম্' এনঃ ঋ. ১।১৮৯।১।

[৪০৫] অর্থাৎ জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি একই।

[৪০৬] দ্র. ঋ. ৪।৪০।৫, ৯।১০৭।১৫, ১০৮।৮...

[৪০৭] দ্র. ঋ. অন্তশ্চরতি রোচনাঽস্য প্রাণাদপানতী (সার্পরাজ্ঞী; তু. কুণ্ডলিনী) ১০।১৮৯।২। বামন 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ' (ক. ২।১২।১, ১৩)। তু. শ. ব্রা. বামনো হ বিষ্ণুরাস ১।২।৫।৫।

[৪০৮] সুতরাং বিজ্ঞানীর মৃত্যু হল শূন্যতা।

[৪০৯] অপ্রবুদ্ধের স্থাণুত্ব; সম্যক্সম্বুদ্ধেরও তা-ই। ঈষৎ-প্রবুদ্ধের জন্মান্তর। তাছাড়া আছে প্রবুদ্ধের 'সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বম্' (ক. ২।৩।৪)

[৪১০] অগ্নি বায়ু সূর্য তিনটি লোকে বা চেতনার তিনটি ভূমিতে।

[৪১১] তু. ঋ. রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্ ৩।৫৩।৮; রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়, ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৬।৪৭।১৮। আবার, 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্' ১০।৯০।১।

চেতনের চেতন। তাঁকে আত্মস্থ যে জানে, তারই শাশ্বত সুখ আর শাশ্বত শান্তি।

সেই হয়েছেন এই। সে অনির্বচনীয় পরম সুখকে কি করে জানব! তিনি কি প্রতিভাত হন, বা হন না?[৪১২]

সেখানে অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য চন্দ্র তারকা কিছুই তো ভায় না। এরা সবাই যে তাঁরই প্রভার অনুভা।[৪১৩]

তারপর তৃতীয় বল্লীতে:

ব্রহ্ম সর্বাশ্রয় অমৃতজ্যোতি। তিনি ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ।[৪১৪] একাধারে যেমন তিনি সর্বপ্রস্রবণ প্রাণ, তেমনি উদ্যত বজ্রের মত মহাভয়।[৪১৫]

এই দেহ থাকতেই যদি তাঁকে জানা যায় তাহলে বিসৃষ্টির পরম্পরায় দিব্যশরীর ধারণের সামর্থ্য জন্মে। তখন গন্ধর্বলোকে তাঁকে অনুভব করা যায় জলে প্রতিবিম্বের মত, পিতৃলোকে স্বপ্নচ্ছবির মত, ব্রহ্মলোকে ছায়াতপের মত।[৪১৬] কিন্তু আত্মাতে দর্শন হয় দর্পণে প্রতিবিম্বের মত।

কি করে এই আত্মাকে পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয়ের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়, তারা সবাই আলাদা-আলাদা আর বহির্মুখ। অথচ তাদের উৎস কিন্তু এক। যেতে হবে সেই একে। ইন্দ্রিয়ের পরে মন, তার পরে সত্ত্ব, তার পরে অব্যক্ত। অব্যক্তের পরে অলিঙ্গ ব্যাপক পুরুষ।[৪১৭] অন্তরাবৃত্তিতে ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধি যখন স্থির হয়ে যায়, তখন এই আত্মাকে দেখা যায়—কিন্তু চোখ দিয়ে নয়, শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে।[৪১৮] আত্মসংবিতের স্থিরভূমিতে থেকে উদয়াস্তের খেলা দেখে যাওয়াই যোগ।[৪১৯]

যেতে হবে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বোধে।[৪২০] উদয়াস্তের তত্ত্বটি রয়েছে ঐখানে। বিশুদ্ধ অস্তিত্বে কামনা নাই। কামনাই হৃদয়ের গ্রন্থি। যিনি অকাম, তিনি নির্গ্রন্থ।[৪২১] মর্ত্য হয়েও তিনি অমৃত, এইখানেই তাঁর ব্রহ্মের সম্ভোগ।

অস্তিতে সমাপন্ন পুরুষ মৃত্যুকালে মূর্ধন্যনাড়ী ধরে অমৃতত্বে অবগাহন করেন।[৪২২]

---

[৪১২] তু. ঋ. ১০।১২৯।৬-৭; কে. ১।৩; ক. ১।২।২৫।

[৪১৩] পতঞ্জলির ভাষায় এইটি অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। তু. তৈ. 'অসদ্‌ ব্রহ্ম' ২।৬। সংহিতায় 'শূন' বা শূন্যতা; তু. ঋ. ২।২৭।১৭, ২৮।১১, ২৯।৭, ১০।৩৭।৬...।

[৪১৪] এইটি ব্রহ্মবৃক্ষ বা বারুণবৃক্ষ। কোথাও তা অশ্বত্থ (ছা. ৮।৫।৩), কোথাও ইল্য (< 'ইরা' অগ্নিশক্তি? কৌ. ১।৩), কোথাও ন্যগ্রোধ (বৌদ্ধ অনুশাসনে, তু. 'নৈচাশাখ' ঋ. ৩।৫৩।১৪ টীকা), কোথাও কদম্ব। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ীতন্ত্র, মস্তিষ্ক তখন 'ঊর্ধ্ববুধ্ন'। 'বুধ্ন' শব্দটি শ্লিষ্ট, বোঝায় বোধকেও। মস্তিষ্ক বোধের আধার। দ্র. ঋ. অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ, নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতা কেতবঃ স্যুঃ ১।২৪।৭। তু. তৈ. আ. ঊর্ধ্বমূল-মবাক্‌শাখং বৃক্ষং য়ো বেদ সম্প্রতি ১।১১।৫।

[৪১৫] ভয় তাঁর প্রশাসনকে (তু. পরবর্তী শ্লোক; বৃ. ৩।৮।৯; তৈ. ২।৮।১)।

[৪১৬] এগুলি যোগীর মৃত্যুর পর বিভূতির বর্ণনা। তু. বৃ. ৪।৪।৪, ৩।৯।১৪-১৬। লোকে চেতনার ভূমি (দ্র. তৈ. ২।৮)।

[৪১৭] তু. ক. ১।৩।১০-১১; দ্র. টীকা ৩২৯। জ্ঞানাত্মা এখানে 'সত্ত্ব'।

[৪১৮] তু. ঋ. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ১।৬১।২।

[৪১৯] প্রত্যাহারই যোগবীজ। সংহিতায় তার বর্ণনা: 'হৃদি প্রতীষ্যা মনীষা' পাওয়া (ঋ. ১০।১২৯।৪)।

[৪২০] সংহিতায় 'একং সৎ' (ঋ. ১।১৬৪।৪৬, ১০।১১৪।৫)।

[৪২১] ভাগবতে মুনিরা আত্মারাম এবং নির্গ্রন্থ (১।৭।১০)। বৌদ্ধ সাহিত্যে জৈনেরা নির্গ্রন্থ।

[৪২২] ছা. ৮।৬।৬

পরমপুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র হয়ে হৃদয়ে নিহিত আছেন।[৪২৩] এই শরীর থেকে তাঁকে নিষ্কাষিত করে জানতে হবে অমৃতজ্যোতিরূপে।

এইখানেই উপনিষদের শেষ। নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব পাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।২।৬, ৭ ; ৩।৪-৫)। প্রথম অধ্যায়ের শেষে এটি আভাসিত ছিল। মোটের উপর সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াল, যে-অস্তিত্বে সব-কিছুর উদয়াস্ত, তাতে স্থিত হলে 'প্রেত্য অস্তি বা নাস্তি'র প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অস্তিত্বে সমাপন্ন হওয়াই অমৃতত্ব। অমৃতত্বলাভের জন্য দরকার শ্রেয় এবং প্রেয়ের বিবেক এবং কাম্যবস্তুর প্রতি বৈরাগ্য। তারপর ধরতে হবে অন্তরাবৃত্তির পথ। ইন্দ্রিয় আর মনকে ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে জ্ঞান-আত্মায়। তারপর স্ফুরিত হবে আত্মার মহিমা এবং প্রশম।[৪২৪] অস্তি-নাস্তির মীমাংসা সেইখানে।

তারপর **শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ**—আগাগোড়া পদ্যে এবং ছয় অধ্যায়ে। দার্শনিক ভাবনার প্রাচুর্য এই উপনিষৎটির একটি বৈশিষ্ট্য। প্রবক্তা শ্বেতাশ্বতর [৪২৫] চরণব্যূহকারের মতে কৃষ্ণযজুর্বেদের একজন শাখাপ্রবর্তক। এই শাখাটি এখন লুপ্ত। শ্বেতাশ্বতরব্রাহ্মণের উল্লেখ মাত্র একজায়গায় পাওয়া যায়।[৪২৬] বর্তমান উপনিষৎখানি তার অন্তর্গত হয়ে থাকলেও ভাষার বিচারে এটিকে অর্বাচীন বলেই মনে হয়। প্রাচীন প্রায় সমস্ত উপনিষদই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেছে, কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে কর্মের কোনও উল্লেখই নাই। তার বদলে আছে যোগের।[৪২৭] তাই এটিকে পরের যুগের যোগোপনিষৎ-গুলির আদিগ্রন্থ মনে করা অসঙ্গত হবে না।

উপনিষৎটিতে সংহিতার অনেক মন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সংহিতার মতই পরম-দেবতা অর্থে 'দেব' শব্দের বহুল প্রয়োগও লক্ষণীয়। আবার এই দেব স্পষ্টতই রুদ্র বলে উল্লিখিত হয়েছেন। ঋক্‌সংহিতাতেই আমরা রুদ্রকে শিবরূপে পাই।[৪২৮] সুতরাং উপনিষৎখানিকে শৈবযোগিসম্প্রদায়েরও[৪২৯] আদিগ্রন্থ বলা যেতে পারে। মোটের উপর

[৪২৩] অঙ্গুষ্ঠমাত্র ছান্দোগ্যে প্রাদেশমাত্র ৫।১৮।১। সংহিতায় এই পুরুষ 'বক্ষয়ঃ রৎসঃ' (১।১৬৪।৪), যিনি শিশু অগ্নি (৩।১।৪, ৪।১৫।৬, ৫।৯।৩, ৬।৭।৪...; পুরাণে 'কুমার'), 'শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে' (১।৩১।২)।

[৪২৪] সংহিতায় এই ভাবনাটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আদিত্যগতির প্রতীক দিয়ে। চেতনার উন্মেষ সূর্যোদয়ের মত। তার চরমোৎকর্ষ সূর্যের মাধ্যন্দিন মহিমায়। তাকে আর ঢলতে দেওয়া হবে না। অথচ আতপের পিছনে ছায়ার রহস্যও জানতে হবে। তাই অন্তরাবৃত্ত চেতনায় চলে আঁধারের ভিতর দিয়ে অভিযান। প্রাণের স্বাভাবিক স্ফুরণে অমৃতত্বের যে-অনুভব, তাকে প্রগাঢ় এবং পূর্ণ করা মৃত্যুতে অবগাহন ক'রে। এই আতপ আর ছায়া বিধৃত হয়ে আছে পরম প্রশান্তিতে।

[৪২৫] দ্র. ৬।২১। বলছেন 'অত্যাশ্রমী'দের। এই অত্যাশ্রমীরা কি অথর্বসংহিতার 'বিদ্বান্ ব্রাত্য' (১৫।১০...)? এ'রাই কি 'শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ' (তৈ. আ. ২।৭।১ 'বাতরশনা ঋষয়ঃ' তু. ঋ. মুনয়ো বাতরশনাঃ ১০।১৩৬।২; বৃ. ৪।৩।২২)? ঊর্ধ্বমন্থী = ঊর্ধ্বরেতাঃ; তা. ব্রা.র জ্যেষ্ঠব্রাত্যেরাও 'শমনীচমেঢ্রাঃ' (১৭।৪।১)। শ্লোকটিতে 'সম্যগ্‌ঋষিসংঘজুষ্ট' শব্দটি লক্ষণীয়। 'সম্যগ্‌ঋষি' স্মরণ করিয়ে দেয় বৌদ্ধ 'সম্মাসম্বুদ্ধ'কে। তাঁদেরও 'সংঘ' ছিল। ব্রাত্যেরাও সংঘবদ্ধ। এই উপনিষদে সাংখ্যভাবনার প্রাধান্যও লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে ঋষিধারার পাশাপাশি মুনিধারার আভাস পাচ্ছি। কপিলের উল্লেখও আছে (৫।২)।

[৪২৬] বিশ্বরূপাচার্যের যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিটীকা ১।২ (দ্র. B. K. Ghosh, *Lost Brahmanas*, p. 113)।

[৪২৭] দ্র. ধ্যানযোগ ১।৩, ১৪; সংহিতা হতে ধীযোগের মন্ত্রোদ্ধার ২।১-৭; যোগক্রিয়া ২।৮-১৩; ভূতশুদ্ধির দ্বারা যোগাগ্নিময় শরীর লাভ ২।১২; অভিধ্যান ও যোজন ১।১০; সাংখ্যযোগ ৬।১৩।

[৪২৮] দ্র. টীকা ৮৪।

[৪২৯] এ'রাই 'মুনি' বা 'বিদ্বান্ ব্রাত্য'।

এ যেন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ পৌরাণিক দেববাদ এবং সাংখ্যীয় যোগবাদের ত্রিবেণীসঙ্গম।

বিশ্বের আদিকারণসম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে উপনিষৎখানির শুরু।[৪০০] অনেকগুলি মতকে প্রত্যাখ্যান করে [৪০১] এক পরমদেবতাকেই বলা হচ্ছে জগৎকারণ।[৪০২] এই দেবতা নিত্যশক্তিযুক্ত।[৪০৩] শক্তি গুণময়ী [৪০৪] অথচ গুণাতীতা। এই শক্তিতে যে ব্রহ্মচক্র[৪০৫] ঘুরছে, হংসরূপী জীব[৪০৬] তাতে বাঁধা পড়েছে।[৪০৭] দেবতার প্রসাদে[৪০৮] সাযুজ্যবোধে তার মুক্তি হয়।

ক্ষর অক্ষর, ব্যক্ত অব্যক্ত, অজ্ঞ জ্ঞ, অনীশ ঈশ, প্রধান পুরুষ (হর)—এই দ্বৈতের ভর্তা সেই পরমদেবতা। ব্রহ্ম তিনের সমাহার এবং সমন্বয়। জীবের মাঝে তিনিই আবার ভোগ্য ভোক্তা এবং প্রেরিতা।[৪০৯] তিনি একে তিন, তিনে এক। তাঁকে জানলেই পাপমুক্তি, জন্মমৃত্যুনিবৃত্তি এবং দেহান্তে বিশ্বৈশ্বর্য এবং আপ্তকাম কৈবল্য।[৪১০]

ইন্ধনে অগ্নির ন্যায় আত্মা এই দেহেই নিগূঢ় হয়ে আছেন। নিজের দেহকে অধরারণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করে বারবার ধ্যাননির্মন্থনের দ্বারা তাঁকে দেখতে হবে।[৪১১]

প্রথম অধ্যায়ের এইখানে শেষ।

---

[৪০০] তু. ঋ. কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং য়দনস্থা বিভর্তি ১।১৬৪।৪; ঋ. ১০।৮১, ৮২; ১২৯।

[৪০১] তু. দীঘনিকায়ের 'ব্রহ্মজালসত্ত'। এইসব জিজ্ঞাসা প্রাচীন ব্রহ্মোদ্যের অন্তর্গত।

[৪০২] উপনিষদের নানা জায়গায় জগৎকারণরূপে উল্লেখ আছে অসৎ, সৎ, দেব, আকাশ, প্রাণ এবং আত্মার। ঋক্‌সংহিতায় পাই অনুপাখ্য (১০।১২৯), অসৎ (১০।৭২।২), একং সৎ (৮।৫৮।২), একই দেবতা নানা নামে (ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, অদিতি, বাক্...), পরমব্যোম। 'আত্মা হতেই সব' এমন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু আত্মস্তুতিগুলিতে তার আভাস আছে (বিশেষ দ্র. 'ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থমিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ' ১০।৬১।১৯)।

[৪০৩] ঋক্‌সংহিতায় পাই দ্যাবা-পৃথিবী, বরুণ-অদিতি, ইন্দ্র-শচী, ব্রহ্ম-বাক্ ইত্যাদি। যুগলের একটি সুলভ প্রতীক হল বৃষভ এবং ধেনু (তু. ১০।৫।৭)। প্রধান সমস্ত দেবতাই সংহিতায় শক্তিযুক্ত।

[৪০৪] তিনটি গুণের উল্লেখ অ. স. ১০।৮।৪৩; বন্ধনরজ্জু অর্থে গুণের প্রথম উল্লেখ তৈ. স. 'য়থা গুণে গুণমন্বস্যাতি' ৭।২।৪।২। তু. ঋক্‌সংহিতায় বরুণের তিনটি পাশ ১।২৪।১৫। বরুণের পাশ এবং মায়া দুইই প্রসিদ্ধ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা পাশ বা গুণ, অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা-ই মায়া (তু. শ্বে. ৪।১০)।

[৪০৫] ব্রহ্মচক্রের বিবরণে যেসব সংখ্যার উল্লেখ আছে, তাদের তাৎপর্য সর্বত্র সুস্পষ্ট নয় (দ্র. টী. ৬৮৭)। একটি ব্রহ্মচক্রের কথা গীতায় আছে (৩।১৪-১৬)। এখানকার ব্রহ্মচক্র বোঝাচ্ছে সমগ্র সম্ভূতি বা বিসৃষ্টিকে ('সর্বজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে' ১।৬)। চক্রের ভাবনা এসেছে আদিত্যের গতি হতে।

[৪০৬] তু. ঋ. ৪।৪০।৫; বৃ. হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ৪।৩।১১-১৩; শ্বে. ৩।১৮, ৬।১৫।

[৪০৭] দ্র. টী. ৪৩৪। সংহিতায় 'অংহঃ' (চেতনার সঙ্কোচ) 'তমঃ', 'এনস্', 'দুরিত', 'মৃত্যু' এই-গুলিই পাশ। মুক্তির ব্যাকুলতা অনেকজায়গায় প্রকাশ পেয়েছে। তু. অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্ ১০।৭৩।১১; বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ২।২৪।৯; উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত, অবাধমানি জীবসে ১।২৫।২১; দামেব বৎসাদ্ বি মুমুগ্ধ্যংহঃ ২।২৮।৬; এবাস্মদগ্নে বি মুমুগ্ধি পাশান্ ৫।২।৭; উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ৭।৫৯।১২...।

[৪০৮] মূলে আছে 'জুষ্টস্তেন', তাঁর দ্বারা সম্ভুক্ত হয়ে। তু. ক. ১।২।২৩।

[৪০৯] তু. ঋ. ১।১৬৪।২০ : পিপ্পল, পিপ্পলাদ এবং দ্রষ্টা। দৃষ্টি থেকেই প্রেরণা আসছে।

[৪১০] বিশ্বৈশ্বর্যই কঠে 'সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বম্' ২।৩।৪। সংহিতায় 'লোকা য়ত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ' (ঋ. ৯।১১৩।৯; সমস্ত সূক্তটিই দ্র.)।

[৪১১] তু. ঋ. অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাঃ...দিবেদিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্মনুষ্যেভিঃ ৩।২৯।২।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়াতেই সংহিতা হতে পাঁচটি মন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রেই যোগের ইঙ্গিত।[৪৪২] এ যেন সংহিতার আধারে যোগবিধির উপন্যাস।

তারপর কয়েকটি শ্লোকে যোগাচারের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৪৪৩] কিছু যৌগিক দর্শনের কথা আছে এবং শেষে আছে কায়সম্পৎ আর যোগাগ্নিময় অমৃতশরীর লাভের কথা।[৪৪৪]

তারপর বলা হচ্ছে, এমনি করেই যোগী আত্মতত্ত্বের প্রদীপ দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্বকে দর্শন করবেন। অবশেষে আবার সংহিতার দুটি মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করে অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে।[৪৪৫]

তৃতীয় অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হচ্ছে, যে অদ্বিতীয় জালবান ঈশনীসমূহের দ্বারা জগতের ঈশান হয়ে আছেন, উদ্ভবে এবং সম্ভবে যিনি এক, তাঁকে যাঁরা জানেন তাঁরা অমৃত হন।[৪৪৬]

তারপর সংহিতা হতে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধার করে এই ঈশানকে 'রুদ্র' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি মন্ত্র ঋক্‌সংহিতার বিশ্বকর্মসূক্ত হতে নেওয়া। একটি মন্ত্রে আছে পুরুষবিজ্ঞানের উদাত্ত ঘোষণা।[৪৪৭] তারপর অধ্যায়ের শেষপর্যন্ত এই পরম-পুরুষেরই বর্ণনা। তার দুটি মন্ত্র পুরুষসূক্ত হতে নেওয়া। তিনিই সব-কিছু হয়েছেন এবং অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হয়ে সবার হৃদয়ে আছেন, এই দুটি ভাবের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়েরই অনুবৃত্তি, সংহিতা হতে তেমনি মন্ত্রের উদ্ধরণ। নতুন বিষয়ের মধ্যে দেখি, পরমদেবতা যেমন রুদ্র, তেমনি শিবও। রুদ্ররূপে তিনি ভয় জাগান, কিন্তু শিবরূপে পাশ ছিন্ন ক'রে দেন পরমা শান্তি।[৪৪৮] শিবস্বরূপে তিনি সর্ব-ভূতে গূঢ়, অথচ সব-কিছুর অতীত, তাঁর মাঝে দিনও নাই রাতও নাই, সৎও নাই অসৎও নাই,[৪৪৯] তাঁর প্রতিমা কোথাও নাই। তাঁকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মন দিয়ে

---

[৪৪২] ৪ আর ৫ ছাড়া বাকী মন্ত্রগুলি যজুঃসংহিতার। সবিতার প্রেরণায় মনকে এবং ধীকে যুক্ত করতে হবে বৃহজ্জ্যোতি বা ব্রহ্মজ্যোতির সঙ্গে—এই তাৎপর্য। এই অভিধ্যানের ফল দ্র. ঈ. ১৬।

[৪৪৩] কঠের যোগবিধির সঙ্গে তুলনীয়। সেখানে সাংখ্যভাবনার প্রাধান্য, উপায় নিয়মন (১।৩।১৩)। কিন্তু নাড়ীবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে (২।৩।১৬)। এখানে তা নাই, আছে যোগভাবনার অনুকূল আসন প্রাণায়াম ধারণা ও ধ্যানের কথা।

[৪৪৪] প্রত্যেক ভূতের যে বিশেষ গুণ, তাতে সংযম করে তার অন্তর্নিহিত যোগগুণকে আবিষ্কার করলে শরীর যোগাগ্নিময় হবে, জরা ব্যাধি মৃত্যুরূপ বৈকল্য তাতে থাকবে না (তু. পতঞ্জলির ভূতজয় (যো. সূ. ৩।৪৪)। এই হল দৈহ্য অমৃতত্ব, পুরাণের ভাষায় সশরীরে স্বর্গে যাওয়া। যোগের কায়-সাধনার বীজ এইখানে।

[৪৪৫] শ্লোক দুটি যজুঃসংহিতার (বা. স. ৩২।৪; তৈ. স. ৫।৫।৯।৩)। সংহিতার 'দেবঃ' উপনিষদে ব্রহ্ম।

[৪৪৬] সংহিতায় যেমন বরুণের পাশ, তেমনি ইন্দ্রের জাল (অ. স. ৮।৮।৫-৮ : অয়ং লোকো জাল-মাসীচ্ছক্রস্য মহতো মহান্)। বরুণের পাশ যেমন মায়া, তেমনি ইন্দ্রজালও মায়া (তু. নির্ঋতির জাল বা পাশ মৈ. স. ৩।২।৪)। সুতরাং জালবান = মায়াবী। সংহিতায় এটি বিশেষ করে বরুণের বিশেষণ। বরুণ॥ শিব, একথা আগে বলেছি। এখানে ঈশান জালবান্। জাল মায়া (৪।১০) বা ঈশনী তাঁর শক্তি।

[৪৪৭] ৩।৮ = বা. স. ৩১।১৮ পুরুষসূক্তের অন্তর্গত।

[৪৪৮] তু. রুদ্র ১২, ২১, ২২ : শিব ১৪-২০।

[৪৪৯] তু. ঋ. নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্...আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস (১০।১২৯।১...২)।

হৃদয় দিয়ে হৃদয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। জীব এবং মায়ার কথাও এই অধ্যায়টিতে স্পষ্টতর। ঋক্‌সংহিতার একটি মন্ত্র অনুসারে জীবকে বর্ণনা করা হয়েছে পিপ্পলাদ বলে এবং এই প্রসঙ্গে দুটি শ্লোকে তার বদ্ধ এবং মুক্ত অবস্থার কথা বলা হয়েছে।[৪৪০] তাঁকে জানলেই মুক্তি, যিনি অক্ষর পরম ব্যোম হয়েও মায়িরূপে এই বিশ্বের স্রষ্টা। এই মায়ীই মহেশ্বর, মায়া তাঁর প্রকৃতি।[৪৪১]

পঞ্চম অধ্যায়টি দার্শনিক ভঙ্গিতে রচিত, সংহিতার কোনও মন্ত্র এতে নাই। প্রতিপাদ্য, ঈশ্বর আর জীবের স্বরূপ এবং দুয়ের সম্পর্ক। প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরশক্তির কথাও এসেছে, তার সংজ্ঞা হয়েছে 'যোনি'। শক্তির ক্রিয়া বোঝাতে গুণ শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

পরমপুরুষ সর্বব্যাপী, সব-কিছুর অধিষ্ঠান কর্তা এবং অধিপতি। তিনিই জীব হয়েছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন মনে হলেও প্রতি জীবে তিনি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ রবিতুল্য-রূপঃ'। জীব স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, নপুংসকও নয়। তার স্বরূপ অতিসূক্ষ্ম। কর্মানুযায়ী সে নানা শরীর গ্রহণ করে। শরীরের বন্ধন হতে তার মুক্তি হয় তাঁকে জানলে পরে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমস্ত উপনিষৎটির উপসংহার। প্রথম অধ্যায়েরই মত আদি-কারণের জিজ্ঞাসা নিয়ে এটির আরম্ভ। তারপর পরমদেবতাই যে বিশ্বকারণ, এই কথা বলে সমস্তটি অধ্যায় জুড়ে তাঁর স্বরূপ এবং মহিমার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সংহিতা হতে একটি মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে আংশিকভাবে।[৪৪২] তাঁর শক্তি পরা এবং বিবিধা, তাঁর জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া স্বাভাবিক, একথার স্পষ্ট উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন তিনি বিশ্বরূপ, তেমনি আবার 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্'। যেখানে তিনি অতিষ্ঠা, সেখানে কোনও-কিছুরই ভাতি নাই, তাঁরই ভাতিতে সবার অনুভা।[৪৪৩] শেষ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, পরমদেবতায় যাঁর পরা ভক্তি, তেমনি

---

[৪৪০] ৬ = ঋ. ১।১৬৪।২০। তার আগের শ্লোকটি সাংখ্যবীজ (তু. ছা. ৬।৪।১; দ্র. টী. ২২৬)। পরের মন্ত্রে (তু. মু. ৩।১।২) সংহিতার মন্ত্রের যে-ভাষ্য করা হয়েছে, তা কিন্তু সংহিতার ভাবনার সঙ্গে মেলে না। সংহিতায় পিপ্পলাদ সুপর্ণকে 'মধ্বদ' বলা হয়েছে, 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' এ-ভাব মোটেই সেখানে নাই (দ্র. ঋ. ১।১৬৪।২০-২২)। বস্তুত এই 'স্বাদু'-পিপ্পলভোজী সুপর্ণ হলেন আমাদের মাঝেকার সত্য এবং নিত্য জীব, কঠোপনিষদে যিনি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ' (২।১।১২-১৩), 'মধ্বদ জীবাত্মা' (২।১।৫)। সংহিতায় এই নিত্যজীবকে বলা হয়েছে 'অজো ভাগঃ' (ঋ. ১০।১৬।৪)।

[৪৪১] বিশ্বমূল তত্ত্বরূপে মায়ার উল্লেখ প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে আর কোথাও নাই। প্র.তে 'মায়া' আছে (১।১৬), ছলনা অর্থে। অথচ ঋক্‌সংহিতায় মায়ার উল্লেখ প্রচুর (দ্র. ৩।২০।৩ টীকা)। আসুরী মায়ার উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়া সেখানে দৈবী মায়া, অর্থাৎ দেবতার অনির্বচনীয় নির্মাণপ্রজ্ঞা (তু. 'যোগমায়া', 'মহামায়া')। পরে বৌদ্ধপ্রভাবে মায়া আর অবিদ্যা বেদান্তে এক হয়ে গেছে। এই উপনিষদেই মায়ার প্রয়োগ হয়েছে দুই অর্থেই (৪।৯, ১০)। সংহিতায় পাই, ত্বষ্টা স্বয়ং বিশ্বরূপ, তাঁর পুত্র বৃত্রও বিশ্বরূপ। ইন্দ্র এই বৃত্রের হন্তা, অর্থাৎ বিশ্বরূপের অবরোধ বা আবরণ ভেঙে সত্যকে আমাদের চেতনায় ফুটিয়ে তোলেন। এই ভাবনায় আমরা মায়াবাদের বীজ পাই, যদিও বেদে এ-বাদ উগ্র হয়ে দেখা দেয়নি (দ্র. ঋ. ৩।৪।৯ টীকায় 'ত্বষ্টা'র প্রসঙ্গ)।

[৪৪২] ১৫ উত্তরার্ধ = বা. স. ৩১।১৮।

[৪৪৩] তু. ক. ২।২।১৫, মু. ২।২।১০; বৃ. ৪।৪।১৬।

গুরুতেও, সেই মহাত্মার কাছেই এসব তত্ত্ব প্রকাশ পায়। উপনিষদে ভক্তির উল্লেখ এই প্রথম।[৪৫৪]

অনেকে বলেন, উপনিষৎটির রচনা বড় এলোমেলো। এ-অভিযোগ যে সত্য নয়, একটু লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। শ্রুতির সঙ্গে ন্যায়ের সমন্বয়চেষ্টা উপনিষৎটির একটি বৈশিষ্ট্য।[৪৫৫] তাহতে বেদার্থবিজ্ঞানের একটি ধারার নিশানা পাওয়া যায়, যার পরিণত রূপ আমরা পাই উত্তরমীমাংসায়।

তারপর শুক্লযজুর্বেদের **ঈশ** এবং **বৃহদারণ্যক** উপনিষৎ।

ঈশোপনিষৎটি সংহিতার অন্তর্গত। আর-কোনও উপনিষদের কিন্তু এ-বৈশিষ্ট্য নাই।[৪৫৬] এর মাত্র আঠারটি মন্ত্রের মধ্যে এমন কতগুলি গভীর উক্তি আছে যা উপনিষৎ সাহিত্যে অতুলনীয়।

অনুশাসন দিয়ে উপনিষৎটির আরম্ভ। বলা হচ্ছে, জগতীতে যা-কিছু জগৎ,[৪৫৭] এই সবকেই উদ্ভাসিত[৪৫৮] দেখবে ঈশের[৪৫৯] দ্বারা। এই ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করো,[৪৬০] কারও ধনের প্রতি লোভ করো না।[৪৬১] কর্ম করেই এখানে শত বছর বেঁচে থাকবার ইচ্ছা করবে।[৪৬২] তুমি যখন এই, এর আর তখন অন্যথা নাই। যে নর, কর্ম তাতে লিপ্ত হয় না।[৪৬৩]

---

[৪৫৪] সংহিতায় ভক্তির দেবতা হলেন 'ভগ', যিনি ভাগবতের ভগবান্। আমরা তাঁর দ্বারা 'ভক্ত' বা আবিষ্ট (তু. ঋ. ১।২৪।৫, সেখানে 'ভগভক্ত রয়ির' কথা আছে যা মূর্ধার দিকে উজান বইছে)। এই আবেশে আমাদের মাঝে জাগে শ্রদ্ধা (তু. ক. কুমারং...শ্রদ্ধাবিবেশ ১।১।২)। এই শ্রদ্ধাই পরে হয়েছে ভক্তি।...প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে 'গুরু' সংজ্ঞার ব্যবহার খুবই কম (ছা. ৫।১০।৯, ৮।১৫।১; মু. ১।২।১২), তার জায়গায় পাই 'আচার্য'। ঋষিপন্থায় 'আচার্য', আর মুনিপন্থায় 'গুরু'—এই কি? বিদ্বান্ ব্রাত্যই কি গুরু? আজও নেপালে দেবপূজকেরা 'দেভাজু', আর গুরুপূজকেরা 'গুভাজু'। এতেও সাধনার দুটি ধারা সূচিত হচ্ছে।

[৪৫৫] এইটি ইতিহাস-পুরাণ বা স্মৃতিরও একটি বৈশিষ্ট্য।

[৪৫৬] কৃষ্ণযজুর্বেদের পরে শুক্লযজুর্বেদ—যাতযাম কৃষ্ণকর্মের অযাতযাম শুক্লকর্মে উত্তরণ। তার পর্যবসান ঔপনিষদ-পুরুষের বিজ্ঞানে। বৈদিক ভাবনার একটি রূপায়ণ পাই এই বিন্যাসে। এইটি যাজ্ঞবল্ক্যের কীর্তি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রাক্তন সমন্বয়াচার্য তিনিই।

[৪৫৭] ঋক্‌সংহিতায় জগতী কোথাও ভুবন (১।১৫৭।৫, ৬।৭২।৪), কোথাও ছন্দ (বিশ্বান্ দেবাঞ্ জগত্যাবিবেশ ১০।১৩০।৫)। ছন্দটি বিশ্বদেবতার। সুতরাং জগতীতে ঈশ্বরী মহাশক্তির ব্যঞ্জনা আছে। জগৎ তাঁরই অন্তর্গত। 'চলন্ত' এই অর্থে সংহিতায় তার বহুল ব্যবহার। ঈশ, জগতী, জগৎ—এই একটি ত্রিপুটী পাওয়া যাচ্ছে।

[৪৫৮] সংহিতায় ণিজন্ত বস্‌ধাতুর অর্থ উদ্‌ভাসিত করা (তু. ঋ. ৩।১।১৭, ৭।৩, ৬।১৭।৫, ৩২।২., ৭।৯১।১; 'রূপৈরবাসয়ৎ' ১।১৬০।২—এখানে আচ্ছাদন অর্থ খাটে)। এই অর্থই এখানে সঙ্গত।

[৪৫৯] ঈশ ॥ ঈশান; পরের সংজ্ঞাটিই সংহিতায় বহুব্যবহৃত। 'ঈশ্বর' ঋক্‌সংহিতায় নাই, যজুঃ-সংহিতাগুলিতে আছে, কিন্তু পরমপুরুষের পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে নয়। অথর্বসংহিতায় পুরুষ-সূক্তের যে-রূপটি পাওয়া যায়, তাতেই দেখি 'অমৃতত্বস্যেশানঃ'র জায়গায় আছে 'অমৃতত্বস্যেশ্বরঃ' (১৯।৬।৪)। সেখানেও ব্যবহারটি পারিভাষিক নয়।

[৪৬০] 'ত্যক্তেন' ত্যাগের দ্বারা (ভাবে ক্ত-প্রত্যয়); ঋক্‌সংহিতায় 'ত্যাগ' শব্দ আছে, অর্থ 'আহুতি'। 'ভুঞ্জীথাঃ' আত্মনেপদে, সুতরাং ভোগ অর্থই খাটে। ত্যাগের দ্বারা ভোগের যাজ্ঞিক প্রতিরূপ হচ্ছে যজ্ঞশেষে 'ইড়াভক্ষণ' (তু. গী. ৩।১৩)।

[৪৬১] 'মা গৃধঃ' : তু. বৌদ্ধ 'গর্ধ'; 'অশনায়া বৈ পাপ্‌মাহমতিঃ' ঐ. ব্রা. ২।২।

[৪৬২] শতায়ুর প্রার্থনা : তু. ঋ. ২।২৭।১০, ৩।৩৬।১০, ১০।১৮।৪, ৮৫।৩৯, ১৬১।৩, ৪; অ. ১৯।৬৭।

[৪৬৩] তু. বৃ. ৪।৪।২৩; ছা. ৪।১৪।৩, ৫।১০।১০; কৌ. ৩।১ । ধর্মাধর্মের অতীত হওয়াই এদেশের ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য।

যারা আত্মঘাতী, প্রেতির পর তারা অন্ধতমে আবৃত অসূর্য লোকেই যায়।[৪৬৪] আত্মা এক, দেবচেতনার ওপারে। আর সবই ছুটে চলছে, কিন্তু আত্মা স্থির। অথচ সবাইকে তিনি ছাড়িয়ে যান।[৪৬৫] মাতরিশ্বা তাঁরই মাঝে অপ্‌কে নিহিত করেন।[৪৬৬] তিনি কাঁপেন না, আবার কাঁপেনও; তিনি দূরে, আবার কাছেও; তিনি এই সব-কিছুর অন্তরে, আবার বাইরেও। এই আত্মাতে দেখতে হবে সর্বভূতকে, সর্বভূতের মাঝে দেখতে হবে আত্মাকে, বা সর্বভূতকে জানতে হবে আত্মা বলেই। এই হল একত্বের অনুভব।[৪৬৭]

তিনি শুক্র অকায় অব্রণ অস্নাবির শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তিনিই ছড়িয়ে পড়েছেন দিকে-দিকে। তখন তিনি যুগপৎ কবি এবং মনীষী, স্বয়ম্ভূ এবং পরিভূ—অর্থের বিধান করে চলেছেন শাশ্বত কাল ধরে।[৪৬৮]

অবিদ্যা বা অসম্ভূতির উপাসনা যারা করে, তারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে। কিন্তু তার চাইতে অন্ধ তমে প্রবেশ করে যারা বিদ্যায় বা সম্ভূতিতে রত।[৪৬৯] ধীরেরা বলেন, বিদ্যা বা সম্ভূতি হতে পাওয়া যায় এক, অবিদ্যা বা অসম্ভূতি হতে পাওয়া যায় আর।[৪৭০] কিন্তু দুটিকে মিলিয়ে যাঁরা পান, তাঁরা অবিদ্যা বা বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যা বা সম্ভূতির দ্বারা অমৃতকে সম্ভোগ করেন।[৪৭১]

---

[৪৬৪] মনে হয়, এখানে অসদ্‌ব্রহ্মবাদ বা শূন্যবাদের ধ্বনি আছে। যারা অনাত্মবাদী, তারাই 'আত্মহনঃ'; 'অসূর্যা লোকাঃ' বারুণী রাত্রি বা শূন্যতা। এ হল একান্তভাবে অসম্ভূতি বা বিনাশের উপাসনা, যা এই উপনিষদের অভিপ্রেত নয় (তু. ১২-১৪)।

[৪৬৫] তাই তিনি 'অতিষ্ঠাঃ' (তু. ঋ. ১০।৯০।১)।

[৪৬৬] 'মাতরি-শ্বা' মাতাতে বা অদিতিতে উচ্ছ্বসিত বিশ্বপ্রাণ (দ্র. ঋ. ৩।২।১৩ টীকা : 'মাতরিশ্বা য়দমিমীত মাতরি' ৩।২৯।১১। অপ্‌ বিশ্বশক্তির ধারা (দ্র. ঋ. ৭।৪৭, ৪৯, ১০।৯, ১৯, ৩০। তু. গৌরীর সলিল-তক্ষণ (ঋ. ১।১৬৪।৪১)।

[৪৬৭] আত্মানুভবের এই ত্রিপুটীই বেদান্তের সার। প্রথম অনুভবে আত্মা সব-কিছুর অধিষ্ঠান, দ্বিতীয়ে অন্তর্যামী, তৃতীয়ে সর্বাত্মভাবে অনুভবের পরাকাষ্ঠা। সংহিতায় আত্মা = পুরুষ। পুরুষও অধিষ্ঠান : দ্যাবাভূমি জনয়ন্‌ দেব একঃ...অধ্যতিষ্ঠদ্‌ ভুবনানি ধারয়ন্‌ ঋ. ১০।৮১।৩-৪; স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌ ৯০।১; বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ১২১।১০; বিশ্বদু তা পরিভূর্ব্রহ্মণস্পতিঃ ২।২৪।১১; অগ্নে তা বিশ্বা পরিভূরসি ত্মনা ৩।৩।১০...। পুরুষও অন্তর্যামী: প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ ১০।৮১।১; য় আত্মদা ১২১।২; অগ্নির্মর্তেষ্বাবিশন্‌ ৫।২৫।৪; বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্‌ ৭।৫৫।১ (৯।২৫।৪); অস্মে অন্তর্নিহিতা কেতবঃ ১।২৪।৭;...। আবার পুরুষই সব-কিছু হয়েছেন : ১০।৮১।৩, ৯০।১; পুরুষ এবেদং সর্বম্‌ ২; বিশ্বরূপ অমৃতানি তস্থৌ ৩।৩৮।৪; রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব ৬।৪৭।১৮...। সংহিতায় দৃষ্টি পরাক্‌, উপনিষদে প্রত্যক্‌; অনুভব কিন্তু একই।

[৪৬৮] যেমন আকাশে আদিত্য। সংহিতায় বরুণ এবং মিত্র।

[৪৬৯] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিদ্যা এবং অবিদ্যা, অধিদৈবতদৃষ্টিতে সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি। সাধনার দুটি ধারার কথা হচ্ছে—একটি ইতিভাবনার, আরেকটি নেতিভাবনার। ঋষিপন্থায় আগেরটির প্রাধান্য, মুনিপন্থায় পরেরটির। দুটি পথকে মিলিয়ে দেওয়াই হল যাজ্ঞবল্ক্যের কৃতিত্ব এবং এই উপনিষৎটির বৈশিষ্ট্য। তু. বৃ. ৪।৪।১০, ১১।

[৪৭০] একটি পাওয়া সর্ববর্ণের সমাহার আদিত্যকে, আরেকটি পাওয়া অবর্ণ আকাশকে। লোকোত্তরকে না পেলে লোকপ্রাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

[৪৭১] বলা বাহুল্য, এখানে প্রাকৃতচিত্তের অবিদ্যাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে না। জানতে-জানতে জানাও শেষে ফুরিয়ে যায়—এ হল মরমীয়াদের সেই অবিদ্যা (তু. কে. ১।৩-৪, ২।১-৩; ঋ. ১০।১২৯।৬-৭)। এইটি তৈ.এর অসদ্‌ব্রহ্মবাদ ২।৬ (তু. বৌদ্ধ নির্বাণ)। 'বিনাশ' সংজ্ঞাটি শ্লিষ্ট—হারিয়ে যাওয়া বা চরম পাওয়া দুইই বোঝায় (√নশ্‌ 'to attain' সংহিতায়)। তা. ব্রা.তে বিনশন-তীর্থের কথা আছে, সরস্বতীর ধারা যেখানে মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। সায়ণ বলেন, সরস্বতীর আদি-অন্ত দেখা যায়, কিন্তু মাঝের অংশটুকু দেখা যায় না; ঐ হল বিনশন। তা. ব্রা. বলেন, বিনশন থেকে ঘোড়ায় চড়ে চল্লিশ দিনের পথ হল 'প্লক্ষপ্রাস্রবণ'; পৃথিবী থেকে স্বর্গও

তারপর প্রার্থনা : [৪৭২]সত্যের মুখ ঢাকা রয়েছে হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা।[৪৭৩] হে পূষন্, হে যম, হে প্রাজাপত্য সূর্য,[৪৭৪] তেজকে সমূঢ় কর, রশ্মিসমূহকে ব্যূঢ় কর।[৪৭৫] তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তা-ই আমি দেখব।[৪৭৬] ঐ যে ঐ যে পুরুষ, সে-ই আমি।[৪৭৭]

তারপর সিদ্ধের অনুভব ও সঙ্কল্প[৪৭৮] : আমার কাছে বায়ু অনিল অমৃত, আর এই শরীর ভস্মান্ত।[৪৭৯] হে ক্রতো, স্মরণ কর, কৃতকে স্মরণ কর।[৪৮০] হে অগ্নি, আমাদের নিয়ে চল সুপথ দিয়ে রয়ির মাঝে, তুমি তো পথের খবর সব জান হে দেবতা! দূর কর সর্পিল পাপকে, তোমার উদ্দেশে বারবার আমাদের নম-উক্তি।[৪৮১]

এইখানেই উপনিষৎটির শেষ। ভাবনার এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় : ঈশ্বরচৈতন্য-

---

ততখানি দূরে। সরস্বতীসম্মিত পথ ধরে স্বর্গে যেতে হয়, আর যেতে হয় উজান বেয়ে (২৫।১০।১, ১২, ১৬)। তাৎপর্য এই : সরস্বতী বিদ্যার ধারা, পৌঁছে দেয় আদিত্যে বা অখণ্ড চেতনায় (তা. ২৫।১০।১১)। যেতে হবে উজান বেয়ে, প্রাকৃত চেতনার বিপরীতে। কিছুদূর গিয়ে ধারা লুপ্ত হয়ে যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় তখন আর সংজ্ঞা থাকে না (বৃ. ২।৪।১২)। কঠে এই হল বৈবস্বত যমের পুরীতে নচিকেতার ত্রিরাত্রবাস। তারপর ফিরে আসা দিব্যচেতনা নিয়ে। তখন অমৃতত্বের সম্ভোগ। মরমীয়ারা যাকে বলেন 'সব ছেড়ে সব পাওয়া'। পুরুষ তখন সংহিতার ভাষায় 'নরেদাঃ'।

[৪৭২] = বৃ. ৫।১৫ (অধ্যায়সমাপ্তি)।

[৪৭৩] তু. ঋ. বিভ্রদ্ দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্তে নির্ণিজম্ ১।২৫।১৩। 'হিরণ্যয় দ্রাপি' বা হিরণ্ময় পাত্র হল বরুণের শূন্যতাকে ঘিরে আলোর আড়াল। ছা.তে এইটি হল আদিত্যের 'শুক্লং ভাঃ' এবং 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্' (১।৬।৬), দার্শনিক ভাষায় সদ্‌ব্রহ্ম এবং অসদ্‌ব্রহ্ম। আদিত্যবিম্বের ওপারে সত্য, তার জন্য সূর্যদ্বারকে ভেদ করে যেতে হবে (তু. মু. ১।২।১১; ছা. 'লোকদ্বারের অপাবরণ' (২।২৪; ৮।৬।৫-৬)।

[৪৭৪] চেতনার উত্তরায়ণের তিনটি পর্বে তিনটি সম্বোধন। প্রথম তাঁকে দেখি প্রাজাপত্য সূর্যরূপে —'বিবস্বান্'রূপে যিনি আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি এবং দীপ্তি। তারপরেই নেমে আসে যম বা মৃত্যুর আঁধার। তারপর আবার ফুটে ওঠে একর্ষি পূষার সন্ধানী আলো। তু. সরস্বতীর ধারা টী. ৪৭১। নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে অশ্বিদ্বয় হতে বিষ্ণু পর্যন্ত বিষ্ণুর সপ্তপদীর যে-বর্ণনা আছে, তাতে সূর্যের স্থান পঞ্চম, পূষার ষষ্ঠ। যোগদৃষ্টিতে একটি বিশুদ্ধচক্র, আরেকটি আজ্ঞাচক্র। যম দুয়ের মাঝে সেতু। ঋক্‌সংহিতায় পূষার একটি বৈশিষ্ট্য দেখি, তিনি 'নষ্ট' অর্থাৎ হারানো পশুকে ফিরিয়ে আনেন, আমাদের 'গবেষণার' তিনি সহায়। অর্থাৎ যে-চেতনা বিনাশের আঁধারে তলিয়ে যায়, পূষা আবার তাকে জাগিয়ে তুলেন। যোগে এইটিই ভ্রূমধ্যে চেতনার বৈন্দব সংহনন। 'একর্ষি' বিশেষণে তা-ই সূচিত হচ্ছে। 'ঋষি' শব্দটি শ্লিষ্ট, বোঝাচ্ছে অগ্র্যা বুদ্ধির সূচীমুখ দৃক্‌শক্তি (√ ঋষ্ 'দেখা', 'বিদ্ধ করা')। সংহিতায় একর্ষির এই পরিচয় : স্কম্ভব্রহ্মে তিনি অর্পিত বা সংহত (অ. ১০।৭।১৪); 'য়মং য়ো বিদ্যাৎ স ব্রূয়াদ্ য়থৈকর্ষির্বিজানতে'—যমকে জানলে তবে একর্ষির বিজ্ঞান পাওয়া যায় (কা. ৪০।১১।৫)। বৃ.র বংশব্রাহ্মণে একর্ষির উল্লেখ আছে : ব্রহ্মবিদ্যা একর্ষি থেকে সঞ্চারিত হল প্রধ্বংসন থেকে যমে, যম থেকে অথর্বায় ইত্যাদি (২।৬।৩)। প্র.তে প্রাণ ব্রাত্য এবং একর্ষি (২।১১; তু. মু. ৩।২।১০)। এখানে যেমন 'একর্ষি', তেমনি ঈশানও 'একব্রাত্য' (অ. ১৫।১।৬), ইন্দ্র 'একবীর' (ঋ. ১০।১০৩।১)। একর্ষি পূষা ছা.তে 'অমানব পুরুষ' (৪।১৫।৫, ৫।১০।২), বৃ.তে মানস পুরুষ (৬।২।১৫)।

[৪৭৫] বিকীর্ণ রশ্মি সংহত হলেই তেজ উৎপন্ন হয়, সেই তেজই আবার সন্ধানী আলোর মত ঊর্ধ্বে ছাড়িয়ে পড়ে।

[৪৭৬] এই রূপ আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্ময় পুরুষের বা পুরুষোত্তমের (ছা. ১।৬।৬)।

[৪৭৭] এই সাযুজ্যের অনুভবই বৈদিক সাধনার পরমা সিদ্ধি।

[৪৭৮] এই দুটি মন্ত্রকে সাধারণত মৃত্যুকালীন প্রার্থনা বলে ব্যাখ্যা করা হয়। বস্তুত এটি সত্য-ধর্মকে (১৫) দেখে আবার এইখানে নচিকেতার মত ফিরে আসার বর্ণনা।

[৪৭৯] 'ভস্মান্ত' অগ্নিষ্বাত্ত, যোগাগ্নিময়। সাধুদের গায়ে ছাই মাখারও ঐ তাৎপর্য।

[৪৮০] 'ক্রতু' সৃষ্টির সঙ্কল্প। 'কৃত' সত্য (তু. প্র. ১।৯ ঋ. ১০।১১১।১; গী. সাংখ্যে কৃতান্তে ১৮।১৩); পাশার একটি ফোঁটাও 'কৃত' বা 'সত্য'। দ্যুলোকে যা সিদ্ধ, পৃথিবীতে চলবে তার সাধনা।

[৪৮১] = ঋ. ১।১৮৯।১। 'রয়ি' প্রাণসংবেগ।

দ্বারা সব-কিছু উদ্ভাসিত দেখতে হবে। ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে বিরোধ নাই। জীবন হেয় নয়। কর্ম করে যেতে হবে, কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে। আত্মানুভবের চরম—আত্মাই সব-কিছু। অবিদ্যা এবং বিদ্যার, অসম্ভূতি এবং সম্ভূতির সহবেদন চাই। যেমন সত্যকে দেখতে হবে আলোর আড়াল ঘুচিয়ে, তেমনি দেখতে হবে সেই পরমপুরুষের কল্যাণতম রূপকেও। তিনি আর আমি এক। অমৃতজীবনে আমি তাঁরই ক্রতু।[৪৪২]

তারপর শতপথব্রাহ্মণের **বৃহদারণ্যকোপনিষৎ**। ব্রাহ্মণের মতই আয়তনে এবং গুরুত্বে এই উপনিষৎটি সত্যি বৃহৎ। মোটের উপর ছয়টি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি ব্রাহ্মণের সমষ্টি। সম্প্রদায়বিদেরা দুটি-দুটি অধ্যায় নিয়ে একেকটি কাণ্ডের কল্পনা করেছেন—মধুকাণ্ড, মুনি- বা যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ড, খিলকাণ্ড।[৪৪৩] কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন দুটি শাখাতেই উপনিষৎখানি পাওয়া যায়। শঙ্কর তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষ্য রচনা করেছেন কাণ্বশাখার উপর।[৪৪৪]

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণটিতে পাই অশ্বমেধযাগের অশ্বোপাসনা।[৪৪৫] অশ্ব বিশ্বরূপ, 'সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো য়োনিঃ'।[৪৪৬]

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে[৪৪৭] অশ্বমেধরহস্যেরই অনুবৃত্তি চলছে সন্ধাভাষায়। বলা হচ্ছে :

এখানে কিছুই আগে ছিল না। মৃত্যুর দ্বারা এ আবৃত ছিল অথবা অশনায়ার দ্বারা। অশনায়াই মৃত্যু।[৪৪৮] তারপর মৃত্যু মনে করলেন,[৪৪৯] আমি আত্মবান্ হব। তিনি জ্বলতে-জ্বলতে চলতে লাগলেন।[৪৫০] তাহতে অপ্ উৎপন্ন হল। এই অপ্‌ই অর্ক।[৪৫১] তার উপরে ঘন হয়ে যে-সর পড়ল, তা-ই হল পৃথিবী। মৃত্যু তখন পৃথিবীকে নিয়ে শ্রম করতে লাগলেন। তাঁর শ্রমে এবং তপে তেজোরস বেরিয়ে এল, তা-ই হল অগ্নি।[৪৫২]

---

[৪৪২] এইটিই যাজ্ঞবল্ক্যের পরিপূর্ণ জীবনদর্শন। মূল ভাবগুলি বৃহদারণ্যকেই পাই।

[৪৪৩] লক্ষণীয়, প্রতিকাণ্ডের শেষেই একটি বংশব্রাহ্মণ আছে।

[৪৪৪] উপনিষৎটি কাণ্বশাখার ১৭শ কাণ্ড। মাধ্যন্দিনে শুরু ১৪।৪ হতে; আগের তিনটি অধ্যায় প্রবর্গ্যাধিকরণ। বিবৃতিতে কাণ্বশাখার অনুসরণ করা হচ্ছে।

[৪৪৫] মাধ্যন্দিনে এটি ১০।৬।৪, অগ্নিচয়নের শেষে। দ্র. অশ্বস্তুতি ঋ. ১।১৬২, ১৬৩; প্রথমটিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে তত্ত্বের।

[৪৪৬] তু. ঋ. ত্রীণি ত আহুর্দিবি বন্ধনানি ত্রীণ্যপ্সু ত্রীণ্যন্তঃসমুদ্রে ১।১৬৩।৪; সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট ২। অন্যত্র পাই, অশ্ব ওজের প্রতীক (ঋ. ১০।৭৩।১০)।

[৪৪৭] =মাধ্যন্দিন ১০।৬।৫।

[৪৪৮] তু. তৈ. ব্রা. ৩।৯।১৫।২; শ. ব্রা. অশনায়া বৈ তমঃ ৭।২।২।২১; ঐ. ব্রা. অশনায়া বা পাপ্মাঽমতিঃ ২।২। সংহিতায় এটি কাম : তু. ঋ. কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং য়দাসীৎ ১০।১২৯।৪। সুতরাং মৃত্যু আর অশনায়া একটি মিথুন; অর্থাৎ অব্যাকৃতই কামনা বা নিত্য-পরিণামের উন্মুখীনতা। এখানে অসদ্‌বাদের উদ্দেশ পাচ্ছি (তু. ঋ. ১০।১২৯)।

[৪৪৯] মূলে আছে 'মনোঽকুরুত'; তু. প্র. 'মনঃকৃতেন' ৩।৩, বোঝাচ্ছে ঈক্ষা।

[৪৫০] মূলে 'অর্চন্'; তু. 'অর্চিঃ'। সংহিতায় এই অর্থ অনেকজায়গায়।

[৪৫১] অর্ক॥ তপঃ (তু. ঋ. তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং য়দাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ১০।১২৯।৩; ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত ১৯০।১। তারই আরেক রূপ হল কারণসলিল, যাতে অগ্নি নিহিত (তু. ঋ. গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতী ১।১৬৪।৪১; অপাং গর্ভো নৃতমো য়হ্বো অগ্নিঃ ৩।১।১২...)।

[৪৫২] মূলে 'অশ্রাম্যৎ' শ্রম করলেন, energised himself. তু. 'শ্রমণ' (তৈ. আ. ২।৭।১)। এই অগ্নিই সংহিতায় বৈশ্বানর (দ্র. ঋ. ৩।২ ভূমিকা; তু. ঋ. ১০।৪৫।১)।

অপ্‌এ প্রতিষ্ঠিত এই অগ্নি প্রাণরূপে সর্বময়। তিনি নিজেকে ত্রেধা ব্যাকৃত করলেন অগ্নি বায়ু এবং আদিত্যরূপে।[৪৯৩]

মৃত্যু আবার চাইলেন, আমার দ্বিতীয় আত্মা জন্মাক্।[৪৯৪] তখন তিনি মনে-মনে মিথুনীভূত বাকের সঙ্গে সঙ্গত হলেন।[৪৯৫] তাতে যে রেতঃপাত হল, তা-ই হল সংবৎসর, তার আগে সংবৎসর ছিল না।[৪৯৬] সংবৎসরকাল ভরণের পর সেই বীজটি কুমার হয়ে জন্মাল। মৃত্যু হাঁ করে তাকে গিলতে গেলেন। সে 'ভ্যাঁ' করে উঠল। তা-ই হল বাক্।[৪৯৭]

মৃত্যু দেখলেন, একে খেলে আর কতটুকু পেট ভরবে। তখন তিনি তাঁর এই দ্বিতীয় আত্মা আর তার ঐ বাক্ দিয়ে এই যা-কিছু সৃষ্টি করলেন।[৪৯৮] যা-যা সৃষ্টি করলেন, তা-ই তিনি খেয়ে চললেন।[৪৯৯]

তারপর মৃত্যু আবার চাইলেন, আমি এক মহাযজ্ঞ করব।[৫০০] আবার তিনি শ্রম করলেন, আবার তপ করলেন। ফলে তাঁর যশ বা বীর্য[৫০১] ঊর্ধ্বগামী হল। প্রাণের ঊর্ধ্বগতিতে শরীর কেঁপে উঠল।[৫০২] তাঁর মন কিন্তু শরীরেই ছিল।[৫০৩]

তিনি আবার চাইলেন, আমার এই শরীর মেধ্য হক। আমি একে নিয়ে আত্মবান্ হই।[৫০৪] তাঁর সেই শরীরটিই হল অশ্ব।[৫০৫] তিনি তাকে আর অবরুদ্ধ করলেন না। সংবৎসরকাল এইভাবে রেখে তারপর নিজের কাছেই তাকে আলম্ভন করলেন।[৫০৬]

আদিত্যই অশ্বমেধ, আর এই-যে অশ্বমেধের অগ্নি, তা-ই অর্ক। আর সেই একমাত্র

---

[৪৯৩] তু. ব্রা. স. ত্রিস্মা তে অগ্নি ত্রেধা ত্রয়াণি ১২।৯৯; শ. ব্রা. অগ্নির্বায়ুরাদিত্য এতানি হাস্য ত্রেধা ত্রয়ানি ৬।৭।৪।৪। ত্রিভুবনের সূচনা।

[৪৯৪] প্রথম আত্মা বৈশ্বানর অগ্নি, দ্বিতীয় 'বিরাট্' (তু. ঋ. ১০।৯০।৫)।

[৪৯৫] বাক্ হতে সৃষ্টি। সংহিতায় এই বাক্ 'গৌরী' (তু. ঋ. গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতী.., তস্যাঃ সমুদ্রা অধিরি ক্ষরন্তি...ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্ বিশ্বমুপজীবতি ১।১৬৪।৪১-৪২)। একপদী বাক্ হল ওম্, আকাশের আদিস্পন্দ। তাহতে সৃষ্টি। প্রজাপতি তাই 'বাচস্পতি' এবং 'বিশ্বকর্মা' (ঋ. ১০।৮১।৭)।

[৪৯৬] সংবৎসর কালের প্রতীক, কেননা বস্তুত ঐটিই আমাদের প্রাকৃত চেতনায় কালমানের ব্যাপ্ততম একক (তু. সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত (ঋ. ১০।১৯০।২)। 'রেতঃ' ॥ 'রয়ি' প্রবেগ (তু. 'মনসো রেতঃ' ঋ. ১০।১২৯।৪)।

[৪৯৭] এই জাতক 'বিরাট্' (ঋ. ১০।৯০।৫)। গুহাহিত বাকের অভিব্যক্তি হল এবার (তু. ঋ. ১।১৬৪।৪৫)। মৃত্যুগ্রস্ত হয়েই সৃষ্টিতে সব-কিছুর বিস্তার ঘটছে।

[৪৯৮] মৃত্যু সঙ্গত হয়েছিলেন গুহাহিত বাকের সঙ্গে, বিরাট্ সঙ্গত হলেন অভিব্যক্ত বাকের সঙ্গে। একটি কারণাবস্থা, আরেকটি কার্যাবস্থা।

[৪৯৯] অতএব মৃত্যুই অন্নাদ বা পরমচেতনা, তিনিই অমৃত। কঠেও মৃত্যুর এই পরিচয়। আরও তু. বৃ. ১।২।৭।

[৫০০] এইটি হল মৃত্যুতরণ অশ্বমেধযজ্ঞ। অশ্বমেধের অশ্বসম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি, দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ' (ঋ. ১।১৬২।২১)। একথা যজমানের বেলাতেও খাটে, কেননা অশ্ব যজমানেরই নিষ্ক্রয়।

[৫০১] মূলে 'য়শো বীর্যম্'। দুটি সমার্থক। সংহিতাতেও তা-ই। 'যশঃ' < √ *য়শ্ ॥ ঈশ্ (যেমন √য়জ্ ॥ *ইজ্)।

[৫০২] এটি যোগের স্বাভাবিক অনুভব। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অশ্বমেধ হল ওজঃশক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করবার সাধনা। তু. তৈ. এতত্ততো ভবতি, আকাশশরীরং ব্রহ্ম ১।৬।

[৫০৩] মন এখানে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নয়, আত্মা (spirit)। এই অর্থই প্রাচীনতর (তু. বৃ. ১।৪।১৭)। উপনিষদে তাই 'মনোময়' অনেকজায়গায় ব্রহ্মের বিশেষণ।

[৫০৪] তৃতীয়বার আত্মন্বী হওয়ার অর্থ দিব্যশরীর লাভ করা, যা যজ্ঞে উৎপন্ন হয়।

[৫০৫] এখন তু. প্রথম ব্রা.।

[৫০৬] অর্থাৎ দিব্যচেতনাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে আবার তাকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনলেন। এটি সহজ সমাধির সাধনা।

দেবতা হচ্ছেন মৃত্যু। আদিত্য অগ্নি বা মৃত্যু এই তিনের এক দেবতা হন যিনি, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, কেননা মৃত্যুই হন তাঁর আত্মা।[৫০৭]

তারপর তৃতীয় ব্রাহ্মণে[৫০৮] প্রাণোপাসনা।[৫০৯] আধারে সেই সনাতন দেবাসুরের দ্বন্দ্ব দিয়ে প্রকরণটির আরম্ভ। দেবতা আর অসুর দুইই প্রজাপতির সন্তান। তবে অসুররা সংখ্যায় বেশী, দেবতারা কম। দুয়ের মাঝে ঝুটাপুটি লেগেই আছে। দেবতারা স্থির করলেন, যজ্ঞে উদ্‌গীথের দ্বারা[৫১০] অসুরদের আমরা পরাভূত করব।

যজ্ঞটি হল অধ্যাত্মযজ্ঞ, বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন হল উদ্‌গাতা ঋত্বিক।[৫১১] তারা উদ্‌গান করতে গিয়ে দেবতাদের জন্য চাইল ভোগ, আর নিজেদের জন্য কল্যাণ।[৫১২] ঐ ভোগাকাঙ্ক্ষার ছিদ্রপথে অসুরেরা এসে তাদের পাপবিদ্ধ করল, জীবনযজ্ঞ পণ্ড হয়ে গেল।

দেবতারা তখন মুখ্য প্রাণকে করলেন উদ্‌গাতা।[৫১৩] তাঁকে আক্রমণ করতে গিয়ে অসুররা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মুখ্যপ্রাণ তখন বাক্ প্রভৃতি হতে পাপ বা মৃত্যুকে অপসারিত করে তাদের অমৃত করে তুললেন। বাক্ তখন হল অগ্নি, প্রাণ বায়ু, চক্ষু আদিত্য, শ্রোত্র দিক্ এবং মন সোম।

এই মুখ্যপ্রাণই আঙ্গিরস, তিনিই বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি সাম বা উদ্‌গীথ।

প্রস্তোতা যখন পবমানস্তোত্রের প্রস্তাব গাইবেন, তখন যজমান জপ করবেন, অসৎ হতে আমায় সৎএ নিয়ে চল, তম হতে নিয়ে চল জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে। এর নাম অভ্যারোহ।[৫১৪]

তারপর চতুর্থ ব্রাহ্মণে সর্বাত্মক আত্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রসঙ্গক্রমে জগৎসৃষ্টির বিবরণ :

আদিতে এসব আত্মাই ছিল—পুরুষের মত হয়ে।[৫১৫] এই আত্মা অনুবীক্ষণ করে

---

[৫০৭] অগ্নি আত্মচৈতন্য, আদিত্য বিশ্বচৈতন্য আর যম বিশ্বাতীত চৈতন্য। তু. ঋ. অগ্নিং য়মং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ (১।১৬৪।৪৬)। তার আগেই আছে অগ্নি—ইন্দ্র সবিতা মিত্র—বরুণের কথা। আবার, অগ্নি—সবিতা মিত্র—বরুণ রাত্রির কথা (১।৩৫।১)। সর্বত্র একই ভাব। অশ্বমেধের অশ্ব যজমানেরই প্রতীক, তার গতি পরম সধস্থের দিকে (ঋ. ১।১৬৩।১৩)।

[৫০৮] এই দিয়ে মাধ্যন্দিন শাখায় উপনিষদের শুরু ১৪।৪।

[৫০৯] তু. ছা. ১।২, ৩; কৌ. ৩; প্র. ২। সংহিতার অধিদৈবতদৃষ্টিতে এই প্রাণ বায়ু বা মাতরিশ্বা।

[৫১০] তু. ছা. ১।১-৯।

[৫১১] এমনি করে দ্রব্যযজ্ঞ রূপান্তরিত হয় জ্ঞানযজ্ঞে। তু. গী. ৪।২৫-৩৩।

[৫১২] ইন্দ্রিয়ের ভোগ দিব্য এবং কল্যাণময় হলেও তা প্রেয়েরই উপাসনা (তু. ক. ১।২।১-৩)। সুতরাং তা পরম পুরুষার্থ নয়।

[৫১৩] মূলে আছে 'আসন্য প্রাণ'। এই প্রাণ অগ্নিস্বরূপ (প্র. ৪।৩)। তার সাতটি শিখা ঊর্ধ্ব-স্রোতা হয়ে আশ্রয় করে শীর্ষকে, তাই আসন্য বা মুখ্য প্রাণকে শীর্ষন্যও বলা হয় (শ. ব্রা. ১১।২।৬।৪; তৈ. ব্রা. ১।২।৩।৩;...)। প্রাণাগ্নির সাতটি শিখাই 'সপ্তার্চিঃ' প্র. ৩।৫; তু. ঋ. সপ্তরশ্মিমগ্নিং ১।১৪৬।১; রহ্বয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ ৩।৬।২) আস্যে বা মূর্ধায় সাতটি ইন্দ্রিয়পথে বেরিয়ে আসছে। সুতরাং মুখ্যপ্রাণকে আশ্রয় করার অর্থ হল ঊর্ধ্বস্রোতা মূর্ধন্যচেতনাকে আশ্রয় করা (দ্র. গী. ৮।১২)। তখন সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির আবির্ভাব হয় (তু. ঋ. আসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ৬।৭।১)। তিনিই অমৃতস্বরূপ আসন্য প্রাণ (ঋ. অমৃতং ম আসন্ ৩।২৬।৭)।

[৫১৪] অর্থাৎ চেতনার উত্তরায়ণ, প্রাণকে ঊর্ধ্বস্রোতা করা। এখানে এটি একটি বিশেষ বিধি, কিন্তু একে সামান্যরূপেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

[৫১৫] এই পুরুষবিধাতার পরিচয় পাই ঋকসংহিতার পুরুষসূক্তে (১০।৯০)। পুরুষের আরেক সংজ্ঞা 'বিশ্বরূপ' (দ্র. ঋ. ৩।৩৮।৪, ৫৫।১৯, ৫৬।৩, ৬।৪১।৩...)। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে মৃত্যু বা

নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই প্রথমে তিনি বলে উঠলেন, 'সোঽহমস্মি',—আমি সেই। তাই তিনি হলেন অহংনামা। তিনি এই সব-কিছুর পুরোবর্তী এবং সমস্ত পাপকে দগ্ধ করেছেন, তাই তাঁর সংজ্ঞা হল 'পুরুষ'।[৫১৬]

তিনি একাকী, তাই তাঁর ভয় হল। কিন্তু যখন দেখলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন তাঁর ভয় চলে গেল।[৫১৭]

কিন্তু একা থেকে তিনি খুশী হতে পারলেন না, চাইলেন আরেকজনকে। অমনি এমন হয়ে গেলেন যেন স্ত্রী-পুরুষ নিবিড় আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে।[৫১৮] সেই নিজেকেই তিনি তখন দুভাগ করলেন, হল পতি আর পত্নী। যাজ্ঞবল্ক্য তাই বলতেন, আমরা যখন এক, তখন আমরা একেকজন ডালের আধখানার মত।[৫১৯] তাইতো এ-আকাশ পূর্ণ হয় স্ত্রীকে দিয়ে।[৫২০]

তারপর আত্মা সেই পত্নীতে[৫২১] সঙ্গত হলেন। তিনি ভাবলেন, এ কি, নিজের থেকে আমাকে জন্ম দিয়ে আবার আমাতেই ইনি সঙ্গত হচ্ছেন! আমি তাহলে পালাই।[৫২২] তারপর মানবীরূপ ছেড়ে তিনি যে-রূপই ধরেন, আত্মা পুরুষ হয়ে তাঁতে সঙ্গত হন। এমনি করে সমস্ত মিথুনের সৃষ্টি হল—মায় পিঁপড়া পর্যন্ত।[৫২৩]

আত্মা তখন জানলেন, আমিই তো এই সৃষ্টি। তারপর হাত দিয়ে মন্থন করে মুখ হতে তিনি সৃষ্টি করলেন অগ্নিকে।[৫২৪] সমস্ত দেবতা এই অগ্নিরই বিসৃষ্টি।[৫২৫] আত্মা রেতঃ হতে সৃষ্টি করলেন সোম।[৫২৬] অগ্নি হলেন অন্নাদ, আর সোম অন্ন। অগ্নি-সোমের আবেশে জগতের মর্ত্যধারা চলল অমৃতের দিকে।[৫২৭] তাই এ-ধারার নাম হল অতিসৃষ্টি।

অসৎকে দেখেছিলাম জগন্মূল, এখানে দেখছি আত্মাকে বা সৎকে। দুটি মতই ছিল (তু. ছা. ৬।২।১-২)।

[৫১৬] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এটি চেতনার উত্তরায়ণের ছবি। পাপ বা দ্বৈতবুদ্ধিকে (তু. ছা. ১।২।১-৮) অতিক্রম করে এই আদিতম অবস্থায় পৌঁছন যেতে পারে।

[৫১৭] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ হল মোক্ষভীতি, সুষুপ্তিতে জেগে উঠলে যেমন হয় প্রথমটায়।

[৫১৮] তু. বৃ. ৪।৩।২১। অর্ধনারীশ্বরের সামরস্য। ঋক্‌সংহিতায় বাক্ ও ব্রহ্মের মিথুন (১০।১১৪।৮); তেমনি ধেনু ও বৃষভের (১০।৫।৭, ৩।৩৮।৭; আরও তু. মাতা পিতরমৃত আ বভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সং হি জগ্মে ১।১৬৪।৮)।

[৫১৯] মূলে 'স্বঃ' ক্রিয়াপদ < √ অস্ + লট্ ব্রস্ (Limaye & Vadekar)। আত্মাতে পতি-পত্নী এক; তু. বৃ. যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদ ২।৪।৫; অ. স. ১৪।২।৭১; বৃ. ৬।৪।২০; ঋ. সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ ১০।৮৫।৪৭।

[৫২০] তু. কে. তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম ৩।১২।

[৫২১] পত্নী কে? শঙ্কর বলেন শতরূপা। বরং বলা ভাল বাক্ (তু. বৃ. ১।২।৪; ঋ.১০।১১৪।৮, 'বাচস্ পতিং বিশ্বকর্মাণম্ ৮১।৭)।

[৫২২] তু. শ. ব্রা. প্রজাপতির্হ বৈ স্বাং দুহিতরমভিদধ্যৌ, দিবং বা উষসং বা, মিথুনী এনয়া স্যামিতি তাং সংবভূব ১।৭।৪।১; ঋ. স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ ১।৭১।৫ (৮), ৩।৩১।১, ১০।৬১।৭, ১।১৬৪।৩৩। শক্তি পুরুষের আত্মশক্তি অতএব আত্মজা; আবার সেই পুরুষ ও শক্তির সংযোগেই সৃষ্টি।

[৫২৩] এটি অবরোহক্রম, বিসৃষ্টি বা ব্যাকৃতি। আরোহক্রমের কথা পরে আছে, তা হল অতিসৃষ্টি।

[৫২৪] এইটি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উধর্বমন্থ (তু. তৈ. আ. ২।৭।১)। একে অন্নের দ্বারা অতিরোহণও বলা যায় (ঋ. ১০।৯০।২; তু. 'অভ্যারোহ' বৃ. ১।৩।২৮)। 'মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ' (ঋ. ১০।৯০।১৩)।

[৫২৫] ইনি বৈশ্বানর অগ্নি (দ্র. ৩।২ ভূমিকা; তু. অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য ১০।৫।৭)।

[৫২৬] তু. প্র. রয়িরেব চন্দ্রমাঃ ১।৫ : রয়ি ॥ রেতঃ < √ রী।

[৫২৭] দ্র. ঋ. ১।৯৩। অগ্নি অভীপ্সার উধর্বশিখা, আর সোম অমৃতের দিব্যধারা—আরোহক্রমে; আবার অবরোহক্রমে অগ্নি দিব্যচেতনার আবেশ, সোম পার্থিব আনন্দের উচ্ছলন ('আন্যং দিবো

সবই ছিল অব্যাকৃত, তারপর এমনি করে নাম আর রূপে হল ব্যাকৃত। সবার মাঝে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে[৫২৮] আছেন বিশ্বম্ভর অগ্নির মত। প্রাণনে তিনি প্রাণ, বচনে বাক, দর্শনে চক্ষু, শ্রবণে শ্রোত্র, মননে মন। কিন্তু এ হল তাঁর টুকরা-টুকরা পরিচয়। তাঁকে সমগ্রভাবে উপাসনা করতে হবে আত্মা বলেই। আত্মার মাঝেই সব এক হয়ে আছে।[৫২৯] এই আত্মা অন্তরতম, তিনি পুত্র হতে বিত্ত হতে সব-কিছু হতে প্রিয়।[৫৩০]

তারপর ব্রহ্মবিদ্যা:

মানুষ মনে করে, ব্রহ্মবিদ্যায় আমরা সব হব। কিন্তু ব্রহ্ম কি জেনে সব হলেন?

আদিতে এসব ব্রহ্মই ছিল। তিনি নিজেকেই জানলেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলে। তাইতে তিনি এসব হলেন।[৫৩১] আবার দেবতা ঋষি বা মানুষের মধ্যে যাঁরই প্রতিবোধ[৫৩২] হয়, তিনিই হন ব্রহ্ম।[৫৩৩] বামদেবও তা-ই হয়েছিলেন।[৫৩৪] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধ যাঁর হয়, তিনি সব হন। তিনি হন দেবতাদের আত্মা।[৫৩৫] তাই তাঁদের কোনও অধিকার থাকে না তাঁর উপর। 'দেবতা আলাদা, আমি আলাদা' এই জ্ঞানে যারা উপাসনা করে, তারা হয় দেবতদের পশু অর্থাৎ ভোগ্য। দেবতারা তাই চান না যে মানুষের ব্রহ্মবিদ্যা হয়।

এক ব্রহ্মেরই বিভূতি এই সৃষ্টি।[৫৩৬] আগে দেবসৃষ্টি, তারপর সেই আদর্শে মনুষ্যসৃষ্টি—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপে।[৫৩৭] তাঁর অতিসৃষ্টি হল ধর্ম,[৫৩৮] যা শ্রেয়োরূপ। ধর্ম আর সত্য এক কথা।[৫৩৯]

তারপর আবার আত্মবিদ্যা:

আত্মাই সবার স্বলোক বা স্বধাম। এই স্বধামেরই উপাসনা করবে। যিনি তা করেন, তাঁর কর্ম ক্ষয় হয় না।[৫৪০] যা তিনি চান, তা এই আত্মা হতেই সৃষ্টি করেন।[৫৪১]

মাতরিশ্বা জভারা মথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ' ঋ. ১।৯৩।৬)। অগ্নি পুরুষ, সোম প্রকৃতি। দুটিতে ওতপ্রোত। তন্ত্রে তাই জগৎ অগ্নিসোমাত্মক। সংহিতায় দেখি, দুটিতে মিলে 'অবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ...উরুং য়জ্ঞায় চক্রথুরু লোকম্...দীদয়তং বৃহৎ' ঋ. ১।৯৩।৪, ৬, ১০।

[৫২৮] তু. ঋ. ১০।৮১।১; ছা. ৬।৩।৩; তৈ. ২।৬; ঐ. ১।৩...।

[৫২৯] তু. কৌ. তমেতমাত্মানমেতে আত্মানোহন্ববস্যান্তি ৪।২০।

[৫৩০] অতএব পুত্রৈষণা এবং বিত্তৈষণা ছাড়তে হবে (বৃ. ৩।৫।১)।

[৫৩১] এই হওয়াই 'সম্-ভূতি'; 'বি-ভূতি' তার পরের ধাপ। তু. সমূহনে তেজ, ব্যূহনে রশ্মিজাল (ঈ. ১৬)। আরও তু. ঋ. দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্ ৫।৬২।১; অহমেব...আরভমাণানি বিশ্বা...এতাবতী মহিনা 'সম্ বভূব' ১০।১২৫।৮; একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ৮।৫৮।২।

[৫৩২] তু. কে. ২।৪; বৃ. ৪।৪।১৩।

[৫৩৩] তু. মু. ৩।২।৯।

[৫৩৪] দ্র. ঐ. ২।৫; ঋ. ৪।২৬।১, ২৭।১।

[৫৩৫] তু. ঋ. ১।১৬৪।৪৬।

[৫৩৬] তু. ঋ. ৮।৫৮।২, ৩।৩৮।৪, ৬।৪৭।১৮...।

[৫৩৭] তু. পুরুষসূক্ত ঋ. ১০।৯০।১২।

[৫৩৮] তু. ঋ. য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ১০।৯০।১৬। প্রথম বা আদিম ধর্ম তাহলে যজ্ঞ বা আত্মত্যাগ। দেবযজ্ঞ হল বিসৃষ্টি, আর তারই অনুসরণে মনুষ্যযজ্ঞ হল উৎসৃষ্টি (উৎসর্গ), যার মূলে আছে দেবতারই প্রেরণা। এইজন্য এখানে তাকে বলা হয়েছে 'অতিসৃষ্টি'। দুটি যজ্ঞভাবনা ওতপ্রোত (তু. গী. ৩।১০-১১)।

[৫৩৯] তু. ঈ. সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ১৫। সত্যই বিশ্বমূল: তু. ঋ. সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ ১০।৮৫।১; ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত ১৯০।১। দ্র. ঋ. ৩।৬।১০ টীকা।

[৫৪০] কিন্তু প্রতু. মু. ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ২।২।৮। এটি অকর্তার অবস্থা। কিন্তু অকর্তারও কর্ম থাকে। তা দিব্য কর্ম (তু. ঈ. ২; গী. ৩।২২, ৪।৯, ১৮, ৫।৭)।

[৫৪১] তু. ছা. ৭।২৫।২, ৮।২।১০; ক. ১।২।১৬...।

আত্মাই সর্বভূতের লোক বা ধাম বা আশ্রয়। আত্মজ্ঞের যে হোম আর যাগ তা-ই দেবলোক, বেদানুবচন ঋষিলোক, পিতৃতর্পণ ও পুত্রোৎপত্তি পিতৃলোক, মানুষকে আশ্রয় ও আহার দেওয়া নৃলোক, সর্বভূতের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান ভূতলোক।[৫৪২] এককথায় তিনি সর্বময়।

উপক্রমের মত উপসংহারে আবার বলা হচ্ছে:

আদিতে এক আত্মাই ছিলেন। তিনি চাইলেন, আমার জায়া হ'ক, আমি প্রজাত হই। আমার বিত্ত হ'ক, আমি কর্ম করি। কামনার এই অবধি। মানুষেরও এই কামনা। আত্মজ্ঞের মধ্যে এই কামনা পূর্ণ হয় যখন, তখন তাঁর মন হয় আত্মা, বাক্ জায়া, প্রাণ প্রজা, চক্ষু মানুষ বিত্ত, শ্রোত্র দৈব বিত্ত, শরীর কর্মসাধন। তখন তিনি পাংক্ত—পশুরূপে, যজ্ঞরূপে, পুরুষরূপে। এই সবই তো পাংক্ত। যিনি এ জানেন, তিনি সব পান।[৫৪৩]

পঞ্চম ব্রাহ্মণে কয়েকটি প্রকরণ আছে। প্রথমটি সপ্তান্নবিদ্যা। মুখবন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করে তারপর তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মেধা[৫৪৪] এবং তপস্যার দ্বারা পরম পিতা সাতটি অন্নের জন্ম দিলেন। একটি অন্ন সর্বসাধারণ, সবাই যা খায়। এটি মিশ্র, এর উপাসনায় পাপ হতে মুক্তি হয় না।[৫৪৫] দুটি দেবতাদের অন্ন—হুত আর প্রহুত।[৫৪৬] কেউ বলেন, দর্শ আর পূর্ণমাস। যা-ই হ'ক, কামনা নিয়ে ইষ্টিযাগ করবে না। পশুদের অন্ন হল পয়ঃ বা দুধ, মানুষদেরও—অন্তত শৈশবে। অপ্রাণ বা সপ্রাণ সবই এই পয়ে প্রতিষ্ঠিত, কেননা এটি হল হোমের সাধন, (আর যজ্ঞ হতেই সৃষ্টি)।[৫৪৭] হোমের দ্বারাই মানুষ সদ্যসদ্য পুনর্মৃত্যুকে জয় করতে পারে।[৫৪৮] এই অন্ন অক্ষয়, কেননা অন্নাদ পুরুষও অক্ষয়, তিনি সর্বদাই তাঁর ধী এবং কর্মের দ্বারা অন্ন সৃষ্টি করে চলেছেন।[৫৪৯] যিনি এই অক্ষিতি অর্থাৎ ক্ষয়-

---

[৫৪২] আত্মবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ছবি। দ্র. পঞ্চমহাযজ্ঞ শ. ব্রা. ১১।৫।৬।১-২।

[৫৪৩] আত্মজ্ঞের মন প্রভৃতি পাঁচটি সাধনই তখন চিন্ময়। মন আর বাকে একটি মিথুন : মন ব্রহ্মচৈতন্য, বাক্ তার স্ফূর্তি (তু. ঋ. ১০।১১৪।৮)। এই মিথুন থেকে উৎপন্ন হল প্রজাপতি প্রাণ, সংহিতার ভাষায় 'মাতরিশ্বা' (তু. ঋ. ৩।২৯।১১; ঈ. ৪)। চক্ষু এবং শ্রোত্র হল দিব্যজ্ঞানের ইন্দ্রিয় : চোখ দেখে বিশ্বের প্রতিষ্ঠারূপী আদিত্যকে, কান শোনে অতিষ্ঠারূপী আকাশকে (তু. ঋ. ১।৮৯।৮)। যোগাগ্নিময় শরীরই কর্মসাধন। পশুই যজ্ঞের ভিতর দিয়ে হয় পুরুষ বা দেবতা (তু. ঋ. অশ্বমেধসূক্ত ১।১৬২।২১, ১৬৩।৬, ৭, ১৩; পাংক্ত পশু : অ. স. ১১।২।৯, শ. ব্রা. ১।২।৩।৬)।

[৫৪৪] মেধা < মনস্ √ধা ॥ অবে. মজ্‌দা, কোনও-কিছুতে মনকে নিবিষ্ট করা, ফলে 'সমাধি'। সংহিতায় সমাধিমান্ পুরুষের সংজ্ঞা তাই 'মান্ধাতা' (তু. ঋ. ১।১১২।১৩, ১০।২।২ অগ্নির বিণ.)। দ্র. অ. স. মেধাসূক্ত ৬।১০৮ (তু. ঋ. 'সনিং' মেধাময়াসিষম্ ১।১৮।৬, সুতরাং মেধা প্রাপ্তির দ্বার)।

[৫৪৫] যারা আত্মপাকী (গী. ৩।১৩) বা কেবলাদী (ঋ. ১০।১১৭।৬), তারা পাপী (তু. তৈ. ৩।১০; মভা. ১২।২৪৯।৪)।

[৫৪৬] একটি বাহ্যযাগ, আরেকটি আন্তরযাগ।

[৫৪৭] দ্র. ঋ. পুরুষসূক্ত ১০।৯০। সৃষ্টি দেবযজ্ঞ।

[৫৪৮] আর মনুষ্যযজ্ঞ হল সৃষ্টির উজানে যাওয়ার সাধন, তাইতে অমৃতত্বলাভ (তু. ঋ. য়জ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্তেতে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি,...য়মস্য জাতমমৃতং য়জামহে ১।৮৩।৫; অপাম সোমমমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ৮।৪৮।৩; যজ্ঞসূক্ত ১০।১৩০)।

[৫৪৯] অন্নাদ পুরুষ, অন্ন প্রকৃতি। আত্মজ্ঞ পুরুষ প্রতিমুহূর্তে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন আন্তরভাবনা এবং বাহ্যকর্মের দ্বারা। এই তাঁর 'কৃতম্' (তু. ঈ. ১৭)।

হীনতার তত্ত্ব জানেন, তিনি প্রতীকের[৫৫০] দ্বারা অন্ন আহার করেন, তিনি দেবতা হয়ে যান, ঊর্জ্[৫৫১] নিয়ে বেঁচে থাকেন।

তিনটি অন্ন আত্মার—মন বাক্ আর প্রাণ। মনের নানা বৃত্তি, প্রাণের পাঁচটি। আত্মা বাঙ্ময় মনোময় প্রাণময়। বাক্ প্রাণ মনই সব। এদের অনন্ত বলে উপাসনা করলে অনন্তলোক জয় করা যায়।[৫৫২]

তারপর ষোড়শকল পুরুষের কথা। এই সংবৎসরই ষোড়শকল প্রজাপতি।[৫৫৩] যে পনেরটি কলার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তারা হল রাত্রি। আরেকটি আছে ধ্রুবা কলা, সেইটি ষোড়শী। অমাবস্যার রাত্রিতে ঐ ষোড়শী কলা নিয়ে তিনি সমস্ত প্রাণীতে অনুপ্রবিষ্ট থেকে পরদিন প্রাতঃকালে আবার জন্মান।[৫৫৪] এঁকে যিনি জানেন, তিনিও ষোড়শকল পুরুষ হন। বিত্ত তাঁর পনের কলা, আর আত্মা ষোড়শী কলা। বিত্ত বাড়ে-কমে, তারা যেন চক্রের পরিধি। আত্মা চক্রের নাভির মতই ধ্রুব।[৫৫৫]

তারপর তিনটি লোকের কথা—মনুষ্যলোক পিতৃলোক আর দেবলোক। তার মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ। এই লোক পাওয়া যায় বিদ্যার দ্বারা।

তারপর সম্প্রত্তি-প্রকরণ। পিতা মরবার সময় পুত্রকে সব-কিছু দিয়ে যান, তার নাম সম্প্রত্তি বা সম্প্রদান।[৫৫৬] পিতা পুত্রকে কাছে ডেকে বলেন, তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক। পুত্র বলেন, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক। এই স্বীকৃতিতে পিতার প্রাণ পুত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়, পিতার সাধনার অনুবৃত্তি চলে পুত্রে। একদিকে যেমন ইহলোকে তিনি পুত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আরেকদিকে তেমনি তাঁর মাঝে আবিষ্ট হয় অমৃত দৈব প্রাণ।[৫৫৭] পৃথিবী এবং অগ্নি হতে তাঁতে আবিষ্ট হয় দৈবী বাক্, দ্যুলোক এবং আদিত্য হতে দৈব মন, অপ্ এবং চন্দ্রমা হতে[৫৫৮] দৈব প্রাণ। সে-বাক্ সিদ্ধ, সে-

---

[৫৫০] প্রতীক॥ প্রত্যাচ্, যা সামনে আছে। অনুরূপ সংজ্ঞা হল 'প্রতিরূপ'। পরমপুরুষই জগৎ হয়েছেন, অতএব জগৎ তাঁর প্রতীক প্রতিরূপ বা প্রতিভাস (projection)। সুতরাং প্রতীকে ন্যূনতার আরোপ অবিদ্যারই পরিচয়। বৈষ্ণবও বলেন, প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি করতে নাই।

[৫৫১] সংহিতায় 'ইষ্' এবং 'ঊর্জ্' অনেকজায়গায় সহচরিত। 'ইষ্' এষণা, আর 'ঊর্জ্' চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেবার শক্তি (< √ বৃজ্ 'মোড় ফেরানো')। তাঁর চেতনা এখানে থেকেও সবসময় ঊর্ধ্বস্রোতা।

[৫৫২] তু. ১।৪।১৭; চক্ষু এবং শ্রোত্র বাদ পড়েছে। ভাবনার সূত্রটি এই : মন দ্যুলোক, বাক্ পৃথিবী; দুয়ের সঙ্গমে ইন্দ্ররূপী প্রাণের উৎপত্তি; প্রাণ অদ্বিতীয় (১।৫।১১-১২)।

[৫৫৩] প্রজাপতি আদিত্য, তাঁর বিম্বের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। তাই তিনি পুরুষ। অথচ তাঁরই মাঝে প্রকৃতির হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে। এইটি ব্যক্তজগৎ। তার ঊর্ধ্বে অব্যক্তের নিত্যা ষোড়শী কলা। আলো আর কালো সেখানে একসঙ্গে, তাই তা 'অমাবস্যা'। একে-একে মনের কলা ক্ষীণ হয়ে অমনীভাবের ষোড়শী কলায় তত্ত্বের 'দর্শন' হয়, তাই অমাবস্যার যাগ 'দর্শযাগ'। তখন চাঁদ বা মন নাই, কিন্তু আদিত্যপুরুষ আছেন, তিনিই আছেন (দ্র. শ. ব্রা. ১১।২।৪।১...)।

[৫৫৪] ষোড়শী কলা অব্যক্ত চিদ্‌বীজ। এর সঙ্গে তু. গর্ভাধানমন্ত্র ঋ. ১০।১৮৪।২; সেখানে সিনীবালী ও সরস্বতী, আবার তমোভাগ ও জ্যোতির্ভাগ অশ্বিদ্বয়ের কথা আছে।

[৫৫৫] নাভি আর পরিধিতে যথাক্রমে শক্তির সঙ্কোচ এবং প্রসার। সঙ্কোচে আত্মভাব, প্রসারে ব্রহ্মভাব। দুটিতে মিলে পুরুষ। তু. আদিত্যবিম্বের সমূহনে তেজ, ব্যূহনে রশ্মিজাল (ঈ. ১৬)।

[৫৫৬] তু. কৌ. ২।১৫, সেখানে বর্ণনাটি আরও বিস্তৃত।

[৫৫৭] তু. ঐ. ২।১।৪ (দ্র. টী. ২৭)।

[৫৫৮] এই চন্দ্রমা সূর্যদ্বার ভেদ করে পাওয়া যায় (তু. মু. ১।২।১১)।

মন নিত্যানন্দ, সে-প্রাণ অব্যথিত এবং অরিষ্ট। পরমদেবতার মতই তিনি হন সর্ব-ভূতাত্মা, অপাপবিদ্ধ।[৫৫৯]

তারপর ব্রত-মীমাংসা অর্থাৎ কার সাধনা করতে হবে তার বিচার। সিদ্ধান্ত হল, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মৃত্যুস্পৃষ্ট বলে শ্রান্ত হয়ে পড়ে,[৫৬০] একমাত্র মধ্যম প্রাণই অশ্রান্ত অজর এবং অমৃত। সুতরাং তাঁরই উপাসনা করতে হবে। এই অধ্যাত্ম প্রাণেরই অধিদৈবত রূপ হল বায়ু। সব দেবতা অস্ত যান বায়ুতে, কিন্তু বায়ু অনস্তমিত।[৫৬১]

সুতরাং 'পাপরূপী মৃত্যু যেন আমায় ধরে না ফেলে' এই বুদ্ধিতে প্রাণ আর অপানের ক্রিয়া করবে—এইটিই একমাত্র ব্রত।[৫৬২]

তারপর ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে আবার আত্মবিদ্যার উপদেশ। পরাক্-দৃষ্টিতে এই সব-কিছুই হল নাম রূপ এবং কর্ম। প্রত্যক্-দৃষ্টিতে এরাই আবার বাক্ চক্ষু এবং আত্মা। যা পরাক্, তার উৎস সামান্য এবং বিভর্তা[৫৬৩] হল যা প্রত্যক্। তিনটি এক হয়েছে আত্মাতে; আত্মা এক হয়েও হয়েছেন ঐ তিনটি। আত্মা অমৃত প্রাণস্বরূপ। তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে[৫৬৪] সত্যরূপী[৫৬৫] নাম আর রূপ।

এইখানে প্রথম অধ্যায়ের শেষ। তার প্রতিপাদ্য হল অশ্বমেধরহস্য, প্রাণোপাসনা, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, সৃষ্টিরহস্য, সপ্তান্নরহস্য, ষোড়শকলপুরুষতত্ত্ব, পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদান, প্রাণ ও বায়ুর তত্ত্ব।

তারপর ছয়টি ব্রাহ্মণে দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম ব্রাহ্মণে অজাতশত্রু-দৃপ্তবালাকি-সংবাদ।[৫৬৬] বালাকি পুরুষের উপাসনা করতেন আদিত্যে চন্দ্রে বিদ্যুতে, আকাশে বায়ুতে অগ্নিতে অপ্এ, আদর্শে শব্দে দিকে ছায়ায় এবং দেহে। অজাতশত্রু দেখিয়ে দিলেন, এর প্রত্যেকটি অনুভব জাগ্রতের, অতএব পরাক্-বৃত্ত objective বলে অগভীর। চেতনার আরও দুটি স্তর আছে—স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। জাগ্রতের চেতনা জ্ঞান, স্বপ্ন আর সুষুপ্তির চেতনা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে জ্ঞান মিলিয়ে যায়। স্বপ্নের বিজ্ঞান মহিমার বোধ, আর সুষুপ্তির বিজ্ঞান শূন্যতা। দুটিই হৃদয়ে আকাশের বোধ। জাগ্রতের চেতনা তখন নাড়ীজালকে অবলম্বন করে আকাশে প্রত্যাহৃত হয়, আবার জেগে ওঠবার

---

[৫৫৯] এমনি করে বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে পুত্র বা শিষ্যে শক্তি সংক্রামিত হয়ে সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করে। সিদ্ধচেতনার সম্পূর্ণ রূপায়ণ না হওরা পর্যন্ত পুত্র 'প্রজা', সম্যক্ রূপায়ণে 'রিজা' (দ্র. ঋ. ৩।১।২৩ টী.)। পুত্র যতক্ষণ 'প্রজা', ততক্ষণই পিতৃলোকের সার্থকতা।

[৫৬০] তু. ক. সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ ১।১।২৬।

[৫৬১] তু. বায়ু প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম তৈ. ১।১; সংবর্গবিদ্যা ছা. ৪।৩।১-৪; শ্বে. বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে...তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ২।৬; ঈ. বায়ুরনিলমমৃতম্ ১৭। আকাশ এবং বায়ু দুইই নীরূপ এবং লয়স্থান বলে সন্মাত্রের প্রতীক। আবার আকাশ ও বায়ু (প্রাণ) শিব-শক্তির মত একটি মিথুন। কোশব্রহ্মবিদ্যায় বায়ু দিক্সমূহের বৎস (ছা. ৩।১৫।২)।

[৫৬২] তু. প্রতর্দনের আন্তর অগ্নিহোত্র কৌ. ২।৫। প্রাণাপানক্রিয়ার প্রথম উল্লেখ ঋ. ১০।১৮৯।২।

[৫৬৩] মূলে আছে, বাকই নামের 'ব্রহ্ম' বা বৃহত্ত্বের সাধক। ব্রহ্মের এই ব্যুৎপত্তি লক্ষণীয় (দ্র. নি. ব্রহ্ম পরিবৃঢ়ং সর্বতঃ ১।৮)।

[৫৬৪] তু. ঋ. প্রথমচ্ছদ্ অবরাঁ আবিবেশ ১০।৮১।১; স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা ৯০।১।

[৫৬৫] পাঠান্তর 'সত্য'। তু. কৌ. ১।৬; তৈ. ২।৬ ।

[৫৬৬] তু. কৌ. ৪; সেখানে কিছু বেশী কথা আছে।

সময় সেখান হতেই বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে যা আছে, তা সত্য। কিন্তু এই আকাশে যে বিজ্ঞানময় পুরুষ আছেন, তিনি সত্যেরও সত্য। তিনিই ব্রহ্ম।[৫৬৭]

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে প্রাণোপাসনা। প্রাণ মধ্যম অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ একটি শিশু।[৫৬৮] সমস্ত দেহই তাঁর আধার হলেও ঋষিরূপে অর্থাৎ চেতনার বিশিষ্ট প্রকাশরূপে তাঁর অবস্থান মস্তকে। মস্তকটি একটি অর্বাগ্‌বিল ঊর্ধ্ববুধ্ন চমসের মত।[৫৬৯] বিশ্বরূপের ঈশনা বা সামর্থ্য তাতেই নিহিত। দুটি চক্ষু দুটি শ্রোত্র দুটি নাসারন্ধ্র আর মুখবিবর এই সাতটি ঋষি।[৫৭০] ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত বাক্‌ অষ্টম ঋষি।[৫৭১] এই প্রাণকে জানলে অন্নাদ হওয়া যায়।[৫৭২]

তৃতীয় ব্রাহ্মণে মূর্তামূর্ত ব্রহ্মের পরিচয়। ব্রহ্মের দুটি রূপ—মূর্ত এবং অমূর্ত।[৫৭৩] যা মূর্ত, তা মর্ত্য স্থাবর এবং সৎ। যা অমূর্ত, তা অমৃত জঙ্গম এবং ত্যম্‌ (ত্যৎ)।[৫৭৪] অধিদৈবতদৃষ্টিতে বায়ু আর অন্তরিক্ষই অমূর্ত, তাছাড়া আর-সব মূর্ত।[৫৭৫] অমূর্তের রস বা সার হলেন আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ।[৫৭৬] তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ আর অন্তরাকাশই অমূর্ত, তাছাড়া সব মূর্ত। অমূর্তের সার হলেন দক্ষিণের অক্ষিপুরুষ।[৫৭৭] তাঁর রূপ যেন বিদ্যুৎঝলকের মত, কমলের মত, অগ্নিশিখার মত, ইন্দ্রগোপকীটের মত, পাণ্ডুবর্ণ মেষলোমের মত অথবা হরিদ্রারঞ্জিত

---

[৫৬৭] বালাকি ব্রহ্মোপাসনার যেসব আলম্বনের উল্লেখ করেছেন, তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আদিত্য চন্দ্রমা বিদ্যুৎ এই তিনটি অধিজ্যোতিষ। আকাশ বায়ু অগ্নি এবং অপ্‌ অধিভূত। দিকও তা-ই, কেননা দিক আকাশের শক্তি (তু. ছা. ৩।১৫।১-২; দ্র. টী. ১৫৫)। আর বাকীগুলি অধ্যাত্ম। তাতে আত্মভাবের চারটি প্রকারের কথা বলা হচ্ছে—জ্যোতির্ময় শব্দময় ছায়াময় এবং অন্নময়। শব্দ শ্বাসপ্রশ্বাসের বা প্রাণের, তন্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'হং-সঃ'। মৃত্যুতে অন্নময় শরীর ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু ছায়াশরীর থাকে—এই বিশ্বাস অতিপ্রাচীন (তু. বৃ. ৩।৯।১৪)। 'আদর্শে পুরুষ' দ্র. ২।৩।৫।

[৫৬৮] মধ্যম শিশু = অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ (ক. ২।১।১২, ১৩; ২।৩।১৭)। তিনি অগ্নিস্বরূপ, মস্তকে তাঁরই সপ্তার্চি (প্র. ৩।৫; মু. ২।১।৮)।

[৫৬৯] মস্তককে চেতনার আধার বলা হচ্ছে। মূল শ্লোকটির সঙ্গে তু. অ. স. ১০।৮।৯। 'বুধ্ন' প্রাচীন সংজ্ঞা, শব্দটি শ্লিষ্ট। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বোধস্থান। 'ঊর্ধ্ববুধ্ন' তু. ঋ. উপরি বুধ্ন এষাম্‌ ১।২৪।৭; আরও তু. 'অহির্বুধ্ন্যঃ'।

[৫৭০] সাতটি ঋষি সাতটি 'খ', কিন্তু তারা পরাক্‌-বৃত্ত (ক. ২।১।১)। তারা অন্ন আহরণ করে, কিন্তু বস্তুত অন্নাদ হলেন মধ্যম প্রাণ, যিনি বৈশ্বানর।

[৫৭১] বাকও অন্নাদ। সুতরাং প্রাণ আর বাকে একটি মিথুন। তেমনি ব্রহ্ম আর বাকে একটি মিথুন (ঋ. ১০।১১৪।৮)।

[৫৭২] অন্নাদ হওয়ার অর্থ সবাইকে আগুন করে তোলা, মৃণ্ময়কে চিন্ময় করা। সর্বাত্মভাবনারও এই তাৎপর্য।

[৫৭৩] তু. প্র. 'মূর্তিরেব রয়িঃ' ১।৫। 'রয়ি' প্রাণের প্রবেগ।

[৫৭৪] লক্ষণীয়, ব্রহ্মের যে-রূপ অমূর্ত, তাও কিন্তু 'য়ৎ' বা জঙ্গম। অথচ তা 'ত্যম্‌' বা অনির্বচনীয়। তন্ত্রের ভাষায় শিব শক্তির সঙ্গে নিত্যযুক্ত, অথচ লোকোত্তর। ঋক্‌সংহিতাতেও পরমতত্ত্বকে 'একং সৎ' এবং 'একং তৎ' দুইই বলা হয়েছে (১।১৬৪।৪৬, ৫।৬২।১)।

[৫৭৫] বায়ু লয়স্থান (দ্র. টী. ৫৬১)।

[৫৭৬] তু. হিরণ্ময় পুরুষ ছা. ১।৬।৬।

[৫৭৭] বৃ. তে ইন্দ্র (৪।২।২), কৌ.তে যিনি পরমাত্মা (৩।১-২); তু. কৌ. ৪।১৬; মৈ. ৭।১১; ছা. ৪।১৫।১। অক্ষিপুরুষ ভ্রূমধ্যে থেকে দ্বিদলে বিভক্ত হয়েছেন—দক্ষিণে ইন্দ্ররূপে, বামে ইন্দ্রপত্নী বিরাট্‌রূপে।

বসনের মত।[৪৭৮] তাঁকে 'নেতি নেতি' করে জানা যায়।[৪৭৯] প্রাণ সত্য, তিনি তারও সত্য। তিনি সত্যের সত্য।[৪৮০]

তারপর চতুর্থ ব্রাহ্মণে বিখ্যাত মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।[৪৮১] ঘর ছাড়বার আগে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে দিতে চাইলেন বিত্ত; মৈত্রেয়ী তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'আমি যাতে অমৃতা না হব, তা দিয়ে কি করব?'[৪৮২] যাজ্ঞবল্ক্য খুশী হয়ে তাঁকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমেই বললেন, জীবনে আমরা যা-কিছু ভালবাসি, তা যে সেই বস্তুর জন্যই ভালবাসি তা নয়, ভালবাসি আত্মার জন্যই।[৪৮৩] এই আত্মাকেই দেখতে হবে, শুনতে হবে, মনন করতে হবে, গভীর ধ্যানে পেতে হবে। এই যা-কিছু, সবই আত্মা।[৪৮৪]

তারপর আত্মা হতেই সব-কিছু বেরিয়ে আসছে, এই তত্ত্বটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার জন্য বললেন, 'ধর দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা বাজছে, আর শব্দ হচ্ছে। শব্দ পেতে হলে চাই ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি বা বাদনক্রিয়া।[৪৮৫] ভিজা কাঠ জ্বলছে, আর তাহতে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। তেমনি এক মহাভূতের[৪৮৬] নিঃশ্বাস হতেই বেরিয়ে আসছে বেদাদি যত বিদ্যা।[৪৮৭] যেমন সব জলের একায়ন[৪৮৮] সমুদ্র, সব বোধের একায়ন ইন্দ্রিয়, যেমন নুনের একটা ডেলা জলে ফেলে দিলে জলে তা মিশে যায়, তেমনি এই মহাভূত এক অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন সত্তামাত্র। মহাভূতেরই বিকার এই পঞ্চভূত। আত্মভাব এই

---

[৪৭৮] ভ্রূমধ্যে জ্যোতির আবির্ভাবের বর্ণনা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে উপমেয়, রক্তবর্ণ থেকে ক্রমে বিদ্যুতের মত শুভ্র হয়ে উঠছে। তু. শ্বে. ২।১১।

[৪৭৯] তু. কে. ১।৩-৮; বৃ. ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।২২, ৫।১৫; ঋ. স. ১০।১২৯। ১-৩। আরও তু. অসদ্‌ব্রহ্মবাদ।

[৪৮০] যা সত্যের সত্য, তা-ই হল 'তৎ' বা 'ত্যৎ'। তু. ঋ. সত্যা সত্যস্য করুণানি ২।১৫।১।

[৪৮১] সংবাদটি আবার আছে বৃ. ৪।৫এ।

[৪৮২] তু. ক.তে নচিকেতার 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' ১।১।২৭-২৯। বিত্ত প্রেয়, অমৃত শ্রেয়; বিত্তের প্রতি বৈরাগ্য হতেই অধ্যাত্মসাধনার শুরু। অথচ এই উপনিষদেই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদীদের খোঁচা দিয়ে বলছেন 'গোকামা' এব বয়ং স্মঃ' (৩।১।২; তু. ৪।১।১)। যাজ্ঞবল্ক্য কাম-অকামের অতীত 'সহজ মানুষ'। দুটি কৌতুকোক্তিতে তাঁর চরিত্র অপরূপ হয়ে ফুটেছে।

[৪৮৩] অনুশাসন পত্নীর প্রতি, নারীর প্রতি; তাই প্রথমেই পতি পত্নী পুত্র ও বিত্তের উল্লেখ, যা নিয়ে মেয়েদের সংসার। লক্ষণীয়, পরের কণ্ডিকায় আর এদের উল্লেখ নাই।

[৪৮৪] দর্শন প্রত্যক্ষীকরণ। তার সাধন হল শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন—সংহিতায় যথাক্রমে শ্রুতি মতি ও ধীতি। এই দিয়ে সাধকের অধিকার নিরূপিত হয়। উত্তমাধিকারীর শ্রবণেই দর্শন হয়, মধ্যমাধিকারীর বিচারের দরকার হয়, আর অধমাধিকারীর দীর্ঘকালব্যাপী ধ্যানের। মনের ওপারে বিজ্ঞান, তা-ই নিদিধ্যাসনের সহজ ভূমি। সেখানকার অনুভব 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্' (ছা. ৬।৮।৭...)।

[৪৮৫] উপমাটির জন্য তু. বা. স. ৩০।১৯। বাদ্যযন্ত্র অধিষ্ঠান, বাদন শক্তি, শব্দ পরিণাম।

[৪৮৬] যিনি 'ভূতস্য পতিঃ' (তু. ঋ. ১০।১২১।১), তিনিই মহাভূত, কেননা তিনিই এইসব হয়েছেন। ব্রহ্মের এই সংজ্ঞা একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্যের দেওয়া (তু. মৈ. ৬।৩২ এখান থেকেই নেওয়া)। এতে জড় আর চিৎএর কৃত্রিম ভেদ লুপ্ত হয়ে গেল বিজ্ঞানীর কাছে। দ্বাদশ কণ্ডিকায় কথাটি আরও স্পষ্ট হয়েছে। পঞ্চভূত থেকে আবার পঞ্চভূতেই লয় হওয়া—মহাসমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত, এটি চিন্ময়ভূতবাদের ছবি। ভাগবতে শুককেও এমনি করে সর্বভূতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে দেখি (১।২।২)। বাউল বলছেন, 'চোখে দেখ গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি, প্রাণরসনায় চাইখ্যা দেখ রসের সাঁই খাঁটী।'

[৪৮৭] বিদ্যার আরও উল্লেখ : ছা. ৭।১।২, বৃ. ৪।১।২, ৫।১১, মু. ১।১।৫।

[৪৮৮] 'একায়ন' আবার বিদ্যাস্থানও (দ্র. টী. ২৩৬)।

ভূতবর্গ হতে উঠে আবার তাতেই লীন হয়ে যায়। তাইতে প্রায়ণের[৫৮৯] পর আর সংজ্ঞা থাকে না'।[৫৯০]

মৈত্রেয়ী বললেন, 'সংজ্ঞা থাকে না, একথা বুঝতে পারলাম না তো।' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না বোঝবার মত কিছু তো বলিনি। বলেইছি, মহাভূতটি বিজ্ঞানঘন। যেখানে দ্বৈত থাকে, সেখানেই একজন আর-কিছুকে জানে। যেখানে সবই আত্মা,[৫৯১] সেখানে কে কি দিয়ে কাকে জানবে? বিজ্ঞাতাই না হয় সব-কিছু জানতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞাতাকে কি করে জানা যাবে? তাই বলছিলাম, ওখানে সংজ্ঞা থাকে না।'[৫৯২]

ব্রাহ্মণটির এইখানেই শেষ।[৫৯৩] তারপর পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যা।[৫৯৪] বিদ্যার বিবৃতিটি একটু বিচিত্র। মূল কথাগুলি এই।

মধু অমৃতচেতনা।[৫৯৫] এই চেতনা সব-কিছুকে জারিত করে রয়েছে—যেমন অধিদৈবত জগৎকে, তেমনি অধ্যাত্মজগৎকেও।[৫৯৬] অধিদৈবত বিশ্ব, অধ্যাত্ম ব্যক্তি। বিশ্বে যে-পুরুষ, ব্যক্তিতেও সেই পুরুষ। তিনি তেজোময়, অমৃতময়। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি এই সব-কিছু। এই পরমা বিদ্যাই মধুবিদ্যা।

অধিদৈবতদৃষ্টিতে পুরুষ পৃথিবী অপ্ অগ্নি বায়ু আদিত্য দিক্ চন্দ্র বিদ্যুৎ মেঘগর্জন; আবার তিনি ধর্ম সত্য মানুষ আত্মা। অর্থাৎ বিশ্বরূপে বস্তু ও ভাব দুইই তিনি। তাঁর প্রত্যেকটি দিব্য বিভূতির প্রতিরূপ পাওয়া যায় ব্যক্তিতেও—শরীর রেতঃ বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন তেজ শব্দ ধর্ম সত্য মনুষ্যত্ব ও আত্মার রূপে।[৫৯৭] পরমাত্মরূপে তিনি সর্বভূতের অধিপতি, সর্বভূতের রাজা।[৫৯৮] রথনাভিতে এবং রথনেমিতে যেমন চক্রশলাকারা গাঁথা রয়েছে, তেমনি তাঁতেই রয়েছে সব।[৫৯৯]

---

[৫৮৯] প্রায়ণ = প্রেতি (তু. প্র. ৫।১; দ্র. টী. ৩৬৫)।

[৫৯০] তু. বৌদ্ধ অষ্টম ধ্যানভূমি 'নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা আয়তন', ঠিক নির্বাণের পূর্বে। এ যেন অস্তগামী সূর্যের দিবা-রাত্রির সন্ধিতে দাঁড়ানো। লক্ষণীয়, মূলে 'বিনশ্যন্তি'র প্রয়োগ। তার সঙ্গে তু. ঈ. বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা' ১৪। বৈনাশিক বৌদ্ধভাবনার মূল এইখানে।

[৫৯১] অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মবোধে মাত্র অবস্থান। এই বোধে পেঁছিবার ধাপগুলি পাই ঈ.তে (৬-৭)।

[৫৯২] সংজ্ঞা মূলত বিবেকজ্ঞান। একরসপ্রত্যয় হল চিন্ময় অবিবেক, বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ সেখানে নাই। সুতরাং আমিও নাই, জগৎ নাই। বৌদ্ধ অনাত্মবাদ আর মায়াবাদের মূল এইখানে।

[৫৯৩] বৃ. ৪।৫এর সঙ্গে তুলনার জন্য দ্র. টী. ৬৯৫।

[৫৯৪] তু. মধুবিদ্যা ছা. ৩।১-১১। সেখানকার বিবৃতি সাধনার, এখানকার বিবৃতি সিদ্ধির।

[৫৯৫] ঋক্‌সংহিতায় মধুর একটি বহুপ্রযুক্ত বিণ. 'সোম্য' (দ্র. ৩।৫৩।১০ টী.)। সোমযাগে অমৃতত্বলাভ হয় (ঋ. ৮।৪৮।৩)। পঞ্চামৃতের চতুর্থ অমৃত হল মধু. সেটি দানা বাঁধলেই শর্করা —সমস্তটাই চেতনার উত্তরায়ণের রূপক। এখানকার মধুময় চেতনার সুন্দর বর্ণনা পাই ঋ.তে (১।৯০।৬-৮)। সোমপানের উক্তশ্রুতি আছে ৯।১১৩তে। তার শেষ ঋক্‌টি : যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে, কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামৃতং কৃধি। অমৃতত্বই আনন্দ, তা-ই সোম্যচেতনা বা মধুচেতনা। জীবে এই আনন্দ অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে বলে তিনি 'মধ্বদ'। তু. তৈ. আনন্দমীমাংসা (২।৮; এতমানন্দময়মাত্মানম্...৩।১০)।

[৫৯৬] অধিদৈবত দৃশ্য, কিন্তু জড় নয়—চিন্ময়; আর অধ্যাত্ম হল দিক্।

[৫৯৭] তু. ঋ. ১০।৯০।১৩-১৪। অগ্নি তপঃশক্তি, তার স্ফুরণ উদ্দীপ্ত বাকে বা মন্ত্রে। আকাশের শক্তি দিক্; স্বরূপশূন্য পরিব্যাপ্ত চেতনায় দিব্যশ্রোত্রের আবির্ভাব হয়, যা আকাশের আদিস্পন্দরূপী অনাহত নাদকে শোনে। প্রাকৃত মনশ্চেতনার হ্রাসবৃদ্ধি আছে চন্দ্রের মত, কিন্তু তার ষোড়শী কলা ধ্রুব।

[৫৯৮] সংহিতায় হিরণ্যগর্ভ ভূতপতি, বরুণ সম্রাট্। একজন লোকাত্মক, আরেকজন লোকোত্তর।

[৫৯৯] অর্থাৎ কেন্দ্রে তিনি স্বয়ম্ভূ, আর পরিধিতে পরিভূ (তু. ঋ. ১।১৬৪।২, ১২-১৪, ৩৬)।

এই মধুবিদ্যা ইন্দ্র দিয়েছিলেন আথর্বণ দধ্যঙ্‌কে। তিনি অশ্বমুখ হয়ে তা আবার বলেছিলেন অশ্বিদ্বয়কে।[৬০০] তার সার কথা হল, আধারে-আধারে তিনি পুর সৃষ্টি করে পক্ষিরূপে তাতে আবিষ্ট হয়েছেন, আত্মমায়ায় তিনিই বহুরূপী হয়ে বিচরণ করছেন। আত্মচেতনায় তাঁর অনুভব হয়, সে-অনুভবেই সব-কিছু অনুভূত হয়।[৬০১]

তারপর ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে বিদ্যাবংশের বিবৃতি দিয়ে অধ্যায়ের এবং মধুকাণ্ডের শেষ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পেলাম, এই আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যেমন বাইরে, তেমনি ভিতরে। মূর্ত আর অমূর্ত তাঁর দুটি রূপ। 'নেতি নেতি' বলে অমূর্তে অবগাহন করা যায়। সে-অবস্থা সুষুপ্তির মত। সেখানে কোনও সংজ্ঞা থাকে না, কিন্তু বিজ্ঞানঘনতার অনুভব থাকে। সেখান থেকে ফিরে এলে সব অনুভবই হয়ে যায় মধুময়।

তৃতীয় অধ্যায়ে নয়টি ব্রাহ্মণ, তাতে জনকের সভায় কুরুপঞ্চালের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মোদ্যের বিবরণ আছে।

যজ্ঞসভায় জনক ঘোষণা করলেন, উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তাঁকে তিনি হাজারটি গাভী দেবেন। নিজেকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলে দাবি করবার সাহস কারও হচ্ছে না দেখে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর ব্রহ্মচারীকে বললেন, 'সামশ্রবা, গরুগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে চল তো।' ব্রাহ্মণেরা তাতে চটে গেলেন। জনকের হোতা অশ্বল বলে উঠলেন, 'কি, আমাদের মাঝে তুমিই ব্রহ্মিষ্ঠ না কি?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'ব্রহ্মিষ্ঠকে আমার নমস্কার। আমি গরু চাই, এইমাত্র।'

ব্রাহ্মণেরা ছাড়বার পাত্র নন। বিচার শুরু হয়ে গেল। অশ্বলই প্রথম প্রশ্ন তুললেন। তাঁর প্রশ্ন যজ্ঞের রহস্য সম্পর্কে।[৬০২] জগতে সব-কিছুই মৃত্যুর বশে, কালিক পর্যায়ের বশে।[৬০৩] যজমান কি করে এদের কবল হতে মুক্ত হতে পারেন? যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর হল, অধিযজ্ঞ দৃষ্টিকে অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করে। যজমান যদি জানেন, মানুষ হোতা অধ্বর্যু বা উদ্‌গাতাই যজ্ঞের প্রকৃত ঋত্বিক নন, ঋত্বিক হচ্ছেন অধিদৈবতদৃষ্টিতে যথাক্রমে অগ্নি আদিত্য এবং বায়ু এবং অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে বাক্ চক্ষু এবং প্রাণ, তাহলে এই বিজ্ঞানের ফলেই যজমান পান মুক্তি, পান অতিমুক্তি।[৬০৪]

---

[৬০০] দ্র. ঋ. ১।১১৬।১২, ১১৭।২২, ১১৯।৯। কাহিনীটির তাৎপর্য এই। মধুবিদ্যা সর্ব-বিদ্যার সার। এই বিদ্যা পেতে হলে 'দধ্যঙ্' অর্থাৎ দধিতে বা বিজ্ঞানঘন চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে (তু. 'দধ্যাশিরঃ' সোমাঃ; দধ্যঙ্ ॥ দধিক্রাবা ঋ. ৭।৪৪)। বিদ্যাদাতা হলেন মাধ্যন্দিন-সূর্যরূপী ইন্দ্র। মাথা ঠিক রেখে এই বিদ্যা অপরকে দেওরা যায় না। দেওরা যায় ইন্দ্রের বাহন হয়ে শুধু। আর যাকে দেওরা যায়, মধ্যরাতের আঁধার চিরে তার মাঝে ফোটে অশ্বিদ্বয়সূচিত আদিত্যদ্যুতির আগমনী। তু. পুরাণের 'হয়গ্রীব, হয়শীর্ষা বা হয়শিরাঃ'—বেদের উদ্ধর্তা এবং প্রবক্তা বিষ্ণুর অবতার।

[৬০১] তু. ঋ. ৬।৪৭।১৮। অদ্বৈতানুভবের ত্রিপুটী : তিনিই সব, আমি তিনিই (সংহিতার বিভিন্ন আত্মস্তুতিতে এই ভাবের প্রকাশ; তু. ঋ. এরা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বা রোচৎ স্বাং তন্ব-মিন্দ্রমেব ১০।১২০।৯), আমিই সব (তু. ঋ. অয়মস্মি সর্বঃ ১০।৬১।১৯)। 'পুরিশয়' : দ্র. টী. ৭৫৩।

[৬০২] কর্মের প্রতিষ্ঠা রহস্যবিজ্ঞানের উপর। তু. ছা. তেনোভৌ কুরুতঃ যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ, ...যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি ১।১।১০।

[৬০৩] কালিক পর্যায়ের মধ্যে অহোরাত্র এবং পক্ষের কথা আছে, অয়নের কথা বাদ গেছে।

[৬০৪] আবার যা অধিদৈবত তা-ই অধ্যাত্ম—এটি উপনিষদের মূল সিদ্ধান্ত (তু. ঈ. ১৬; তৈ. স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ আদিত্যে স একঃ ৩।১০;...)। এর বীজ ঋক্‌সংহিতার সাযুজ্যবাদে

তারপর প্রশ্ন হল, অন্তরিক্ষ তো নিরালম্ব, যজমান কি ধরে তাহলে স্বর্গে যাবেন?[৬০৫] যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর হল, যজ্ঞের অধ্যক্ষ ঋত্বিক ব্রহ্মাকে অধিদৈবতদৃষ্টিতে তিনি যদি দেখেন চন্দ্ররূপে, আর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মনরূপে, তাহলে।[৬০৬]

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ঋক্ আর সাম তিনরকমের। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা হল প্রাণ অপান এবং ব্যান। এদের দিয়েই তিনটি ভুবন জয় করা যায়, যেমন পারা যায় উজ্জ্বল অতিনাদী এবং অধিশয়ান তিনটি আহুতির দ্বারা।[৬০৭] ব্রহ্মাই হলেন যজ্ঞের রক্ষক। যজ্ঞকে রক্ষা করেন তিনি মনের শক্তিতে। মন অনন্ত, যেমন বিশ্বদেব বা বিশ্বচেতনাও অনন্ত।[৬০৮]

অশ্বল দেখলেন, যজ্ঞরহস্য যাজ্ঞবল্ক্যের হাতের মুঠোয়, সুতরাং তিনি ব্রহ্মবিৎ। তাই তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে প্রশ্নকর্তা হলেন জারৎকারব আর্তভাগ। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, কয়টি গ্রহ আর কয়টিই বা অতিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয় কয়টি? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আটটি।'[৬০৯]

দ্বিতীয় প্রশ্ন, জগতে সবই তো মৃত্যুর অন্ন, মৃত্যুরও কি মৃত্যু আছে? যাজ্ঞবল্ক্য সংক্ষেপে বললেন, আছে। যেমন অগ্নি সবার মৃত্যু, কিন্তু তারও মৃত্যু হল অপ্।[৬১০]

তৃতীয় প্রশ্ন, পুরুষের মৃত্যুর পর তার প্রাণের উৎক্রান্তি হয় কি হয় না? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না, এখানেই তা মিশে যায়। মৃত দেহটাই পড়ে থাকে, ফুলে ওঠে।'[৬১১] 'তখন কী তাকে ছেড়ে যায় না?' 'নাম। নাম অনন্ত, যেমন বিশ্বদেব বা বিশ্বচেতনা অনন্ত। তাইতে সে অনন্তলোককেই জয় করে।' 'তা ঠিক। মৃত পুরুষের সব-কিছুই বিশ্বদেবতায় মিলিয়ে যায় বটে, কিন্তু তবুও সে কোথাও তো থাকে। কোথায় থাকে?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'ভিড়ের মাঝে একথা হতে পারে না, চল নির্জনে যাই।' নির্জনে

(১।১৬৪।২০; তু. ঋ. ৩।২৬।৭ সবার মাঝে অনুপ্রবিষ্ট যে-বৈশ্বানর, আমি তিনিই)। উজান বয়ে মুক্তি, আবার সহজ হয়ে অতিমুক্তি। অতিমুক্তিই ব্রাহ্মণ্য (দ্র. বৃ. ৩।৫)।

[৬০৫] এটি স্বর্গসম্পর্কে প্রাকৃত কল্পনা।

[৬০৬] ব্রহ্মাই যজ্ঞপুরুষ। তিনি মনোময়। কলায়-কলায় মনশ্চেতনার বিকাশ পূর্ণিমা পর্যন্ত—এই হল মুক্তি। আর ধ্রুবা ষোড়শী কলাতে স্থিতি অতিমুক্তি (তু. বৃ. ১।৫।১৫)।

[৬০৭] কাণ্বশাখার পাঠ অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। মাধ্যন্দিনশাখার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে ভাল। মাধ্যন্দিনশাখায় মনুষ্যলোককে অতিনাদী এবং পিতৃলোককে অধঃস্থিত বলা হয়েছে (তু. Gk. Hades)।

[৬০৮] অর্থাৎ এই মনশ্চেতনাই বিস্ফারিত হবে বিশ্বচেতনায়। তা-ই যজ্ঞের পরম তাৎপর্য। দেবযজ্ঞ যেমন বিসৃষ্টির সাধন, মনুষ্যযজ্ঞ তেমনি অতিসৃষ্টির (তু. বৃ. ১।৪।৬)।

[৬০৯] ইন্দ্রিয়ের মাঝে পাদ পায়ু উপস্থ বাদ গেছে। অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যই কিন্তু একাদশ রুদ্র বা প্রাণের কথা বলেছেন (বৃ. ৩।৯।৪)।

[৬১০] মৃত্যুতে বিজ্ঞানীর সত্তা অগ্নিময় হয়ে যায়। অন্ত্যেষ্টিরও এই তাৎপর্য (তু. ঋ. অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ, য়াস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্ ১০।১৬।৪)। অগ্নিচেতনা বিস্ফারিত হয় আদিত্যচেতনায়। তার পরের অবস্থা জলে জল মিশে যাবার মত (ক. ২।১।১৫)।

[৬১১] 'অত্রৈব সমবনীয়ন্তে'র পরে মাধ্যন্দিনে আছে 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'। উৎক্রান্তির কথাও যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলেছেন (বৃ. ৪।৪।২)। বর্তমান অনুভবটি তাঁর মহাভূতবাদের অনুগত (বৃ. ২।৪।১০; দ্র. টী. ৫৮৬)।

গিয়ে তাঁরা যা আলোচনা করলেন, তার সার হল কর্ম।[৬১২] আর্তভাগ চুপ হয়ে গেলেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে ভুজ্যু লাহ্যায়নি প্রশ্ন করলেন, 'অশ্বমেধযাজীরা কোথায় যায়?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'সূর্যের রথ একদিনে যতটুকু চলে, তার বত্রিশগুণ হল এই লোকের পরিমাণ। তার দ্বিগুণ পৃথিবীর পরিমাণ, তারও দ্বিগুণ সমুদ্রের।[৬১৩] এর ভিতর দিয়ে ক্ষুরের ধারা বা মাছির পাখার মত সূক্ষ্ম আকাশের পথ আছে।[৬১৪] ইন্দ্র সুপর্ণ হয়ে অশ্বমেধযাজীদের অর্পণ করেন বায়ুর কাছে। বায়ু তাদের নিজের মধ্যে নিহিত করে নিয়ে যান পূর্বতন অশ্বমেধযাজীরা যেখানে আছেন।'[৬১৫] সুতরাং বায়ুই ব্যষ্টি, বায়ুই সমষ্টি। এই জানলেই পুনর্মৃত্যুকে জয় করা যায়।'[৬১৬] প্রশ্নের উত্তর পেয়ে ভুজ্যু চুপ হয়ে গেলেন।

তারপর চতুর্থ ব্রাহ্মণ। উষস্ত চাক্রায়ণ প্রশ্ন করলেন, 'যে অপরোক্ষ ব্রহ্ম সর্বান্তর আত্মস্বরূপ, তাঁর স্বরূপ কি?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'যিনি প্রাণাদির প্রবর্তক, অথচ যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা শ্রবণের শ্রোতা মননের মন্তা বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা বলে বিশিষ্ট বোধের অতীত, তিনিই সর্বান্তর আত্মা।'[৬১৭] উষস্ত আর-কিছু বললেন না।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে কহোল কৌষীতকেয়রও একই প্রশ্ন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'তোমার মাঝে যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা শোক-মোহ জরা-মৃত্যুর অতীত, তিনিই সর্বান্তর আত্মা। এই আত্মাকে যাঁরা জানেন, তাঁরা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণাকে ছাপিয়ে উঠে ভিক্ষু হয়ে যান। তখন প্রথম তিনি লাভ করেন পাণ্ডিত্য, তারপর বাল্য।[৬১৮] তারপর হয়ে যান মুনি।[৬১৯] তারপর অমৌন মৌন দুই-ই ছাপিয়ে হন ব্রাহ্মণ। তখন যেভাবেই তিনি থাকুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই।'[৬২০] কহোল নিরস্ত হয়ে গেলেন।

---

[৬১২] মৃত্যুতে সর্বময় হয়ে যাওয়া : তু. ঋ. ১০।১৬।৩। কিন্তু তার পরেই বলা হচ্ছে, জীবের 'অজ ভাগ' যায় 'উলোকে' বা পরমব্যোমে। এটি ব্রহ্মীভাবের অনুগত। নির্জনে আলোচিত হল কর্মানুসারী গতির কথা। মনে হয়, আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে এইটিই শুনতে চেয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পরে জনককেও এই তত্ত্বটি শুনিয়েছিলেন (বৃ. ৪।৪।৫; তু. ছা. ৫।১০।৭, সেখানে প্রবাহণ এটিকে গুহ্যবিদ্যা বলে দাবি করছেন)।

[৬১৩] লোকসংস্থানের বিবরণটি ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। দ্র. শাঙ্করভাষ্য।

[৬১৪] তু. ক. ১।৩।১৪।

[৬১৫] অশ্বমেধযাজীর গতির জন্য দ্র. বৃ. ১।১-২; টী. ৫০৭। আদিত্যচেতনা বা সদ্‌ব্রহ্ম এবং মৃত্যুচেতনা বা অসদ্‌ব্রহ্ম দুইই তাঁদের অধিগত হয়। এই চেতনায় তাঁরা পৌঁছন বায়ুভূত হয়ে। বায়ু বিশ্বপ্রাণ। তিনি সূত্রাত্মা (বৃ. ৩।৭।১)।

[৬১৬] ব্রাহ্মণে উপনিষদে বারবার পুনর্মৃত্যুজয়ের কথা আছে। আমরা সাধারণত ভাবি পুনর্জন্ম-নিরোধের কথা। আপাতদৃষ্টিতে পুনর্মৃত্যু আর পুনর্জন্ম এক মনে হলেও দুয়ের মাঝে দৃগ্‌ভঙ্গির সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। মরতে হবে সবাইকেই। কিন্তু যোগীর মৃত্যু বৈবস্বত অর্থাৎ আলোঝলমল। এই মৃত্যু যাঁর হয়েছে, তাঁর আর তামস মৃত্যু হয় না। প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু (বৈদিক রূপক 'সূর্যের উদয়াস্ত') তখন তাঁরই মাঝে ঘটে। সুতরাং জন্মকে এড়াবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পুনর্জন্ম-নিরোধ প্রাথমিক সাধ্য হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মীভূত চেতনা বস্তুত পুনর্মৃত্যুজিৎ বা অ-মৃত, এবং এ-চেতনা সিদ্ধের। জন্ম (ভব) হেয়, দুঃখবাদী দর্শনের একথা সেখানে উঠছে না। জন্ম তখন দিব্য জন্ম (তু. ক. ২।৩।৪; গী. ৪।৫-৯)।

[৬১৭] তু. কে. ১।২...; বৃ. ৩।৭।২৩, ৮।১১, ৪।৪।১৮...।

[৬১৮] পাণ্ডিত্য বুদ্ধিজ, আর বাল্য বোধিজ। কৈশোরচেতনাকে আবার ফিরে পেতে হয় নচিকেতার মত।

[৬১৯] মুনি একা, নিঃসঙ্গ (< Gk. *monos* তু. এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি বৃ. ৪।৪।২২; ক. মুনের্বিজানত আত্মা ২।১।১৫।

[৬২০] এইটি অতিমুক্তি বা সহজস্থিতি (তু. বৃ. ৩।১।৩-৬)। ব্রাহ্মণ অন্তরে মুনি হয়েও বাইরে 'সর্বানুভূ' (বৃ. ২।৫।১৯)। যাজ্ঞবল্ক্যের উদারদৃষ্টিতে মুনি (=শ্রমণ) আর ব্রাহ্মণে বিরোধ নাই।

তারপর ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে গার্গী বাচক্নবী[৬২১] প্রশ্ন করলেন লোকসমূহের কার্যকারণ-পরম্পরার সম্পর্কে। শেষপর্যন্ত ব্রহ্মলোকে পেঁছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'এটা অতিপ্রশ্ন।'[৬২২] গার্গী আর-কিছু বললেন না।

সপ্তম ব্রাহ্মণে উদ্দালক আরুণি প্রশ্ন করলেন, 'ইহলোক পরলোক এবং সর্বভূত গাঁথা রয়েছে এক সূত্রে, এক অন্তর্যামীতে। সেই সূত্র এবং অন্তর্যামীকে আমি জানি। তুমি জান কি?' 'জানি।' 'জানি বলতে পারে সবাই। কি জান বল তো!'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'বায়ু হচ্ছেন সূত্র। তাঁতেই সব-কিছু গাঁথা রয়েছে।'[৬২৩] 'ঠিক। এখন অন্তর্যামীর কথা বল।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলে চললেন, 'অন্তর্যামী অমৃত হয়ে আছেন পৃথিবী অপ্ অগ্নি অন্তরিক্ষ বায়ু দ্যুলোক আদিত্য দিক্ চন্দ্র তারা আকাশ তমিস্রা আর তেজে, সর্বভূতে, প্রাণ বাক্ চক্ষু মন ত্বক্ বিজ্ঞান আর রেতে।[৬২৪] এদের অন্তরে তিনি আছেন, এরা তাঁর শরীর। এরা তাঁকে জানে না, কিন্তু অন্তরে থেকে এদের তিনিই নিয়মিত করে চলেছেন। তোমার আত্মাই এই অন্তর্যামী। অদৃষ্ট হয়েও তিনি দ্রষ্টা, অশ্রুত হয়েও শ্রোতা, অমত হয়েও মন্তা, অবিজ্ঞাত হয়েও বিজ্ঞাতা। তিনি ছাড়া দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা কেউ নাই।' উদ্দালক চুপ হয়ে গেলেন।[৬২৫]

তারপর অষ্টম ব্রাহ্মণ। গার্গী আবার এগিয়ে এসে ব্রাহ্মণদের বললেন, 'আমি এঁকে দুটি প্রশ্ন করব। ইনি যদি তার জবাব দিতে পারেন, তাহলে বুঝব ব্রহ্মবিচারে আপনারা কেউ এঁর সঙ্গে পেরে উঠবেন না।'

গার্গীর প্রথম প্রশ্ন, 'যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নীচে, যা দুয়ের মাঝে, যা হয়েছে, যা হচ্ছে, আর যা হবে, এসবই কিসে ওতপ্রোত?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আকাশে।'[৬২৬] গার্গী বললেন, 'ঠিক। কিন্তু আকাশ কিসে ওতপ্রোত?'

যাজ্ঞবল্ক্য যেন আবিষ্ট হয়ে বলে চললেন, 'ব্রহ্মজ্ঞেরা তাঁকে বলেন অক্ষর।[৬২৭] তাঁর আকার প্রকার বা বিশেষণ কিছুই নাই। তিনি কাউকে খান না, তাঁকেও কেউ খায় না। অথচ বিশ্বের যা-কিছু সব এই অক্ষরেরই প্রশাসনে বিধৃত হয়ে আছে। এই অক্ষরকে না জেনে হাজার বছর ধরে যাগ হোম বা তপস্যা করলেও তা নিষ্ফল। এঁকে না জেনে ইহলোক থেকে যে চলে যায়, সে কৃপণ; আর এঁকে জেনে যিনি যান, তিনিই

---

[৬২১] দ্র. ব্রাহ্মণের বিবৃতিতে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রসঙ্গ।

[৬২২] তু. তৈ. আনন্দমীমাংসা ২।৮; বৃ. ৪।৩।৩৩।

[৬২৩] দ্র. টী. ৫৬১; ছা. সংবর্গবিদ্যা ৪।৩।

[৬২৪] লক্ষণীয়, অন্তর্যামীর আধারের বিন্যাস লোক হতে ভূতের দিকে। তাঁর অনুভব ক্রমেই যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে।

[৬২৫] এই অন্তর্যামিবিজ্ঞানের সঙ্গে তু. উদ্দালকের দর্শন ছা. ৬।

[৬২৬] তু. ছা. আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা ৮।১৪।১। যাঁর মাঝে সব আছে, সংহিতায় তিনি বিশ্বকর্মা (ঋ. ১০।৮২।৬)। আকাশ বা পরম ব্যোম তাঁরই প্রতীক (তু. ঋ. ১।১৬৪।৩৯)।

[৬২৭] 'অক্ষর' সংজ্ঞাটি শ্লিষ্ট—যেমন বোঝায় পরব্রহ্মকে, তেমনি শব্দব্রহ্ম বা ওঙ্কারকেও। ঋক্-সংহিতায় অক্ষরের তিনটি অর্থ: অপরিণামী (১।১৬৪।৪২; ৩৯ পরমব্যোমের বিশেষণ; ৬।১৬।৩৫ পরমব্যোম উহ্য); বাক্ (কখনও ক্লীবলিঙ্গ ৩।৫৫।১, ১।১৬৪।২৪, ১০।১৩।৩; কখনও স্ত্রীলিঙ্গে 'অক্ষরা' ৭।১৫।৯, ৩৬।৭); ধেনু (৭।১।১৪, ১।৩৪।৪, ৩।৩১।৬; বাক্ আবার ধেনুরূপিণী)। সুতরাং অক্ষর নিত্যচেতন আকাশ আর তার নিত্যস্পন্দ ওঙ্কারকে বোঝাচ্ছে (তু. ক. ১।২।১৫-১৭)।

ব্রাহ্মণ। এই অক্ষর অদৃষ্ট হয়েও দ্রষ্টা, অশ্রুত হয়েও শ্রোতা, অমত হয়েও মন্তা, অবিজ্ঞাত হয়েও বিজ্ঞাতা। তিনি ছাড়া দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা কেউ নাই। গার্গী, আকাশ এই অক্ষরেই ওতপ্রোত।'

গার্গী বললেন, 'ঠিক। আপনারা কেউ ব্রহ্মবিচারে এঁর সঙ্গে পেরে উঠবেন না।'

গার্গীর এই রায়ের পর আর কারও কিছু বলবার ছিল না। তবুও বিদগ্ধ শাকল্য[৬২৮] বিচারটা শেষ হতে দিলেন না। তাই নিয়ে শুরু হল নবম ব্রাহ্মণ।

শাকল্যের প্রথম প্রশ্ন, 'দেবতা কয়জন?' যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম বললেন, তিনশ' তিন আর তিন হাজার তিনজন। তারপর সংখ্যাটিকে ক্রমে কমিয়ে এনে শেষে বললেন, 'দেবতা একজনই। তিনি প্রাণ বা ব্রহ্ম বা ত্যৎ।'[৬২৯]

শাকল্যের দ্বিতীয় প্রশ্ন পুরুষসম্পর্কে। তিনি নিজে অষ্টবিধ পুরুষের কথা জানেন, যাঁরা মনোজ্যোতি এবং সমস্ত আত্মার পরায়ণ। যথাক্রমে পৃথিবী কাম রূপ আকাশ তমঃ রূপ অপ্ এবং রেতঃ তাঁদের আয়তন অর্থাৎ আধার, অগ্নি হৃদয় চক্ষু শ্রোত্র হৃদয় চক্ষু হৃদয় এবং হৃদয় তাঁদের লোক অর্থাৎ উপলব্ধির ভূমি। যাজ্ঞবল্ক্য কি এই পুরুষদের জানেন কোথায়-কোথায় তাঁরা আছেন এবং তাঁদের দেবতাই বা কি-কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, এই পুরুষদের তিনি জানেন। যথাক্রমে তাঁরা আছেন শরীরে কামে আদিত্যে শ্রোত্রে ছায়াতে আদর্শে অপে এবং পুত্রে। তাঁদের দেবতারা হলেন অমৃত স্ত্রী সত্য দিক্ মৃত্যু অসু বরুণ এবং প্রজাপতি।[৬৩০]

শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে ঠকাতে পারলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য তখন বিদ্রূপ করে তাঁকে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণেরা তোমাকে কি অঙ্গরাবক্ষয়ণ[৬৩১] করেছেন নাকি?' শাকল্য চটে গিয়ে বললেন, 'কুরুপঞ্চালের ব্রাহ্মণদের যে ঠেস্ দিয়ে কথা বলছ, তুমি কীরকম ব্রহ্মকে জান?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আমি দেবতা ও প্রতিষ্ঠা সহ দিকের তত্ত্ব জানি।'[৬৩২]

তারপর শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে চললেন, 'পূর্বদিকে আমি আদিত্যের সঙ্গে এক। আদিত্যের প্রতিষ্ঠা চক্ষুতে, চক্ষুর প্রতিষ্ঠা রূপে এবং রূপের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে। এমনি করে দক্ষিণে আমি যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে সোম, ধ্রুবে অর্থাৎ ঊর্ধ্বে

---

[৬২৮] তু. শ. ব্রা. ১১।৬।৩।

[৬২৯] তু. বৃ. ৩।৯।৯ টী.। দেবতার সংখ্যাগুলি একটি ঊর্ধ্বত্রিকোণের আকারে বিন্যস্ত করা যায়—যার শীর্ষে ৩, আর অধোরেখা ৩০০৩। এতে দশমিক পদ্ধতিতে অঙ্কের স্থানীয় মানের উদ্দেশ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের বায়ুর প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট। তিনি শুক্লযজুর্বেদের প্রবর্তক, যজুর্বেদের অধিষ্ঠাতা বায়ু। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বায়ু প্রাণ। 'ত্যৎ' অনির্বচনীয় (তু. ঋ. ৫।৬২।১)।

[৬৩০] এখানে মাধ্যন্দিনশাখার সংজ্ঞায় এবং বিন্যাসে কিছু ভেদ আছে। মূলে দণ্ডচিহ্নটি 'স্যাৎ'-এর পরে না দিয়ে 'য়াজ্ঞবল্ক্য'র পরে দিলে সঙ্গতি থাকে। প্রসঙ্গটি বুঝতে হবে এইভাবে : পৃথিবীতে যে-পুরুষ, দেবতারূপে তিনি 'অমৃত'; এই শরীরে তাঁকে আমরা অনুভব করি 'অগ্নি' অর্থাৎ তাপ দিয়ে। তেমনি কামতত্ত্বে দেবতারূপে তিনি 'স্ত্রী' (মাধ্যন্দিন মতে 'মন'); আমাদের কামময় চেতনায় তাঁকে অনুভব করি হৃদয় দিয়ে ইত্যাদি। আদিত্য বিশ্বচেতনার প্রতীক, আদর্শ আত্মচেতনার (তু. ক. ২।৩।৫)। একই পুরুষ লোকে শরীর রিরংসা ও পুত্ররূপে; আর তাঁর অলৌকিক অনুভব হয় অপে আদিত্যে শ্রুতিতে আদর্শে এবং ছায়ায়। ছায়ায় অনুভব লোকোত্তর (তু. ক. ২।৩।৫)।

[৬৩১] শব্দটির আর প্রয়োগ নাই। শংকর অর্থ করেছেন 'চিমটা'।

[৬৩২] অর্থাৎ ব্রহ্ম দিকে-দিকে ছড়িয়ে আছেন, আবার গুটিয়ে এসেছেন হৃদয়ে, সেইখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা (তু. ছা. ৭।২৫।১, ৮।৩।৩; ঋ. ৬।১৯।৯, ১০।৪২।১১...)।

অগ্নি।[৬৩৩] অগ্নির প্রতিষ্ঠা বাকে, বাকের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে। হৃদয়ে সবার প্রতিষ্ঠা।'[৬৩৪]

শাকল্য প্রশ্ন করলেন, 'হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা কোথায়?' যাজ্ঞবল্ক্য তিরস্কার করে বললেন, 'বোকার মত কথা বলো না।'[৬৩৫] কিন্তু শাকল্য নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন করলেন, 'তবুও বল, তুমি আর আত্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'প্রাণে।' 'প্রাণ কোথায় প্রতিষ্ঠিত?' 'অপানে।' 'অপান?' 'ব্যানে।' 'ব্যান?' 'উদানে।' 'উদান?' 'সমানে।[৬৩৬] কিন্তু আত্মাকে জানতে হয় নেতি নেতি করে। তিনি অগৃহ্য অশীর্য অসঙ্গ অবন্ধন অরিষ্ট। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আটটি পুরুষের কথা সবিস্তারে বলেছি। এই পুরুষেরা যে-ঔপনিষদপুরুষ হতে বেরিয়ে আসেন এবং যাঁতে লয় হন, অথচ যিনি সব ছাপিয়ে আছেন, তাঁর কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। তাঁকে তুমি জান?'[৬৩৭]

শাকল্যের মাথা হেঁট হয়ে গেল।[৬৩৮] তখন যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করে বললেন, 'এইবার আপনারা যে খুশী আমায় প্রশ্ন করতে পারেন। না আমিই আপনাদের প্রশ্ন করব?'

ব্রাহ্মণেরা চুপ করে রইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'যেমন গাছ, তেমনি মানুষ। গাছ কেটে ফেললেও মূল থেকে নতুন করে গজায়। মানুষ মরলে পর আবার কোন্ মূল হতে জন্মায়? গাছ মরে আবার বীজ থেকে জন্মায়। মানুষ তো তেমনি করে বীজ রেখে মরে না। পিতৃরেতঃ মানুষের বীজ, একথা বলা চলে না। রেতঃ তো জীবন্ত দেহের।[৬৩৯] আসল মানুষটি জন্মেই রয়েছে, সে আর নতুন করে জন্মায় না।[৬৪০] যে আছেই, তাকে আবার জন্ম দেবে কে? এখানে থেকেই যিনি তৎস্বরূপকে জেনেছেন, বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ ব্রহ্মই তাঁর পরায়ণ বা পরম গতি,[৬৪১] দাতার যে-দান তাও ব্রহ্মই।'[৬৪২]

---

[৬৩৩] সংহিতার মিত্র ও বরুণ যথাক্রমে সূর্যের উদয় ও অস্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সোম উত্তরজ্যোতি বা অমৃতচেতনার দেবতা; বিপরীত কোটিতে যম বা মৃত্যু। তবে এই মৃত্যু বৈবস্বতও হতে পারেন।

[৬৩৪] তু. ছা. ৮।৩।৩; যোগের 'হার্দজ্যোতিঃ', উপনিষদের 'হার্দাকাশ', সংহিতার 'হৃদ্যসমুদ্র'। যাজ্ঞবল্ক্যের ঝোঁক হৃদয়ের দিকে (দ্র. বৃ. ৪।১।৭)। হৃদয় < হৃৎ (< √হৃ (দীপ্তি দেওয়া)। শ্রৎ > শ্রদ্ধা। দ্র. টী. ৩১০।

[৬৩৫] অর্থাৎ হৃদয়ই আত্মা।

[৬৩৬] অর্থাৎ প্রাণকে অপানের সহায়ে গুটিয়ে আনতে হবে দেহের গভীরে। সেখানে বায়ুর নিরোধ হলে তা ব্যানরূপে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত দেহে। তখন লঘুত্বের ফলে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি হবে। তারপর মূর্ধন্যলোক হতে সূক্ষ্ম হয়ে তা ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র।

[৬৩৭] বহুর মূলে জানতে হবে এককে (তু. ছা. ৩।১৮।২-৬, ৪।৫-৮, ৫।১৮।১, বৃ. ২।১।২০, ৪।১।৭, কৌ. ৪।১৮...)।

[৬৩৮] তারপর শাকল্যের দুর্দশার যে-বিবরণ, তা নিশ্চয়ই অনেক পরের ঘটনা, এখানে প্রসঙ্গক্রমে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

[৬৩৯] আর বীজ মরা গাছেরও হয়, সুতরাং রেতের সঙ্গে তার উপমা খাটে না।

[৬৪০] কেননা সে আত্মা অতএব ব্রহ্ম, সুতরাং বৃহতের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্ন বৃথা। ছান্দোগ্যে উদ্দালকের সৎসম্পত্তিবাদও এইধরনের। তু. যাজ্ঞবল্ক্যের মহাভূতবাদ (বৃ. ২।৪।১২)। সমুদ্রের বুদ্‌বুদ সমুদ্রে মিশে সমুদ্র হয়েই থাকে—এই হল সত্যকার অমৃতত্ব। ব্যষ্টির সত্তা তখন থাকে না, যেমন সুষুপ্তিতে থাকে না। এই থেকে বুদ্ধের অনাত্মবাদ এক ধাপ মাত্র।

[৬৪১] 'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম' = চিৎ আনন্দ সন্মাত্র (যিনি আছেনই) = বেদান্তের সচ্চিদানন্দ। তু. 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' তৈ. ২।১; দ্র. টী. ৩২১।

[৬৪২] এটি সংহিতার দানস্তুতির মত জনককে লক্ষ্য করে বলা।

এইখানে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ। দেখলাম, যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেই ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি কর্ম আর ব্রহ্ম দুয়েরই তত্ত্ব জানেন। দেববাদ এবং যজ্ঞবাদ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত এই : সব দেবতা পর্যবসিত হন এক দেবতাতে, সে দেবতা প্রাণ বা ব্রহ্ম বা ত্যৎ। দেবতার উদ্দেশে যে-যজ্ঞ, তাও মুক্তি এবং অতিমুক্তির সাধন হতে পারে যদি অধিযজ্ঞ দৃষ্টিকে রূপান্তরিত করা যায় অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। অশ্বমেধযাজীরা অন্তকালে বায়ুতে মিশে যান। বায়ুই বিশ্বের সূত্রাত্মা। ব্রহ্মবাদসম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত: ব্রহ্ম সর্বাতীত, নেতি-নেতি করে তাঁর স্বরূপ জানা যায়। অথচ তিনি সবার অন্তর্যামী, তিনিই সর্বান্তর আত্মা। লোকদৃষ্টিতে বলতে গেলে ব্রহ্মলোকই পরম, তার পরে আর-কিছুই নাই। আকাশই এই ব্রহ্মলোক। অক্ষর ব্রহ্ম তাতেই ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তাঁরই প্রশাসনে রয়েছে বিশ্বের সব-কিছু। তাঁকে পেতে হলে তিনটি এষণা ত্যাগ করে ভিক্ষু হতে হবে। পাওয়ারও চারটি ধাপ—পাণ্ডিত্য বাল্য মৌন এবং ব্রাহ্মণ্য। জীবের উৎক্রান্তিসম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত: মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। সে হল এইখানে সব-কিছুর সঙ্গে মিশে যাওয়া। যিনি সব-কিছু হয়েছেন, তাঁকে জেনে তার সঙ্গে যে এক হয়ে গেল, তার বেলায় জন্ম মৃত্যু উৎক্রান্তি পুনর্জন্ম ইত্যাদির প্রশ্ন অবান্তর।

তারপর ছয়টি ব্রাহ্মণে চতুর্থ অধ্যায়। প্রথম চারটি ব্রাহ্মণ জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, পঞ্চম ব্রাহ্মণটি যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদেরই রকমফের, শেষ ব্রাহ্মণটিতে বংশ।

প্রথম দুটি ব্রাহ্মণে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের একটি পর্ব। জনক বসে আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য এসে হাজির। জনক একটু কটাক্ষ করে বললেন, 'কি মনে করে? পশু না অণ্বন্ত?'[৬৪৩] যাজ্ঞবল্ক্য অম্লানবদনে বললেন, 'দুইই। তবে বাবা বলতেন, উপদেশ না দিয়ে কিছু নেবে না। আগে শুনতে চাই, তোমাকে কে কি বলেছেন।'

জনক ছয়জন আচার্যের[৬৪৪] উল্লেখ করে বললেন, তাঁরা যথাক্রমে জানিয়েছেন, বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং হৃদয়ই ব্রহ্ম।[৬৪৫] যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এসবই হল ব্রহ্মের একপাদ মাত্র।[৬৪৬] আচ্ছা, ব্রহ্মের আয়তন প্রতিষ্ঠা এবং স্বরূপের কথা তাঁরা বলেছেন কি এইসবের কথা বলতে গিয়ে?' 'না, আপনিই বলুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য তখন বুঝিয়ে দিলেন, 'বাক্ ইত্যাদি সবই ব্রহ্মের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় বা আলম্বন বটে, কিন্তু তাদের সবারই প্রতিষ্ঠা আকাশে। এই প্রতিষ্ঠাকে জানলে পর

---

[৬৪৩] অণ্বন্ত : 'অণু' সূক্ষ্মতত্ত্ব (তু. ক. অণুরেষ ধর্মঃ ১।১।২১; অণুমেতমাপ্য ১।২।১৩; মু. যদণুভ্যোঽণু ২।২।২; এষোঽণুরাত্মা ৩।১।৯; ছা. স য় এষোঽণিমা ৬।৮।৬...), 'অন্ত' শেষ, মীমাংসা (তু. বৃ. সর্বেভ্যোঽন্তেভ্যঃ ৪।৩।৩৩; অনুরূপ : বেদান্ত, সিদ্ধান্ত, কৃতান্ত [গী. ১৮।১৩], সুত্তন্ত [সূত্রান্ত])।

[৬৪৪] এঁদের মধ্যে আছেন আমাদের পূর্বপরিচিত সত্যকাম জাবাল আর বিদগ্ধ শাকল্য।

[৬৪৫] ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপার (তু. ছা. ৩।১৩) অতিরিক্ত আরেকটি পাচ্ছি 'হৃদয়' (দ্র. টী. ৩১০, ৬৩৪)। শ্রদ্ধাই তত্ত্বোপলব্ধির দ্বার, তার উৎপত্তি হৃদয়ের আকূতি হতে (দ্র. ঋ. শ্রদ্ধাসূক্ত ১০।১৫১, শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়াকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু [=জ্যোতিঃ] ৪; বৃ. ৩।৯।২১)। শব্দব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বার হল আদিতে বায়ু এবং অন্তে শ্রোত্র। আদিত্যপুরুষের উপলব্ধির দ্বার চক্ষু। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনিই প্রাণ (তু. ঋ. সূর্য 'আত্মা' জগতস্তস্থুষশ্চ ১।১১৫।১; প্র. প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ ১।৮...)। এর চাইতে উন্নততর সাধন হল মন মনীষা আর হৃদয় (ঋ. ১।৬১।২), অথবা মন বিজ্ঞান আর আনন্দ দ্র. তৈ. 'অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি,' তারপর বিজ্ঞান ও আনন্দের কথা ৩।১-৬)।

[৬৪৬] চাই চতুষ্পাৎ পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞান, দ্র. টী. ৬৩৭।

ঐসব আয়তনের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মের স্বরূপ যথাক্রমে প্রকাশ পায় প্রজ্ঞা[৬৪৭] প্রিয়তা সত্য অনন্ততা আনন্দ এবং স্থিতিরূপে।[৬৪৮] তুমি সমাহিতাত্মা, সবই জান, কেবল জান না এখান থেকে বিমুক্ত হলে পর কোথায় যাবে। আমি তা-ই তোমায় বলে দিচ্ছি।

'ডান চোখে যে-পুরুষ আছেন, তিনি ইন্ধ বা ইন্দ্র। আর বাঁ চোখে তাঁর পত্নী বিরাট্।[৬৪৯] দুটি এসে মিলেছেন হৃদয়ের মাঝে যে-আকাশ তার মাঝে।[৬৫০] এই হৃদয় হতেই অতিসূক্ষ্ম হিতানাড়ীরা[৬৫১] চলে গেছে উপরপানে। তার ভিতর দিয়ে যা বয়ে চলেছে তা হল আত্মার প্রবিবিক্ত আহার।[৬৫২] এই নাড়ী বেয়ে চেতনা ঊর্ধ্বস্রোতা হলে পর একসময় দেখতে পাবে তোমার প্রাণ দিকে-দিকে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।[৬৫৩] তখনকার অনুভব হল নেতি-নেতি। তখন আর কিছু থাকে না, থাকেন শুধু আত্মা—যিনি অগৃহ্য অশীর্য অসঙ্গ অসিত অরিষ্ট অভয়। সেই অভয়কে আজ তুমি পেলে।'

জনক কৃতার্থ হয়ে গেলেন। বললেন, 'যে-অভয়ের সন্ধান আমায় দিলেন, আপনিও যেন তাঁকে পান। আমার এই বিদেহরাজ্য আর আমি...।' আনন্দে জনকের বাগ্‌রোধ হয়ে গেল।

পরের দুটি ব্রাহ্মণে আরেকদিনের সংবাদ। জনক প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ জ্যোতি পুরুষের সাধন?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'প্রধানত আদিত্যের জ্যোতি। আদিত্য না থাকলে চাঁদের, চাঁদ না থাকলে আগুনের, আগুন না থাকলে বাকের। তাও না থাকলে আত্ম-জ্যোতিই পুরুষের সাধন।'[৬৫৪] 'আত্মা কোনটি?' 'প্রাণে এবং হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতি যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, তিনিই আত্মা। বাইরে তিনি যেন চলছেন, আবার অন্তরে যেন ধ্যানে ডুবে আছেন।

'তিনি শরীর নিয়ে জন্মান যখন, তখন পাপের সঙ্গে[৬৫৫] জড়িয়ে যান। আবার শরীর ছাপিয়ে উঠতে গিয়ে পাপকেও ছেড়ে যান।

'তাঁর দুটি মাত্র স্থান আছে—ইহলোক আর পরলোক।[৬৫৬] দুয়ের সন্ধিস্থানে স্বপ্নলোক। সেইখানে থেকে তিনি ইহলোক আর পরলোক দুইই দেখতে পান। যে-

---

[৬৪৭] প্রজ্ঞানের বিষয় তু. ছা. ৭।১।২, ২।১, ৭।৭।১; বৃ. ২।৪।১০, ৪।৫।১১; আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ঐ. ৩।২।

[৬৪৮] লক্ষণীয়, প্রাণের দ্বারা লাভ হয় প্রিয়তা, আর মনের দ্বারা আনন্দ (তু. তৈ. আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম 'প্রাণারামং মনআনন্দং' শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্ ১।৬)। এখানেও আমরা ব্রহ্মকে পাচ্ছি সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে; অধিকন্তু তিনি অনন্ত (তু. তৈ. ২।১) এবং হৃদয়ে তাঁর স্থিততা (তু. ছা. ৮।৩।৩)। পরবর্তী ব্রাহ্মণ দ্র.।

[৬৪৯] অক্ষিপুরুষ দ্র. ছা. ১।৭।৫, ৪।১৫।১, ৮।৭।৪; বৃ. ২।৩।৫, ৫।৫।২...। এখানে ইন্দ্র পরমপুরুষ, তাঁর পত্নী হলেন বিরাট্ বা বিশ্বভুবন (তু. ঋ. তস্মাদ্ বিরাল.জায়ত ১০।৯০।৫; ৬।৪৭।১৮)। সংহিতায় আছে; 'বিরাণ্ মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীঃ' ঋ. ১০।১৩০।৫।

[৬৫০] হার্দাকাশই সঙ্গমস্থান (তু. ঋ. ৪।৫৮।১১)। ধারণার জন্য হৃৎপিণ্ড।

[৬৫১] তু. বৃ. ২।১।১৯, ৪।৩।২০; কৌ. ৪।১৯।

[৬৫২] প্রবিবিক্ত তু. মা. ৪। এটি স্বপ্নচেতনার স্রোত। পরবর্তী ব্রাহ্মণ দ্র.।

[৬৫৩] আকাশের স্পন্দই প্রাণ; তার বিচ্ছুরণ দিকে-দিকে। তা-ই দিক্ আকাশের শক্তি। তু. শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্যের সহজস্থিতির বর্ণনা বৃ. ৩।৯।১৯-২৪।

[৬৫৪] ক্রমিক অন্তরাবৃত্তিতে অবশেষে আত্মচৈতন্যে পর্যবসান। তখন 'যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ' শ্বে. ৪।১৮।

[৬৫৫] পাপের দুটি লক্ষণ : অশনায়া বা বুভুক্ষা (তু. ঐ. ব্রা. ২।২), আর দ্বন্দ্ববোধ (ছা. ১।২)।

[৬৫৬] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জাগ্রৎ আর সুষুপ্তি।

ক্রম ধরে তিনি পরলোকের দিকে চলেন, তারই একজায়গায় থেকে তিনি একদিকে দেখেন পাপ, আরেকদিকে আনন্দ।[৬৫৭] তাঁর স্বপ্ন যখন প্রস্বপ্ন[৬৫৮] হয়, তখন সর্বময়[৬৫৯] এই লোকেরই একাংশ নিয়ে নিজেকে বিহত এবং নির্মিত করে ফুটে ওঠেন স্বয়ংজ্যোতি হয়ে।[৬৬০] তিনি তখন স্রষ্টা বা কর্তা।[৬৬১]

'আত্মা হিরণ্ময় পুরুষ, তিনি একহংস।[৬৬২] স্বপ্নে শরীরচেতনাকে তিনি অভিহত করে নিজে অসুপ্ত থেকে সুপ্তদের দেখে চলেন।[৬৬৩] তারপর শুক্রচেতনাকে নিয়ে আবার তিনি জাগ্রতে ফিরে আসেন। শরীরকে তখন তিনি বাঁচিয়ে রাখেন প্রাণ দিয়ে, আর তার বাইরে যেখানে খুশি চরে বেড়ান, ভয় বা আনন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হয়। তাঁর খেলাকেই লোকে অনুভব করে, তাঁকে নয় কিন্তু।

'কেউ-কেউ বলে, হিরণ্ময় পুরুষ জাগ্রতে যা দেখেন, তা-ই দেখেন স্বপ্নেও। কিন্তু তবুও তিনি তখন স্বয়ংজ্যোতিঃ।

'স্বপ্ন থেকে তিনি যান সুষুপ্তির সম্প্রসাদে।[৬৬৪] সেখানে খেলা করে ঘুরে-ফিরে পুণ্য আর পাপ[৬৬৫] দেখে আবার তিনি বিপরীতক্রমে ফিরে আসেন স্বপ্নে, সেখান থেকে তেমনি করে আবার জাগ্রতে, জাগ্রৎ থেকে আবার স্বপ্নে। কিন্তু সব অবস্থাতেই তিনি থাকেন অসঙ্গ দ্রষ্টা মাত্র।

'এমনি যাতায়াতের ফলে শ্রান্ত হয়ে অবশেষে তিনি চলেন চেতনার সেই ভূমির দিকে যেখানে সুপ্ত হয়ে তিনি আর-কোনও কামনাও করেন না, স্বপ্নও দেখেন না।

'স্বপ্নে আত্মা সূক্ষ্ম হিতা নাড়ীসকলের মাঝে বিচরণ করেন। তারা নীল পিঙ্গল লোহিত হরিৎ এবং শুক্ল রসে পূর্ণ।[৬৬৬] এ-অবস্থায় যে-দর্শন হয়, তার মূলে অবিদ্যা অথবা বিদ্যা থাকে। অবিদ্যাবশে তিনি অনুভব করেন জাগরণের ভয়কেই। কিন্তু বিদ্যার বশে তাঁর অনুভব হয়, আমি রাজা, আমি দেবতা, আমি এই সব-কিছু।[৬৬৭] এই শেষের অনুভবই হল আত্মচৈতন্যের পরম ভূমি।

'আত্মার অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা এই অভয় রূপটি কেমন? না প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা সম্পরিষ্বক্ত পুরুষ যেমন বাইরের বা ভিতরের কিছুই জানে না, তেমনি এই পুরুষও

---

[৬৫৭] চেতনার অন্তরাবৃত্তির পথে মাঝখানটায় স্বপ্নস্থান। জাগ্রতে দ্বন্দ্ববোধজনিত পাপ, আর সুষুপ্তিতে একরসপ্রত্যয়জনিত সম্প্রসাদ বা আনন্দ।

[৬৫৮] প্রস্বপ্ন প্রকৃষ্ট স্বপ্ন, বিজ্ঞানভূমির অনুভব। প্রাকৃত স্বপ্ন মনোভূমির। বিজ্ঞানভূমির পুরুষ 'স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ' (মা. ৪)। তাঁর স্বপ্নজ্ঞানকে আলম্বন করে যোগের সাধনা চলতে পারে (যো. সূ. ১।৩৮)।

[৬৫৯] মূলে 'সর্বাবৎ'; সংহিতায় এরই নাম 'সর্বতাতি' (দ্র. ৩।৫৪।১৯ টী.)।

[৬৬০] জাগ্রতের বিঘাতে স্বপ্নের বা বিজ্ঞানের নির্মাণ।

[৬৬১] স্বপ্নে জাগ্রতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান নিয়ে সৃষ্টি, আর প্রস্বপ্নে অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের উপাদান নিয়ে।

[৬৬২] একহংস তু. ঋ. ৪।৪০।৫ (ক. ২।২।২); শ্বে. ৬।১৫, ১।৬, ৩।১৮।

[৬৬৩] তু. ক. ২।২।৮।

[৬৬৪] তু. ছা. ৮।৩।৪, ১২।৩।

[৬৬৫] বিদ্যায় পুণ্য, অবিদ্যায় পাপ; তু. খণ্ড ২০।

[৬৬৬] রং দিয়ে চেতনার স্তর বোঝানো, তু. কৌ. ৪।১৮, টী. ৫৪।

[৬৬৭] তু. খণ্ড ১৫-১৭। সেখানে যে পাপ ও পুণ্যের কথা বলা হয়েছে, এখানে তার বিবৃতি। প্রাকৃতনিদ্রা আর যোগনিদ্রায় এই তফাত।

প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা সম্পরিষ্বক্ত হয়ে বাইরের বা ভিতরের কিছুই জানতে পারেন না।[৬৬৮] এই তাঁর আপ্তকাম আত্মকাম অকাম অশোক রূপ।

'এখানে এলে পার্থিব সকল পরিচয়[৬৬৯] লুপ্ত হয়ে যায়। পুণ্য বা পাপও থাকে না,[৬৭০] হৃদয়ের কোনও শোকও নয়। দ্বিতীয় কিছুই নাই বলেই সেখানে দেখা শোনা বা বলার কিছুই থাকে না, অথচ দেখা শোনা বা বলা এসব থাকে—কেননা দ্রষ্টা ইত্যাদি থাকেনই।[৬৭১]

'শুদ্ধ সলিলের মত[৬৭২] এক অদ্বৈত দ্রষ্টাই তখন থাকেন। এই হল ব্রহ্মলোক। এই হল পরম আনন্দ। এই আনন্দই টুকরা-টুকরা হয়ে ছড়িয়ে আছে সকল বিশ্বে।[৬৭৩]

'যেমন জাগ্রত থেকে সুষুপ্তিতে, তেমনি আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অন্বারূঢ় (অধিষ্ঠিত) হয়ে চলেন জীবন থেকে মরণে—শব্দায়মান এবং ঊর্ধ্বোচ্ছ্বাসী হয়ে।[৬৭৪] পাকা ফল যেমন বোঁটা থেকে খসে পড়ে, তেমনি তিনি সমস্ত অঙ্গ হতে সম্প্রমুক্ত হয়ে বিপরীতক্রমে চলেন উৎসরূপী প্রাণের দিকে।[৬৭৫] "এই যে ব্রহ্ম আসছেন" এই বলে সমস্ত ভূতেরা তখন তাঁর অভ্যর্থনা করে।[৬৭৬]

'প্রয়াণকালে আত্মা যেন দুর্বল এবং সম্মূঢ় হয়ে পড়েন। তখন সমস্ত প্রাণ অন্তরাবৃত্ত হয়ে হৃদয়ে আসে। পুরুষ তাদের তেজকে আকর্ষণ করেন বলে হৃদয়ের অগ্রভাগ তখন প্রদ্যোতিত হয়ে ওঠে। তাঁর আর বাইরের চেতনা থাকে না। হৃদয়ের সেই প্রদ্যোতে আত্মা তখন চক্ষু মূর্ধা বা শরীরের অন্য-কোনও স্থান দিয়ে[৬৭৭] বেরিয়ে যান। আত্মা তখন সবিজ্ঞান হয়েই সবিজ্ঞান কোনও ভূমি আশ্রয় করেন—যেমন পিত্র্য গান্ধর্ব দৈব প্রাজাপত্য বা ব্রাহ্ম।[৬৭৮] তাঁর মর্ত্য শরীর মরে যায়, হয় কল্যাণতর রূপ। তাঁর বিদ্যা কর্ম এবং পূর্বপ্রজ্ঞা তাঁরই অনুগামী হয়।[৬৭৯]

'এই আত্মাই ব্রহ্ম। তিনি বিজ্ঞানময় মনোময় প্রাণময় ইন্দ্রিয়ময় ভূতময় কামময়

---

[৬৬৮] প্রাজ্ঞ আত্মা = পরমাত্মা। এই সামরস্যের অনুভব তন্ত্রে সুপরিচিত। কিন্তু এখানে বিপরীত-রতির আভাস আছে, তা-ও তন্ত্রসম্মত। তু. বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যদেবী বা 'প্রজ্ঞা' ও সিদ্ধাচার্য (চর্যাগীতি), সুফী ভাবনা।

[৬৬৯] মূলে শ্রমণের উল্লেখ লক্ষণীয় (তু. তৈ. আ. ২।৭।১)।

[৬৭০] 'ন পুণ্যং ন পাপম্' বোঝায় বিশুদ্ধ অদ্বয়স্থিতিকে (তু. কৌ. ৩।১; বৃ. ৪।৪।২২; তৈ. ২।৯)।

[৬৭১] অন্তরাবৃত্তিতে বিষয় ক্রমে বিষয়ীর সন্নিকৃষ্ট হয় এবং অবশেষে তার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তখন আত্মা দিয়ে আত্মাকে জানা এবং পাওয়া (তু. বৃ. ২।৪।৫)।

[৬৭২] তু. ক. ২।২।১৫।

[৬৭৩] তু. আনন্দমীমাংসা তৈ. ২।৮।

[৬৭৪] মূলে 'উৎসর্জন্', তু. তৈ. স. য়দন উৎসর্জতি অক্রন্দাদিত্যাহ ৫।২।২৩। এই শব্দ 'ব্রহ্মঘোষ'—হৃদয় থেকে মূর্ধার দিকে (তু. গী. ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ ৮।১৩; ১০, ১২)। ঊর্ধ্বোচ্ছ্বাস হয় প্রাণের উদানগতির ফলে।

[৬৭৫] অধিদৈবতদৃষ্টিতে প্রাণ বায়ু; তু. সংবর্গবিদ্যা ছা. ৪।৩।৪; কৌ. ৩।৩-৪।

[৬৭৬] তু. কৌ. অপ্সরাদের অভ্যর্থনা ১।৪। এইখানে তৃতীয় ব্রাহ্মণের শেষ।

[৬৭৭] তু. গী. ৮।১০, ১২, ১৩; এই তিনটি ঐ.তে 'আবসথ' (১।৩।১২)। অন্য-কোনও স্থান দিয়ে বেরিয়ে গেলে অধোগতি হয় (দ্র. ছা. ৮।৬।৪-৬)।

[৬৭৮] তু. ক. সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ২।৩।৪।

[৬৭৯] তু. ক. ২।২।৭; ঐ. আ. য়থাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ ২।৩।২। কল্যাণতর রূপ আশ্রয়ের পর পুরুষের অনুভবের বর্ণনা ঋ. ৯।১১৩।৭-১১।

অকামময় ক্রোধময় অক্রোধময় ধর্মময় অধর্মময়—এককথায় সর্বময়।[৬৮০] তিনি যথাকারী যথাচারী। বস্তুত পুরুষ কামময়। যেমন তাঁর কামনা, তেমনি তাঁর ক্রতু বা সংকল্প, তেমনি আবার তাঁর কর্ম।

'তাই বলা হয়, পুরুষের মন যেখানে নিষক্ত, কর্মের ফলে তিনি সেইখানেই যান। কর্মের শেষে সেখান থেকে আবার তিনি এখানে আসেন নতুন কর্মের জন্য।

'যার কামনা আছে, এ হল তার গতি।[৬৮১] কিন্তু যিনি অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম এবং আত্মকাম, তাঁর প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না। তিনি ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মেই মিশে যান।[৬৮২] তিনি অমৃত হয়ে এইখানেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করেন। মৃত শরীরটাই এখানে পড়ে থাকে, কিন্তু অশরীর হয়ে তিনি হন অমৃত প্রাণ, হন ব্রহ্ম, হন তেজ।

'তিনিই বলতে পারেন, অণুপ্রমাণ অথচ বিতত[৬৮৩] পথটি আমায় স্পর্শ করেছে। ধীর ব্রহ্মবিদেরা এই পথ ধরেই এখান থেকে বিমুক্ত হয়ে উজিয়ে চলেন স্বর্গের[৬৮৪] দিকে। কেউ-কেউ এই পথের নীল পিঙ্গল লোহিত হরিৎ ও শুক্লবর্ণের কথা বলেন।[৬৮৫]

'আত্মাকেই জানতে হবে। সংবৎসরের ঊর্ধ্বে তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি অমৃতায়ু।[৬৮৬] পাঁচটি পঞ্চজন[৬৮৭] এবং আকাশ তাঁতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র (অন্নের অন্ন),[৬৮৮] মনের মন। আকাশের ওপারে বিরজঃ

---

[৬৮০] ভাল-মন্দ সবই তিনি, এই ভাবটি সপ্তশতীতে সুপরিস্ফুট। Problem of Evilএর অন্য-কোনও সমাধান নাই। এইটিই আর্যভাবনার বৈশিষ্ট্য।

[৬৮১] তু. আর্তভাগের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের গোপন কথা : 'তৌ হ য়দূচতুঃ কর্ম হৈব তদূচতুঃ...' বৃ. ৩।২।১৩। সংহিতায় উৎক্রান্তির ছবিটাই স্পষ্ট (দ্র. ঋ. ৯।১১৩, ১০।১৪-১৮, ১০।১৩৫)। তাকে সোমযাগের ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। কিন্তু আবর্তনের বীজ সংহিতাতেই আছে 'দ্বে স্রুতী' মন্ত্রে (১০।৮৮।১৫; দ্র. টী. ২০৩)।

[৬৮২] তু. উদ্দালকের সৎসম্পত্তিবাদ, যাজ্ঞবল্ক্যের মহাভূতবাদ; সংহিতায় কুমার যামায়নের 'নিরয়ন' (ঋ. ১০।১৩৫।৬)।

[৬৮৩] চেতনার সমূহন এবং ব্যূহন যুগপৎ (তু. ঈ. ১৬), তাইতে বিন্দুর বিস্ফারণ। গতিপথ যেন এমনতর <, টর্চের আলো যেমন দেখায়।

[৬৮৪] স্বর্গ < সুবর্গ (< √বৃজ্ 'মোড় ফেরানো') এমনভাবে চেতনার মোড় ফেরানো যাতে তার বৃত্তিগুলি সুসংহত হয়। তার প্রতীক হল আদিত্যবিম্ব। নচিকেতা তা-ই চেয়েছিলেন 'স্বর্গ্য অগ্নি'র রহস্য (ক. ১।১।১৩) অর্থাৎ আত্মদীপ্তিকে আদিত্যদীপ্তিতে রূপান্তরিত করবার কৌশল। তার পরের কথা হল 'অপ-বর্গ', সব-কিছু হতে একেবারে চেতনার মোড় ফেরানো। তখন 'ন তত্র সূর্যো ভাতি' (ক. ২।২।১৫)। এই হল অসদ্‌বাদ। মুনিদের লক্ষ্য 'অপবর্গ'। সংজ্ঞাটি সংহিতায় নাই, কিন্তু যজুঃসংহিতায় 'স্বর্গ্য' সংজ্ঞাটি আছে (বা. ১১।২; কা. ১৫।৩৪; ঋ.তে পাই 'সুবৃক্তি'; শ্বে.র পাঠ 'সুবর্গেয়' ২।২)।

[৬৮৫] পথটি নাড়ীপথ। রঙের বিন্যাস বোঝাচ্ছে কালো হতে আলোর দিকে যাওয়া। তু. বৃ. ৪।৩।২০; ছা. ৮।৬।১-২; কৌ. ৪।১৯।

[৬৮৬] 'সংবৎসর' দ্র. টী. ৪৯৬। সংবৎসর তাই প্রজাপতি (তু. প্র. ১।৯)। সংবৎসরে ঋতু-পরিবর্তন আছে অর্থাৎ প্রকৃতি-পরিণাম আছে। তার ঊর্ধ্বে যাওয়ার অর্থ কালজিৎ অতএব অমৃতায়ু হওয়া।

[৬৮৭] ঋক্‌সংহিতায় পঞ্চজনের কথা অনেকজায়গায় আছে। এখানে আছে পাঁচটি পঞ্চজন। কেউ-কেউ বলেন, এ হল সাংখ্যের পঁচিশটি তত্ত্ব : পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন হতে পুরুষ পর্যন্ত পাঁচটি চিৎতত্ত্ব। প্রকৃতি পুরুষেরই আত্মপ্রকৃতি বলে চিন্ময়ী—এ-দৃষ্টি প্রাচীন। পুরুষ ব্যষ্টিচৈতন্য বা আত্মা, আকাশ সমষ্টিচৈতন্য বা পরমাত্মা। সুতরাং মোটের উপর ছাব্বিশটি তত্ত্ব। তু. শ্বে. ১।৫ : সেখানে স্রোত জ্ঞানেন্দ্রিয়, যোনি ভূতসূক্ষ্ম, প্রাণ কর্মেন্দ্রিয়, আবর্ত ভূত—এই ধরে ওখানকার এককেটি পর্বকে এখানকার পঞ্চজন বলা চলে কি?

[৬৮৮] 'অন্নের অন্ন' মাধ্যন্দিনে আছে। অন্ন অর্থাৎ জড়ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন হতে পারে, দেহ অন্নরসময় বলে (তু. তৈ. ৩।১, ২।২)।

মহান্ ধ্রুব তিনি। তিনি বিশ্বকৃৎ, সব লোক তাঁর, তিনিই সব লোক। তিনি ছাড়া এখানে আর-কিছুই নাই।

'তাঁকে জেনে প্রজ্ঞাবান্ হতে হবে, মিছামিছি শব্দের অনুধ্যান করে কোনও লাভ নাই। তাঁকে জানতে হবে এই দেহে থেকেই, নইলে পরে মহতী বিনষ্টি।[৬৮৯] যে তাঁকে জানে না, সে মৃত্যুর পর অন্ধতমসে আবৃত অনন্দলোকে যায়।[৬৯০] অবিদ্যার উপাসনা করে যারা, তারা অন্ধতমসে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তার চাইতেও তমসে প্রবেশ করে যারা কেবল বিদ্যায় রত থাকে।[৬৯১]

'আমি এই আত্মাই—এই বিজ্ঞান যাঁর হয়, তাঁর শরীরের জ্বালা থাকে না, কোনও জুগুপ্সাও[৬৯২] থাকে না।

'এই মহান্ অজ আত্মা প্রাণে বিজ্ঞানময়, অন্তর্হৃদয়ে তিনি আকাশ। তিনি সবার ঈশান, সবার মাঝে অনুস্যূত সেতু তিনি। পুণ্যে তিনি বড় হন না, পাপেও ছোট হন না। যজ্ঞ দান তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণেরা তাঁকেই জানতে চান, প্রব্রাজী প্রব্রজিত হন তাঁরই জন্য—এষণাত্রয় বর্জন করে হন ভিক্ষুক। তাঁকে পান যিনি, তিনি হন মুনি। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব তাঁকে অভিভূত করে না।

'আত্মাকে যিনি জানেন, তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে[৬৯৩] আত্মাতেই আত্মাকে দেখেন, আবার সব-কিছুকে দেখেন আত্মরূপে।[৬৯৪] তিনি তখন হন বিপাপ বিরজঃ অবিচিকিৎস ব্রাহ্মণ। এই তো ব্রহ্মলোক। সম্রাট্, এই লোকে তোমায় পৌঁছিয়ে দিলাম!'

জনক আবেগভরে বলে উঠলেন, 'ভগবান, এই বিদেহরাজ্য আপনাকে দিলাম, দিলাম নিজেকেও। আমি আপনার দাস।'

চতুর্থ ব্রাহ্মণের এইখানেই শেষ। তারপর পঞ্চম ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদের পুনরাবৃত্তি।[৬৯৫] তারপর ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে বংশাখ্যান দিয়ে অধ্যায়ের শেষ, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডেরও শেষ।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের সার হল এই: বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন—সবই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। কিন্তু ব্রহ্মের প্রকৃষ্টতম প্রকাশ হৃদয়াকাশে। হৃদয়াকাশ হতে যে-নাড়ী ভ্রূমধ্যের ভিতর দিয়ে উপরপানে চলে গিয়েছে, সে-ই হল বিমুক্তির পথ।

---

[৬৮৯] তু. কে. ২।৫; শ. ব্রা. তদের সন্তঃ তদু তদ্ভরাম, ন চেদবেদী মহতী রিনষ্টিঃ ১৪।৭।২।১৫।

[৬৯০] তু. ঈ. ৩; ক. ১।১।৩। মাধ্যন্দিনে 'অসুর্য়াঃ লোকাঃ'। সোমলোক অমৃত জ্যোতি ও আনন্দের লোক (ঋ. ৯।১১৩।৯, ১১)। অনন্দলোক তাহলে তার বিপরীত।

[৬৯১] তু. ঈ. ৯-১৪। সেখানে সম্ভূতি-অসম্ভূতির কথা আছে। তাছাড়া আছে সহবেদনের কথাও। মনে হয়, ওখানে যেন এখানকারই ভাবের বিস্তার।

[৬৯২] তু. ঈ. ৬-৭। 'জুগুপ্সা' সংকোচ, যোগের ভাষায় চেতনার ক্লিষ্টতা।

[৬৯৩] এইগুলি পরে বেদান্তে সাধনসম্পদ হয়েছে।

[৬৯৪] তু. ঈ. ৬-৭।

[৬৯৫] তু. বৃ. ২।৪। মনে হয়, এটি পরবর্তী সংযোজন। এখানকার বিবরণটি একটু বিস্তৃত। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী আর কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা—এই মন্তব্যটি ওখানে নাই। ওখানকার 'উদ্য়াস্যন্' (২।৪।১) এখানে 'প্রব্রজিষ্যন্' (৪।৫।২)। 'আরও প্রিয়া হলে' (৪।৫।৫), খুশির এ-পরিচয়টি নতুন। ওখানে উপসংহার নাই, এখানে আছে 'য়াজ্ঞবল্ক্যো রিজহার' (৪।৫।১৫), মাধ্যন্দিনে 'প্রবব্রাজ'। প্রজ্ঞার কথা বেশ স্পষ্ট। উপদেশেও কিছু বিস্তার আছে।

পুরুষের ঊর্ধ্বগ চেতনা ঐ পথ দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে মহাপ্রাণে মিশে যায়। পুরুষের জাগ্রৎ-চেতনা বাইরের জ্যোতির অপেক্ষা রাখে, কিন্তু স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিতে তিনি স্বয়ংজ্যোতি। জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—চেতনা এই তিন ভূমিতেই সঞ্চরণ করে। তার ঊর্ধ্বে পুরুষের অলক্ষণ অতিস্থিতি। স্বপ্ন আর সুষুপ্তির শুদ্ধ রূপ আছে। একটিতে সর্বাত্মভাবের অনুভব হয়, আরেকটিতে হয় সম্পরিষ্বক্তের আনন্দের অনুভব। তখন দৃশ্য না থাকলেও দ্রষ্টা থাকেন। অন্তকালেও হৃদয়ের প্রদ্যোতিত ঐ নাড়ীপথ ধরেই পুরুষের উৎক্রান্তি হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী এখানেই ব্রহ্মীভূত হয়ে যান বলে তাঁর উৎক্রান্তি হয় না। ব্রহ্মকে জানতে হবে, নইলে মহতী বিনষ্টি। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, বিদ্যার অন্ধতর তমঃ যেন পুরুষকে গ্রাস না করে। শেষ কথা, আত্মাতেই সব, আত্মাই সব। এই অনুভবে পাপ-পুণ্যের কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না।[৬৯৬]

তারপরে দুটি অধ্যায় খিলকান্ড অর্থাৎ পরবর্তী সংযোজন। পঞ্চম অধ্যায়ে পনেরটি ব্রাহ্মণ। চতুর্দশ ব্রাহ্মণটি ছাড়া সবগুলিই ছোট-ছোট। যেন সূত্রাকারে একেকটি তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে।

প্রথম ব্রাহ্মণে পূর্ণতার উপনিষদ্।[৬৯৭] সবই পূর্ণ। তারপর বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম খম্ বা আকাশ। এই আকাশ বায়ুতে অর্থাৎ মহাপ্রাণে পূর্ণ। এই হল বেদ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতির অনুশাসন দেবতার প্রতি—'দান্ত হও'; মানুষের প্রতি—'দান কর'; অসুরের প্রতি—'দয়া কর'।[৬৯৮]

তৃতীয় ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে, হৃদয়ই ব্রহ্ম, সত্যই ব্রহ্ম।[৬৯৯]

চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে, সত্যই ব্রহ্ম, তিনিই প্রথমজ মহৎ যক্ষ।[৭০০]

পঞ্চম ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে, এই সত্য ব্রহ্ম অধিদৈবতদৃষ্টিতে আদিত্য, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অক্ষিপুরুষ। তাঁরা অন্যোন্যে প্রতিষ্ঠিত। যেমন আদিত্যে রশ্মি, তেমনি অক্ষিপুরুষে প্রাণ। দুয়েরই আয়তন হল ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়। একজন অহঃ, আরেকজন অহম্।[৭০১]

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে: পুরুষ মনোময়, ভাঃসত্য, আছেন হৃদয়ে সবার ঈশান হয়ে।[৭০২]

---

[৬৯৬] সবসুদ্ধ দেখতে গেলে যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শন একটি প্রাচীন ভাবনারই অনুবৃত্তি। তার উপর কিছু স্থানীয় প্রভাব পড়েছে। তাইতে নৈতিবাদ আর মহাভূতবাদের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু নৈতিবাদ তাঁর মাঝে কখনও উগ্র হয়ে ওঠেনি—বৌদ্ধদর্শনের মত। তাঁর দুটি বৈশিষ্ট্য: বিনাশ আর সম্ভূতিতে সমন্বয়সাধন, আর হৃদয়ের উপর জোর দেওয়া। তাঁরই উত্তরাধিকার নিয়ে বৌদ্ধদর্শন, একথা বেশ বোঝা যায়।

[৬৯৭] এইটি ঈ.র শান্তি। তু. অ. স. পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে, উতো তদদ্য বিদ্যাম য়তস্তৎ পরিষিচ্যতে ১০।৮।২৯।

[৬৯৮] দয়া দান দম—এগুলিও ধর্মস্কন্ধ। তু. ছা. যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ২।২৩।১; তপ দান আর্জব অহিংসা সত্যবচন ৩।১৭।৪; তৈ. ১।৯, ১১; পতঞ্জলির যম-নিয়ম। দেবতাদের যম সাধনা করতে বলার অর্থ 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' নিয়ে আসা। তু. ক. নচিকেতার দিব্যকাম প্রত্যাখ্যান ১।১।২৫-২৬।

[৬৯৯] তু. ছা. ৮।৩।৩; দ্র. টী. ৬৪৫।

[৭০০] ব্রহ্ম যক্ষ বা রহস্য; তু. কে. ৩ (ঋ. ৭।৬১।৫, 'য়ক্ষভৃৎ' ১।১৯০।৪, ৪।৩।১৩, ৫।৭০।৪)।

[৭০১] ওই অহঃ (আদিত্য) আর এই অহং এক (তু. ঈ. ১৬; তৈ. ২।৮)।

[৭০২] তু. ক. ২।১।১২-১৩; ছা. মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ ৩।১৪।২। মন আলো করে রয়েছেন তিনি। এই মন দিব্য। এটি সিদ্ধের সহজ অবস্থা।

সপ্তম ব্রাহ্মণে : বিদ্যুৎ ব্রহ্ম।[৭০৩] অষ্টম ব্রাহ্মণে : বাক্ ধেনু, প্রাণ তাঁর বৃষ, মন বৎস।[৭০৪] নবম ব্রাহ্মণে অগ্নির উপদেশ, তিনি পুরুষের মাঝেই আছেন।[৭০৫] দশম ব্রাহ্মণে উৎক্রান্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—ইহলোক হতে বায়ুতে, বায়ু হতে আদিত্যে, আদিত্য হতে চন্দ্রমায়, চন্দ্রমা হতে অশোকলোকে।[৭০৬]

একাদশ ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে, ব্যাধি মৃত্যু অন্ত্যেষ্টি সমস্তই বিদ্বানের পক্ষে তপস্যা।[৭০৭] দ্বাদশ ব্রাহ্মণে : অন্ন ও প্রাণ অন্যোন্যাপেক্ষ হয়ে ব্রহ্ম।[৭০৮] ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণে : প্রাণই ত্রয়ী, প্রাণই ক্ষত্র।[৭০৯]

চতুর্দশ ব্রাহ্মণে গায়ত্রীবিদ্যা। গায়ত্রীর[৭১০] তিনটি পদ যথাক্রমে ত্রিলোক ত্রিবিদ্যা এবং ত্রিপ্রাণ (প্রাণ অপান ও ব্যান)। তাঁর চতুর্থ পদ হলেন আদিত্য, যিনি দর্শত[৭১১] এবং পরোরজাঃ বা লোকোত্তর। এই তুরীয় পদই সত্য এবং প্রত্যক্ষগম্য। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা হল প্রাণ। আচার্য অন্তেবাসীকে সাবিত্রী গায়ত্রীরই উপদেশ দেবেন, সাবিত্রী অনুষ্টুভের নয়। এই গায়ত্রী একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী,[৭১২] আবার অপাৎ বা পদশূন্যা। অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ।[৭১৩]

পঞ্চদশ ব্রাহ্মণের চারটি মন্ত্র ঈশোপনিষদের শেষভাগে আছে।[৭১৪]

তারপর ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঁচটি ব্রাহ্মণ। প্রথম ব্রাহ্মণে প্রাণোপাসনা।[৭১৫] প্রাণ মুখ্য, তার বৃত্তি হল বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং রেতঃ।[৭১৬] এই জ্ঞানে প্রাণেরই উপাসনা করা

---

[৭০৩] তু. বৃ. ২।৩।৬; কে. ৪।৪। বিদ্যুৎ আচমকা প্রকাশ। তার একটি স্থান অন্তরিক্ষে, বৃত্র বা মেঘের সঙ্গে তখন ইন্দ্রের লড়াই চলছে আর আঁধার বিদীর্ণ হয়ে মাঝে-মাঝে ওপারের আলো দেখা দিচ্ছে। আরেকটি বিদ্যুৎ দ্যুলোকের ওপারে লোকোত্তরে, অগ্নি সূর্য চন্দ্রের ওপারে (ছা. ৪।৭।৩, ১৩।১...)। এই বিদ্যুতে অমানব পুরুষকে দেখা যায় (ছা. ৪।১৫।৫, ৫।১০।২; বৃ. ৬।২।১৫)। এ হল মহাশূন্যে ঝলকে-ঝলকে অব্যক্তের প্রকাশ (তু. ঋ. সা [বাং] চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্যং বিদ্যুদ্ ভরন্তী প্রতি বব্রিমৌহত ১।১৬৪।২৯)।

[৭০৪] ঋক্‌সংহিতায় দীর্ঘতমা বাক্‌কে বারবার ধেনুরূপে কল্পনা করেছেন (১।১৬৪; তু. ৮।১০১।১৫-১৬)। আবার ধেনু-বৃষও বিশ্বের আদিমিথুন (ঋ. ১০।৫।৭, ৩।৩৮।৭, ৪৬।৩, ৪।৩।১০...)। দীর্ঘতমার সূক্তে বৎসেরও অনেক উল্লেখ আছে। বৃষভ ধেনু বৎস = শিব শক্তি জীব।

[৭০৫] দ্র. বৈশ্বানরসূক্তের ভূমিকা ঋ. ৩।২।

[৭০৬] তু. ছা. ৪।১৫।৫, ৫।১০।২।

[৭০৭] তু. ছা. ৪।১৫।৫, বিদ্বানের দাহাদি হক বা না হক, তাঁর পরমলোকপ্রাপ্তি হয়।

[৭০৮] তু. কৌ. এতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ ৩।৯।

[৭০৯] মূলে 'উক্‌থ' = ঋক্। ত্রয়ী = ঋক্ যজুঃ সাম = ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এবং ক্ষত্রের সহচার নিবিদে আছে; তু. ক. ১।২।২৫। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শ্রদ্ধা এবং বীর্য (তপঃ)।

[৭১০] তু. ছা. ৩।১২।

[৭১১] অর্থাৎ সূক্ষ্ম অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা দৃশ্য এই হৃদয়ে।

[৭১২] তু. বাক্ : ঋ. ১।১৬৪।৪১, ৪৫।

[৭১৩] তু. ঋ. অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ ১০।১৩০।৪।

[৭১৪] ঈ. ১৫-১৮। সাধারণত উৎক্রান্তির মন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করা হয়; কিন্তু জীবন্মুক্তিপক্ষেও ব্যাখ্যা করা চলে। দ্র. টী. ৪৭৮।

[৭১৫] তু. ছা. ৫।১।১-৫; কৌ. ৩।৩; প্র. ২।৩।

[৭১৬] ছা.তে রেতের উল্লেখ নাই। প্রজনন প্রাণের ধর্ম : তু. বা. স. ৩১।১৯ (অ. স. ১০।৮।১৩; প্র. ২।৭)।

উচিত। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। প্রসঙ্গটি ছান্দোগ্যেও আছে।[৭১৭] তৃতীয় ব্রাহ্মণে শ্রীমন্থকর্ম। এটিও ছান্দোগ্যে আছে সংক্ষিপ্ত আকারে।[৭১৮]

তারপর চতুর্থ ব্রাহ্মণে পুত্রমন্থ[৭১৯] বা দাম্পত্যধর্ম-পালন ও সুপ্রজননবিদ্যা। দাম্পত্যধর্ম পালন করতে হবে অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়ে নয়, দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে।

তারপর পঞ্চম ব্রাহ্মণে বংশাখ্যান দিয়ে অধ্যায় এবং উপনিষদের সমাপ্তি।

দেখা যাচ্ছে, খিলকাণ্ডটিতে নানা প্রকীর্ণ বিষয়ের সঙ্কলন, প্রায়শই নতুন কোনও কথা এতে নাই।

তারপর অথর্ববেদের **প্রশ্ন, মুণ্ডক** এবং **মাণ্ডূক্য** উপনিষৎ।

প্রশ্নোপনিষৎটি অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। প্রবক্তা পিপ্পলাদ।[৭২০] ছ'জন ঋষির ছ'টি প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করে দিয়েছেন। উপনিষৎটি গদ্যে রচিত, মাঝে-মাঝে কিছু শ্লোকও আছে।

প্রথম প্রশ্ন, প্রজাসৃষ্টি কোথা হতে হল? পিপ্পলাদ বললেন, স্রষ্টা প্রজাপতি।[৭২১] প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় তপের দ্বারা[৭২২] তিনি প্রথম একটি মিথুন সৃষ্টি করলেন—প্রাণ এবং রয়ি।[৭২৩] এদের অধিজ্যোতিষ রূপ হল আদিত্য এবং চন্দ্রমা। আদিত্যের রশ্মিসমূহে নিহিত রয়েছে প্রাণ। দিকে-দিকে তা-ই প্রকাশিত হয়। আদিত্যই বৈশ্বানর বিশ্বরূপ প্রাণাগ্নি,[৭২৪] তাঁর উদয়ন প্রাণেরই উদয়ন।[৭২৫] এই প্রাণের মাঝে মূর্ত হওয়ার যে-সংবেগ, তা-ই রয়ি।[৭২৬] প্রাণ আর রয়ির মিথুনলীলাই সৃষ্টির মূলে।

সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয় কালে। কালের একটি পূর্ণ মান আমরা পাই সংবৎসরে। সংবৎসর প্রজাপতিরই রূপ। তার উত্তরায়ণ প্রাণ, দক্ষিণায়ন রয়ি। একটিতে প্রাণের উত্তরণ, আরেকটিতে অবতরণ। তাই একটিতে অনাবৃত্তি এবং নিরোধ, আরেকটিতে

---

[৭১৭] তু. ছা. ৫।৩-১০। বৃ.তে উদ্ধৃত ঋক্‌টি (১০।৮৮।১৫) ছা.তে নাই। বৃ. ৬।২।১৫-র 'মানস' পুরুষ ছা.তে 'অমানব' ৪।১৫।৫, ৫।১০।২।

[৭১৮] তু. ছা. ৫।২।৪-৮; কৌ. ২।৩।

[৭১৯] শ্রীমন্থ আর পুত্রমন্থ ছাড়া আছে ঊর্ধ্বমন্থ বা শ্রামণ্য। বিত্তৈষণা এবং পুত্রৈষণা তাতে ছাড়তে হয়, লোকৈষণাও (তু. বৃ. ৩।৫. ৪।৪।২২)।

[৭২০] নামটির মূলে ঋ. তয়োরন্যঃ স্বাদু পিপ্পলমত্তি ১।১৬৪।২০।

[৭২১] তু. ঋ. প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ১০।১২১।১০। সন্তান-জন্মের মূলেও তিনি : ঋ. ৮৫।৪৩, ১৮৪।১। তাঁর আদিসংজ্ঞা 'ত্বষ্টা বিশ্বরূপ' (ঋ. ৩।৫৫।১৯, ১।১৩।১০); বিশ্বকর্মা (ঋ. ১০।৮১, ৮২), পুরুষ (১০।৯০), হিরণ্যগর্ভ (১০।১২১)—এগুলি তাঁর দার্শনিক সংজ্ঞা।

[৭২২] তপের (radiation) ফলে সৃষ্টি : তু. ঋ. ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ১০।১৯০।১; তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ১২৯।৩।

[৭২৩] প্রাণের সংবেগে 'রয়ি' (দ্র. ঋ. ৩।১।১৯ টী.)।

[৭২৪] অগ্নি পরমরূপে বৈশ্বানর। ঋ. ১০।৮৮তে বৈশ্বানর আর সূর্যের একতার ইঙ্গিত আছে। এখানে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনিই প্রাণ।

[৭২৫] তু. ঋ. মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্ ১০।৮৮।৬।

[৭২৬] তাইতে তিনি বিশ্বরূপ হলেন : তু. ঋ. মহৎ তদ্ 'বৃষ্ণো অসুরস্য নাম' বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ৩।৩৮।৪।

আবর্তন এবং প্রজাসৃষ্টি। তপ ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা এবং বিদ্যা দিয়ে একটির সাধনা—এইটি দেবযান;[৭২৭] ইষ্টাপূর্ত দিয়ে আরেকটির সাধনা—এইটি পিতৃযাণ।[৭২৮]

সংবৎসরের দুটি অয়ন সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে মাসের দুটি পক্ষে। শুক্লপক্ষ প্রাণ, কৃষ্ণপক্ষ রয়ি।

দুটি পক্ষ সংক্ষিপ্ত হয় অহোরাত্রে। অহঃ প্রাণ, রাত্রি রয়ি। রয়িতে আছে মূর্তত্বের ভাবনা, সুতরাং রেতঃসংযোগদ্বারা যে-প্রজাসৃষ্টি, তার প্রশস্ত কাল হল রাত্রি। রেতঃ যে-অন্নের বিকার, তাও প্রজাপতি। সুতরাং রেতঃসংযোগের দ্বারা যাঁরা মিথুন উৎপাদন করেন, তাঁরা প্রজাপতিরই ব্রতের অনুসরণ করেন। এখানকার এই ব্রহ্মলোক তাঁদেরই, কেননা তাঁরা তপস্যা ব্রহ্মচর্য এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত।[৭২৯]

আর ঐ ব্রহ্মলোক তাঁদেরই, যাঁদের মাঝে নাই কৌটিল্য অনৃত বা মায়া।[৭৩০]

দ্বিতীয় প্রশ্ন : কয়জন দেবতা প্রজাকে ধরে আছেন? কাঁরা প্রজার কাছে এই জগৎকে প্রকাশ করছেন? তাঁদের মাঝে শ্রেষ্ঠই-বা কে? পিপ্পলাদ বললেন, আকাশই হলেন সেই দেবতা।[৭৩১] পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত আর বাক্ মন চক্ষু শ্রোত্র এই ইন্দ্রিয়েরা[৭৩২] দৃগ্-দৃশ্যভাবকে প্রকাশ করে বলল, আমরাই এই বাণকে[৭৩৩] ধরে আছি। প্রাণ বললেন, তা নয়, ধরে আছি আমিই। তারা তা বিশ্বাস করতে চাইল না। কিন্তু দেখা গেল, প্রাণের উৎক্রান্তিতে তাদের উৎক্রান্তি হয়, প্রাণের প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রতিষ্ঠা। তখন তারা প্রাণের স্তুতি করতে আরম্ভ করল।[৭৩৪]

প্রাণই প্রজাপতি। প্রাণ সর্বদেবময়, প্রাণেই সব-কিছু প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই ব্রাত্য, প্রাণই একর্ষি, প্রাণই অন্নাদ, প্রাণই মাতরিশ্বা। বাক্ চক্ষুঃ শ্রোত্র মনে প্রাণেরই তনু প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই প্রজ্ঞা এবং শ্রীর বিধাতা।[৭৩৫]

তৃতীয় প্রশ্ন : প্রাণ জন্মান কোথা হতে? কি করে শরীরে আসেন? তাঁর বিভাগ কি-কি? তাঁর উৎক্রান্তি হয় কি করে? বাহ্য এবং অধ্যাত্ম জগৎকে কি করে তিনি ধারণ করেন? পিপ্পলাদ বললেন, বলতে পার, আত্মা থেকেই প্রাণ জন্মান। পুরুষে

---

[৭২৭] মূলে আছে 'নিরোধ' বা অপুনরাবৃত্তি (তু. ছা. ৮।৬।৫, সেখানে 'বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্')। এইটি দেবযান। উদ্ধৃত মন্ত্রটি ঋ. ১।১৬৪।১২।

[৭২৮] কিন্তু ঋ.তে পাচ্ছি : সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্, হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ১০।১৪।৮। এখানে ইষ্টাপূর্তের সাধনাকে নিকৃষ্ট বলা হচ্ছে না। আসলে গতির ভেদ হয় বিদ্যায় আর অবিদ্যায় (তু. ঋ. ১০।৮৫।৩)। দ্র. টী. ২০৩।

[৭২৯] সুপ্রজননবিদ্যা বা পুত্রমন্থের জন্য দ্র. বৃ. ৬।৪; ঋ. গর্ভাধানমন্ত্র ১০।১৮৪; ১৮৩। আরও তু. কৌ. ১।২। গার্হস্থ্য নিন্দনীয় নয়। ব্রহ্ম এখানেও। ব্রহ্মচর্যের অর্থব্যাপ্তি লক্ষণীয়।

[৭৩০] এই ব্রহ্মলোক হতেই ঐ ব্রহ্মলোকে যাওয়া। দুয়ে বিরোধ নাই। 'মায়া' এখানে দার্শনিক সংজ্ঞা নয়।

[৭৩১] আকাশ একদিকে পরমদেবতা, আরেকদিকে ভূতাদি। তু. ছা. পুরুষ আকাশাত্মা ৩।১৪।২; 'আকাশো ব্রহ্ম' ৩।১৮।১; 'আকাশঃ পরায়ণম্' ১।৯।১...(তু. ঋ. অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ১।১৬৪।৩৯)।

[৭৩২] সবার অধিপতিরূপে 'প্রাণ'। ব্রহ্ম 'প্রাণশরীর...আকাশাত্মা' ছা. ৩।১৪।২।

[৭৩৩] বাণ শরীর। তু. অ. স. কো বাণং কো নৃতো দধৌ ১০।২।১৭; তার সঙ্গে তু. ঋ. ধমন্তো বাণম্ (বাঁশি ১।৮৫।১০)। শীর্ষন্য প্রাণের সাতটি ছিদ্র। তা-ই থেকে কি?

[৭৩৪] তু. অ. স. প্রাণস্তুতি ১১।৪।

[৭৩৫] আকাশ দিয়ে আরম্ভ, প্রাণ দিয়ে শেষ। আকাশ আর প্রাণ দুটি একটি মিথুন। তু. ব্র. সূ. আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ, অতএব প্রাণঃ ১।১।২২-২৩।

যেমন ছায়া, তেমনি আত্মাতে আতত এই প্রাণ।[৭৩৬] মনের কর্মে তিনি এই শরীরে আসেন।[৭৩৭] প্রাণ স্বয়ং থাকেন চক্ষু আর কর্ণে, পায়ু এবং উপস্থে থাকেন অপানরূপে, মধ্যদেশে সমানরূপে থেকে অন্নের সমনয়ন (assimilation) দ্বারা জ্বালিয়ে তোলেন চেতনার অগ্নিশিখা, হৃদয় হতে প্রসৃত সহস্র-সহস্র নাড়ীতে[৭৩৮] সঞ্চরণ করেন ব্যানরূপে, আর ঊর্ধ্বগামী একটি নাড়ীপথে[৭৩৯] উদানরূপে উৎক্রান্তির কারণ হন।

এই প্রাণই বাইরে আদিত্য, পৃথিবীতে অপান, অন্তরিক্ষে সমান, বায়ুরূপে ব্যান এবং তেজরূপে উদান।[৭৪০]

মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয় মিলে যায় মনে, মন প্রাণে। প্রাণ তেজোযুক্ত হয়ে আত্মার সঙ্গে সংকল্পিত লোকে জীবকে নিয়ে যান।[৭৪১]

চতুর্থ প্রশ্ন: এই পুরুষে কে ঘুমায়? কে জেগে থাকে? কে স্বপ্ন দেখে? কার সুখ হয়? কে সব-কিছুর প্রতিষ্ঠা? পিপ্পলাদ বললেন, ঘুমের সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়[৭৪২] মনোরূপী পরমদেবতায়[৭৪৩] একীভূত হয়। দেহপুরে তখন জেগে থাকে কেবল প্রাণাগ্নিরা। অগ্নিময় শরীরে তখন অপান গার্হপত্য, প্রাণ আহবনীয়, ব্যান অন্বাহার্যপচন। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সমনয়ন করে সমান, আর উদান এই প্রাণযজ্ঞের যজমান মনকে নিয়ে যায় ব্রহ্মে।[৭৪৪] এই ব্রহ্মে এসে মনোদেবতা স্বপ্নকালে আত্ম-মহিমাকে অনুভব করেন। এখানে যেমন জাগ্রতের জ্ঞানের অনুবৃত্তি চলতে পারে, তেমনি আবার অজ্ঞাতেরও জ্ঞান হয় এইখানেই। সব হয়ে এখানে তিনি সব দেখেন।[৭৪৫] তারপর পরমতেজে অভিভূত হয়ে মনোদেবতা আর স্বপ্নও দেখেন না। তখন এই শরীরে মহাসুখের অভিব্যক্তি হয়।[৭৪৬]

পঞ্চভূত ও তাদের বিকার,[৭৪৭] জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, তেজ, প্রাণ এবং তাদের বিষয়—সমস্তই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানাত্মা[৭৪৮] প্রতিষ্ঠিত অক্ষর পরমাত্মাতে।

---

[৭৩৬] তু. কৌ. স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ ৩।৯।

[৭৩৭] মূলে 'মনঃকৃতেন' শঙ্করের পাঠ। তু. বৃ. মনঃ অকুরুত ১।২।১ (=ঐক্ষত)।

[৭৩৮] তু. বৃ. ২।১।১৯, বাহাত্তর হাজারের কথা সেখানেও আছে।

[৭৩৯] তু. ছা. ৮।৬।৬।

[৭৪০] বিরাট্ পুরুষের কল্পনা।

[৭৪১] তু. ছা. ৬।৮।৬, ১৫।২।

[৭৪২] এখানে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় আর পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে প্রচলিত রীতি অনুসারে।

[৭৪৩] তু. বৃ. ৪।৪।২।

[৭৪৪] তু. ছা. ৮।৩।২; বৃ. ৪।৩।২১-২২; মা. ৫। পরের দুটি খণ্ডে ব্রহ্মলোকের কথা বিস্তৃত করে বলা হচ্ছে। উদান ঊর্ধ্বস্রোতা, মনশ্চেতনাকে তা-ই লোকোত্তরে নিয়ে যায়। নিদ্রায় মন যে স্বভাবত বৃত্তিশূন্যতার দিকে ঝোঁকে, উদানের সহায়ে তাকে উপর দিকে ঠেলে দেওবা যোগের একটা রহস্য (দ্র. যো. সূ. ১।৩৮)।

[৭৪৫] স্বপ্নে মহিমার দর্শন হয় যোগনিদ্রায় (তু. বৃ. য়ত্র দেব ইব রাজেব অহমেবেদং সর্বোঽস্মি ইতি মন্যতে ৪।৩।২০)। সব হয়ে সব দেখা তু. ছা. সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি ৭।২৬।২; বৃ. অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ ২।৫।১৯।

[৭৪৬] সুখ = সম্প্রসাদ, আনন্দ। যোগীর দেহ তখন আনন্দঘনবিগ্রহ (তু. বৃ. তদ য়থা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং বেদ কিঞ্চন...প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ; 'প্রাজ্ঞ আত্মা' মা.তে 'সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ' ৫)।

[৭৪৭] মূলে 'মাত্রা' = বিকার; তু. 'ভূতমাত্রা' 'প্রাণমাত্রা' 'প্রজ্ঞামাত্রা' কৌ., 'মাত্রাস্পর্শ' গী. ২।১৪।

[৭৪৮] তু. 'জ্ঞান আত্মনি' ক. ১।৩।১৩। তু. বৃ. ৪।৩।৭, ৪।২২।

এই অক্ষর অচ্ছায় অলোহিত শুভ্র[৭৪৯] অশরীর। তাঁকে যিনি পান, তিনি সব জানেন সব হন।

পঞ্চম প্রশ্ন: মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওঙ্কারের অভিধ্যানে কোন্ লোক জয় করা যায়? পিপ্পলাদ বললেন, ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা যথাক্রমে ঋক্ যজুঃ এবং সামের স্বরূপ-শক্তি।[৭৫০] ওঙ্কারের একটি মাত্রার অভিধ্যানের ফলে যে-সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তা মানুষকে জগতীর সঙ্গে এক করে দেয়। সে তখন মনুষ্যলোকে তপ ব্রহ্মচর্য এবং শ্রদ্ধার ফলে মহিমা অনুভব করে। দুটি মাত্রায় সে মনের সঙ্গে এক হয়ে যায়, আর অন্তরিক্ষস্থ সোমলোকে বিভূতি অনুভব করে আবার ফিরে আসে।[৭৫১] তিনটি মাত্রায় পরমপুরুষের অভিধ্যানে সে তেজঃস্বরূপ সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে উন্নীত হয় ব্রহ্মলোকে। এই ব্রহ্ম-লোক বা আদিত্যমণ্ডল জীবঘন।[৭৫২] তারও অতীত যে পুরিশয়[৭৫৩] পুরুষ, সে তখন তাঁকে দর্শন করে।[৭৫৪] ওঙ্কারের তিনটি মাত্রাই বিনাশী বটে, কিন্তু অন্যোন্যসম্বদ্ধ সমাহরণে (integration) তারা বাহ্য আভ্যন্তর এবং মধ্যম ক্রিয়ায়[৭৫৫] সম্যক্ প্রযুক্ত হলে বিজ্ঞানীকে অটল করে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন : ষোড়শকল পুরুষ[৭৫৬] কোথায় আছেন? পিপ্পলাদ বললেন, তিনি এই শরীরেই আছেন, প্রাণকে আশ্রয় করে। প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়, মন এবং অন্ন; আবার বীর্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম, লোক এবং নাম—এই ষোলটি তাঁর কলা।[৭৫৭] এই সমস্ত কলাই যখন তাঁতে অস্তমিত, তখন তিনি অকল।

---

[৭৪৯] অর্থাৎ তমঃ ও রজোগুণশূন্য শুদ্ধসত্ত্ব।

[৭৫০] তু. ছা. ত্রয়ীবিদ্যার সার ব্যাহৃতি, ব্যাহৃতির সার ওঙ্কার ২।২৩।২-৩।

[৭৫১] এই সোম আদিত্যের নীচে, তার পনের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। তা-ই মনশ্চেতনার প্রতীক (তু. ঋ. ১০।৯০।১৩)।

[৭৫২] জীবঘন = প্রাণঘন (যেমন 'বিজ্ঞানঘন' শ. ব্রা. ১৪।৫।৪।১২ = 'প্রজ্ঞানঘন' বৃ. ৪।৫।১৩)। সূর্য = প্রাণ (প্র. ১।৮; তু. ঋ. সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ১।১১৫।১; জীব অসুর্ন আগাৎ ১১৩।১৬)।

[৭৫৩] তু. বৃ. 'পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ' ২।৫।১৮ (তু. তৈ. ব্রা. হিরণ্ময়ঃ শকুনির্ব্রহ্ম নাম ৩।১২।৯।৭; বৃ. হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ৪।৩।১১, ১২; ঋ. হংসঃ শুচিষদ্ বসুঃ ৪।৪০।৫; তৈ. পুরুষের উপমা পাখির সঙ্গে ২।১-৬)। তিনি পরাৎপর হয়েও আবার এইখানে অন্তর্যামিরূপে।

[৭৫৪] এই দর্শন চতুর্থমাত্রার অভিধ্যানের ফল। মা.তে তার অনুভব 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'। অথচ তাঁরই আছে কল্যাণতম রূপ, যা হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে দেখা যায় (ঈ. ১৫, ১৬); হিরণ্ময় পুরুষরূপে তিনি আলো আর কালো দুইই (ছা. ১।৬।৬)। সংহিতায় তিনিই মিত্রাবরুণরূপী দেবতাদ্বন্দ্ব।

[৭৫৫] বাহ্যক্রিয়া জাগ্রতে, মধ্যমক্রিয়া স্বপ্নে, আর আভ্যন্তরক্রিয়া সুষুপ্তিতে (তু. মা. ৯-১২)। মন বিজ্ঞান এবং আনন্দ যথাক্রমে প্রয়োজক।

[৭৫৬] তু. ছা. ৬।৭।১; বৃ. ১।৫।১৪; মু. ৩।২।৭। অন্যত্রও নানাভাবে ষোলকলার কথা বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, সোমযাগে ঋত্বিক ষোলজন, ঋক্সংহিতায় পুরুষসূক্তে ষোলটি ঋক্, দুটি মীমাংসায় ষোল অধ্যায় ইত্যাদি।

[৭৫৭] প্রাণ থেকে অন্ন পর্যন্ত দশটি কলায় বিসৃষ্টি। প্রাণ নেমে এল পঞ্চভূতের ভিতর দিয়ে অন্ন বা জড়বিগ্রহ পর্যন্ত (তাতে পাই আটটি কলা বা অবরার্ধ), তাতে উন্মিষিত হল ইন্দ্রিয় এবং মন। তা-ই দিয়ে প্রাকৃত মানুষ পর্যন্ত সৃষ্টি হল। কিন্তু তার জন্মের মূলে রইল শ্রদ্ধা বা চিদাবেশ (দ্র. ছা. ৫।৪।২, বৃ. ৬।২।৯)। তারপর যথাসময়ে শুরু হল অতিসৃষ্টির কাজ। শ্রদ্ধা অঙ্কুরিত হল বীর্যে তপস্যায় মননে এবং কর্মে বা সাধনায়। ফলে লোকদ্বার অপাবৃত হল, সংহিতার ভাষায় 'অনিবাধ উরুলোকের' প্রাপ্তি হল। সবার শেষে ফুটল নাম বা ঋতম্ভরা বাক্, সংহিতায় যার নাম

তখন আর তাঁর মাঝে নাম-রূপ থাকে না।[৭৫৮] তাঁকে পেলেই মানুষ অমৃত হয়।

এইখানেই উপনিষদের শেষ। জীবজন্ম, প্রাণতত্ত্ব, সুষুপ্তিবিজ্ঞান, ওঙ্কারোপাসনা এবং ষোড়শকলপুরুষবিদ্যা এইগুলি হল তার প্রতিপাদ্য।

তারপর তিনটি মুণ্ডকে **মুণ্ডকোপনিষৎ**। প্রত্যেকটি মুণ্ডকে দুটি খণ্ড। প্রবক্তা অঙ্গিরস্, শ্রোতা শৌনক। উপক্রম এবং উপসংহারের সামান্য অংশ ছাড়া আগাগোড়া সবটাই পদ্যে রচিত।[৭৫৯]

শৌনকের প্রশ্ন ছিল, কি জানলে সব জানা হয়? অঙ্গিরা বললেন, বিদ্যা দুরকমের—পরা আর অপরা। বেদ-বেদাঙ্গ হল অপরা বিদ্যা। যে-বিদ্যা দিয়ে অক্ষরকে পাওয়া যায়, তা-ই পরা। অক্ষর অতীন্দ্রিয় অবর্ণ, অথচ সর্বগত এবং ভূতযোনি। অক্ষর হতেই বিশ্বের উৎপত্তি—যেমন মাকড়সা থেকে তার জাল, পৃথিবী থেকে ওষধি, পুরুষ থেকে কেশ-লোম।[৭৬০] অক্ষরব্রহ্ম জ্ঞানময় তপঃশক্তিতে উপচে ওঠেন, তা থেকে হয় অন্ন, তা থেকে প্রাণ মন সত্য লোক কর্ম এবং কর্মের ফলে অমৃত।[৭৬১] এই-যে নাম-রূপ, এও ব্রহ্ম।

অক্ষরব্রহ্মের পরিচয় দিয়ে অঙ্গিরা বললেন, ত্রয়ীতে যে কর্মের উপদেশ আছে তাও সত্য, তাও যথাযথভাবে সম্পাদন করা উচিত। করলে পর অগ্নির সপ্তজিহ্বায়[৭৬২] প্রদত্ত আহুতিরা সূর্যরশ্মি হয়ে যজমানকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়, যেখানে আছেন দেবতাদের পতি সেই এক।[৭৬৩] কিন্তু আঠার জনে মিলে [৭৬৪] যে-কর্ম করা হয় তা যদি অবর[৭৬৫] হয়,

---

'অপীচ্য' (গুহ্য ঋ. ১।৮৪।১৫), 'গুহা' (৯।৮৭।৩), অথচ 'চারু' (১।২৪।১, ২)। নাম ব্রহ্মেরই সংহত অভিব্যক্তি।

[৭৫৮] তু. ছা. ৬।৯, ১০...।

[৭৫৯] মুক্তিকোপনিষদের উপনিষৎ-তালিকায় নাম 'মুণ্ড'। মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীরও সংজ্ঞা মুণ্ড। সন্ন্যাসযোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (৩।২।৬), কর্মসম্বন্ধে বিরূপতার পরিচয়ও পাওয়া যায় (১।২।৭-১০; তু. অ. স. ব্রাত্যকাণ্ড ১৫)।

[৭৬০] শৌনকের প্রশ্ন : তু. ছা. ৬।১।৩-৬; অক্ষর হতে বিশ্বের সম্ভূতি (মু. ১।১।৭) : তু. অসৎ হতে সৎএর উৎপত্তি (ঋ. ১০।৭২।২, ৩; ১০।১২৯); আবার সৎ অসৎ দুইই পরমব্যোমে (১০।৫।৭)।

[৭৬১] 'তপসা' দ্র. টী. ৭২২। অন্ন হতে প্রাণ মন : তু. তৈ. ২।১-৩। এই হল প্রাকৃত চেতনার অবধি (তু. টী. ৭৫৭)। তারপর সত্য অবলম্বনে কর্ম এবং তার ফলে অমৃতত্বলাভ (তু. ঋ. ৮।৪৮।৩) এবং ঊর্ধ্বলোকে গতি (তু. ছা. ২।২৪)। সত্যের প্রশংসা মু. ৩।১।৫-৬ (তু. ঋ. ১০।৮৫।১)।

[৭৬২] তু. ঋ. সপ্তরশ্মিমগ্নিম্ ১।১৪৬।১; বহুয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ ৩।৬।২। সাতটি জিহ্বা পূর্বশ্লোকোক্ত সাতটি লোকের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম দুটি লোকে অন্ন এবং প্রাণ প্রধান বলে চেতনা আচ্ছন্ন। তারপর মন জাগল। আলো দেখা দিল চতুর্থ ভূমিতে। লাল আলো ক্রমে শুভ্র হয়ে সব-কিছুকে উদ্‌ভাস্বর করে তুলল (তু. বৃ. ২।৩।৬)। কালো—লাল—সাদাতে ভোরে আলো ফোটার ছবি, গুণের ঊর্ধ্বপরিণামেরও।

[৭৬৩] 'দেবানাং পতিরেকঃ' = আদিত্য। সংহিতায় 'মিত্র'; কিন্তু তারও পরে আছেন 'বরুণ'। তাই বলা হচ্ছে, কর্ম সত্যাশ্রিত হলেও তার ফলে যে-লোক লাভ হয়, তা পরম নয়। যেতে হবে সূর্যদ্বারকে ভেদ করে (মু. ১।২।১১)।

[৭৬৪] 'অষ্টাদশোক্তম্' অষ্টাদশভ্য উক্তং বিহিতম্। সোমযাগে ষোলজন ঋত্বিক আর যজমান এবং তাঁর পত্নী—এই নিয়ে আঠারজন। সোমযাগই কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। Limaye & Vadekar অনুমান করেন : মু. ১।১।৫ : Four Vedas × 3 (সংহিতা + ব্রাহ্মণ + সূত্র) = 12 + six Vedangas = 18? কিন্তু কল্পের মাঝেই সূত্র; আবার ব্রাহ্মণের মাঝে যে-উপনিষৎ তা তো বিশেষ করে কর্মপর নয়।

[৭৬৫] 'অবরং' জ্ঞানবর্জিতম্ (শঙ্কর); তু. গী. দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিয়োগাৎ ২।৪৯; ঋ. ১০।৮৫।৩। তাহলে আর কর্মের সঙ্গে বিদ্যার বিরোধ হয় না, দ্রব্যযজ্ঞকে রূপান্তরিত করা যায়

তাহলে তার অনুষ্ঠানে জরামৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। একেই যারা শ্রেয় মনে করে, তারা অবিদ্যাগ্রস্ত, রাগের বশে তারা পরমতত্ত্বকে জানতে পারে না। তাই ইষ্টা-পূর্তের বাইরে শ্রেয় কিছুই থাকতে পারে না মনে ক'রে কর্মের ফলে 'নাকে' গিয়েও তারা আবার এখানেই ফিরে আসে।[৭৬৬]

কিন্তু অরণ্যে যাঁরা শ্রদ্ধা ও তপের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভিক্ষুরা সূর্যদ্বারের ভিতর দিয়ে সেই অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষের কাছে চলে যান।[৭৬৭]

তাই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নির্বিণ্ণ পুরুষের সমিৎপাণি হয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাওয়া উচিত এবং গুরুরও উচিত উপযুক্ত জিজ্ঞাসুকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া।

এইখানে প্রথম মুণ্ডকের শেষ। দ্বিতীয় মুণ্ডকে অঙ্গিরা বলে চললেন, এই আরেক সত্য, শোন।[৭৬৮] আগুন থেকে আগুনের ফুলকি যেমন বেরিয়ে আসে হাজারে-হাজারে, তেমনি অক্ষর থেকে নানা ভাবের জন্ম হয়, আবার তাতেই তারা লয় পায়। সব-কিছুর অন্তরে-বাইরে আছেন এক শুভ্র অমূর্ত দিব্য পুরুষ, যাঁর প্রাণ নাই মন নাই, যিনি সর্বাতীত অক্ষরেরও পরে।[৭৬৯] তাঁথেকেই ভূত প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদির উৎপত্তি। তিনিই বিশ্বরূপ।[৭৭০] সর্বভূত সর্বদেবতা সর্বযজ্ঞ তাঁতেই। যে-সপ্তলোকে সপ্তগুণিত সপ্তপ্রাণ গুহাশয় হয়ে বিচরণ করছে, তারা তাঁহতেই উৎপন্ন। সেই পুরুষই সব-কিছু হয়েছেন।[৭৭১] কর্মও তিনি, তপও তিনি।[৭৭২] তিনি প্রতি জীবে গুহাহিত। তাঁকে জানলেই অবিদ্যাগ্রন্থি বিকীর্ণ হয়ে যায়।

তিনি আবিঃস্বরূপ।[৭৭৩] তিনি গুহাচর, তাই বড় কাছে।[৭৭৪] আবার তিনিই পরম-পদ। সৎও তিনি, অসৎও তিনি। তিনি অণু হতেও অণু, অথচ সর্বলোক তাঁতেই নিহিত। এই যে সত্য তিনি, অমৃত তিনি—তাঁকেই বিদ্ধ করতে হবে।[৭৭৫] তার জন্য উপনিষৎকে করতে হবে ধনু এবং উপাসনানিশিত তদ্‌গত চিত্তকে করতে হবে শর।[৭৭৬] অথবা প্রণব হবে ধনু, আত্মা শর। শরবৎ তন্ময় হয়ে অপ্রমত্ত আত্মা দিয়ে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে হবে।

জ্ঞানযজ্ঞে, যার কথা ব্রাহ্মণেও আছে।

[৭৬৬] এইখান থেকে কর্ম আর জ্ঞানে বিরোধের সূচনা। সংহিতায় কিন্তু 'নাক' সর্বোত্তম লোক (দ্র. ঋ. ৩।২।১২ টী.)। তু. ঋ. য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্, তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত য়ত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ১০।৯০।১৬। এই সাধ্যেরা দেবোত্তম (দ্র. ছা. ৩।১০।১)।

[৭৬৭] তু. ছা. ৫।১০।১-২; তৃতীয় ধর্মস্কন্ধ ২।২৩।১; বৃ. ৬।২।১৫। এখানে ভৈক্ষচর্যার সঙ্গে বিশেষ যোগ লক্ষণীয় (তু. বৃ. ৩।৫।১, ৪।৪।২২)।

[৭৬৮] কর্মের সত্যের পর জ্ঞানের সত্য।

[৭৬৯] 'অক্ষরাৎ পরতঃ' তু. সাংখ্যের অব্যক্ত। ক.র অব্যক্ত কিন্তু মহান্ আত্মার পর অব্যক্ত আত্মা (২।৩।৭-৮, ১।৩।১০-১১) = যাজ্ঞবল্ক্যের 'অক্ষর' (বৃ. ৩।৮।৮)।

[৭৭০] তু. ছা. ৫।১৮।২; পরবর্তী অংশের সঙ্গে তু. ঋ. ১০।৯০।

[৭৭১] তু. ঋ. ১০।৯০।২।

[৭৭২] কেননা দুইই সত্য। তু. ইষ্টাপূর্ত এবং শ্রদ্ধা-তপঃ।

[৭৭৩] তু. অ. স. আবিঃ সন্নিহিতং গুহা জরন্নাম মহৎ পদম্ ১০।৮।৬; কে. তস্যৈষ আদেশঃ, য়দেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ৪।৪।

[৭৭৪] তু. অ. স. অন্তি সন্তং ন জহাতি, অন্তি সন্তং ন পশ্যাতি ১০।৮।৩২।

[৭৭৫] মূলে 'বেদ্ধব্যম্' : তু. ঋ. কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ১০।১২১।১...।

[৭৭৬] মূলে 'সন্ধয়ীত' = সন্দধীত।

এই দিব্য ব্রহ্মপুরে এই হৃদয়ে যে-আকাশ,[৭৭৭] যেখানে রথনাভিতে চক্রশলাকার মত নাড়ীরা এসে সংহত হয়েছে,[৭৭৮] সেইখানে তিনি আছেন অন্নে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মনোময় প্রাণশরীরনেতা হয়ে। তাঁকে ওঙ্কাররূপে ধ্যান করতে হবে, দেখতে হবে তাঁর আনন্দ-রূপ, তাঁর অমৃত বিভা। তাঁকে দেখলে পর হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয়, সর্বকর্ম ক্ষীণ হয়। তিনি একাধারে পরাবর।[৭৭৯]

হিরন্ময় পরকোশে[৭৮০] তিনি বিরজ নিষ্কল ব্রহ্ম। সেখানে তিনি জ্যোতির জ্যোতি, অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য চন্দ্র তারার জ্যোতি সেখানে যায় না, এদের মাঝে তাঁরই অনুভা।[৭৮১]

সেখান থেকে ফিরে এসে দেখি, তিনি সামনে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি ঊর্ধ্বে অধে সর্বত্র প্রসারিত তিনিই এই বিশ্ব।[৭৮২]

দ্বিতীয় মুণ্ডকের এইখানে শেষ। তৃতীয় মুণ্ডকে অঙ্গিরা বলে চলেছেন : একই গাছে দুটি পাখি, একটি স্বাদু পিপ্পল খাচ্ছে, আরেকটি না খেয়ে চেয়ে দেখছে।[৭৮৩] ঈশনার অভাবে পুরুষ মুহ্যমান হয়ে শোক করে, কিন্তু আরেকজনের[৭৮৪] মহিমাকে দেখতে পেলেই সে অশোক হয়, আর নিরঞ্জন হয়ে পরমসাম্য লাভ করে। সেই প্রাণ-স্বরূপকে[৭৮৫] যিনি জানেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরিষ্ঠ, তিনি আত্মরতি আত্মক্রীড় এবং ক্রিয়াবান্।[৭৮৬]

এই আত্মস্বরূপকে পাওরা যায় সত্যের দ্বারা, তপস্যা ব্রহ্মচর্য এবং সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা। সত্যেরই জয় হয়, দেবযানের পথ সত্যে ছাওরা।[৭৮৭]

তিনি বৃহৎ, তিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, তিনি দূরে, তিনি কাছে। শুদ্ধ ধ্যানেই তাঁকে দেখা যায়, আর-কিছুতেই নয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হলেই আত্মা প্রকাশিত হন।[৭৮৮] আর তাঁকে পেলেই সব পাওরা যায়।[৭৮৯]

আবার এও সত্য, কামনা হতেই জন্ম হয়; সুতরাং তাঁকে পেয়ে যিনি আপ্তকাম হয়েছেন, তাঁর আর-কোনও কামনা থাকে না।

বলহীন এই আত্মাকে পায় না, প্রমাদ বা অলিঙ্গ তপেও তাঁকে পাওরা যায় না।[৭৯০]

---

[৭৭৭] তু. ছা. ৮।১।১।

[৭৭৮] তু. বৃ. ২।১।১৯, ৪।২।৩, ৩।২০; কৌ. ৪।১৯।

[৭৭৯] সমাহারে একবচন লক্ষণীয়।

[৭৮০] তু. ঈ. ১৫=বৃ. ৫।১৫।

[৭৮১] তু. ক. ২।২।১৫; শ্বে. ৬।১৪।

[৭৮২] তু. ছা. ৭।২৫।১, ২।

[৭৮৩] তু. ঋ. ১।১৬৪।২০; দ্র. টী. ৪৫০।

[৭৮৪] তু. ঋ. অন্যদন্তরম্ ১০।৮২।৭।

[৭৮৫] উপনিষদের প্রায় সর্বত্র প্রাণবাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। তু. শিবসূত্রবিমর্শিনীতে ক্ষেমরাজের মন্তব্য : 'শরীর-প্রাণ-বুদ্ধি-শূন্যানি লৌকিকচার্বাক-বৈদিক-য়োগাচার-মাধ্যমিকাভ্যুপগতানি...' (সূ. ১)।

[৭৮৬] যেমন শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও রাসচক্রে আত্মক্রীড়, কুরুক্ষেত্রে ক্রিয়াবান্।

[৭৮৭] 'দেবযান' দেবতারা যে-পথ ধরে নেমে আসেন; ঋষিরাও সেই পথ ধরে উঠে যান (দ্র. টী. ২০৩)।

[৭৮৮] তু. ছা. ৭।২৬।২।

[৭৮৯] তু. ছা. ৮।১।৬, ৭।১।

[৭৯০] 'লিঙ্গ' নিশ্চায়ক, 'অলিঙ্গ' তার বিপরীত। তামস তপ হল অলিঙ্গ তপঃ : তু. গী. 'মূঢ়-গ্রাহেণাত্মনো য়ৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ, পরস্যোৎসাদনার্থং রা তত্তামসমুদাহৃতম্ ১৭।১৯। এখানে প্রমাদ বা অলিঙ্গ তপ দুই আত্মলাভের বিরোধী বলা হচ্ছে। তু. ধর্মচক্রপ্রবর্তনের সময় বুদ্ধের

প্রশান্ত ও বীতরাগ হয়ে তাঁকে যাঁরা পান, সবরকমে তাঁকে পেয়ে তাঁরা সবার মাঝে আবিষ্ট হন।[৭৯১]

যাঁরা বিজ্ঞানী, সন্ন্যাসযোগের ফলে শুদ্ধসত্ত্ব যতি যাঁরা,[৭৯২] অন্তকালে তাঁরা ব্রহ্মের ভূমিসমূহেই ছড়িয়ে পড়েন।[৭৯৩] তাঁদের মনশ্চেতনার পনেরটি কলা প্রতিষ্ঠায় মিলিয়ে যায়,[৭৯৪] দেবতারা মিলিয়ে যান প্রতিদেবতায়,[৭৯৫] তাঁদের কর্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা পরম অব্যয়ে এক হয়ে যায়।[৭৯৬]

এমনি করে বিদ্বান্ পরাৎপর দিব্য পুরুষকে পান।[৭৯৭]

এই পরমব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন।[৭৯৮] তাঁর কুলে অব্রহ্মবিৎ কেউ হয় না।

এই ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদেরকেই দেবে, যাঁরা ক্রিয়াবান্ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধায় নিজে-নিজেই একর্ষিতে আহুতি দেন এবং বিধিমতে যাঁরা শিরোব্রতের আচরণ করেছেন।[৭৯৯]

এইখানেই উপনিষদের শেষ।

তারপর বারোটি মন্ত্রে **মাণ্ডূক্যোপনিষৎ**। প্রবক্তার নাম নাই। চরণব্যূহের মতে ঋগ্বেদের একজন শাখাপ্রবর্তক হচ্ছেন মাণ্ডূকায়ন। ঋগ্বেদের আরণ্যকগুলিতেও মাণ্ডূকেয়দের উল্লেখ আছে।[৮০০] উপনিষৎটির প্রতিপাদ্য হল চতুর্মাত্র ওঙ্কারের তত্ত্ব।

এই প্রসঙ্গে এই কয়টি সমীকরণ পাওয়া যাচ্ছে : ওঙ্কারই সব, ব্রহ্মই সব, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ওঙ্কার আত্মা।[৮০১]

আত্মা চতুষ্পাৎ—জাগ্রতে বহিঃপ্রজ্ঞ এবং স্থূলভুক্ বৈশ্বানর, অন্তঃপ্রজ্ঞ এবং প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস, সুষুপ্তিতে প্রজ্ঞানঘন এবং আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞ, তুরীয়ে অব্যবহার্য অব্যপদেশ্য—'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'।[৮০২]

উপদেশ : দুটি অন্তই পরিহার করতে হবে—কামবাসনা এবং আত্মপীড়ন; অবলম্বন করতে হবে মধ্যমপ্রতিপদ (মহাবগ্গো ১।১।৬)।

[৭৯১] সংহিতায় 'সর্বতাতি'-সবার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

[৭৯২] 'সন্ন্যাসে'র প্রথম উল্লেখ। কিন্তু ভিক্ষাচর্যের কথা বৃ.তে আছে। যতির অনুকূল উল্লেখ ঋ. ৮।৩।৯; প্রতিকূল উল্লেখ তৈ. স. ৬।২।৭।৫, তা. ব্রা. ৮।১।৪; কৌ. ৩।১ (দ্র. টী. ৪৮)।

[৭৯৩] 'ব্রহ্মলোকেষু' তু. ক. 'সর্গেষু লোকেষু' ২।৩।৪-৫; বৃ. ৪।৪।৪। এইটি দেবযানে শুক্লগতি, সংহিতায় দেব-পিতৃগণের 'স্রুতি' ১০।৮৮।১৫।

[৭৯৪] ধ্রুবা কলাই তাদের প্রতিষ্ঠা (বৃ. ১।৫।১৪)।

[৭৯৫] তু. বৃ. অগ্নিং বাগপ্যেতি...৩।২।১৩; ঋ. ১০।১৬।৩।

[৭৯৬] তু. ছা. ৬।১৫।২; বৃ. ৪।৪।২।

[৭৯৭] 'পরাৎ পরং পুরুষম্' তু. মু. ২।১।২।

[৭৯৮] বৈদিক সাযুজ্য : দুটি পাখি 'সযুজৌ' ঋ. ১।১৬৪।২০; ঐ পুরুষ আর এই পুরুষ এক ঈ. ১৬, তৈ. ২।৮...।

[৭৯৯] 'একর্ষি' দ্র. টী. ৪৭৪। 'শিরোব্রতম্' শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্ (শংকর) : তু. ঋ. ত্বামগ্নে পুষ্পরাদধ্যথর্বা নিরমন্থত মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ৬।১৬।১৩।

[৮০০] দ্র. ঐ. আ. ৩।১।১; শ. আ. ৭।২, ১১, ১২, ১৩...।

[৮০১] তিনটি সমীকরণের জন্য যথাক্রমে দ্র. ছা. ২।২৩।৩, ৩।১৪।১, বৃ. ২।৫।১৯।

[৮০২] তু. ছা. ৮।৭-১২; বৃ. ৪।৩।৯...। এখানে প্রাকৃত চৈতন্যের ভূমির কথা হচ্ছে না, হচ্ছে আত্মচৈতন্যের কথা। এই ভূমিগুলিকে যোগের আলম্বনরূপে গ্রহণ করা ঔপনিষদভাবনার একটি বিশিষ্ট কীর্তি। 'প্রবিবিক্তভুক্' দ্র. বৃ. ৪।২।৩; 'একোনবিংশতিমুখঃ' তু. প্র. ৪।৮।

যেমন আত্মা চতুষ্পাৎ, তেমনি ওঙ্কারও চতুর্মাত্র। অ উ ম এই তিনটি মাত্রা[৮০৩] আত্মার তিনটি পাদের অনুরূপ। চতুর্থ মাত্রাটি তেমনি অব্যবহার্য প্রপঞ্চোপশম শিব এবং অদ্বৈত।[৮০৪]

এইখানেই উপনিষৎটির শেষ।

এইসঙ্গে প্রাচীন বারখানি উপনিষদের পরিচয়ও শেষ হল। বাকী রইল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণভাগের সঙ্গে যুক্ত নারায়ণ আর মৈত্রায়ণী উপনিষৎ। দুটি উপনিষদই অর্বাচীন, তবে বৈদিকধারার সঙ্গে যুক্ত। সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিচ্ছি।

তৈত্তিরীয়ারণ্যকের দশম প্রপাঠকটি একটি খিলগ্রন্থ। এটি তৈত্তিরীয়োপনিষদের পরিশেষ। এইটিই **নারায়ণ** বা যাজ্ঞিকী উপনিষৎ নামে প্রচলিত। দ্রাবিড়ে তার অনুবাক-সংখ্যা ৬৪, কর্ণাটে ৭৪, অন্যত্র ৮০। সায়ণ ভাষ্য করেছেন দ্রাবিড়গ্রন্থের। তাঁর ভাষ্যের অনুযায়ী ৮০টি অনুবাকের ভাষ্যও পাওরা যায়।

প্রথম অনুবাকটি বিস্তৃত। তাতে প্রসিদ্ধ সাবিত্রী গায়ত্রীর অনুরূপ বারোটি গায়ত্রী-মন্ত্র পাওরা যায়। দেবতা যথাক্রমে রুদ্র, রুদ্র, গণপতি (দন্তি), নন্দি, কার্তিক (ষণ্মুখ), গরুড়, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, নরসিংহ, আদিত্য, অগ্নি এবং দুর্গা (দুর্গি)। লক্ষণীয়, তন্ত্রোক্ত পঞ্চদেবতার সবাইকে এখানে পাচ্ছি। দ্বিতীয় অনুবাকে একটি দুর্গামন্ত্রও আছে।[৮০৫] ত্রয়োদশ অনুবাকে হৃৎপদ্মে নারায়ণোপাসনার একটু বিস্তৃত বিবরণ আছে। উপনিষদের নামকরণ হয়েছে এই অনুবাক থেকেই, যদিও বিষয়বস্তুর দিক থেকে যাজ্ঞিকী নামটিই যুক্ততর। সপ্তদশ হতে একবিংশ পর্যন্ত পাঁচটি অনুবাকে পঞ্চবক্ত্র শিবের[৮০৬] পাঁচটি মন্ত্র আছে। পরের অনুবাকে তাঁকে বলা হয়েছে 'অম্বিকাপতি উমাপতি পশুপতি'। চতুস্ত্রিংশ থেকে ষট্‌ত্রিংশ অনুবাক পর্যন্ত গায়ত্রী উপাসনার প্রসঙ্গ। দ্বিষষ্টিতম অনুবাকে আছে: 'মন্যুরকার্ষীন্মন্যুঃ করোতি নাহং করোমি' ইত্যাদি। বৈদিক ধর্ম-বোধের স্বরূপনির্ণয়ে এই মন্ত্রটি সাহায্য করে। আমি পুরুষ আর মন্যু প্রকৃতি, মন্যুর অনুমন্তা হয়েও আমি তাথেকে আলাদা, অতএব স্বরূপত আমি অপাপবিদ্ধ—এই সাংখ্যভাবনা মন্ত্রটিতে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। অনুরূপ ভাবনা ঋক্‌সংহিতাতেও পাই।[৮০৭] সপ্তসপ্ততি হতে অশীতি অনুবাক পর্যন্ত সন্ন্যাসপ্রশস্তি। সন্ন্যাসকে বলা হয়েছে 'ন্যাস'। সত্য তপ দম শম দান ধর্ম প্রজনন অগ্ন্যুপাসনা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ মানস

---

[৮০৩] তু. ঐ. ব্রা. অকার উকারো মকার ইতি তানেকধা সমভরৎ, তদেতদোমিতি ৫।৩২।

[৮০৪] তু. গায়ত্রীবিজ্ঞান বৃ. ৫।১৪।৩-৭।

[৮০৫] দুর্গাগায়ত্রীটি এই : কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারি ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। দুর্গা-মন্ত্রটি : তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্, দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে। তার আগে একটি এবং পরে দুটি আগ্নেয়ী ঋক্ আছে। তাতে অগ্নিকে বলা হয়েছে 'দুর্গহা' এবং প্রার্থনা করা হয়েছে, তিনি যেন আমাদের 'দুর্গাণি' বা 'দুরিতানি'র ওপারে নিয়ে যান। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথঃ' কঠোপনিষদেও পাচ্ছি (১।৩।১৪)। দেবীর দুর্গানাম এবং অগ্নির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইঙ্গিত এইখানে পাওরা যায়। তিনি পর্বতবাসিনী বলেই কি দুরারোহা দুর্লভা অতএব দুর্গা? ঋ.তে বিষ্ণুকে বলা হচ্ছে 'মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ' (১।১৫৪।২)। দুর্গাও পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী। ভাবনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

[৮০৬] সদ্যোজাত বামদেব অঘোর তৎপুরুষ এবং ঈশান।

[৮০৭] তু. ঋ. ৭।৮৬।৬ (লক্ষণীয় 'অচিত্তি' এবং 'স্বপ্ন')।

উপাসনা সবই জ্ঞানের উৎকৃষ্ট সাধন, কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গেছে সন্ন্যাস। যিনি সন্ন্যাসী, তিনি যজ্ঞ না করেও যজ্ঞময়: তাঁর আত্মা যজমান, শ্রদ্ধা পত্নী, মরণ অবভৃথ।

তারপর সাতটি প্রপাঠকে **মৈত্রায়ণী** উপনিষৎ অথবা আরণ্যক। এটি কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণী সংহিতার পরিশিষ্ট। রাজা বৃহদ্রথ এবং মুনি শাকায়ন্যের সংবাদচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎটির বিষয়বস্তু। বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য কঠ প্রশ্ন শ্বেতাশ্বতর হতে অনেক উদ্ধরণ আছে। ভাষায় অর্বাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। ষষ্ঠ প্রপাঠকে সাবিত্রী গায়ত্রীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ঔপনিষদভাবনার প্রাচীন ধারার এইখানেই শেষ বলে ধরে নিতে পারি। নবীন ধারায় এই ভাবনার অনুবৃত্তি চলেছে ইতিহাস-পুরাণের আবহে, একথা আগেই বলেছি।

বেদাঙ্গ

১

বৈদিক ভাবনার তিনটি প্রস্থান—শ্রুতি স্মৃতি এবং ন্যায়। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক যে-বেদবিদ্যা, তার সংজ্ঞা হল শ্রুতি। শ্রুতির অধিকার বিস্তৃত উপনিষৎ পর্যন্ত।

বেদপন্থীরা বলেন, শ্রুতি অপৌরুষেয়। দিব্যবাকেরই শ্রুতি, কিন্তু বাক্ তো সবার কাছে ধরা দেন না। যাকে তিনি কামনা করেন, তাকেই তিনি সুমেধা ঋষি করেন, তারই কাছে তিনি তাঁর তনুখানি মেলে ধরেন। সুতরাং তাঁর শ্রুতি অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয়।[১]

শ্রুতির সাধন হল বোধি। বোধি আবেশের ফল।[২] আবেশ থাকে না, বিদ্যুতের মত দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়।[৩] কিন্তু চিত্তে তার স্মৃতি থাকে। এই স্মার্তজ্ঞান পৌরুষেয়। তা লোকব্যবহারের প্রবর্তক।[৪] প্রামাণ্যের দিক দিয়ে শ্রুতি বা অপরোক্ষ জ্ঞানের চাইতে খাটো হলেও এখনও তা তর্কাতীত।[৫] এখনও বোধিই মনের শাস্তা।[৬]

তারও এক ধাপ নীচে মনের ক্রিয়া। মনের মাঝে আছে 'বিচিকিৎসা' বা 'সংশয়'। তাকে আশ্রয় করে ভাবনার মাঝে জাগে তর্কবুদ্ধি বা ন্যায়, বৈদিকেরা যাকে বলতেন 'ওহ' বা 'মীমাংসা'। এতক্ষণ তত্ত্বসমীক্ষায় খণ্ডন-মণ্ডনের প্রয়াস ছিল না, এইবার তা দেখা দিল।

বেদ যদি অপৌরুষেয় শ্রুতি, তাহলে পৌরুষেয় স্মৃতি- ও ন্যায়-প্রস্থানের সবটাই বেদাঙ্গ—একথা মনে করা অসমীচীন নয়। তবুও অতি প্রাচীনকাল হতে শিক্ষা প্রভৃতি

---

[১] তু. ঋ. দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাঃ ৮।১০০।১১, বদন্তী অবিচেতনানি (যা বলেন তা রহস্যময় বলে বোঝা যায় না, তু. ১।১৬৪।৪৫); ১০।৭১।৪; ১২৫।৫।

[২] তু. ঋ. তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্ ১০।৭১।৩।

[৩] তু. কে. ৪।৪; ঋ. সা চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্যং বিদ্যুদ্ ভবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত ১০।১৬৪।২৯।

[৪] তু. তৈ. ১।১১।৩-৪ (ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ)।

[৫] √ স্মৃ (> √ মৃ 'ঝলমল করা' তু. 'মর্য়' 'মরুৎ') 'ঝলমলিয়ে ওঠা'; তু. ঋ. প্রতি স্মরেথাং তুজয়দ্‌ভিরেবৈঃ ৭।১০৪।৭।

[৬] তু. ঋ. বোধিন্মনস্ (অশ্বিদ্বয় ৫।৭৫।৫, ইন্দ্র ৮।৯৩।১৮); চিকিত্বিন্মনস্ (অগ্নি ৫।২২।৩)।

ছয়টি বিদ্যাই বিশেষ করে বেদাঙ্গ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। বেদবিদ্যার অনুশীলন হতেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি, সুতরাং তার মূল রয়েছে বেদের ব্রাহ্মণে। তাছাড়া ব্রাহ্মণের সুমিত গদ্যবাচনভঙ্গিই বেদাঙ্গের সূত্রের রচনারীতির প্রবর্তক, তা সহজেই বোঝা যায়। সূত্রসাহিত্য বৈদিকদের উদ্‌ভাবিত হলেও ক্রমে তার আদর্শ আর্য মনীষার নানাক্ষেত্রেই সংক্রামিত হয়েছে।

ছয়টি বেদাঙ্গের প্রাচীনতম সূচনা মেলে ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণে।[৭] মুণ্ডকোপনিষদে সর্বপ্রথম তাদের নামের উল্লেখ পাওরা যায়।[৮] আলোচনার সুবিধার জন্য মুণ্ডকের ক্রমকে অনুসরণ না করে নামগুলিকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি: শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং কল্প। এর মধ্যে প্রথম দুটি বেদাঙ্গ দেখা দিয়েছে স্বাধ্যায়ের প্রয়োজনে, দ্বিতীয় দুটি অর্থবিজ্ঞানের প্রয়োজনে এবং তৃতীয় দুটি কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে।[৯]

এইবার একটি-একটি করে এদের পরিচয় নেওরা যাক্‌।

২

বেদবিদ্যার অনুশীলনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বেদাধ্যয়ন। অধ্যয়নের বিশেষ বিধি ছিল। আচার্য পূব উত্তর বা অপরাজিতা দিকে মুখ করে বসলে শিষ্যেরা তাঁর কাছ থেকে শুনে বেদের শব্দরাশি গ্রহণ করতেন।[১০] এই ব্যাপারের নাম 'পারায়ণ' বা 'শিক্ষা'। যে-শাস্ত্রে এই শিক্ষার বিষয় আলোচিত হয়েছে, তাও **শিক্ষা**—যা স্বভাবতই বেদাঙ্গের আদি।[১১]

শিক্ষার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওরা যায় তৈত্তিরীয়োপনিষদে। সেখানে শিক্ষার বিষয়বস্তুর একটি তালিকা আছে। তার মধ্যে দেখা যায় সংহিতাকেই প্রাধান্য দেওরা হয়েছে।[১২]

---

[৭] 'চত্বারোঽস্যৈ (স্বাহায়ৈ) বেদাঃ শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি ৪।৭; তু. গৌতমধর্মসূত্র ৮।৫, আপস্তম্বধর্মসূত্র ১০।১০।২৮।২১, ২।৪।৮।১০।

[৮] ১।১।৫; তু. ছা. বেদানাং বেদম্‌ ৭।১।২।

[৯] তু. স্বাধ্যায় : ঋ. ১০।৯০।৯ (ঋক্‌ সাম যজুঃ, আবার ছন্দের উল্লেখ)। অর্থবিজ্ঞান : ঋ. ১।১৬৪।৩৯, ১০।৭১; নি. ১। ১৮-২০। কর্মানুষ্ঠান : ঋ. ১০।৯০ (বিশ্বযজ্ঞ) ১০।১৩০। ১, ২, ৬, ৭।

[১০] সমস্ত কর্মেই দিগ্‌বিজ্ঞান দরকার। পূবদিকে সূর্যোদয় হয়, উত্তরায়ণে সূর্যের আলো বেড়ে চলে। সুতরাং এই দুটি দিক প্রশস্ত। পূর্বোত্তর দিক্‌ 'অপরাজিতা'।

[১১] < √ শক্‌ + স (পা. ৭।৪।৫৪)। ধাতুটির ঋক্‌সংহিতায় যেসব প্রয়োগ আছে, তাহাতে এই অর্থ পাওরা যায় : সমর্থ হওরা, সামর্থ্য সঞ্চার করা। 'শিক্ষা'র ব্যুৎপত্তিতে এই শেষের অর্থটিই খাটে। বেদমন্ত্রের পারায়ণের সময় আচার্য অন্তেবাসীর মাঝে মন্ত্রের শক্তি সঞ্চারণ করে দিতেন। তা-ই হল 'শিক্ষা'। এই শিক্ষাই দীক্ষা। তু. ক. বেদসার ওঙ্কারে নচিকেতার দীক্ষা ১।২।১৫। শিক্ষার সাধারণ লক্ষণ : 'বর্ণস্বরাদ্যোচ্চারণপ্রকারো যত্রোপদিশ্যতে সা শিক্ষা' (সায়ণ ঋ. ভা. উপোদ্‌ঘাত পৃ. ২৫ তিলকমন্দির সং)।

[১২] দ্র. উপনিষৎপরিচয়ে তৈ. ১।১ ও টীকা। বাক্‌ সর্বশক্তিময়ী (তু. ঋ. রাষ্ট্রী দেবানাম্‌ ৮।১০০।১০, ইষমূর্জং দুহানা ১১; বাক্‌সূক্ত ১০।১২৫), সুতরাং মন্ত্রবর্ণের একটা নিজস্ব শক্তি আছে। তাই তার উচ্চারণবিশুদ্ধি প্রয়োজন (দ্র. সায়ণ ঋ. ভা. ঐ)। ঋক্‌সংহিতাতেও অধ্যয়ন-

সংহিতাপাঠকে ভেঙে পদপাঠ। সংহিতাপাঠে যা 'অব্যাকৃত', পদপাঠে তা 'ব্যাকৃত'। এইখানে শিক্ষার মাঝে ব্যাকরণের অনুপ্রবেশ ঘটে। সংহিতাপাঠের সঙ্গে পদপাঠের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে 'প্রাতিশাখ্য'-গ্রন্থের উদ্ভব। অনেকে এইগুলিকে আদিম শিক্ষাগ্রন্থ বলে মনে করেন।[১৩]

প্রত্যেক বেদেরই প্রাতিশাখ্য আছে। ঋগ্বেদের **শাকলপ্রাতিশাখ্যের** রচয়িতা শৌনক। সম্ভবত গোড়ায় এটি সূত্রগ্রন্থ ছিল, পরে তাকে ছন্দোরূপ দেওরা হয়েছে। সামবেদের প্রাতিশাখ্যগ্রন্থ হল **সামপ্রাতিশাখ্য, পুষ্পসূত্র, পঞ্চবিধসূত্র, ঋক্তন্ত্র-ব্যাকরণ**। কৃষ্ণযজুর্বেদের **তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যসূত্র**, আর শুক্লযজুর্বেদের কাত্যায়নরচিত **বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যসূত্র**। অথর্ববেদের দুটি প্রাতিশখ্য পাওয়া যায়—**অথর্ববেদপ্রাতিশাখ্যসূত্র** এবং **শৌনকীয়চতুরধ্যায়িকা**।

প্রাতিশাখ্যের পরেই ছন্দে রচিত অনেকগুলি শিক্ষাগ্রন্থ পাওরা যায়। তাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান: ঋগ্বেদের এবং যজুর্বেদের **পাণিনীয়শিক্ষা**,[১৪] সামবেদের **নারদশিক্ষা**, কৃষ্ণযজুর্বেদের **ব্যাসশিক্ষা**, শুক্লযজুর্বেদের **যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা**, অথর্ববেদের **মাণ্ডূকশিক্ষা**।

শিক্ষায় শব্দবিজ্ঞানের অনুশীলনে আর্যমনীষার অত্যুজ্জ্বল পরিচয় মেলে।

৩

শিক্ষার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত আরেকটি বেদাঙ্গ হল **ছন্দঃ**।[১৫] ঋক্সংহিতার এবং অথর্বসংহিতার প্রায় সব মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। গদ্যে রচিত যজুঃকেও ছন্দোবদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

ঋষিরা কবি, ছন্দ নিয়ে তাঁদের উল্লাসের যেন আর সীমা নাই। সংহিতায় ব্রাহ্মণে উপনিষদে নানা জায়গায় নানা ভাবে ছন্দের প্রসঙ্গ আছে।[১৬]

শাকলপ্রাতিশাখ্যের শেষে, সামবেদের নিদানসূত্রে, শাংখ্যায়নশ্রৌতসূত্রে এবং বিভিন্ন অনুক্রমণিকাতে বৈদিক ছন্দের বিবরণ আছে। তবে সাধারণত পিঙ্গলের **ছন্দঃসূত্রকেই**

প্রশংসা আছে ৯।৬৭।৩১-৩২। তু. ঐ. ব্রা. ন্যঙ্খবিধি ৫।৩; স্বর উষ্ম ও স্পর্শবর্ণের উচ্চারণবিধি ছা. ২।২২।৩-৫।

[১৩] প্রাতিশাখ্যের 'শাখা'য় সাধারণত বোঝায় প্রত্যেক বেদের বিভিন্ন শাখা। কেউ বলেন, চতুর্বেদে একই বেদের চারটি শাখা।

[১৪] ডঃ মনোমোহন ঘোষ মনে করেন, এই শিক্ষাটি প্রাতিশাখ্যেরও আগেকার (দ্র. *Pāṇinīya-śikṣā* Calcutta 1938)

[১৫] সাধারণ নির্বচন < √ ছদ্ 'আচ্ছাদন করা' : তু. তৈ. স. ৫।৬।৬।১; শ. ব্রা. ৮।৫।২।১; ছা. ১।৪।২; নি. ৭।১২। কিন্তু ঋ.তে 'আবির্ভূত হওরা' অর্থে ধাতুটি পাওরা যায় : ১।১৩২।৬, ১৬৩।৪, ১০।৩২।৩। কবিচিত্তে ছন্দ উদ্ভাসিত হয়, সুতরাং এই অর্থই ঠিক।

[১৬] দ্র. ঋ. ১।১৬৪।২৩, ১০।১৪।১৬, ১১৪।১, ১৩০।৪-৫ সাতটি প্রধান ছন্দ ('পঙ্ক্তি'র বদলে আছে 'বিরাট্') ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ...; অ. ৮।৯, ১০; শ. ব্রা. ৩।৯।৪।১০, ৮।১।১-২...। ছন্দের মাঝে গায়ত্রীর একটি বিশেষ স্থান আছে। তিনি দেবী, তিনিই গন্ধর্বলোক হতে সোম আহরণ করে আনেন। ছন্দোজ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দ্র. ছ. ব্রা. ৩।৭।৫।

বেদাঙ্গ বলে গণ্য করা হয়। তার প্রথম চার অধ্যায়ের কিছুদূর পর্যন্ত বৈদিক ছন্দের প্রসঙ্গ আছে, তারপরেই নানা লৌকিক ছন্দের বিবরণ।

৪

তারপর তৃতীয় বেদাঙ্গ **ব্যাকরণ**। তৈত্তিরীয়সংহিতায় আছে,[১৭] বাক্ ছিলেন অব্যাকৃতা, দেবতাদের অনুরোধে ইন্দ্র তাঁকে ব্যাকৃতা করলেন অর্থাৎ বাক্য পদ প্রকৃতি প্রত্যয় ইত্যাদিতে বিশ্লিষ্ট করলেন। সংহিতাপাঠকে পদপাঠে ভাঙ্তে গেলে এইটি করতে হয়। তাছাড়া বেদমন্ত্রকে যজ্ঞে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কোনও-কোনও পদের লিঙ্গ বিভক্তি প্রভৃতির বিপরিণাম ঘটাতে হয়। পদের স্বরূপটি না জানলে অর্থজ্ঞানও সুকর হয় না। অপভাষা বর্জন করে ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখাও প্রয়োজন। এইসমস্ত কারণে অতিপ্রাচীন কালেই ব্যাকরণের উদ্ভব হয়েছিল।

পতঞ্জলি মনে করেন, ঋক্সংহিতার 'চত্বারি শৃঙ্গাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটি[১৮] ব্যাকরণকে লক্ষ্য করছে। সে যা হ'ক, ব্যাকরণের অনেক পরিভাষা যেভাবে ব্রাহ্মণে উপনিষদে ও প্রাতিশাখ্যে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তাথেকে ব্যাকরণ অনুশীলনের যে একটি দীর্ঘ ধারা ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। শব্দবিজ্ঞান এবং অর্থবিজ্ঞান দুয়ের সঙ্গেই ব্যাকরণের সম্পর্ক, তাই তার স্থান শিক্ষা এবং নিরুক্ত—এই দুটি বেদাঙ্গের মাঝামাঝি।

ব্যাকরণের দীর্ঘবাহী আলোচনা অবশেষে পর্যবসিত হয়েছে পাণিনির বিখ্যাত **অষ্টাধ্যায়ীতে**। আটটি অধ্যায়ে এটি সূত্রাকারে বৈদিক এবং লৌকিক ভাষার বিবৃতি। যদিও অষ্টাধ্যায়ীকেই সাধারণত বেদাঙ্গ বলে গণ্য করা হয়, তবুও তাতে লৌকিক ভাষার পরিচয় কিন্তু বৈদিক ভাষাকে ছাপিয়ে উঠেছে। পাণিনি তাঁর সূত্রে চৌষট্টিজন পূর্বাচার্যের নাম করেছেন। তাতেই বোঝা যায়, ব্যাকরণের আলোচনা সেযুগে কতখানি ব্যাপক ছিল।

৫

তারপর চতুর্থ বেদাঙ্গ **নিরুক্ত**। সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'ভেঙে বলা'।[১৯] ব্যাকরণও পদকে ভাঙে, নিরুক্তও ভাঙে। কিন্তু দুয়ের তফাত আছে। ব্যাকরণ হল

---

[১৭] ৬।৪।৭।৩; দ্র. সায়ণ ঋ. ভা. ঐ ২৬।

[১৮] ৪।৫৮।৩।

[১৯] তু. শ. ব্রা. বাচা নিরুক্তং ক্রিয়তে ১।৪।৪।২। বেদবাণী গুহাহিত অতএব 'নিবচন' (তু. ঋ. ১।১৮৯।৮, ৫।৪৭।৫, ৯।৯৭।২, ১০।১১৩।১০; আচার্যমুখে তার প্রকাশ হল 'প্রবচন', যেমন শিক্ষায়; আর তার অর্থাবিষ্করণ হল 'নির্বচন' ও 'মীমাংসা'।

শব্দানুশাসন, আর নিরুক্ত হল অর্থানুশাসন।[২০] তবে শব্দ এবং অর্থ যখন পরস্পর সম্পৃক্ত, তখন ব্যাকরণের সঙ্গে নিরুক্তেরও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। পদকে ভাঙ্‌লে তবে তার অর্থ আবিষ্কার করা সহজ হয়। তাই নিরুক্তকে পদে-পদে ব্যাকরণের আশ্রয় নিতে হয়। তবুও পদের ব্যাকরণ বা বিশ্লেষণ একটা বহিরঙ্গ ব্যাপার, অর্থবোধ হল অন্তরঙ্গ ব্যাপার। তাই বেদার্থনিরূপণের বেলায় নিরুক্ত ব্যাকরণের সম্পূরক, তার অধিকারও বিস্তৃততর।[২১]

অন্যান্য বেদাঙ্গের মত নিরুক্তেরও উৎস হল ব্রাহ্মণ।[২২] বিভিন্ন ব্রাহ্মণে প্রায় ৬০০ শব্দের নির্বচন পাওয়া যায়।[২৩] ঋক্‌সংহিতাতেও কিছু-কিছু নির্বচনের দেখা মেলে।[২৪]

নিরুক্ত বস্তুত 'নিঘণ্টু'র ব্যাখ্যা। নিঘণ্টু হল বৈদিকশব্দসংগ্রহ। নৈরুক্তদের এমনতর একাধিক সংগ্রহ ছিল।[২৫] তার মধ্যে এখন একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই নিঘণ্টুর উপরেই যাস্কের রচিত ভাষ্যের নাম হল 'নিরুক্তম্'।[২৬]

নিঘণ্টুর তিনটি কাণ্ডে পাঁচটি অধ্যায়। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে 'নৈঘণ্টুক' কাণ্ড, তাতে একার্থবাচক পর্যায়শব্দের সংগ্রহ।[২৭] চতুর্থ অধ্যায় হল 'ঐকপদিক' বা 'নৈগম'

---

[২০] তু. নি. দুর্গ : তস্মাৎ স্বতন্ত্রমেবেদং বিদ্যাস্থানম্ অর্থনির্বচনম্, ব্যাকরণং তু লক্ষণপ্রধানম্ ১।১৫। প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখানো ব্যাকরণের কাজ; আর তার বিভিন্ন অর্থের অনুরোধে তাকে ভাঙা হল নিরুক্তের কাজ। এদেশের মরমীয়াদের মধ্যে এখনপর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মানুষ তাকেই বলি যার মান আছে আর হুঁশ আছে। লোকনিরুক্তি হলেও শব্দের অর্থবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি উপেক্ষণীয় নয়। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে বৈয়াকরণ এবং লৌকিক দুটি রীতিই ব্যবহার করেছেন। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে 'দেব' শব্দে শুধু 'দিব্' ধাতুই আছে; কিন্তু অর্থবৈচিত্র্যের দিকে তাকিয়ে যাস্ককে বলতে হল, 'দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা' (নি. ৭।১৫)। এই রীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই স্পষ্টভাষায় বললেন, 'তদ্ য়েষু পদেষু স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং তথা তানি নির্ব্রূয়াৎ; অথানন্বিতেঽর্থেঽপ্রাদেশিকে বিকারেঽর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত কেনচিদ্ বৃত্তিসামান্যেন; অবিদ্যমানে সামান্যেঽপ্যক্ষরবর্ণসামান্যান্নির্ব্রূয়াৎ; ন ত্বেব ন নির্ব্রূয়াৎ, ন সংস্কারমাদ্রিয়েত' (নি. ২।১।১-৪)। তাসত্ত্বেও যাস্কের নিরুক্তির প্রতি আধুনিক শব্দবিজ্ঞানীদের কটাক্ষ করা অন্যায়।

[২১] তু. নি. 'অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে, অর্থমপ্রতিয়তো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশঃ, তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকং চ' (১।১৫)। বৈদিক অনেক শব্দই পারিভাষিক—এখনকার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার মত। নিরুক্তির সাহায্যে তাদের ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করতে হয়। তাইতে বেদার্থ অবধারণের পক্ষে নিরুক্তের উপযোগিতা অসীম।

[২২] বিশেষ করে শতপথ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐ. আরণ্যক। যাস্ক নিজেই অনেকজায়গায় ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

[২৩] এই নির্বচন অনেকক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, মরমীয়াদের নির্বচনের মত। যাস্ক এই ধারাকে উপেক্ষা করেননি, যদিও স্ব-তন্ত্র আলোচনার দ্বারা নির্বচনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

[২৪] যেমন 'জাতবেদাঃ' ৭।১০।২; 'মায়া' ১।১৫৯।৪; 'মাতরিশ্বা' ৩।২৯।১১; 'পুরোহিত' ১।১৩১।১, ৩।২।৫, ৪।৫০।১, ৫।১৬।১, ৬।১৭।৮, ২৫।৭, ৮।১২।২, ১০।১৪০।৬...।

[২৫] তু. নি. 'তানপ্যেকে সমামনন্তি' ৭।১৩।৯, ১২।

[২৬] মনে হয়, নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত একজনেরই রচনা। দ্র. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য *Yaska's Nirukta* (1958) Sec. III.

[২৭] এই অংশটিই আসল 'নিঘণ্টু', সংজ্ঞাটি বাকী অংশে উপচরিত। নিঘণ্টুতে দেওয়া অর্থটি সামান্যবোধক। কিন্তু পর্যায়শব্দগুলি বিশিষ্ট অর্থের বোধক। সে-অর্থ নিরূপণ করতে হয় নির্বচন প্রকরণ প্রভৃতি দিয়ে। যেমন পৃথিবী যে-অর্থে 'অদিতি', সেই অর্থে 'নির্ঋতি' নয়, যে-অর্থে 'পৃষা', সেই অর্থে 'রিপঃ' নয়। দুটি অর্থ প্রত্যয়ের দুটি মেরুকে বোঝাচ্ছে।

কাণ্ড—তাতে একার্থক একেকটি শব্দের সংগ্রহ। পঞ্চম অধ্যায় 'দৈবত' কাণ্ড—তাতে বেদোক্ত দেবতাদের নামের সংগ্রহ।[২৮]

নিরুক্তের দুটি ষট্‌কে বারোটি অধ্যায়। প্রথম ষট্‌কে নিঘণ্টুর প্রথম দুটি কাণ্ডের এবং দ্বিতীয় ষট্‌কে দৈবতকাণ্ডের ব্যাখ্যা। প্রত্যেকটি ষট্‌কের গোড়ায় একটি করে বিস্তৃত উপোদ্‌ঘাত আছে, তাতে শব্দ অর্থ নির্বচন এবং দেবতা প্রসঙ্গে নানা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আছে। গার্গ্য ছাড়া সব নৈরুক্তের এবং বৈয়াকরণদের মধ্যে একমাত্র শাকটায়নের মত এই যে, সমস্ত 'নাম' বা সংজ্ঞাশব্দই 'আখ্যাত' বা ধাতু হতে ব্যুৎপন্ন। যাস্ক নিজে নৈরুক্ত হয়েও এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার পক্ষপাতী নন। এবিষয়ে তাঁর মতামত খুবই যুক্তিনিষ্ঠ।[২৯] 'মন্ত্রসমূহ অর্থহীন' কৌৎসের এই মতবাদকেও তিনি নানা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন।[৩০]

বৈদিক শব্দের নির্বচন উপলক্ষ্যে যাস্ক প্রায় ছয়শ' বেদমন্ত্র উদ্ধার করে সমগ্র মন্ত্রটিরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অতএব বেদের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে যাস্কই এখন প্রাচীনতম,[৩১] যদিও নৈরুক্তদের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ।[৩২] বেদব্যাখ্যার একটি ধারা যেমন ছিল নৈরুক্তদের, তেমনি আরেকটি ধারা ছিল ঐতিহাসিকদের। যাস্ক তাঁদেরও উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

দুই অধ্যায়ে নিরুক্তের একটি পরিশিষ্ট আছে, তা স্পষ্টতই পরবর্তী সংযোজন। তাতে বেদমন্ত্রের অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যার প্রয়াস আছে।[৩৪]

---

[২৮] আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ঐকপদিককাণ্ডের অধিকাংশ শব্দই বেদের অর্বাচীন ভাগ হতে নেওয়া। দেবতার নামকে বিশেষ করে নিঘণ্টুর অন্তর্ভুক্ত করাতে বৈদিক ভাবনায় দেববাদের প্রাধান্য সূচিত হচ্ছে, যেন বেদার্থের পর্যবসান দেবতাতেই। শব্দসংগ্রহে ঋক্‌সংহিতাই যাস্কের প্রধান অবলম্বন।

[২৯] দ্র. নি. ১।১২-২৪।

[৩০] দ্র. নি. ১।১৫-১৬; তু. পূ. মী. সূ. ১।২।৩১-৪৫ (আম্নায় ক্রিয়ার্থমাত্র ১।২।১)। কৌৎসবাদের যুক্তি এই : অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রের একটা নিজস্ব সামর্থ্য আছে, যা ফলপ্রসূ হতে অর্থের অপেক্ষা রাখে না। আদি বাক্ অনিরুক্তা, 'ৱদন্ত্যৱিচেতনানি' (ঋ. ৮।১০০।১০), তার অর্থ আবিষ্কার করতে হলে যেতে হবে সেই পরমব্যোমে যেখানে তিনি সহস্রাক্ষরা (ঋ. ১।১৬৪।৩৯, ৪১)। সে-অর্থ আকাশের ছন্দঃস্পন্দ। বৈখরী বাক্ দিয়ে তাকে অভিব্যক্ত করা যায় না। এইটিই যাগের 'অনিরুক্তস্ত্রয়োদশ স্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কারঃ' (ছা. ১।১৩।৩; টী. দ্র.)। আবার এইটিই সর্ববেদসার ওঙ্কার। তা-ই শব্দব্রহ্ম। অর্থ মনঃকল্পিত, তাকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ শব্দের অনুধ্যান করতে হবে। এইসব ভাবনা কৌৎসবাদের ভিত্তি, 'শিক্ষা'র সাধনারও। কিন্তু তু. ছা. 'তেনোভৌ কুরুতো য়শ্চৈতদেৱং ৱেদ য়শ্চ ন ৱেদ, নানা তু ৱিদ্যা চাৱিদ্যা চ, য়দেৱ ৱিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেৱ ৱীর্য়ৱত্তরং ভৱতি' (১।১।১০)।

[৩১] কিছু-কিছু মন্ত্রব্যাখ্যা ব্রাহ্মণেও আছে। কিন্তু প্রায়ই সে-ব্যাখ্যা ক্রিয়ানুসারী। যাস্কের ব্যাখ্যা স্ব-তন্ত্র, এইখানে তার উৎকর্ষ। তবে রহস্য বা উপনিষৎ তাঁরও ব্যাখ্যার লক্ষ্য নয়। পরবর্তী ভাষ্যকারদের আদর্শ হলেন যাস্ক।

[৩২] যাস্ক ১৪ জন পূর্বাচার্যের নাম করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ঔপমন্যব, ঔর্ণবাভ, কাথক্য, গার্গ্য এবং শাকপূণি।

[৩৩] দ্র. নি. ২।১৬, ১২।১, ১২।১০। নৈরুক্তদের মতে বেদের উপাখ্যানগুলি রূপক। অনেকজায়গায় যাস্কের ব্যাখ্যাও ঐতিহাসিক, যেমন ২।২৫-২৭, ৩-১৭, ৪।৬...(দ্র. *Yāska's Nirukta* Sec. IX).

[৩৪] নিরুক্তের একজায়গায় পরিব্রাজকদের ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে (২।৮)। মনে হয়, এ'দের ব্যাখ্যাও ছিল রাহস্যিক (দ্র. দুর্গটীকা)।

৬

পঞ্চম বেদাঙ্গ হল **জ্যোতিষ**। সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়নের মতে বৈদিকদের একমাত্র দেবতা হলেন সূর্য, অন্য দেবতারা তাঁরই বিভূতি।[৩৫] দেবতা সর্বব্যাপী হলেও বিশেষ করে তিনি দ্যুস্থান। আদিত্যজ্যোতি দেবতার প্রত্যক্ষ রূপ। এই আধারে যে-পুরুষ আর আদিত্যে যে-পুরুষ, দুইই এক। সবিতাই জীবের ধীবৃত্তির প্রচোদক। সূর্য-রশ্মিকে ধরেই তার ঊর্ধ্বগতি। বেদের এইসমস্ত ভাবনায় জ্যোতিরই প্রাধান্য।[৩৬]

যজ্ঞের অনুষ্ঠান মুখ্যত এই জ্যোতিকে লাভ করবার জন্য।[৩৭] যাঁরা অনুষ্ঠাতা, তাঁরা 'ঋত্বিক' কি না 'ঋতু-যাজী'।[৩৮] ঋতু হল কালের ছন্দ। এই ছন্দ সূচিত করে জ্যোতির উপচয়। তাই যজ্ঞের কাল প্রধানত নিরূপিত হয় দিবাভাগে শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণকে লক্ষ্য করে। অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতুপর্যায়, অয়ন, সংবৎসর—এগুলির পরিগণন তাই ঋত্বিকের পক্ষে অপরিহার্য।[৩৯] এই হতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের উদ্ভব।

সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে ঋষিদের জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণের নানা নিদর্শন পাওয়া যায়।[৪০] লগধের **বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে** তা শাস্ত্ররূপ গ্রহণ করে। যাজুষ এবং আর্চ ভেদে তার দুটি শাখা। একটি আথর্বণ জ্যোতিষও পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা তাকে পরবর্তী কালের রচনা মনে করেন।

৭

তারপর ষষ্ঠ বেদাঙ্গ **কল্প**। বেদের শুদ্ধ উচ্চারণ ও ছন্দোজ্ঞান আয়ত্ত হল, অর্থ-বোধ হল, দেবতাদের জানা গেল। এইবার জ্যোতির্বিদ্যার পর বেদোক্ত যজ্ঞের প্রয়োগ-বিজ্ঞান, আর সেই যজ্ঞভাবনার আদর্শে জীবন ও সমাজকে গড়ে তোলা। এইগুলি হল কল্পের অন্তর্ভুক্ত।[৪১]

---

[৩৫] দ্র. সর্বানুক্রমণী, পরিভাষাকাণ্ড ২।১৫-১৮। তু. ঋ. ১০।১৭০।৩।

[৩৬] তু. ঋ. একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে...সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ১০।১১৪।৪, ৫ (দ্র. ১।১৬৪।৪৬); অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ১।১৬৪।৩৯; য়োঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ঈ. ১৬ (তু. তৈ. ২।৮); ঋ. এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব ১০।১২০।৯; ৩।৬২।১০; ১।৫০।৩; অমী য়ে সপ্ত রশ্ময়স্তত্রা মে নাভিরাততা ১০৫।৯...।

[৩৭] তু. ঋ. উদ্ বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্, দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ১।৫০।১০; অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ৮।৪৮।৩...।

[৩৮] তু. ঋ. বিদ্বাঁ ঋতূঁর্ঋতুপতে (অগ্নে) য়জেহ ১০।২।১; য়জ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ (অগ্নিম্) ১।১।১; দেবান্ য়জন্তাবৃতুথা (দৈব্যৌ হোতারৌ) সমঞ্জতো নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু ২।৩।৭...।

[৩৯] দ্র. সায়ণ ঋ. ভা. ঐ পৃ. ২৯।

[৪০] দ্র. ঋ. মলমাস ১।২৫।৮; সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সমাধান ৪।৩৩।৭; পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ৫।৪০; নক্ষত্রনাম অ. স. ১৯।৭, ৮; তৈ. স. ৪।৪।১০; নক্ষত্রদর্শ বা. স. ৩০।১০; নক্ষত্রবিদ্যা ছা. ৭।১।২...।

[৪১] কল্প < √ কৢপ্ (রূপ গড়ে তোলা; তু. ঋ. সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ৎ ১০।১৯০।৩)। শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাই ঋ. অবা কল্পেষু নঃ পুমস্তমাংসি সোম য়োধ্যা ৯।৯।৭। এখানে 'কল্প' স্পষ্টতই যজ্ঞানুষ্ঠান। কল্পে কাদের রূপ দেওয়া হচ্ছে, তার উল্লেখ দেখি ঋ. য়জ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীকৢপাতি ১০।১৫৭।২। সোমযাগের ফলে যজমানের

কল্পগুলি সূত্রাকারে রচিত। অন্যান্য বেদাঙ্গের মতই এদের উৎস হল ব্রাহ্মণে এবং আরণ্যকে।[৪২] যজ্ঞভাবনা ব্রাহ্মণে বিবৃতিধর্মী বলে ছড়ানো, আর কল্পসূত্রে তা প্রয়োগের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত আকারে গোছানো। তাছাড়া এতে পাই বৈদিকদের জীবন-দর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, যা ব্রাহ্মণে পাই না।[৪৩]

কল্পসূত্রের মোটামুটি চারটি ভাগ—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্ব-সূত্র।

ব্রাহ্মণ শ্রুতি; তাতে যেসব যজ্ঞের বিবরণ আছে, তার সুসংবদ্ধ বিবৃতি পাই **শ্রৌতসূত্রে**। সাতটি হবির্যজ্ঞ আর সাতটি সোমযাগ—এই চৌদ্দটি হল শ্রৌতযজ্ঞ।[৪৪] তার জন্য বিশেষ করে গার্হপত্য আহবনীয় এবং দক্ষিণ—এই তিনটি অগ্নির আধান করতে হয়।

এছাড়া বাকী সব যাগ 'স্মার্ত'। তাদের বিবৃতি পাই **গৃহ্যসূত্রে**। সেখানে ঔপাসন-হোম বৈশ্বদেব প্রভৃতি[৪৫] সাতটি পাকযজ্ঞের বিধান আছে। তাছাড়া আছে গর্ভাধান হতে শুরু করে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত মানুষের সারাজীবন ব্যাপে অনুষ্ঠেয় নানা 'সংস্কারের' বিবৃতি।[৪৬] তার মধ্যে জাতকর্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টি আমাদের সুপরিচিত। শান্তি পৌষ্টিক প্রভৃতি কর্মও স্মার্তকর্ম। সমস্ত স্মার্তকর্মের অনুষ্ঠান স্মার্ত অগ্নিতে করাই বিধি।[৪৭] এই অগ্নির আধান করতে হয় বিবাহের সময় অথবা পিতার মৃত্যুর পর অথবা সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেলে। স্মার্ত অগ্নির অন্য নাম বৈবাহিক, গৃহ্য, আবসথ্য বা ঔপাসন অগ্নি। কতকগুলি যাগের শ্রৌত এবং গৃহ্য দুটি রূপই আছে।[৪৮] যাগের গৃহ্যরূপটি অপেক্ষাকৃত সরল এবং তা একটিমাত্র অগ্নিতে করতে হয়, আর শ্রৌতযাগটি করতে হয় তিনটি অগ্নিতে—এইমাত্র তফাত। তবে শ্রৌত পিতৃযাগ করা হত কেবল দক্ষিণাগ্নিতেই।

দেবজন্ম হয়, দীক্ষণীয়েষ্টিতে যজমানকে তাই নবজন্মের অভিনয় করতে হয়। যজমানকে এমনি করে দিব্য রূপ দেওরাই হল কল্প। অ. স.তে কল্পের উল্লেখ আছে, পাঠান্তর 'রূপম্' (৮।৯।১০)।

[৪২] ঋক্‌সংহিতায় যদিও সোমযাগের প্রাধান্য, তবুও তার সব মন্ত্রই ক্রিয়ার্থক নয়। ক্রিয়ার্থক মন্ত্রের সঙ্কলন হল যজুঃ- এবং সাম-সংহিতা। অথর্বসংহিতার মন্ত্রের প্রয়োগ গৃহ্যকর্মেই বেশী। এইগুলির সঙ্গে কল্পসূত্রের যোগ ঘনিষ্ঠ।

[৪৩] ব্রাহ্মণ অপৌরুষেয় শ্রুতি, তাই তার মাঝে শ্রৌতকর্মই প্রধান। শ্রৌতকর্মের মুখ্য লক্ষ্য হল নিঃশ্রেয়স, আর স্মার্তকর্মের অভ্যুদয়। নিঃশ্রেয়সের সাধনাকে অভ্যুদয়ের উদ্দেশেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাহতে শ্রৌত কাম্যকর্মের উৎপত্তি। তবে এগুলিকে পতঞ্জলির ভাষায় মূল লক্ষ্যের 'উপসর্গ' বলা যেতে পারে। কল্পসূত্রের অধিকার স্বভাবতই ব্রাহ্মণের চাইতে বিস্তৃত, তাতে নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় দুয়েরই কথা আছে।

[৪৪] কিন্তু ঐ. আ.তে আছে : স এষ য়জ্ঞঃ পঞ্চবিধঃ, অগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্মাস্যানি পশুঃ সোমঃ (২।৩।৩)।

[৪৫] শ্রৌত অগ্নিহোত্রেরই স্মার্তরূপ হল ঔপাসন হোম। সন্ধ্যায় আর সকালে হোম করতে হয়। যথাক্রমে প্রধান দেবতা অগ্নি এবং সূর্য। বৈশ্বদেবকর্মের আরেক নাম পঞ্চমহাযজ্ঞ—'দেবয়জ্ঞো ভূতয়জ্ঞঃ পিতৃয়জ্ঞো মনুষ্যয়জ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ' (শ. ব্রা. ১১।৫।৬।১)। দুটিই নিত্য সপত্নীক যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয়।

[৪৬] সংস্কার পাপক্ষয় করে, স্বাধ্যায় ব্রত হোম মহাযজ্ঞ ইত্যাদিতে ব্রাহ্মী তনু লাভ হয় (তু. মনু. ২।২৬-২৮)। এইটিই কল্পের তাৎপর্য। তু. ভূতশুদ্ধির ফলে যোগাগ্নিময়শরীরলাভ শ্বে. ২।১২।

[৪৭] কর্ম স্মার্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী, দায়কালাহৃতে বাপি শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু য়া. স্মৃ. ১।৯৭।

[৪৮] যেমন অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস পশুযাগ পিতৃযাগ ইত্যাদি। সোমযাগ কিন্তু সবসময় শ্রৌত, কেননা তার মুখ্য লক্ষ্য হল অমৃতত্বলাভ বা নিঃশ্রেয়স।

গৃহ্যসূত্রের অনুরূপ হল **ধর্মসূত্র**। গৃহকে ছাপিয়ে তার অধিকার ব্যাপ্ত হয়েছে সমগ্র সমাজে। এখানে অনুষ্ঠানের নয়, প্রাধান্য হল আচরণের। তাই ধর্মসূত্রের আরেক নাম হল 'সাময়াচারিক সূত্র' (সময়=সর্বসম্মত অনুশাসন)। এই সময় এবং আচার সমাজস্থিতির মূলে। আর্যসমাজের বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থাকে ধরে আছে বলে তারা 'ধর্ম'।[৪৯]

অবশ্য বেদবিদ্যাই সমস্ত ধর্মের উৎস। এসম্বন্ধে প্রাচীন ধর্মাচার্যদের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা আচারকে স্বাতন্ত্র্যের অপঘাতক বন্ধনরূপে বা কোনও সম্প্রদায়ের মতলববাজিরূপে চিত্রিত করেননি।[৫০]

কল্পসূত্রের চতুর্থ বিভাগ হল **শুল্বসূত্র**। এগুলি শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে সাধারণত যুক্ত থাকে। 'শুল্ব' মানে জমি মাপবার দড়ি। শুল্বসূত্রে নানা আকারের যজ্ঞবেদির পরিমাণ ইত্যাদি স্থির করবার বিধি দেওয়া আছে। এগুলি ভারতীয় জ্যামিতিবিদ্যার আদিগ্রন্থ।

এখন প্রত্যেক বেদের কল্পসূত্রের একটা সাধারণ পরিচয় নেওয়া যাক্।

(ক) ঋগ্বেদের দুটি শ্রৌতসূত্র পাওয়া যায়—শাংখায়নব্রাহ্মণের সম্পৃক্ত **শাংখায়ন-শ্রৌতসূত্রে** এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণের সম্পৃক্ত **আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র**।[৫১] তার মধ্যে প্রথমটিই মনে হয় প্রাচীনতর।

এই বেদের গৃহ্যসূত্র দুটি—**শাংখায়নগৃহ্যসূত্র** এবং **আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র**। শাংখায়ন-শাখার আরেকটি গৃহ্যসূত্র হল **শাম্বব্যগৃহ্যসূত্র**।

ঋগ্বেদের ধর্মসূত্র[৫২] বা শুল্বসূত্র পাওয়া যায় না।

(খ) সামবেদের প্রধান শ্রৌতসূত্র তিনটি : পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের সম্পৃক্ত **মশক**-(নামান্তর 'আর্ষেয়কল্প') এবং **লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র**। আগেরটিই প্রাচীনতর। আর রাণায়নীয় শাখার **দ্রাহ্যায়ণশ্রৌতসূত্র**। মশককল্পের পরিশিষ্ট হল **ক্ষুদ্রসূত্র**। জৈমিনীয় শাখার একটি খণ্ডিত শ্রৌতসূত্রও পাওয়া গেছে। পতঞ্জলির নামে চলিত **নিদানসূত্রে** ছন্দ ও ব্যাকরণের প্রসঙ্গও আছে।

---

[৪৯] তু. ঋ. য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ১।১৬৪।৫০, ১০।৯০।১৬। সৃষ্টির মূলে যজ্ঞ, সুতরাং তা-ই আদিম ধর্ম। এই ধর্মের দ্বারা চেতনার ঊর্ধ্বায়নে যেমন দেবতার সাযুজ্য লাভ করি, তেমনি আবার তাঁর বিভূতিতে আবিষ্টও হই। আগেরটি শ্রৌতসূত্রের অধিকারে, পরেরটি গৃহ্য- এবং ধর্ম-সূত্রের। বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াই সময় এবং আচারের লক্ষ্য।

[৫০] তু. বশিষ্ঠধর্মসূত্র : শ্রুতিস্মৃতিবিহিতো ধর্মঃ, তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্, শিষ্টঃ পুনরকামাত্মা ১।৪-৬ (তু. তৈ. ১।১১।৩-৪); মনু. বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্, আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ২।৬; য়া. স্মৃ. শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ, সম্যক্‌সংকল্পজঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্ ১।৭।

[৫১] সম্পৃক্ত, কিন্তু তাবলে ব্রাহ্মণের সারসংক্ষেপ মাত্র নয়। দ্র. Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol. I, p. 27 (n. 2)।

[৫২] ঋগ্বেদীরা বসিষ্ঠধর্মসূত্রকে তাঁদের ধর্মসূত্র বলে মনে করেন। কিন্তু দ্র. Kane, *HD*, Vol. I, Sec. 9।

এই বেদের গৃহ্যসূত্র হল: **গোভিলগৃহ্যসূত্র**, যা খুবই প্রামাণিক এবং পূর্ণাঙ্গ; রাণায়নীয়শাখার **খাদিরগৃহ্যসূত্র** আর জৈমিনীয়শাখার **জৈমিনীয়গৃহ্যসূত্র**।

রাণায়নীয়শাখার **গৌতমধর্মসূত্র** (সাধারণত 'ধর্মশাস্ত্র' নামে পরিচিত) সম্ভবত ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন।

সামবেদের কোনও শুল্বসূত্র পাওয়া যায় না।

(গ) কৃষ্ণযজুর্বেদের বিভিন্ন শাখা মিলিয়ে অনেকগুলি কল্পসূত্র পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয়শাখার শ্রৌতসূত্র ছয়টি: **বৌধায়নশ্রৌতসূত্র**—সূত্রসাহিত্যের মধ্যে এইটি সম্ভবত সর্বপ্রাচীন, রচনার ভঙ্গি ব্রাহ্মণের মত, রচয়িতার আখ্যা 'প্রবচনকার'; **বাধূল-শ্রৌতসূত্র**—খণ্ডিত, বিষয়বস্তুর অনেকাংশ সম্ভবত বৌধায়ন হতেও প্রাচীন; **ভারদ্বাজ-শ্রৌতসূত্র**—খণ্ডিত; **আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র**—পূর্ণ এবং বিস্তৃত; **হিরণ্যকেশিশ্রৌতসূত্র** (নামান্তর 'সত্যাষাঢ়')—তথা; **বৈখানসশ্রৌতসূত্র**।

এছাড়া পাওয়া যায়: কাঠকশাখার **কাঠকশ্রৌতসূত্র**—খণ্ডিত; মৈত্রায়ণীয়শাখার **মানবশ্রৌতসূত্র**—খুবই প্রাচীন, এবং সম্ভবত তারই সম্পৃক্ত **বারাহশ্রৌতসূত্র**।

গৃহ্যসূত্রের মাঝে তৈত্তিরীয়শাখার পাওয়া যায় **বৌধায়ন-**, **বাধূল-**(খণ্ডিত), **ভারদ্বাজ-**, **আপস্তম্ব-**, **হিরণ্যকেশি-** এবং **বৈখানস- গৃহ্যসূত্র**; কাঠকশাখার **কাঠকগৃহ্যসূত্র**; মৈত্রায়ণীয়শাখার **মানব-** এবং **বারাহ- গৃহ্যসূত্র**।

ধর্মসূত্রের মাঝে পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়শাখার **বৌধায়ন-**, **আপস্তম্ব-**, **হিরণ্যকেশি-** এবং **বৈখানস-ধর্মসূত্র**।

শুল্বসূত্রের মাঝে আছে তৈত্তিরীয়শাখার **বৌধায়ন- আপস্তম্ব-** এবং **হিরণ্যকেশি-** কাঠকশাখার—**কাঠক-** এবং মৈত্রায়ণীশাখার **মানব-** এবং **বারাহ শুল্বসূত্র**।

(ঘ) শুক্লযজুর্বেদে পাওয়া যায় **কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র**, **পারস্করগৃহ্যসূত্র** এবং **কাত্যায়নশুল্বসূত্র**।[৩৩]

(ঙ) অথর্ববেদের দুটি কল্পসূত্র আছে—**বৈতানসূত্র** (শ্রৌত), আর **কৌশিকসূত্র** (গৃহ্য)। এগুলি ঠিক অন্যান্য বেদের সূত্রের মত নয়। শেষেরটি মিশ্রপ্রকৃতির, তাতে অনেক তুকতাকের কথাও আছে।

৮

কল্পসূত্রের পরিশেষরূপে পাই বিভিন্ন **পিতৃমেধসূত্র**—যেমন বৌধায়ন-, হিরণ্যকেশি- এবং গৌতম- পিতৃমেধসূত্র; বিভিন্ন **শ্রাদ্ধকল্প**—যেমন মানব-, কাত্যায়ন-, শৌনক-, পৈপ্পলাদ-শ্রাদ্ধকল্প; বিভিন্ন **পরিশিষ্ট**—যেমন আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট, গোভিলের

[৩৩] বাজসনেয়ীরা অধুনালুপ্ত শঙ্খ-লিখিতের ধর্মসূত্র মেনে চলতেন বলে শোনা যায়। দ্র. Kane ঐ, Sec. 12।

কর্মপ্রদীপ, গোভিলপুত্রের গৃহ্যসংগ্রহ, বৌধায়নের পরিশিষ্ট, অথর্ববেদপরিশিষ্ট ইত্যাদি। শৌনকের **বৃহদ্দেবতা** এবং **ঋগ্‌বিধানের** কথা আগেই বলেছি। তারও পরে আছে নানা **প্রয়োগ পদ্ধতি** এবং **কারিকা** গ্রন্থ। এমনি করে বৈদিক কর্মকাণ্ডের আলোচনা আধুনিক যুগ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ধর্মসূত্রের অনুবৃত্তি চলেছে **ধর্মশাস্ত্রে** এবং **স্মৃতিতে**।

বেদাঙ্গের আরেক পরিশেষ হল বিভিন্ন সংহিতার **অনুক্রমণী**। এগুলি প্রধানত সূচীগ্রন্থ। ঋক্‌সংহিতার ছয়টি অনুক্রমণী শৌনকের রচিত—ঋষি ছন্দঃ অনুবাক পাদ সূক্ত ও দেবতার অনুক্রমণী। কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণীর বিষয়বস্তু নামেই বোঝা যায়। এইটিই সর্বাধিক প্রচারিত। এছাড়া সামসংহিতার দুটি, কৃষ্ণযজুঃসংহিতার দুটি, শুক্লযজুঃসংহিতার একটি এবং অথর্বসংহিতার একটি অনুক্রমণী আছে। এই অনুক্রমণীগুলি থেকে বোঝা যায়, অতি প্রাচীনকাল হতেই বেদের সংহিতাগুলি এখন যেমন পাওয়া যায় প্রায় তেমনিই ছিল, হাজার-হাজার বছরের ব্যবধানেও তাদের অতি-সামান্যই ইতরবিশেষ হয়েছে। বৈদিক ভাবনায় শ্রুতির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে অন্বিত স্মৃতিপ্রস্থানের এইখানে শেষ।

৯

স্মৃতির পর ন্যায়প্রস্থান। ন্যায়ের আরেক নাম 'মীমাংসা।' এই নামটিই প্রাচীন।[৫৪] মীমাংসার উদ্‌ভব ব্রহ্মোদ্য হতে। বেদপ্রতিপাদিত ক্রিয়া বা বেদার্থ নিয়ে ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত। এই উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-পরিষদে যে-আলোচনা বা বিচার চলত, তারই নাম মীমাংসা। নিজেদের মাঝে যে-মীমাংসা, তাতে তর্কের অবকাশ বিশেষ ছিল না। অনুকূল বিচারের দ্বারা তত্ত্বের অবধারণই ছিল তার লক্ষ্য। ব্রাহ্মণে-উপনিষদে মীমাংসার এই রূপটিই আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু যাঁরা হৈতুক এবং বেদনিন্দক,[৫৫] বিরোধ হত তাঁদের সঙ্গে। এই উপলক্ষ্যে মীমাংসার মাঝে তর্কের অনুপ্রবেশ ঘটল। সৃষ্টি হল বৈদিক দর্শনের বা মীমাংসা-প্রস্থানের। তার মধ্যে অনুকূল এবং প্রতিকূল দুরকম তর্কই স্থান পেয়েছে।

---

[৫৪] আরও প্রাচীন নাম হল 'ওহ' বা 'ঊহ' < √ ঊহ 'ভাবনা করা'। সুতরাং আদিম অর্থ 'ভাবনা' (তু. গী. ২।৬৬; Gk. *eucho*, 'prayer') : তু. ঋ. ১।৬১।১, ১৮০।৫, ৪।১০।১, ওহ-ব্রহ্মাণঃ ১০।৭১।৮, প্র য়দ্‌ বাং মিত্রাবরুণা স্পূর্ধন্‌ প্রিয়া ধাম যুবধিতা মিনন্তি, ন য়ে দেবাস 'ওহসা' ন মর্তা অয়জ্ঞসাচো অপ্যো ন পুত্রাঃ (দেবতাও নয়, মর্ত্যও নয়, অতএব অসুর, উপনিষদে যারা বিরোচনের প্রজা [দ্র. ছা. ৮।৭, ৮ বিশেষত শেষাংশ]; এখানেও অযজ্ঞ অদেব ভোগমত্ত অসুরদের উল্লেখ পাচ্ছি, যারা হৈতুক; 'ওহস্‌' এখানে কুতর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। ব্রাহ্মণে উপনিষদে নানা জায়গায় 'মীমাংসা'র উল্লেখ আছে। 'ন্যায়' দ্র. ঐ. ব্রা. শৌদ্রাম্ন্যায়াৎ ৭।১৭। 'তর্ক' দ্র. ক. ১।২।৯ টীকা। 'মীমাংসা' অনুকূল তর্ক; আর 'তর্ক' অনুকূল বা প্রতিকূল দুইই হতে পারে। এইথেকে মীমাংসাপ্রস্থান আর তর্কপ্রস্থানের ভেদ।

[৫৫] তু. মনু. য়োঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্‌ দ্বিজঃ, স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ (২।১১)। দেখা যাচ্ছে, দ্বিজদের মধ্যেও হৈতুকের অভাব ছিল না। এটা খুবই স্বাভাবিক। মীমাংসা আর তর্ক একই আর্য মননের দুটি ধারা।

বৈদিকদের দুটি মীমাংসা—পূর্ব- বা কর্ম-মীমাংসা এবং উত্তর- বা ব্রহ্ম-মীমাংসা। দুটিই সূত্রগ্রন্থ। পূর্বমীমাংসার সূত্রকার জৈমিনি, উত্তরমীমাংসার বাদরায়ণ। পূর্ব-মীমাংসার আধার হল বেদের ব্রাহ্মণ, আর উত্তরমীমাংসার উপনিষৎ। ব্রাহ্মণে কর্মের প্রাধান্য, আর উপনিষদে তত্ত্বের। এইথেকে ক্রমে পূর্বমীমাংসা কর্মকাণ্ডের আর উত্তর-মীমাংসা জ্ঞানকাণ্ডের দর্শন হয়ে দাঁড়াল। দুয়ের মাঝে ক্রমশ একটা বিরোধও দেখা দিল, দার্শনিক ভাবনায় যা রূপ নিল জ্ঞান-কর্মের অসমুচ্চয়বাদে। এই বিরোধের মূলে তার্কিকদের প্রভাব যে ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

পূর্বমীমাংসাসূত্রের বারোটি অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে চারটি পাদ, কেবল তৃতীয় ষষ্ঠ এবং দশম অধ্যায়ে পাদের সংখ্যা দ্বিগুণ। উত্তরমীমাংসাসূত্রের চারটি অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে চারটি পাদ। দুটি মীমাংসাসূত্রে মোটের উপর ষোলটি অধ্যায়—এটি যে আকস্মিক নয়, সেকথা আগেই বলেছি।[৫৬]

পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রভাকর এবং কুমারিল প্রবর্তিত দুটিমাত্র প্রস্থান আছে। কিন্তু উত্তরমীমাংসাদর্শন বা বেদান্ত বহু প্রস্থানে বিভক্ত। বৈদিক ছাড়া শৈব বৈষ্ণব সাংখ্য এমন-কি আধুনিককালে শাক্ত সম্প্রদায়ের রচিত বেদান্তভাষ্যও পাওয়া যায়। আজও ভাষ্যরচনার বিরাম হয়নি। বলতে গেলে বৈদান্তিক ভাবনাই এখন ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তার জগতে একচ্ছত্র সম্রাট্‌, এমন-কি একসময় বহিরাগত ইসলামকেও এই ভাবনার আওতাও পড়তে হয়েছিল। বৌদ্ধভাবনা তো কবেই এর মধ্যে জীর্ণ হয়ে গেছে।

এমনি করে বেদের সংহিতা হতে মীমাংসাসূত্র পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যের বিপুল বিস্তার হাজার-হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের বহুমুখী ভাবনাকে ব্রহ্মসূত্রে গেঁথে এক পরম সমন্বয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আজও সে-সাধনা তার ঈপ্‌সিত সাগর-সঙ্গমে পেঁছয়নি। একদিন পেঁছবে এই আমাদের আশা।

১০

বৈদিক ভাবনার আরেকটি শাখার পরিচয় না দিলে এই সাহিত্যের রূপরেখা অপূর্ণ থেকে যায়। এ-শাখাটি হচ্ছে **ইতিহাস-পুরাণ**। **তন্ত্রকেও** তার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে পারি।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে-সাহিত্যের আলোচনা করলাম, তা সমাজের অভিজাতদের কীর্তি। ক্ষত্রিয়ের পোষকতায় ব্রাহ্মণেরা এই সাহিত্য গড়ে তুলেছেন। তাঁরাই ত্রয়ী-বিদ্যার ধারক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বাইরে রয়েছে বিরাট্‌ গণসমাজ। বর্ণব্যবস্থা অনুসারে বলতে গেলে তার মাঝে আছেন বৈশ্য এবং শূদ্রেরা। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ক্রমে

---

[৫৬] দ্র. 'সাধারণ পরিচয়' টী. ২৪। অনেকে মনে করেন, দর্শনসূত্রগুলির মধ্যে পূর্বমীমাংসা আদিম আর উত্তরমীমাংসা অন্তিম। তাহলে ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক ভাবনার স্থান হয়েছে এ-দুটি দর্শনের বন্ধনীর মাঝে। তবে অধুনালব্ধ ব্রহ্মসূত্র গীতোক্ত 'হেতুমৎ ব্রহ্মসূত্রপদ' (১৩।৫) বা পাণিনির 'পারাশর্য ভিক্ষুসূত্র' (৪।৩।১১০) নাও হতে পারে। এদেশের সমস্ত শাস্ত্রই পুষ্ট এবং প্রচারিত হয় সম্প্রদায়ক্রমে, শিষ্য-প্রশিষ্যেরা সম্প্রদায়প্রবর্তকের মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন।

সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে আছেন অভিজাতদেরও স্ত্রীবর্গ। আরও আছেন যাঁরা বৈদিক ভাবনার অনুগামী নন। ব্যাসের ভাষায় বলতে গেলে আছেন স্ত্রী শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুরা—সাক্ষাৎভাবে ত্রয়ীবিদ্যায় যাঁদের অধিকার নাই, কিংবা সে-বিদ্যার যাঁরা বিপক্ষে।[৫৭]

এই গণসমাজ নিশ্চিন্ত বা নিশ্চল থাকে না। অভিজাতসমাজের অনুকূল বা প্রতিকূল দুরকম ভাবনার দ্বারাই সে আন্দোলিত হয়। তাছাড়া তার নিজস্ব ভাবনা ও চাহিদাও আছে, তাকে সে লোকাতত দর্শন ও সাহিত্যে রূপ দেয়। প্রতিলোমক্রমে এগুলি আবার অভিজাতসমাজকেও প্রভাবিত করে। সমাজের উপর এবং নীচের তলায় এমনি করে ভাবনার একটা আদান-প্রদান চলতে থাকে, যদিও মুখ্যত অভিজাতরাই হন সমগ্র সমাজের নিয়ামক।

ব্রাহ্মণ্যসমাজ প্রধানত রক্ষণশীল হলেও নিজের ঔদার্যগুণে পরকে আত্মসাৎ করে রূপান্তরিত করবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তার আছে। প্রাকৃতকে সংস্কৃত করা তার একটা বৈশিষ্ট্য। অনেক-কিছুকেই এমনি করে সে জাতে তুলে নিয়েছে। অভিজাত ভাবনার প্রাকৃতীকরণ এবং প্রাকৃত ভাবনার আভিজাত্যসাধন—যুগ-যুগ ধরে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের এই প্রচেষ্টার ফল হল ইতিহাস পুরাণ এবং তন্ত্র। এরাও বৈদিক ভাবনার বাহন এবং বেদার্থ আবিষ্কারে এদের উপযোগিতাও নিতান্ত কম নয় বলে গৌণদৃষ্টিতে এদেরও বেদাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যায়।[৫৮]

ইতিহাসের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্বসংহিতার ব্রাত্যকাণ্ডে।[৫৯] ব্রাহ্মণে আরণ্যকে এবং উপনিষদেও তার উল্লেখ আছে।[৬০] ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে সবজায়গায় পুরাণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ইতিহাস-পুরাণকে বলা হয়েছে 'পঞ্চম বেদ'। এই বিশেষণটি ব্যঞ্জনাবহ।

ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল পুরাবৃত্ত। শতপথব্রাহ্মণ এবং নিরুক্তকার ইতিহাসের যে-উদাহরণ দিচ্ছেন, তাতে মনে হয়, তাঁদের মতে ইতিহাস অলৌকিক বা লৌকিক দুইই হতে পারে। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যে লড়াই হয়েছিল এও যেমন ইতিহাস, তেমনি ত্রিত ঋষি কুয়ায় পড়ে গিয়েছিলেন, এও ইতিহাস। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাসমতে দুটিই সত্য ঘটনা। শতপথব্রাহ্মণের ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, দেবাসুরযুদ্ধকে আবার অনেকে ইতিহাস মনে করতেন না, বলতেন ওটা অন্বাখ্যান বা গল্প।[৬১]

ক্রমে ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিবদ্ধ হয়েছে লৌকিক পুরাবৃত্তে। এই দৃষ্টিতে

---

[৫৭] ভা. ১।৪।২৫।

[৫৮] তু. সায়ণ : 'ষড়ঙ্গবৎ পুরাণাদীনামপি বেদার্থজ্ঞানোপয়োগঃ' ইত্যাদি (ঋ. ভা. ঐ ২৯-৩০)।

[৫৯] ১৫।৬।১১, ১২। সঙ্গে-সঙ্গে পুরাণ গাথা এবং নারাশংসীর উল্লেখও লক্ষণীয়। এসবই গণসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

[৬০] তু. শ. ব্রা. ১১।৫।৬।৮, ৭।৯, ১৩।৪।৩।১২, ১১।১।৬।৯ (এখানে ইতিহাস আর অন্বাখ্যানে ভেদ দেখানো হয়েছে); তৈ. আ. ২।৯।১, ১০।১, ১১।১; বৃ. ২।৪।১০, ৪।১।২, ৫।১১; ছা. ৩।৪।১, ২, ৭।১।২, ৪, ২।১, ৭।১। নিরুক্তে ঐতিহাসিকদের উল্লেখ ২।১৬, ১২।১০, ১২।১, ব্রহ্ম ইতিহাসমিশ্রম্ ৪।৬।

[৬১] দেবাসুরের যুদ্ধ যদি দুটি সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে (দ্র. টী. ৫৪), তাহলে তার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। বোধ হয় শ. ব্রা. এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তা না হলে তা অন্বাখ্যান। ঐতিহাসিকেরা দেবতাদের মনে করতেন 'পুণ্যকৃৎ রাজা' (নি. ১২।১)। এর মাঝে বেশ আধুনিকতার গন্ধ আছে।

ভারতযুদ্ধের বৃত্তান্ত রয়েছে যে-**মহাভারতে** তা ইতিহাস। তেমনি **রামায়ণও** ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস পুরাণ গাথা ও নারাশংসী(বীরপ্রশস্তি)গুলি খুব কাছাকাছি থাকায় সহজেই তাদের অধিকারের মাঝে অন্যোন্যসংক্রমণ ঘটেছে।

ইতিহাস হিসাবে মহাভারতের স্থান সবার উপরে। তাকে ভারতবর্ষের জীবনবেদ বলা যেতে পারে। 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে' এই লোকোক্তি বাস্তবিকই সত্য।

ইতিহাসের সহচরিত হল **পুরাণ**। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ।[৬২] তার মধ্যে সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়) এবং মন্বন্তর এই তিনটি ব্যাপার বিশ্বগত। এইগুলিই পুরাণের বৈশিষ্ট্য; বংশ আর বংশানুচরিত হল পুরাণের মাঝে ইতিহাসের অনুপ্রবেশ। ভাগবত-পুরাণে পুরাণের দশটি লক্ষণ আছে, তার মধ্যে বংশ ও বংশানুচরিত ধরা হয়নি।[৬৩]

অধ্যাত্মভাবনার প্রাধান্যসত্ত্বেও পুরাণের বিষয়বৈচিত্র্যের যেন অন্ত নাই। দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি বর্ণাশ্রমধর্ম পূজাপার্বণ তীর্থমাহাত্ম্য শিল্প স্থাপত্য সঙ্গীত—কিছুরই আলোচনা পুরাণ হতে বাদ পড়েনি। এদিক দিয়ে পুরাণকে বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণ্যভাবনার বিশ্বকোষ।

ইতিহাস আর পুরাণকে স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্গত ধরা হয়। আবহমানকাল ধরে বেদপন্থী সমাজে এরা হয়ে এসেছে লোকশিক্ষার বাহন, সমাজব্যবস্থার শাস্তা, সম্প্রদায়-ভেদে অধ্যাত্ম ভাবনা ও সাধনার দিশারী।

মূল পুরাণের সংখ্যা আঠার। তাছাড়া কতকগুলি উপপুরাণও আছে। সমস্ত পুরাণই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে প্রচলিত। বেদবিভাগ এবং ইতিহাস-পুরাণের রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এই দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ যিনিই হন না কেন, বৈদিক আর্যদের সমস্ত ভাবনা তাঁকে আশ্রয় করেই সংহত হয়েছে বলে বেদপন্থী সমাজে আজও তিনি গুরু-রূপে পূজিত। ব্যাসচেতনা বস্তুতই উত্তরায়ণের পরমবিন্দুর চেতনা, অখণ্ড মহাভারতের চেতনা।

ইতিহাস-পুরাণের পাশাপাশিই চলেছে **তন্ত্রের** ধারা। পুরাণের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বেদের সঙ্গে কল্পসূত্রের যে-সম্পর্ক, পুরাণের সঙ্গে তন্ত্রেরও কতকটা সেই সম্পর্ক। তন্ত্র মুখ্যত সাধনার বিজ্ঞান, যদিও তার মধ্যে দার্শনিক ভাবনারও অনুপ্রবেশ ঘটেছে স্বাভাবিক রীতিতেই। পুরাণের মতই তন্ত্র সর্বজনীন—অথচ তা স্মৃতি নয়, শ্রুতি।[৬৪]

তন্ত্র বলতে আমরা সাধারণত শুধু শক্তি-উপাসনাই বুঝি। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। তন্ত্র বস্তুত বিষ্ণু শিব শক্তি গণপতি ও সূর্য—এই পঞ্চদেবতার উপাসনা। সূর্যকে

---

[৬২] 'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ, বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।' সায়ণ বলেন, বেদে যেসব উপাখ্যান আছে তা-ই থেকে গড়ে উঠেছে ইতিহাস, আর উপনিষদে যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদির তত্ত্ব তাথেকে পুরাণ (ঋ. ভা. ঐ)।

[৬৩] ভা. ২।১০।১-৯।

[৬৪] তু. কুল্লূক : 'অতএব হারীতঃ। অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্মঃ। শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ' (মনু. ২।১ টী.)। হারীত একজন বহুমান্য প্রাচীন ধর্মসূত্রকার (দ্র. Kane, *HD*, Vol I, Sec, 8)। অনেক সাম্প্রদায়িক উপনিষদও শ্রুতি। শ্রুতিসংজ্ঞার এই অর্থব্যাপ্তি প্রাণের লক্ষণ।

স্বীকার করে নিয়ে তন্ত্র বৈদিক সাধনাকেও তার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।[৬৫] অন্যান্য দেবতাও বেদে অপরিচিত নন।[৬৬] তন্ত্রের দার্শনিকতার ভিত্তি হল সাংখ্য এবং বেদান্ত।[৬৭] সুতরাং তন্ত্রের ভাবনা ও সাধনাকে বেদবাহ্য বা বহিরাগত বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না। পৌরাণিক ভাবনার মতই তান্ত্রিক ভাবনার পরিধি বহুবিস্তৃত, তন্ত্র এক বিরাট্ সমন্বয় ও আত্তীকরণের (assimilation) সাধন। সুতরাং তার মাঝে বহিরাগত ভাবনার কিছু-কিছু অনুপ্রবেশ ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যভাবনা তাকে এমনভাবেই আত্মসাৎ করে নিয়েছে যে তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া কঠিন।

তন্ত্রের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হচ্ছে 'পট' বা কাপড়। যজ্ঞানুষ্ঠানকে বেদে কাপড় বোনার সঙ্গে অনেকজায়গায় তুলনা করা হয়েছে। তাথেকে তন্ত্রের অর্থ হতে পারে 'অনুষ্ঠানপরম্পরা'।[৬৮] তন্ত্রশাস্ত্রের চরিত্রের সঙ্গে এই অর্থটি বেশ খাটে।

---

[৬৫] দ্র. শারদাতিলকম্ ১৪।২৭...। বৈদিক সাধনা গায়ত্রী-উপাসনাতে পর্যবসিত। তৈত্তিরীয়ারণ্যকের খিলকাণ্ডে সাবিত্রী গায়ত্রী ছাড়া অন্যান্য গায়ত্রীও পাই। এটি তান্ত্রিক প্রভাবে ঘটেছে। পঞ্চদেবতার সবাই সেখানে আছেন।

[৬৬] আগেই দেখেছি, শিব ব্রাত্যদের দেবতা; বিষ্ণু আদিত্যেরই লোকাতত রূপ, তা পরে দেখব। ঋক্‌সংহিতায় বৃহস্পতি গণপতি (গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে ২।২৩।১); আবার ইন্দ্রও গণপতি (নি ষু সীদ গণপতে গণেষু ত্বামাহুর্বিপ্রতমং কবীনাম্ ১০।১১২।৯)। যজুঃসংহিতায় দেখি, 'রুদ্রস্য গাণপত্যম্' (বা. ১১।১৫, কাঠ. ১৬।১, ১৯।২); একজায়গায় আছে 'গণপতয়ে স্বাহা' (বা. ২২।৩০), ভাষ্যকারদের মতে গণপতি এখানে লোকপাল। 'গণপতি'র অনুরূপ সংজ্ঞা হল 'গণশ্রী'; ঋক্‌সংহিতায় তা দুজায়গায় মরুদ্‌গণের বিশেষণ (১।৬৪।৯, ৫।৬০।৮), একজায়গায় অগ্নির (৮।২৩।৪)। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, ঋক্‌সংহিতায় প্রধান গণপতি হলেন বৃহস্পতি, তাঁর গণ 'ঋক্বান্' ('ঋগ্বতা গণেন...বলং রুরোজ ৪।৫০।৫)। এই গণ নিঃসন্দেহে মরুদ্‌গণ (যাঁরা সেইজন্যই 'গণশ্রী'), আর ঋক্ বা অর্কের সঙ্গে তাঁদের যোগও ঘনিষ্ঠ (১।৩৮।১৫, ৮৫।২, ৮৮।১, ৬।৬৬।১০...)। ইন্দ্রের গাণপত্য ঔপচারিক, বৃহস্পতির সঙ্গে তিনি এক হয়ে আছেন বলে (তু. ৪।৪৯; বৃহস্পতিও বৃত্রহা পুরন্দর ৬।৭৩।২; ইন্দ্রের পরেই বৃহস্পতি তৈ. ২।৮)। যজুঃসংহিতায় গাণপত্য রুদ্রের। যাস্কের মতে বৃহস্পতি এবং রুদ্র দুইই মধ্যস্থানদেবতা। মরুদ্‌গণও তা-ই। অধিকন্তু ঋক্‌সংহিতায় মরুদ্‌গণ রুদ্রপুত্র (১।৬৪।২, ১২, ৮৫।১, ২।৩৪।১০, ৬।৬৬।৩...)। সুতরাং রুদ্রের গণও হলেন মরুতেরা। এইদিক থেকে বৃহস্পতি এবং রুদ্রের মাঝে সাম্য দেখা যায়। রুদ্রের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'গর্জনকারী'। বৃহস্পতিরও আরাবের কথা ঋক্‌সংহিতায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে (৪।৫০।১, ৫, ৬।৭৩।১, ১০।৬৭।৬...)। ব্যুৎপত্তি ধরতে গেলে বৃহস্পতি হলেন বাকের অধিষ্ঠাতা; আর রুদ্র অন্তরিক্ষস্থান বলেই প্রাণের অধিষ্ঠাতা (বৃ. ৩।৯।৪)। বৃহস্পতি অন্তরিক্ষস্থান হলেও তিনি সংহিতার মতে 'প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্' (ঋ. ৪।৫০।৪)। এই জ্যোতিঃ সূচিত করছে বৃহস্পতির প্রজ্ঞার দিক। অথচ সংহিতায় তাঁর শক্তিরূপটিই উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, সেক্ষেত্রে তিনি রুদ্রের সমধর্মা। পৌরাণিক (অতএব তান্ত্রিক) গণপতির মাঝে বৃহস্পতি আর রুদ্র দুইই এসে মিলে গেছেন। পুরাণে তিনি রুদ্রের (শিবের) পুত্র, জ্ঞানদাতা, বিঘ্ননাশন। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগ রক্ষা করা হয়েছে ঐরাবতের মাথা দিয়ে (ঐরাবত মেঘ বা বৃত্রশক্তি, কিন্তু রূপান্তরিত অতএব শুভ্র; তু. সপ্তশতীর 'শুম্ভ-নিশুম্ভ' < √শুভ্ ॥ শুম্ভ্, যারা শিবম্মন্যের প্রতীক; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই শুভ্রতা হল পার্থিব চেতনার দিব্য রূপান্তর; তা-ই সিদ্ধিদাতা গণপতির মারুতী সিদ্ধি, দ্র. ছা. ৩।৯)। সংহিতায় গণপতি ইন্দ্রকে বলা হয়েছে কবিদের মধ্যে বিপ্রতম (ঋ. ১০।১১২।৯), এইটি লক্ষণীয়।...বেদে শক্তি-উপাসনার অপ্রতুলতা নাই, কেননা শাক্তধর্ম বস্তুত সর্বজনীন। সুতরাং পঞ্চদেবতার উপাসনার মূল আমরা বেদেই পাচ্ছি।

[৬৭] সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তন্ত্রে পরমতত্ত্বের যুগনদ্ধ রূপ। বিষ্ণু ও শ্রীতে, শিব ও শক্তিতে তার প্রকাশ। বৈদান্তিক ভাবনার প্রতিরূপ পাই শিবাদ্বৈতবাদে, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে।

[৬৮] তু. বা. স. 'সীসেন তন্ত্রং মনসা মনীষিণ ঊর্ণাসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি, অশ্বিনা যজ্ঞং সবিতা সরস্বতীন্দ্রস্য রূপং বরুণো ভিষজ্যন্ (১৯।৮০; উব্বট : 'যজ্ঞঃ পটেন রূপ্যতে')। আরও তু. ঋ. সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ১০।৭১।৯। তন্ত্রের অনুরূপ 'তন্তু'। এই উপমাগুলি লক্ষণীয় : ঋ. মা. তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে (২।২৮।৫; নিঘ.তে 'ধী' প্রজ্ঞা এবং কর্ম দুইই বোঝায়, অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞ

অথর্ববেদকে বলা যেতে পারে তন্ত্রবিদ্যার উৎস। অথর্ববেদে যেমন পাই ব্রহ্মের উপদেশ, তেমনি 'মায়া' বা তুকতাকেরও বিধান। তন্ত্রেও তা-ই। তন্ত্রের ষট্‌কর্মের আদিরূপ অথর্ববেদেই পাই। তন্ত্রের এক নাম 'মন্ত্রশাস্ত্র'; বৈদিক কর্মকাণ্ডও তেমনি একান্তভাবে মন্ত্রনির্ভর। তন্ত্রের 'যন্ত্র'-রচনা বৈদিক বেদিরচনারই অনুরূপ। এইদিক দিয়ে যজুর্বেদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বেদের আরণ্যক যেমন রহস্যবিদ্যা, তন্ত্রও তা-ই।[৬৯] যে-বামাচারকে আমরা শাক্ততন্ত্রের একটা বিশিষ্ট রীতি বলে জানি, বৈদিক মহাব্রতের অনুষ্ঠানে এবং ছান্দোগ্যের বামদেব্যব্রতে[৭০] আমরা তার নিদর্শন পাই; বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে; শাক্ততন্ত্রের অনুষ্ঠানেও দেখি নারীর সেই মর্যাদা। তন্ত্রের যুগনদ্ধবাদ বা সামরস্যবাদের অনুরূপ ভাবনা আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষদে পরিষ্কার দেখতে পাই।[৭১] সোমযাগ বৈদিকযাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর সোম একটি মাদকদ্রব্য। শাক্ততন্ত্রে সুরা এসে সোমের স্থান নিয়েছে।[৭২] সোমযাগে পশুমাংস এবং ধানা করম্ভ ইত্যাদি শস্যজাত উপচার স্বভাবতই মাংস এবং মুদ্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭৩] এইসব থেকে তন্ত্রকে আর অর্বাচীন বলে মনে হয় না। মনে হয়, ইতিহাস-পুরাণের মত, এও একটি অতিপ্রাচীন লোকায়ত ধারা। ব্রাহ্মণ একেও সংস্কৃত করে ক্রমে জাতে তুলে নিয়েছেন। আজ স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, বৈদিক ধর্ম তার আভিজাত্যের তুঙ্গতা হতে নেমে এসে ইতিহাস পুরাণ আর তন্ত্রের ভিতর দিয়ে এদেশের সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে।[৭৪]

বৈদিক সাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে শেষ হল—গঙ্গোত্রী হতে এসে দাঁড়ালাম গঙ্গাসাগরের কূলে। সাহিত্য তখনই সার্থক হয়, যখন তার আদর্শ জীবনে রূপ ধরে। এইদিক দিয়ে এই সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করব, পরবর্তী এক অধ্যায়ে যখন বৈদিক জীবনের প্রসঙ্গ তুলব।

এবং দ্রব্যযজ্ঞ দুইই); য়ো য়জ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেষ্বাততঃ ১০।৫৭।২; য়ো য়জ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্মেভিরায়তঃ, ইমে বয়ন্তি পিতরো য় আয়যুঃ প্র বয়াপ বয়েত্যাসতে ততে ১৩০।১; নাহং তন্তুং ন বি জানাম্যোতুং ন য়ং বয়ন্তি সমরেহতমানাঃ ৬।৯।২; স ইং তন্তুং স বি জানাত্যোতুম্ ৩। মধ্যযুগের মরমীয়াদের মধ্যেও এই কাপড়বোনার উপমা প্রচলিত ছিল। তু. কবীর : 'ঝীনী ঝীনী বিনী চাদরিয়া'; বাংলার 'যোগী' এবং 'যুগী'।

[৬৯] শাম্ভবী বিদ্যা 'গুপ্তা কুলবধূরিব'। বেদবিদ্যাও যাকে-তাকে দিতে নাই (তু. নি. ২।৪।১)।

[৭০] মহাব্রতে দ্র. তৈ. স. অন্তর্বেদি মিথুনৌ সং ভবতঃ ৭।৫।৯।১১; জৈ. ব্রা. মাগধং চ পুংশ্চলূং চ দক্ষিণে বেদ্যন্তে মিথুনীকারয়ন্তি ২।৪০৫...। বামদেব্যব্রত : ছা. ২।১৩।২।

[৭১] বৃ. তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ য়াজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব ১।৪।৩; ৪।৩।২১; ৬।৪।২০।

[৭২] বৈদিক সৌত্রামণীযাগে সুরার প্রয়োগ ছিল। সুরার ব্যবহার এবং তজ্জনিত প্রমাদের উল্লেখ পাই ঋ. ৭।৮৬।৬। তু. অ. স. ব্রাত্যকাণ্ড : স বিশোহনু ব্যচলৎ, তং সভা চ সমিতি চ সেনা চ সুরা চানু ব্যচলন্ ১৫।৯। বিশ্ বা জনসাধারণের সঙ্গে সুরার সম্পর্ক লক্ষণীয়।

[৭৩] তু. ঋ. আ ত্বা বহন্তু হরয়ো...সোমপীতয়ে...ইমা ধানা ঘৃতস্নুবঃ ১।১৬।১-২; পিবাস্যন্ধঃ... অদ্ধি ধানাঃ ৩।৩৫।১, ৩; সুত ইন্দ্র সোমঃ...কৃতা ধানা অত্তবে তে ৭; ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তম্... জুষস্ব নঃ ৫২।১ ইত্যাদি (সম্পূর্ণ সূক্তটিই দ্র.)।

[৭৪] মোটামুটি বলা যায়, বৈষ্ণবতন্ত্রের আকর হল 'সংহিতা', শৈবতন্ত্রের 'আগম' এবং শাক্ততন্ত্রের 'তন্ত্র'। বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্র হতে আলাদা একটা-কিছু নয়। এক সর্বজনীন তন্ত্রকেই হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই গ্রহণ করেছেন। যেমন বাউলদের মাঝে দেখি বৈষ্ণব সহজিয়া যোগী সূফী সবাই আছেন।

সংশোধন ও সংযোজন

প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠার (স্থূলাক্ষরে), দ্বিতীয় সংখ্যা ছত্রের। তিনটি সংখ্যা থাকলে দ্বিতীয়টি টীকার, তৃতীয়টি ছত্রের (ঐ পৃষ্ঠা হতেই গোনা হয়েছে)। সংযোজনের আগে যোগচিহ্ন দেওয়া আছে। সংশোধিত রূপ উদ্ধৃতিচিহ্নের মাঝে।

১১।১৫ নিত্যত্ব ‘ভাবগত’। **১৭**।১২ কাল ‘হতে’। **২৬**।৩৩ আছে।+’ ‘। **৩১**।১৯ অনাবৃষ্টি ‘শুষ্ক’। **৩৭**।২।৩ ‘hi-in-du-is’ ; ।৪।২ সোম্যাসঃ ‘৬।৭৫।১০’ ; ।৫।৪ মনবে ‘শাসদব্রতান্’। **৩৮**।৫।১ ‘ইন্দ্রং’ বর্ধন্তো ; ।৫।২ ‘১০।৪৩।৪ ;’ ; ।৫।৪ ‘(সুদাসঃ)’ ; ।৫।১০ ‘অপাব্রৃণোর্’…‘সব্রতঃ’…‘৪।২৬।২ ;’ ; ।৫।১৭ ‘সে’ তমঃশক্তির। **৩৯**।১।৫ ৩।৫৬।১+, ৬।৯।১, ৭।২১।৫, ১০।৭১।৮। **৪১**।৭।১ সত্যাষাঢ়-‘শ্রৌতসূত্র’ ; ।৮।৬ ‘দুর্গাণি’। **৪২**।১২।৫ দুজনেই ‘ঋক্‌সংহিতায়’। **৪৩**।১৩।৪ (১।২।১।২৬)। + দ্র. অ. স. ১০।৭।২০। ; ।১৫।১ গানের ‘সম্পর্ক’ ; ।১৫।৪ তা ‘যে গানের’ ; ।১৫।৬ ‘১।১৬৭।৬,’ ; ।১৫।১৭ ঐ. আ.+ভাষ্য … ‘ব্রতস্যাবিচ্ছেদায়’। **৪৫**।৪ দৈনন্দিন ‘অধ্যেতব্য’ ; ।২২।৪ ‘যাজ্ঞ.’ ১।৪৫। **৪৮**।২ প্রচারিত। +[৩২] (পাদটীকা)[৩২] মহিদাস তাঁর চরণব্যূহসূত্রভাষ্যে কয়েকটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করেছেন, তাতে দেশ ভেদে শাখা ভেদের একটা বিবরণ পাওয়া যায় (চৌখাম্বা সং পৃ. ৩৩-৩৪)। **৫০**।৮।১ ‘সায়ণ’। **৫১**।১০।৫ আমরা ‘আর্যমণ্ডলের’ ; ।১১।৩ ‘ত্বা দধ্যঙ্ঙ্’। **৫২**।১৫।১ ঐ. ব্রা. ‘৩।১—৩।’ **৫৩**।১৬।১ এবং ‘সরস্বতী’ ; ।১৭।১ ১০২+ ; ১০।১—৭। **৫৪**।৩২।৩ ১।১৯১ ; ‘২।৪২—৪৩,’। **৫৫**।৩৮।৩ ৩।৭।৬+ ।১—৩ ; ।৩৮।৪ ‘হৌত্রং’ ক্রিয়তে। **৫৬**।৪২।৪ ‘শংসস্তি’কে ; ।৪৩।২ ‘আবিষ্কৃত’ ; ।৪৪।৩ মনসো ‘জবেষু’। **৫৭**।৪৭।৪ ‘স্থবিরঃ’। **৫৯**।৫২।১ [৫২]+২৮৭। ; ।৫৩।১ মোট ‘১৮৭৫’। **৬০**।৫ ‘উহ’ গানের …‘উহরহস্য’…‘উহগানেও’ ; ।৫৭।৩ ‘পিতৃযাণ পথে’। **৬১**।৬১।৪ হোতাসা ‘ৎসাই’ ; ৬২।৩ ‘মাঝে-মাঝে আবার’ এহী… ও ‘বাক্যস্তোভের’। **৬৪**।২২ ছিলেন, ‘যাতে’ ; ।৮০।১ ৪।২।৩, ‘৩।২০’ ; ।৮২।১ ‘পুত্রমন্থ’। **৬৬**।৮৮।১ ‘ভৃগবঃ সোম্যাসঃ’ ; ।৮৮।৫ অঙ্গিরাঃ+ঋ. ১।৩১।১, ৭৫।২, ১২৭।২, ৬।১১।৩, ১০।৯২।১৫…। **৬৭**।৯০।১ গোসূক্ত ‘৯।৭’ ; ।৯০।৩ ‘অসম্ভূতির’। **৬৮**।১০৩।১ সূক্তের ‘১১৭টিই’। **৭০**।২।৬ মহৎ ‘১০।৮।২০’ ; ।২।৯ ‘১১।৫।৫’। **৭১**।৫।৫ ব্রহ্মাণো ‘বিহুর্ন’। **৭২**।৮।৮ ‘পুরাকল্পে’। **৭৩**।৯।১ ১৩, ‘২৫।১’। **৭৪**।১৯ **ছান্দোগ্য** ‘ব্রাহ্মণ।[১২]’ ; ।১৪।২ ‘উপাসিতব্যা (৪।১৭)।’ **৭৬**।৩৪ ‘দেবতাকে,’+আরেকটি…‘দে-ভাজু’+আর ‘ত্ত-ভাজু’। **৭৭**।২০।২ ব্রাতং ‘সচেমহি’। **৭৮**।১ ‘ব্রাত্যেভ্যো ব্রাত্যধনানি য়ে ব্রাত্যচর্য়ায়া’ ; ।৫ ‘ব্রাত্য বা ইদ্’। **৭৯**।১৮ রাত্রে ‘পুবমুখী’। **৮২**।৩৬।১ ‘২।১।১’ ; ।৩৭।২ ‘প্রজা হ’ ; ৩৭।৫ ‘২।৫।১।১—২’। **৮৩**।২৮ ‘ধর্মসূত্রে[৪২]’ ; ।৪০।১ ‘*Vedic*’। **৮৪**।৫ ‘সন্দংশ’ ; ।১৮ এই ‘উপলক্ষ্যে’। **৮৬**।৫০।৫ ‘তৈত্তিরীয়ারণ্যকের’। **৮৭**।৫৪।১ বয়ুনানি ‘বিদ্বান্’। **৮৮**।২৪ ‘এইখানে।[৬৬]’। **৯০**।২৪ প্রাজাপত্য সূর্যের + মাঝামাঝি হলেন যম। প্রাজাপত্য সূর্যের। **৯১**।২৫ ছড়িয়ে পড়ে + এগিয়ে ; ।৭৯।২ ‘দ্র. ঋ. ১০।১৪’। **৯২**।৯১।২ ‘< √অজ্’ ; ।৯৪।১ ‘নালী.’ মূলত। **৯৪**।৯৬।৪ সমাপ্নোতি। +অহরহঃ

স্বাহাকুর্য়াদ্ আকাষ্ঠাৎ, তথৈতং দেৱয়জ্ঞং সমাপ্নোতি। **৯৫**।৩ 'তাঁরা উর্ধ্বমন্থী'; ।১০৩।১ তু.+শ.। **৯৬**।১।৯ 'দুর্বোধ'। **৯৭**।২৫ 'প্রবর্গ্যবিধি;[৬]'; ।২৬ 'ব্রাহ্মণ।' **৯৮**।২।৬ 'অশ্বমেধযজ্ঞে'। **১০০**।৮।১ ঋ. '২।২১।৫'। **১০৩**।১৮।২ এখানে 'যতি'। **১০৫**।২৮।২ '১।২।২৪'; ।২৮।৫ '৩।২৬।৮'; ।২৯।৬ '৬।৮।৬'। **১০৬**।৩০।৩ 'পথ … দেবয়ানান্ (১০।৯৮।১১)—'; ।৩২।৫ এই 'ভাবনাগুলি'। **১০৭**।৭ মুক্ত+আত্মা; ।২১ 'নিমেষের দিক।'; ।৩৮।১ দ্র.+ছা.। **১০৮**।৪২।২ '২।২।৪'। **১০৯**।৪৬।১ দ্র.+ঋ.; ৪৯।২ অর্থাৎ 'রূপজ্ঞান'। **১১০**।৫১।২ বা 'নিস্পন্দ'; ।৫৪।৪ আছে।+তু. জৈনদর্শনের 'লেশ্যা'। **১১১**।৫৭।১ '১০।২২' খিল। **১১২**।৫৮।১ ॥ 'রেন'; ।৬০।৫ 'ঐ. ব্রা.'; ।৬০।৬ 'তস্মাদ্', ওম্। **১১৩**।৫ 'পরমব্যোম থেকে।[৬৩]'। **১১৪**।৭০।৪ 'যিনি' আদিত্য। **১১৬**।৭৬।৮ 'শ্বানের' নো; ।৭৬।১৪ শুনেষিতং 'প্রাজ্ম'; ।৭৭।২ 'যোনিমুদ্রার'। **১২০**।৮৯।১ 'পরিষস্বজাতে'। **১২১**।১০৭।১ '১।১১৫।২'। **১২২**।১১ সিদ্ধি 'দেবসাযুজ্য'; ।১১৩।৪ ইন্দ্রিয়দ্বার+দিয়ে। **১২৩**।১১৫।২ 'রিহূর্ছন'; ।১১৭।৩ 'ব্রহ্মেদম্'; ।১১৭।৫ আদিম 'ভাতি'; ১১৭।১২ '২।৮'। **১২৫**।১৫ হয়েছে 'উর্ধ্বদিক।'; ।১২০।৩ যথাক্রমে 'অন্ন'; ।১২০।৬ 'পরস্তাদায়ুষঃ'; ।১২০।১৪ ছা. '১।৬—৭'; ।১২০।১৯ '১।২৫।১০'। **১২৭**।১২৬।১ 'অস্ত'গৃহের ।১২৮।১ অথ 'যন্নীলং'; ।১৩২।৪ 'শা.' ৭।৮। **১২৮**।১৩৪।৫ '১০।২।২।৩'; ।১৩৪।৬ নি. '১২।৪১।১'; ।১৩৫।৫ সর্ববিজ্ঞান '(৬।১।৪—৬)'; ।১৩৫।৬ নেতি নেতি '২।৩।৬'; ।১৩৭।৫ '১।১৬৪।২৫'; ।১৩৭।১০ ঐ. '৩।২৬'; ।১৩৭।১২ ঐ.+ব্রা.; ।১৩৭।১৫ 'ঋ. ৩।৬২।১০'। **১২৯**।১৩৭।২ ৫।১৪।৫ +; তু. শ. ১১।৫।৪।৩; ।১৩৭।১২ বৃ. '৬।৩।৬'; ।১৪১।১ 'ঋক্‌সংহিতায়'। **১৩১**।২১ পর্জন্য 'হন'। **১৩২**।১১ এই 'চারটি'। **১৩৩**।১৬০।২ ঐ. ব্রা. '১।৩'; ।১৬৩।২ এই 'কথার উপর'। **১৩৪**।১৬৫।৫ '১৬।১—২'। **১৩৫**।১০ তিনি 'সর্বভুক্',। **১৩৬**।১ 'ব্রহ্মবিদ' সত্যকামের। **১৩৭**।১৭৬।৪ পরমং 'গুহা যৎ'। **১৩৮**।১৮৩।১ 'অর্চিঃ'; ।১৮৩।২ 'তাদাত্ম্যভাবনায়'; ।১৮৩।৬ অক্ষিপুরুষের+উপাসনার; ।১৮৫।৭ 'ব্যাবর্তনা'। **১৩৯**।১৯০।১ ছা. '৫।১৮…'; ।১৯২।৫ 'সোমাৱতীম্' ৭। **১৪১**।২০১।৬ 'ঐ. ১।৪।১'। **১৪২**।২০১।৩ তু.+ঋ.। **১৪৩**।২০৩।১ 'অমানৱঃ' নয়; ।২০৩।২ 'যজ্ঞেন…যজ্ঞদানতপঃ'; ।২০৩।৪ 'ধূমপথে।'; ।২০৩।৯ পিতৃযাণ 'শব্দের'। **১৪৫**।৫ নাম দেওৱা+হয়েছে; ।২১০।১ 'অধ্যাত্মদৃষ্টিকে'। **১৪৭**।১৩ 'পঞ্চম' অধ্যায়েরও; ।১৬ 'মহাবাক্যটি' এই; ।২১৫।১ '২।৫'। **১৪৮**।২২৩।৫ তু. 'অস্থন্বন্তং'; ।২২৩।১৮ বলেই+সবাই। **১৪৯**।২২৬।১৪ কৃষ্ণ, 'অন্তে' শুক্ল; ।২২৬।২০ 'সমরুণৎন্নিমানি'। **১৫০**।২২৭।৭ উতো 'ত্বস্মৈ'। **১৫১**।২৩১।১ বৃ. '২।৪।১২' **১৫৩**।২৩৬।৩ 'রাশি'=অঙ্কশাস্ত্র; ।২৪১।৩ চাইতে 'আন্তর-'। **১৫৫**।২৪৯।১ তু. 'উত্তিষ্ঠত'। **১৫৬**।২৫৬।৩ ৬।৮।৬, '১৫।২'। **১৫৯**।১ 'উত্তারপন্থার' কথাই; ।১৪ 'ঘনীভূত'; ।১৯ একদিকে 'দেহত্ব'…আরেকদিকে 'শরীরত্ব'। **১৬০**।২৭০।১ 'স' ৱিদ্বান্; ।২৭৩।১ 'হিরণ্ময়ঃ' কোশঃ; ।২৭৩।২ দ্র. ছা. '৮।৫।৩, কৌ. ১।৩।৫।'; ।২৭৪।২ তস্মিন্ 'য়দ্'; ।২৭৪।৩ 'মূর্ধ্নঃ'। **১৬১**।২৭৪।১ 'নিষিক্তং'; ২৭৬।১ দিশ 'আহা'। **১৬৪**।২৯২।২ 'ৱেদে' চ; ।২৯৪।৩ 'দৈবচক্ষু),'; ।২৯৬।১ পূর্ব্যে 'যুগে'; ।২৯৮।১ আছে 'শ্বেতমদৎকম্'…'শ্বেতং' ৱর্ণতঃ; ।২৯৮।৪ সবিতা 'শ্বেত'; ।২৯৮।৫ এই থেকে 'শ্বেত'; ।২৯৮।৬ 'শ্বেত্যেকা'…'(৬।৮৩।২)'…'শ্বেনী' আর। **১৬৬**।৩০৫।২ 'হতে' উৎপন্ন; ।৩০৭।১ তৈ. '২।২।৪।৩'। **১৬৮**।৩২৩।১ হংস+বা। **১৭১**।৩৪৩।৪ তিনটি 'মন্ত্রকর্মের'। **১৭৩**।৩৫৮।৩ মো 'যু'…'মূল.।' সুক্ষত্র। **১৭৫**।৩৬৯।১ 'ঋ. ৪।২।১১'; ।৩৭১।৩ 'কো' ন; ।৩৭১।১০ '*eucho*', a prayer; ।৩৭৩।১ সঙ্গে 'যুক্ত'। **১৭৬**।৬ অক্ষরই 'আলম্বন';

।১৫ ‘হয়ে।’ তাহলে। **১৭৭**।১০ আসবে ‘সমনস্কতা’ ; ।১৫ ‘গূঢ়োত্মা[৩৯১]’ হয়ে ; ।৩৮৬ ‘শীর্ষণ্য’ প্রাণের ; ৩৮৭।৩ ‘ব্রিদ্মা’ তমুৎসং। **১৭৯**।৪০৩।১ ‘পুরের’ কথা…তস্মাং ‘হিরণ্ময়ঃ’ ; ।৪০৪।১ সংহিতায় ‘অধ্বর’…তু. ‘য়ুয়োধ্যস্মজ্’ ; ।৪০৭।২ ক. ‘২।১।১২,’। **১৮০**।৪১৬।১ ‘লোক’। **১৮১**।৪২৩।২ ১।১৬৪।‘৫’ ; ।৪৩১।১ ‘ব্রহ্মজালসুত্ত’ ; ।৪৩৭।১ সংহিতায় ‘অংহ’ ; ।৪৩৭।২ তু. ‘ঋ. অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি’ ; ।৪৩৭।৪ মুমুগ্ধ্যস্মৎ ‘১।২৪।৯’। **১৮৪**।৪৫১।৭ তোলেন+(তু. ঈ.র ‘হিরণ্ময় পাত্র’)। **১৮৫**।৪৫৭।২ ‘দেৱাঞ্জগত্যা ৱিবেশ’। **১৮৭**।৪৭৩।১ ৱরুণো ‘ৱস্ত’ ; ।৪৭৪।১৩ সঞ্চারিত হল + প্রধ্বংসনে। **১৮৮**।৪৯১।২ ‘(১৯০।১)’। **১৮৯**।৪৯৩।১ ত্রয়াণি ‘১২।১৯’ ; ।৪৯৫।২ তদ্ ‘বিশ্বমুপ জীৱতি’ ; ।৫০১।২ ॥ ‘*ঈজ্ তু. ঈজানঃ ক. ১।৩।২’। **১৯০**।৫১৩।২ প্রাণকে ‘শীর্ষণ্যও’ ; ।৫১৩।৩ শিখাই+(; ।৫১৫।১ এই ‘পুরুষবিধতার’। **১৯১**।৫২৫।১ দ্র. ‘ঋ. ৩।২’। **১৯২**।১০ হন ‘ব্রহ্ম’ ; ।৫২৭।১ ‘জভারামথ্নাদন্ন্যং’…ঋ. ১।৯৩।‘৬’) ; ।৫২৮।১ ‘ঐ. ১।৩।১২’… ; ।৫৩১।৩ ‘আরভমাণা ভুৱনানি ৱিশ্বা’ ; ।৫৩৯।২ ‘ঋ. ৩।৬।১০’ টীকা। **১৯৩**।৫৪৪।২ তাই ‘সন্ধাতা’। **১৯৪**।৯ ‘জন্মান।[৫৫৪]’। **১৯৫**।২০ ‘(objective)’। **১৯৬**।৫৬৭।৬ দ্র. ‘ক. ২।৩।৫’ ; ।৫৭২।১ ‘মৃন্ময়কে’ চিন্ময়। **১৯৭**।১২ ধর ‘দুন্দুভি’ ; ।৫৮০।১ সত্যস্থ ‘করণানি’। **১৯৮**।৫৯৫।৪ সোমপানের ‘ফলশ্রুতি’ ; ।৫৯৬।১ হল ‘দৃক্’। **১৯৯**।৬০০।৭ ‘প্রবক্তা’, বিষ্ণুর ; ।৬০১।২ ‘অথর্ৱাবোচৎ’। **২০১**।৭ যেখানে ‘আছেন।[৬১৫]’ ; ।৬১৫।৩ ‘সূত্রাত্মা’। **২০৪**।৬৩৪।২ ‘দেওৱা)॥’ ; ।৬৩৭।২ কৌ. ‘৪।১৯’ ; ।৬৪১।১ আনন্দ ‘সন্মাত্র’। **২০৮**।৬৭৪।১ ‘অক্রন্দদিত্যন্বাহ’। **২০৯**।৬৮২।২ ‘নিরয়ণ’। **২১২**।৭০৪।২ ‘৫৬’।৩। **২১৩**।৭২৬।১ ‘অস্থরস্থ’ নামা। **২১৪**।৭৩৩।২ ‘শীর্ষণ্য’। **২১৯**।৯ সর্বত্র ‘প্রসারিত।’। **২২০**।১৮ বৈশ্বানর,+স্বপ্নে ; ।৭৯১।১ ‘সর্বতাতি’ সবার ; ।৮৯৩।২ ‘শ্রুতি’+ঋ. ; ।৭৯৯।২ ‘পুষ্করাত্থর্বা’ ; ।৮০০।১ ‘শা.’ আ.। **২২২**।১।২ ৪৫)+১০ ; ।৫।১ তু. ‘ময়´’। **২২৩**।৯।২ ১০।৭১+সূক্ত। **২২৪**।৮ ‘তৈত্তিরীয়প্রাতি-শাখ্যসূত্র’ ; ।৯ ‘বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যসূত্র’। **২২৫**।১৯।২ ‘(১০।১১৩।১০)’ ।**২২৬**।২০।৪ হুঁশ ‘আছে।’’ ; ।২৪।২ ৮।‘২২’।২। **২২৭**।২৯।১ ১।১২—‘১৪’ ; ।৩০।৬ ‘সামের’ অনিরুক্ত… ; ।৩৩।২ ‘৩।১৭’। **২২৮**।৯ হয় ‘দিবাভাগ’। **২৩০**।৫১।২ p. ‘271’। **২৩১**।১৩ ‘ৱারাহশ্রৌতসূত্র’ ; ।১৯ ‘হিরণ্যকেশি-’ ; ।২০ ‘ৱারাহ-শুল্বসূত্র’। **২৩২**।৫৪।৪ পুত্রাঃ+৬।৬৭।৯। **২৩৬**।৬৬।৮ ‘ঋক্‌ৱতা’ গণেন ; ।৬৬।১৩ ১০।৬৭।‘৫’ ; ।৬৬।২৬ এইটি লক্ষণীয়+দ্র. Kali Kumar Datta, Date of Gaṇeśa Worship *Indian History Congress* (Bombay 1960) pp. 150 ff. ; ।৬৮।৩ ঋ. ‘মা’। **২৩৭**।২০ ‘করব পরবর্তী এক অধ্যায়ে,’।

———